সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

৭ম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

৭ম খন্ড

সূরা আল আ'রাফ

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক
মাওলানা কুতুবুল ইসলাম

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(৭ম খন্ড সূরা আল আ'রাফ)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
স্যুট ৫০১ ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ২২৩ রিজেন্ট ষ্ট্রীট, লন্ডন ডব্লিউ ১ বি ২কিউ ডি
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৯৫৬ ৪৬৬৯৫৫
বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬
বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
১১ ইসলামী টাওয়ার, (নীচতলা), দোকান নং ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭
প্রথম সংস্করণ
১৯৯৭
৮ম সংস্করণ
রবিউস আউয়াল ১৪৩০, মার্চ ২০০৯, চৈত্র ১৪১৫
কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত বিশ টাকা মাত্র

❑

Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author
Syed Qutb Shaheed
Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed
7th Volume
(Surah Al A'raf)

Published by
Khadija Akhter Rezayee
Director Al Quran Academy London
Suite 501 International House 223 Regent Street London W1B 2QD
Phone & Fax : 0044 020 7274 9164 Mob : 07956 466955
Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526
Sales Centre: 507/1 Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)
11 Islami Tower (Garand Floor), Stall No- 36, Bangla Bazar, Dhaka
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997
1st Edition 1997
8th Edition
Rabiul Awal 1430, March 2009
Price Tk. 220 .00
E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN-984-8490-21-3

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্‌সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক—এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়- হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত- এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা ইতিমধ্যেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে—

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ–আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না-এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে এককেবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না–না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যর সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ক্রটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'
অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও
ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা আল আ'রাফ

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত, ঠিক সূরায়ে আনয়াম-এর মতোই। এর আলোচ্য বিষয় তাই, যা অন্যান্য মক্কী সূরার মধ্যে সাধারণভাবে দেখা যায়। অর্থাৎ মানুষের অন্তরের গভীরে প্রোথিত আকীদা সম্পর্কিত বিশেষ আলোচনা। কিন্তু এসত্তেও এই একই বিষয়ের ওপর দুটি সূরার মধ্যে আলোচন্য কত বৈচিত্র্যময় তা লক্ষণীয়। আসলে আকীদা বিশ্বাসের বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক আলোচনার দাবী রাখে।

আল কোরআনের প্রত্যেকটি সূরাই স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রত্যেকটির রয়েছে নিজের কিছু এমন বিশেষত্ব যা অপর সূরা থেকে তাকে আলাদা করে রাখে। প্রত্যেকের রয়েছে নিজের পৃথক বর্ণনাভংগি এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট। এই একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন দিক দিয়ে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সামনে রেখে আলোচনা করা হয়েছে, কারণ বিষয়টি অতি বড়, অতি মহান।

বিষয় ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি মক্কী সূরাতে রয়েছে একই সুরের মূর্ছনা। এতদসত্তেও প্রত্যেকটির রয়েছে নিজস্ব স্বতন্ত্র দৃষ্টিভংগি, আকর্ষণীয় পৃথক পৃথক বর্ণনাভংগি ও পদ্ধতি এবং ক্ষেত্র ভেদে এ বিষয়টির ওপর বহু রূপের আলোচনা। এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যেই বিভিন্ন সূরাতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে।

আল কোরআনের মর্যাদা বুঝতে হলে আমাদের একবার সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষের মর্যাদার দিকে তাকানো প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি জগতের মধ্যে কেমন ধরনের আদর্শ বানিয়ে সৃষ্টি করেছেন ! বিশ্ব-চরাচরে যতো আদম সন্তান আমরা দেখছি, সবাই তো মানুষ, প্রত্যেকের মধ্যেই মানুষের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার প্রত্যেকটি অংগ-প্রত্যংগ ও গঠন প্রণালীতে ও কর্মকান্ডে পরিদৃশ্যমান হয়ে রয়েছে মানবীয় সকল আকার-আকৃতি। এতদসত্তেও এদের মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন রূপের মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন। একজনের সাথে অন্য জনের কিছু বৈচিত্র্যময় সাদৃশ্য বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বহু বিষয়ে তাদের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য সৃষ্টিকারী দারুণ রকমের বৈসাদৃশ্য, যা মানুষ নামের পরিচয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তাদের একত্রিত করতে সক্ষম নয়।

এভাবেই আমি মহাগ্রন্থ এই পবিত্র কালামের সূরাগুলোকে গণনার মধ্যে নিয়ে এসেছি। অনুভব করেছি এইভাবে এবং আল কোরআনের ছায়াতলে দীর্ঘকাল থেকে আমি এইভাবে বাস্তব জীবনে আল্লাহ পাকের এই পবিত্র গ্রন্থ বাস্তব কাজে প্রয়োগ করেছি, দীর্ঘ দিন ধরে মোহব্বত করেছি এই পাক কালামকে এবং এর প্রত্যেকটি কথা ও নির্দেশকে প্রকৃতি সংগত ও আমার জীবনের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেয়ার জন্যে প্রতিটি মুহূর্তেই প্রেরণাদায়ক হিসাবে পেয়েছি।

আর আমি আল কোরআনের মধ্যে এরপরই দেখতে পেয়েছি বহু প্রকার মানুষের মডেল। দেখেছি বিভিন্ন প্রকারের মানুষকে, যারা নিজেদের চেষ্টা বলে নিজেদের যোগ্যতা ও মান সম্ভ্রমকে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে। দেখেছি কোরআনের ছোঁয়া বহু দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তির অবস্থার আশাতীত উন্নতি।

এই সকল মানুষ, যারা ভালো হওয়ার চেষ্টা করেছে, তারা পরস্পর বন্ধু হিসাবে নিজেদেরকে পেয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই সত্যপ্রিয় এবং একে অপরের সঠিক বন্ধু। প্রত্যেকেই সত্যিকারের প্রেমিক, যার অন্তর মোহব্বতে ভরা। এ মানব-প্রেমিক বন্ধুদেরকে আমি সচ্ছল দেখতে পেয়েছি, পেয়েছি তাদেরকে বিভিন্ন দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী, সুন্দর ও পরোপকারী বন্ধু হিসেবে।

এই সৎ চিন্তাশীল, সৎ কর্মশীল ও দানশীল ব্যক্তিদেরকে মানুষের ভালোবাসার পাত্র হিসাবে পেয়েছি। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন প্রবাহ এগিয়ে চলেছে এবং মানুষের অজান্তেই ওই সৎ ব্যক্তিদের প্রভাব তারা গ্রহণ করেছে। সকল কিছুর মধ্যেই তারা জীবনের স্বাদ খুঁজে পেয়েছে এবং সকল সংকটাবর্তে তারা নিজেদের জন্যে সমাজে এক বিশেষ স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

সূরাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সাবলীলতা দেখা যায়। যে সব নিদর্শন ও দৃশ্যাবলী, যেসব চিন্তা উদ্রেককারী তত্ত্ব ও তথ্য প্রতি মুহূর্তে এবং প্রতি জিনিসের মধ্যে ফুটে উঠেছে, তা আমার প্রাণকে উজ্জীবিত করেছে, অন্তরের গভীরে তা প্রভাব বিস্তার করেছে এবং সৃষ্টির সব কিছুকে আমার নযরে সুষমা মন্ডিত করে তুলেছে। কিন্তু এটাও সত্য যে, প্রত্যেকটি সূরার মধ্যে এমনই হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা রয়েছে, যা মানুষের মনের মধ্যে স্নেহের এক মধুর পরশ বুলিয়ে দেয়।

সূরায়ে আন্‌য়ামের আলোচ্য বিষয় যেমন আকীদা, তেমনই সূরায়ে আরাফের মধ্যে আলোচিত বিষয়বস্তুও ওই একই আকীদা। কিন্তু দেখা যায় সূরায়ে আনয়ামে শুধু আকীদা সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে, কিন্তু আ'রাফে আলোচনা শুধু আকীদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আকীদার বিষয়বস্তু ও এর তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়ের আরব জাহেলিয়াতের চেহারা প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে ওই জাহেলিয়াতের মতোই অন্যান্য সকল জাহেলিয়াত ও তাদের প্রকৃতির দিক দিয়ে একই প্রকার; অর্থাৎ জাহেলিয়াতের প্রথম কথাই হচ্ছে মানুষের সুস্থ বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য যুক্তিকে দেখেও না দেখা এবং ব্যক্তি-স্বার্থের কারণে সকল যুক্তিকে উপেক্ষা করা। এই অর্থে, অতীতে আরবদের মধ্যে যেমন হঠকারিতা ও ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে হীনতা প্রদর্শন করা হতো, আধুনিক বিশ্বেও এই একই প্রকার কুক্ষিগত ও সংকীর্ণমনা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিয়ত সত্যের বিরোধিতাই শুধু নয়, বরং সত্যের বাতিকে চিরতরে নিভিয়ে দেয়ার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে যে বিষয়ে কখনও সংক্ষেপে এবং কখনও বিস্তারিতভাবে আমরা সপ্তম পারাতে এবং এই পারাতেও আলোচনা করেছি। আমরা আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক এই অধ্যায়গুলোর সামনে দাঁড়িয়ে (চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে) ততোক্ষণ অপেক্ষা করেছি যতোক্ষণ আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন। আমরা ইতিমধ্যে সূরায়ে আনয়ামের মধ্যে এই সূরার অনুরূপ কর্মপদ্ধতির দিশা এবং একই পথ পরিক্রমার রূপরেখাও দেখে নিয়েছি।

আমরা সূরায়ে আ'রাফে পূর্ববর্তী সূরার অনুরূপ আলোচনাই মুখ্যতর দেখেছি। দেখেছি এই সূরার মধ্যে আলোচিত বিষয়টি অন্য আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে এবং তা আলোচিত হয়েছে গোটা পৃথিবীর মানুষের ইতিহাসকে সামনে রেখে পৃথিবীর এ জীবন যে নিশ্চিন্তভাবে এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের ক্ষেত্র নয় বরং এ হচ্ছে চলমান এক ভ্রমণক্ষেত্র মাত্র। এর যাত্রা সত্যিকারে শুরু হবে জান্নাতে পৌঁছানোর পর এবং যখন আল্লাহর দরবারে মানুষ পৌঁছুবে তারপর থেকে। এ যাত্রার শেষ যেখানে– সেখান থেকে এর শুরু (অর্থাৎ এ যাত্রার কোনো শেষ নেই, নেই এ ভ্রমণের কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থান। মহাকাল ধরে চলবে সেখানে এ অনন্ত জীবন)। এই সুদীর্ঘ সময়ে ঈমানের প্রতিফল পাওয়া যায়। বরং বলা যায় ঈমানের মেলা বসবে সেখানে মহা-সমারোহে, যার কোনো শেষ হবে না। এ সৌভাগ্যের মেলার পরিচালক হবেন আদম (আ.) থেকে নিয়ে মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত সকল নবী রসূলের কাফেলা। এ মহান জামায়াতের সবার মধ্যে বিরাজ করেছে এই একই আকীদা। সারা বিশ্বের ইতিহাসের সর্বত্র মূর্ত হয়ে রয়েছে এই কাফেলা

এবং যুগ যুগ ধরে এই আকীদার ভিত্তিতে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আর এই বিষয়টিই এই সূরার মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে, কেমন করে বিভিন্ন যুগের মানবগোষ্ঠিকে এই নবীরা সম্বোধন করেছেন আর তারা কিভাবেই বা তার জবাব দিয়েছে! কি ভাবে এইসব জনগোষ্ঠী নবীদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্যে ওঁৎ পেতে থেকেছে। এভাবে নবী রসূলদের কষ্ট দিয়ে কি জঘন্য অপরাধ না তারা করেছে। আরো আলোচনা এসেছে এ সূরাটির মধ্যে তাদের– যারা আল্লাহর দ্বীনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে আদা-পানি খেয়ে লেগেছিলো তাদের সম্পর্কে পরিণতি দুনিয়াতে কি ভয়ংকরই না হয়েছিলো যে সম্পর্কে ! ইতিহাসের এই বর্ণনাধারা এবং মানবমন্ডলীর সত্যের সাথে সদ্ব্যবহার ও দুর্ব্যবহারের এ ইতিহাস অনেক অনেক দীর্ঘ কিন্তু পর্যায়ক্রমে এ সুদীর্ঘ যাত্রা পথের বাধা অতিক্রম করে এ সূরাটিতে প্রত্যেকটি বিষয়ের বিশদ বর্ণনা এসেছে। বংশের পর বংশ ধরে এবং যুগের পর যুগ ধরে এ সূরার আবেদন মানবমন্ডলীকে সম্বোধন করে এই বিশ্বাস গ্রহণ করার কথা বলে এসেছে। এরপর দেখা যায় সূরাটির বর্ণনাভংগি যেন বলছে, দাওয়াতে দ্বীন নিয়ে যারা মানুষের কাছে গেছে, তাদের সাথে মানুষ কি ব্যবহার করেছে এবং তাদের ডাকে কিভাবে তারা সাড়া দিয়েছে? আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীরা কিভাবে তাদেরকে সম্বোধন করেছে, আর তারাই বা কিভাবে এর জবাব দিয়েছে? কিভাবে মানবগোষ্ঠী এ সত্যের দিশারীদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্যে চেষ্টা চালিয়েছে এবং 'দায়ী ইলাল্লাহ' (সত্যের দিকে আহ্বানকারী) ব্যক্তিদেরকে কিভাবে সত্য-বিরোধীদের রক্ত চক্ষু এড়িয়ে তাদের পাতানো ফাঁদ পার হয়ে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর কাজ অবিরাম চালিয়ে গেছে? এরপর দুনিয়াতে এবং পরকালে এইসব সত্য বিরোধী ও সত্যাশ্রয়ী লোকদের কি কি পরিণতি হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ ও সূরাটির মধ্যে পাওয়া যায়।

এ সফর অনেক অনেক লম্বা.... কিন্তু সূরাটি ক্রমে ক্রমে একটির পর আর একটি ধাপ এগিয়ে চলেছে তার মন মাতানো গতিময় ছন্দের সাথে এবং এগিয়ে চলেছে চিহ্নিত পথে বিশ্বব্যাপী ফলকে প্রকাশিত সত্যের চিহ্নগুলোর প্রতি অংগুলি সংকেত করে। আল্লাহর শক্তি ক্ষমতা প্রকাশক এসব চিহ্ন এতো স্পষ্ট যে, যে কেউ খেয়াল করলে এগুলো থেকে শিক্ষা নিতে পারে। এসব চিহ্ন সদা-বিরাজমান, কোনো ছোট খাটো বা তুচ্ছ চিহ্ন এগুলো নয়, বরং সাধারণ দৃষ্টিতেই এগুলো ধরা পড়ে। সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর মানুষ ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু ভীতসন্ত্রস্ত হৃদয়ে আবার পিছিয়ে আসছে, ফিরে আসছে তারা সেই স্থানে যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলো। অর্থাৎ উত্থান, পতন, আবার উত্থান এই নিয়মে মানুষের জীবন এগিয়ে চলেছে। অবশেষে তার সেই বেহেশতেরই দিকে যেতে হবে, যেখান থেকে সে এই মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছিলো, একথা ভুলে গেলে চলবে না।

স্বাভাবিকভাবেই মানুষ এক বিশেষ স্থান থেকে তার জীবনযাত্রা শুরু করেছে। বাবা আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী মা হাওয়া (আ.)– এই দুইজন মানুষ থেকেই মানুষের এই মহা পরিবারের যাত্রা শুরু। তখন এদের সাথে, এদেরকে ও এদের সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ট করার অনুমতিপ্রাপ্ত শয়তানও তার যাত্রা শুরু করলো। অপরদিকে বাবা আদম ও মা হাওয়াও আল্লাহর সাথে একমাত্র তাঁরই আনুগত্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন এবং তাঁদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে (এই চুক্তিতে তারা দৃঢ় থাকে কিনা এবং উপস্থিত লোভনীয় বহু জিনিসের টানে না-ফরমানী করে কিনা) তাদের কিছুটা স্বাধীনতা দেয়া হলো। এই এখতিয়ার দেয়া হলো যে, তারা চাইলে আল্লাহ তায়ালারই হুকুম মতো জীবন যাপন করবে, অথবা তাদের ইচ্ছা হলে এবং শয়তানের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে পড়লে তার

দিকেও তারা ঝুঁকে পড়তে পারবে। আল্লাহ তায়ালা প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন যে, শয়তান তোমাদের জাতশত্রু, (যে তোমাদেরকে ধোকা দিয়ে জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়ার বুকে নামিয়ে আনার জন্যে দায়ী) সে তোমাদেরকে ক্ষতি ও বিপথগামী করার জন্যে সর্বপ্রকার সুযোগ ব্যবহার করবে, অতএব তার থেকে সাবধান থেকো। এসব সতর্কবাণী সত্তেও তার দেয়া লোভ ও লোভনীয় বস্তুর আকর্ষণ থেকে মানুষ মুক্ত থাকতে পারে কিনা সে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্যেই ছিলো আল্লাহর এ পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষার প্রয়োজনেই তাদের আদি পিতামাতাকে জন্যে এবং তাঁদের বংশধরদেরকে এ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। মানুষের পরীক্ষার মধ্যে এটাও ছিলো যে, ডান ও বাম দিক থেকে শয়তান এসে তাকে ভুলপথে নেয়ার চেষ্টা করবে, যার প্ররোচনায় দুঃখ কষ্টের স্থান এ দুনিয়াতে তাদের আসা, তার ও তার উপস্থাপিত লোভনীয় জিনিস থেকে সতর্ক করার জন্যে নবী-রসূলরা আসবেন, তখন শয়তানও সুন্দর করে তার সামনে তুলে ধরবে উপস্থিত লাভ ও লোভের জিনিসকে। এ অবস্থায় তখন সে কোনো্টা গ্রহণ করবে?

পবিত্র ও মহান আল্লাহর কাছ থেকে পৃথিবীর দিকে মানুষের যাত্রা শুরু হয়েছে। এখন সে চতুমূখি অবস্থার সম্মুখিন, অন্যায় কাজও করছে, ভালো কাজও করছে আবার কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে আবার নিজেই কখনো অশান্তি ঘটাচ্ছে। গড়ছে কখনও, ভাংছে কখনও, প্রতিযোগিতা ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে আবার মারামারি কাটাকাটিতেও লিপ্ত হয়ে পড়ছে। এ ধরার বুকে একটু ভালো থাকা ও খাওয়া পরার জন্যে দুষ্ট-প্রকৃতির ও ভালো মনের সকল মানুষ নিরন্তন চেষ্টা সাধনা করে চলছে। এরপর অনুতপ্ত হৃদয়ে সেই স্থানে ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে যেখান থেকে প্রথমে রওয়ানা হয়েছিলো। আর এই দীর্ঘ সফর কালে যা কিছু সে উপার্জন করেছে তাই সাথে করে নিয়ে যাবে। যা কিছু কামাই করেছে এ জীবন পরিক্রমায়, ফুল ও কাঁটা, দামী ও সস্তা, মূল্যবান ও তুচ্ছ জিনিস, ভালো ও মন্দ, কল্যাণকর এবং অকল্যাণকর সব কিছুই সে তার সাথে নিয়ে যাবে। যা কিছু আজকে সে আনবে তারই সে মালিক হবে– তার পরিণাম তাকে ভোগ করতে হবে।

অতএব, এটা স্পষ্ট যে, তার যাত্রা সেই দিকে যেখান থেকে সে রওয়ানা হয়েছিলো এবং সেখানেই অবশেষে সে পৌঁছে যাবে। সূরাটি অধ্যয়ন কালে এই কথাগুলোই আমরা জানতে পারছি! এখানে এই সূরার বর্ণনার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারাটা পৃথিবী ভর্তি হয়ে আছে নানা প্রকার জিনিসে ও মানুষে। কোথায় ছিলো এসব বস্তু ? বিশেষ করে মানুষগুলো কোথায় ছিলো। এসব মানুষ তার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে, তাই নিয়ে তারা ফিরে যাবে যা তারা করছে। দলে-দলে ভ্রমণ করার পর পথেই তাদের একদিন যাত্রা বিরতি ঘটবে। অবশেষে তাদের রওয়ানা হওয়ার সেই প্রথম স্থানে যখন পৌঁছে যাবে, তখন প্রত্যেকের আমল দাঁড়িপাল্লার সামনে রাখা হবে, তখন সে ভীতসন্ত্রস্ত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। কেউ কাউকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসবে না, তা সে আত্মীয়স্বজন যেইহ হোক না কেন! প্রত্যেকের হিসাব পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করা হবে এবং তার প্রতিদান সে পেয়ে যাবে।

সূরাটির মধ্যে আর এক প্রসংগের বর্ণনায় আর এক শ্রেণীর মানুষের দলীয়ভাবে ঐ ভয়ংকর দিনের আগমন সংবাদ দেয়া হয়েছে– এরা জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবে, কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছুতেই, জান্নাতের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে– এরা আসলে পৃথিবীর বুকেও ছিলো এমনি। এদের সম্পর্কে কালামে পাকে বলা হয়েছে, 'তোমাদেরকে যেভাবে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিলো,

তেমনি করে তোমরা আবার ফিরে যাবে। এদের মধ্যে একদল তো সঠিক পথেই চলছে এবং আর এক দলের পথভ্রষ্টতাই অবধারিত হয়ে গেছে। ওরা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু পরিচালক বলে গ্রহণ করছিলো, অথচ তারা মনে করছিলো যে, তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।'

আর সকাল-সন্ধ্যা সত্য ও মিথ্যা (হক ও বাতেল)-এর মধ্যে সংগ্রাম চালু রয়েছে, এ সংগ্রাম হেদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে, এ সংগ্রাম নবী-রসূলের দল এবং সম্মানিত মোমেন দলের সাথে অহংকারীর দল ও সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞানকারীদের সংগ্রাম। এ দ্বন্দ্ব একবার হয়েই শেষ হয়ে যায় না, বরং বরাবর এ সংঘাত সংঘর্ষ চলে এসেছে এবং চলতে থাকবে। আর এসব যুদ্ধের ফলাফলও একই। এসব সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই ঈমানের পাতা শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে আর কুশ্রী কদাকার হয়ে ওঠে মিথ্যার পাতা। এমনি করে মিথ্যার ধ্বজাধারীরা সত্যের বিরুদ্ধে মাথা তোলে এবং সুযোগ পেলে হেদায়াতের ধারক-বাহকদেরকে আক্রমণ করে। এ বিষয়টিকে আলোচ্য প্রসংগ তুলে ধরেছে যেন এর থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং অন্যায়কারী ও অহংকারী না-ফরমানের দল সতর্ক হতে পারে। পবিত্র এসব স্মৃতি সূরার মধ্যে এক বিশেষ ধারায় পেশ করা হয়েছে। তারপর প্রতিটি স্তর পার হওয়ার পর দেখা যায় নতুন আর এক সংঘর্ষ এগিয়ে আসে। সেখানেও অবশেষে সত্যেরই বিজয় হয়। এইভাবে চলতে থাকে এসব বিবরণধারা।

সমগ্র মানব জীবনের আগমন ও প্রত্যাবর্তনের কাহিনী এক নির্দিষ্ট ধারায় এ সূরার মধ্যে পেশ করা হয়েছে। যার মধ্যে ফুটে উঠেছে মানব ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আল্লাহ যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কথা। তারপর দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী এ আন্দোলনের সুদূর-প্রসারী ফলের বর্ণনা এসেছে। দেখানো হয়েছে কেমন করে সেই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে যা শুরুই হয়েছিলো দ্বীন প্রতিষ্ঠার মিশন নিয়ে। এই হচ্ছে এ সূরা মধ্যে বর্ণিত আর একটি দিক যা সূরায়ে আনয়ামে বর্ণিত হয়নি, যদিও দেখা যায় মিথ্যার ওপরে প্রতিষ্ঠিত দল এবং মিথ্যা ব্যবস্থাকে বিজয়ী করার জন্যে চেষ্টারত দলের চেহারা তুলে ধরার ব্যাপারে এবং কেয়ামত ও সৃষ্টিকুলের গতি-প্রকৃতির বর্ণনা করার ব্যাপারে দুটি সূরা একই প্রকারের ভূমিকা পালন করেছে। তবে, দুটি সূরার বর্ণনাভংগি এতোটা ভিন্ন যে, পাশাপাশি পাঠ করলে এ পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দুটি সূরার পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করলে অবশ্য এই পার্থক্য ধরা পড়ে। প্রত্যেকটি সূরার মধ্যে আলোচিত বিষয়ের সাথে সংগতি রেখেই তার ব্যাখ্যা আসে। আর প্রসংগক্রমে এখানে বলা দরকার যে, সূরায়ে আনয়ামে আকীদা বিশ্বাসের বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে দফায় দফায়, যেমন করে একটি ঢেউ শেষ হতে না হতে আর একটি ঢেউ আছড়ে পড়ে বালিয়াড়ির ওপরে। আর এসময়ে দৃশ্যপটে যে ছবিগুলো ভেসে ওঠে তা কম্পমান, সমুজ্জ্বল এবং হৃদয় আকর্ষণকারী। মনোরম এ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে মন পুলকিত হয়, নেচে ওঠে ধমনী। এ ঘটনাগুলো যখন ঘটে, তখন গানের সুরের মতোই তা মধুর লাগে, কি দ্রুতগতিতে ও হঠাৎ করে এসব দৃশ্য হৃদয়াবেগের মধ্যে এনে দেয় অভাবনীয় এক উচ্ছ্বাস। কিন্তু আ'রাফের বর্ণনা প্রসংগ এইভাবে আবেগ সৃষ্টি করার পরিবর্তে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে ঘটনাগুলো পেশ করে সহজভাবে বাস্তব কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করার আহব্বান জানিয়ে। এ যেন বিশাল এক কাফেলার সুদীর্ঘ সফরের শিহরণ জাগানো অভিজ্ঞতা, যদিও তা প্রতি মনযিলে নব নব রূপে আসে এবং সফরের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এ বৈচিত্র নিত্য নতুন আকারে হাযির হয়। তবে নতুন নতুন ঘটনার আগমন কখনও কখনও কঠিন অবস্থা বয়ে নিয়ে আসে, বিশেষ করে যে সব পথে চললে এবং যে সব কাজ করলে শাস্তির ভয়

দেখানো হয়েছে, সে বিষয়ে সতর্ক না হলে প্রায় সময়েই এহেন কাফেলার ভাগ্যে দারুণ বিপর্যয় নেমে আসে যা তাদেরকে ওলট-পালট করে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেয়– এমন ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অহংকারী ও না-ফরমান যাত্রীদের কপালে। এর সাথে সূরা দুটির মধ্যে বড় ও উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য হচ্ছে– সূরা দুটির উভয়ই মক্কায় অবতীর্ণ।

আর সম্ভবত এ পর্যায়ে সূরাটির বাস্তব কর্মসূচী ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করে নিলে সূরাটির অধ্যয়ন করা এবং এর মধ্যে আলোচিত আকীদার বিষয়বস্তু বুঝা সহজ ও সুন্দর হবে, আর এ মহান আকীদা মানুষের ইতিহাসের স্রোতধারায় কি পরিবর্তন এনেছে তাও হৃদয়ংগম করা সহজ হবে।

অবশ্য এটা ঠিক যে, মানবেতিহাসের মধ্যে এই আকীদার কাহিনীটি কি পরিবর্তন সাধন করেছে, প্রধানত সূরাটি সে কথা পেশ করেনি এবং সৃষ্টির সূচনা থেকে নিয়ে এর পরিসমাপ্তি পর্যন্ত মানুষকে কি কি পর্যায় অতিক্রম করতে হবে সে বিষয়েও তেমন কোনো কিছু জানায়নি। শুধু জানিয়েছে পর্যায়ক্রমে সংঘটিত ঘটনাবলী, তাও অনেকটা কেসসা বর্ণনার পদ্ধতিতে। অবশ্য, জাহেলিয়াতের সাথে সংঘর্ষের কথা দৃঢ়তার সাথে জানিয়েছে। এরপর সূরাটির বিভিন্ন দৃশ্য ও গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আর এই সমস্ত দৃশ্য ও পদক্ষেপের বর্ণনা ওইসব মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে সরাসরি যারা আল কোরআনের আহ্বান পাচ্ছিলো। কোরআনুল করীম তাদের সামনে অতীতের ওইসব দীর্ঘ কাহিনী তুলে ধরছে– যার বর্ণনা মনে গভীর রেখাপাত করে। তাদেরকে সম্বোধন করে পবিত্র গ্রন্থ যখন কথা বলতে শুরু করেছে, তখন কখনও তাদেরকে উপদেশ দিয়েছে অথবা না-ফরমানীর কারণে আযাবের ভয় দেখিয়েছে। তাদেরকে একথাও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে তারা যে মত ও পথের ওপর রয়েছে তা পরিত্যাগ না করলে তাদের সাথে রসূল ও তাঁর সংগী-সাথীদের সংঘর্ষ অনিবার্য এবং এ সংঘর্ষ শেষে তাদের ওপর ভয়ানক শাস্তি নেমে আসবে। জানানো হচ্ছে যে, এ শাস্তির মধ্যে অবশ্যই তাদেরকে পড়তে হবে যাদেরকে আল কোরআন সত্যের দিকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে এবং যারা এ আহ্বানকে জেনে বুঝে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তাদের সত্য বিরোধিতার কারণে এ শাস্তি তাদের ওপর নেমে আসবে মানজীবন শেষে সীমাহীন পরকালীন জীবনে এবং সত্য জানা সত্তেও তাতে সাড়া না দেয়ায় পরিশেষে এরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

আল কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলীর উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই ঘটনার মাধ্যমে কোনো একটি বাস্তব পরিস্থিতির মোকাবেলা করা। আর সত্য প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে কোনো মিথ্যাকে দূরীভূত করা। জীবন্ত সমাজেই কোনো জীবন্ত আন্দোলন গড়ে ওঠে। সুখী-সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়ার কাজের জন্যেই ইসলামের আন্দোলন। সুতরাং শুধু দর্শন ও চিন্তা ভাবনার উন্মেষ ঘটানোর জন্যেই ইসলামের আন্দোলন সৃষ্টি হয়নি, অথবা কোনো ঘটনার বর্ণনা অযথা শুধু গল্প বলার উদ্দেশ্যেই করা হয়নি বা কোনো সাহিত্য সৃষ্টির জন্যেও তা বলা হয়নি!

অতীতের না-ফরমান জাতিসমূহের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব গযব নেমে এসেছিলো আল কোরআনে তার বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো সন্ধিৎসুদের উপদেশ দান এবং হঠকারী জাহেল ও ক্ষমতাগর্বী ইসলাম দুশমনদেরকে সতর্ক করা। এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আল কোরআনের এসব ঘটনাবলীর অবতারণা। ঘটনার আলোকে আন্দোলনের সূচনা-বিন্দুকে কেন্দ্র করে যেমন কথা বলা হয়েছে তেমনি কথা বলা হয়েছে পরিসমাপ্তি বা পরিণতিকে কেন্দ্র করে। ইতিহাসের এসব পাতা জুড়ে রয়েছে নূহ-জাতি, হূদ জাতি, সালেহ জাতি, লূত জাতি ও শোয়ায়ব জাতির কেসসাসমূহ। এসব জাতির মধ্যে মূসা (আ.)-এর জাতির ঘটনাটি এসেছে সবচেয়ে বিষদভাবে।

শুরুতেই আমরা এমন কিছু উদাহরণ পেশ করতে চাই যেগুলোকে কেন্দ্র করে মহা গ্রন্থ আল কোরআন নাযিল হয়েছে। দেখুন কেমন করে সূরাটি শুরু হচ্ছে,

'আলিফ লা-ম মী-ম সোয়াদ। এ হচ্ছে একটি কেতাব যা তোমার কাছে নাযিল করা হলো, অতএব এর প্রচারের ব্যাপারে তোমার মনের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা যেন না থাকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি যেন মানুষকে সতর্ক করতে পারো এবং মোমেনদের জন্যে এ কেতাব এক মহা উপদেশমালা। তোমরা তারই অনুসরণ করো, যা তোমার রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে নাযিল হয়েছে, আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অনুসরণ করো না। আসলে তোমরা খুব কমই তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকো।'

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমেই সম্বোধন করা হয়েছে রসূলুল্লাহ (স.)-কে এবং তাঁর সেই সাথীদেরকে যারা অন্যদের বিরুদ্ধে এই কোরআনের সাহায্যেই জেহাদ করে চলেছে। আর এরপর এখানে, মহাকাল ধরে মানুষের সফরের বর্ণনা এসেছে, এসেছে সুনির্দিষ্ট এই সফর শেষে তার প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা। সৃষ্টির বুকে বিরাজমান যে সব দৃশ্যের বর্ণনা তার সামনে পেশ করা হয়েছে এবং কেয়ামতের দিনে যে অবস্থা হবে তাও জানানো হয়েছে। এসব কিছুর সম্বোধন হচ্ছে পরোক্ষ আর কখনও কখনও নবী (স.)-কে ও তাঁর জাতিকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এ উপদেশ দিতে গিয়ে তাকে প্রত্যক্ষভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। সূরাটির এই ছোট্ট শুরুর আয়াতটিতে যেমনটি দেখা গেছে।

রসূলুল্লাহ (স.)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহর ঘোষণা, এ হচ্ছে একটি কেতাব– যা তোমার নিকট নাযেল করা হলো, সুতরাং এর প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে তোমার মনের মধ্যে যেন কোনো সংকীর্ণতা না থাকে।'

এ ছোট্ট আয়াতাংশে আল্লাহ তায়ালা এমন একটি অবস্থার ছবি এঁকেছেন যা আজকের সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝা খুবই মুশকিল। তবে সে ঠিকই বুঝতে পারবে, যে অনুরূপ কোনো জাহেলী সমাজে বসবাস করছে কিংবা সে ওই জাহেলী সমাজের মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছ। তখন সে বুঝতে পারবে যে, কতো বড় কঠিন ও ভয়ানক কথা সে উচ্চারণ করছে– একথার লক্ষ্য কি, কতো কঠিন কাজ রয়েছে তার সামনে।

তার লক্ষ্য হচ্ছে, ওদের মধ্যে এক মহান বিশ্বাসের ইমারত গড়ে তোলা, তাদেরকে এক বিশেষ চিন্তাধারার আলোকে গড়ে তোলা। তাদের জন্যে জীবনের নতুন মূল্যবোধ ও মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করা, তাদের মধ্যে বিরাজমান জীবনের গতিধারা, কার্যকলাপ ও সমাজ সভ্যতার আমূল পরিবর্তন করে এক নতুন জীবনের সূচনা করা, সাথে সাথে তাদের অন্তরে বিরাজমান জাহেলিয়াতের অবশিষ্ট ভাবধারাকে সমুলে ঝেঁটিয়ে বের করে নেয়া তাদের চেতনায় যে জাহেলিয়াত বিরাজ করছে তা দূর করে দেয়া, তাদের জীবনে জাহেলিয়াতের যে মূল্যবোধ বাসা বেঁধে রয়েছে তাকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে মুছে ফেলা। তাদের অংগ প্রত্যংগ ও ধমনী থেকে জাহেলিয়াতের সকল প্রভাব দূর করে দিয়ে সর্বত্র ইসলামের ভাবধারা চালু করাই ছিলো মূলত সকল নবী রসূলের লক্ষ্য। তৎকালীন সমাজ যেহেতু এক বিশেষ ভাব ধারায় গড়ে উঠেছিলো এজন্যে প্রথম প্রথম তাদের কাছে নতুন এ জীবনধারা কঠিন মনে হচ্ছিলো, তাদের মনের ওপর প্রবল চাপ পড়ছিলো এবং অন্তরের গভীরে তারা ভীষণ কষ্টবোধ করছিলো। বাপ দাদার আমল থেকে চলে আসা নিয়মনীতি পরিত্যাগ করা তাদের কাছে খুবই কঠিন লাগছিলো। অপরদিকে নবী রসূলদের আনীত ব্যবস্থা সমাজের আংশিক সংস্কার সাধন করেই তৃপ্ত ছিলো না। তাদের কাজ

ছিলো মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। তাই আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশ অনুসরণ করে সর্বকালে নবী রসূলরা সারা বিশ্বে সামগ্রিক বিপ্লব সাধন করতে চেয়েছেন এবং জীবনের সর্বত্র আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্যে তারা আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সবখানে চেয়েছেন তারা আল্লাহর বিধান ও আইন কানুন চালু করতে, যেন সাধারণ মানুষ ইনসাফ পায় এবং দুর্বলরা সবলের দ্বারা শোষিত না হয়। মানব রচিত আইন কানুন যেহেতু কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত এজন্যে সবার স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই তাঁর বান্দাদের অহংকারী, আত্মসেবী ও স্বার্থপর কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীর হাতে নিষ্পেষিত হতে দিতে পারেন না, আর এই কারণেই নবী রসূলরা মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান চালু করার উদ্দেশ্যে আমরণ আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। এ ব্যাপারে কারো অনীহা, অসহযোগিতা, বিরোধিতা বা আক্রমণাত্মক ভূমিকার কোনো পরওয়াই তাঁরা করেননি। এমনকি বাস্তব যুদ্ধ করতেও তাঁরা পিছপা হননি।

আর যেহেতু প্রতি যুগেই নতুন এ ব্যবস্থা মানুষের কাছে কঠিন লেগেছে, সমাজের শোষক শ্রেণী এ ব্যবস্থা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সমাজের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে আগত এ অমোঘ ব্যবস্থাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করার জন্যে রুখে দাঁড়িয়েছে, মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে এ আকীদা বিশ্বাসের ধারক বাহকদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে– এজন্যে সত্যের পতাকাবাহী নবী ও তাঁর সংগী সাথীরা, সংখ্যা ও সরঞ্জামে অসম প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সীসা-ঢালা প্রাচীরের মতো একতাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন এবং একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্যের ওপর নির্ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে। আর এই সাক্ষাত সমরের শেষ পরিণতিতে চূড়ান্ত বিজয় হয়েছে সর্বকালে সত্যের পতাকাবাহীদেরই। যারা পরিচালিত হয়েছেন আল্লাহর যমীনে সত্য সুন্দর জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আবেগ উচ্ছ্বাস নিয়ে, যারা ঘৃণা ভরে নিক্ষেপ করেছেন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত সকল স্বার্থপরতাকে। অবশেষে, আল্লাহর রহমতে তারাই হয়েছেন বিজয়ী। এই সকল তথ্যের ধারা বিবরণী পর্যায়ক্রমে ফুটে উঠেছে আলোচ্য সূরার মধ্যে। দেখুন, কী চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে অতীতের ঘটনাপঞ্জীকে–

'কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি .... ওরাই হচ্ছে তারা, যারা আমার আয়াতগুলোর সাথে যুলুম করার কারণে নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।' (আয়াত ৪-৯)

এই ভূমিকার পর মূল কাহিনী শুরু হচ্ছে–

এতে বলা হয়েছে পৃথিবীর বুকে মানব জাতির বসবাস কেমন করে সম্ভব হলো? এটা সম্ভব হয়েছিলো এইভাবে যে, মানব জাতির বসবাসের উপযোগী করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন গোটা পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন সকল দ্রব্য-সামগ্রী, উপায়-উপকরণ, প্রয়োজনীয় খাদ্য খাবার এবং মানুষকে এসব কিছু সংগ্রহ করার জন্যে বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন। পৃথিবীর গোটা পরিবেশ ও আবহাওয়াকে তাদের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন। মানব-প্রকৃতির মধ্যে দান করেছেন সেই সব উপাদান, যা দ্বারা সৃষ্টির সব কিছু থেকে সে নিজের সকল প্রয়োজন পূরণ করে নিতে পারে। তাকে দান করেছেন এমন জ্ঞান, যার দ্বারা সে বুঝে নিতে পারে পৃথিবীর সব কিছু থেকে কোন্‌টাকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, কি কি খাদ্য সে গ্রহণ করবে এবং কিভাবেই বা তা উৎপাদন করবে– এসব জ্ঞানই আল্লাহ তায়ালা তাকে দিয়ে

দিয়েছেন। এজন্যে তাকে আল্লাহ তায়ালা প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থও দিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন–

'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে ক্ষমতা দান করেছি এবং তোমাদের জন্যে সেখানে জীবিকা উপার্জনের বিভিন্ন উপায় বানিয়ে দিয়েছি, খুব কমই তোমরা শোকরগোযারী করো।'

একথাগুলো মূল আলোচ্য বিষয় 'প্রথম সৃষ্টির বিষয়'টি বর্ণনার পূর্বে শুধুমাত্র ভূমিকা স্বরূপই পেশ করা হয়েছে। আর মানুষের জীবন যাত্রার সূচনা যে বিন্দু থেকে সুপরিকল্পিতভাবে শুরু হলো, বর্তমান এই সূরার মধ্যে সেই প্রসংগেই মূলত বর্ণনাকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে এবং সৃষ্টির ঘটনাকেই পেশ করা হয়েছে। এ ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা এবং তাকে সঠিক পথে চলার জন্যে উপদেশ দান যাতে করে এসকল অবস্থাকে সে কল্পনার চোখে দেখতে পায় এবং পর্যায়ক্রমে সংঘটিত ঘটনাবলী থেকে বলিষ্ঠ, প্রভাবপূর্ণ ও গভীর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

তিনি বললেন, 'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পর তোমাদেরকে সুন্দর আকৃতি দান করেছি, ... । এখানেই তোমরা বেঁচে থাকবে, মৃত্যুও বরণ করবে এখানে আর এর থেকেই তোমাদেরকে (রোজ হাশরে) বের করা হবে।' (আয়াত ১১-২৫)

এখানে মানব জাতির পথ পরিক্রমার বিবরণের মধ্যে যে সব দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে এ যাত্রার চমৎকারীত্ব এবং যাত্রীদের মহা এ সফরের সর্বপ্রকার বৈচিত্র ফুটে উঠেছে। আর এ বর্ণনাতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তাকে বরাবরই এক মহা সংঘর্ষের মোকাবেলা করেই জীবন সাগর পাড়ি দিতে হবে ... জীবনের দীর্ঘ এ সফরের কোনো পর্যায়েই এ সংঘর্ষ স্তিমিত হবে না। সকল আদম সন্তানকেই তাদের সবার প্রকাশ্য দুশমন শয়তানের সাথে বরাবরই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে হবে।

এই আলোচনা প্রসংগে মানুষের শাস্তির যে পর্যায়ক্রমিক দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তাতে দেখানো হয়েছে যে, প্রতিবারে গযব নাযিল হওয়ার পূর্বে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে এবং রোজ হাশরে বিচার শেষে চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যাপারে তাদেরকে সময়মতো এবং যথাযথভাবে সতর্ক করা হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে সেই মরদূদ জেদী শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার জন্যে। সতর্ক করা হয়েছে যে, সে তাদের সবার বাপ-মা হযরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়া (আ.)-কে ধোকা দিয়ে জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলো।

এরপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করা হয়েছে। এই জেদী ও অহংকারী শয়তান কিভাবে মানবমন্ডলীর বাপ মাকে বিভ্রান্ত করেছিলো তার বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। আর বর্ণনার মধ্যে দেখা যায় মানব জাতির পিতামাতার সাথে শয়তান কেমনভাবে মুখোমুখি হয়েছে। আর এ মোকাবেলার ফলেই মানুষ সৃষ্টির প্রথম লক্ষ্য অর্জিত হলো। তাই আদম সন্তানকে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে তাদেরকে অবশেষে সেখানেই ফিরে যেতে হবে, যেখান থেকে তারা এসেছে। যার বর্ণনা নিম্নের আয়াতগুলোতে আসছে, 'হে আদম সন্তানেরা, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে এমন পোশাক পাঠিয়েছি, যা...... (আয়াত ২৬-২৭) আরো দেখুন তর্জমা (৩৫-৩৬)

আমাদেরকে অবশ্যই একটু খেয়াল করে ওই ঘটনার দিকে তাকাতে হবে যখন আমাদের পিতা মাতা নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর বিবস্ত্র হয়ে গেলেন এবং তারা নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্যে লতা-পাতা ব্যবহার করতে লাগলেন। আর তারপর তাদের প্রতি আল্লাহর তরফ

থেকে নেমে এলো ভয়ানক এক তিরস্কারবাণী। স্মরণ করানো হলো তাদেরকে পোশাক রূপ আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে, যা তাঁদের লজ্জাস্থান ঢাকার সাথে সাথে সৌন্দর্যবর্ধক হিসাবেও দেয়া হয়েছিলো। আরো খেয়াল করতে হবে শয়তানের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার হুঁশিয়ারীর কথা, যা তৎকালীন মক্কাবাসীদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদেরও লজ্জা ঢাকার পোশাক ও সৌন্দর্যের জিনিসগুলো মরদূদ শয়তান তেমনি করে খুলে দিয়ে তাদেরকে লজ্জা ও বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেবে– যেমন করে তাদের বাপ মায়ের সাথে তারা করেছিলো। শুধু তাই নয়, তাদেরকে সৌন্দর্য স্বরূপ যে নেয়ামতের বস্তুসমূহ আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তার থেকেও ওই ভয়ানক শয়তান ধোকা দিয়ে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেবে– যদি তার ধোকাবাজির জালে তারা পা রাখে। এখানে আর একটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে, বলা হচ্ছে। আমাদের দেখা দরকার যে, আদম-হাওয়ার এই ঘটনাটিকে তৎকালীন জাহেল আরবের মোশরেক সমাজের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তারা প্রাচীন কালের আচার অনুষ্ঠান ও নিয়ম নীতি অন্ধভাবে মানতে গিয়ে উলংগ হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করতো। হজ্জের সময় তারা বেশ কিছু খাদ্য খাবার ও বিভিন্ন ধরনের পোশাক নিজেদের জন্যে নিজেরাই হারাম করে নিয়েছিলো এবং তারা মনে করতো এবং বিশ্বাসও করতো যে, এগুলো আল্লাহরই নির্ধারিত ব্যবস্থা। যেগুলো তারা নিজেদের ওপর হারাম করে নিয়েছিলো, সেগুলো আসলে আল্লাহ তায়ালাই তাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছিলেন। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানব সৃষ্টির সূচনালগ্নে বিবস্ত্র হওয়ায় তাদের মধ্যে যে লজ্জা ও অপ্রস্তুত হওয়ার অনুভূতি জেগেছিলো এবং মানবতার স্বাভাবিক দাবী হিসাবে তাদের মধ্যে নিজেদেরকে আবৃত করার যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিলো, তাকে সামনে রেখে জাহেল আরব সমাজ তথা গোটা মানবমন্ডলীকে জানানো হচ্ছে, লজ্জাস্থান ঢাকা ও সৌন্দর্যের জন্যে পোশাক ব্যবহার মানুষের প্রকৃতির ধর্ম। কাজেই প্রকৃতির এ স্বাভাবিক প্রবণতাকে উপেক্ষা করাটাই জাহেলিয়াত তথা মূর্খতা নয়? এবং উলংগতা ও শরীর খোলা রাখার অর্থই কি লজ্জাহীনতা এবং আল্লাহভীতির অভাব নয়? আর এই ঘটনাটি আল কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন দিকের মধ্য থেকে একটি দিককে চিন্তা করার জন্যে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে যে, আল কোরআনের মধ্যে যতো উদাহরণ পেশ করা হয়েছে এবং যতো ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওই ঘটনার আলোকে মানুষ যেন বাস্তব জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাযথ শিক্ষা নিতে পারে। যতোবারই এ ঘটনার উল্লেখ এসেছে ততোবারই নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপটে এর উল্লেখ এসেছে। আল কোরআনে বর্ণিত এ ঘটনা কোনো বাস্তব অবস্থা মোকাবেলা বা সমস্যা সমাধানের জন্যে উপদেশ দান করা হয়েছে।

আর এই বিষয় সম্পর্কে সূরায়ে আনয়ামের ৭ম রুকুর তাফসীরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে খুবই গুরুত্বের সাথে যে মূলনীতিটি পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে, কোরআনুল করীমে এমন কোনো কথা বলা হয়নি যার বাস্তব প্রয়োগ নাই, অথবা বাস্তব জীবনে যার কোনো ব্যবহার নাই। নিছক জ্ঞান গরিমার ঘর অথবা তথ্যের ভান্ডার হয়ে থাকাই আল কোরআনের কাজ নয়, এমন কি বাস্তব কোনো অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা অথবা ওই ঘটনার উপর স্রেফ শিক্ষা স্বরূপই কোনো কাহিনীর অবতারণা করা নয়।

আর বর্তমানে মানব জাতির কাফেলা তার যাত্রাপথে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এদেরকে নবী রসূলরা কিভাবে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন এবং আদম (আ.) ও তার স্ত্রী তাদের দুইজনের প্রথম ভুল কাজ করার অভিজ্ঞতার পর মানব জাতির ইতিহাসে যে দৃঢ় আকীদা সৃষ্টি হয়েছিলো

তার পূর্বে কিভাবে এই আকীদা এক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলো তা দেখা দরকার। আবার এখন পেছনের ঘটনাগুলো সামনে টেনে আনলে শেষ বিচারের দিনের ছবির দৃশ্য দ্রুতগতিতে সামনে ভেসে ওঠে। মহা এ সফর শেষে আগত শেষ বিচারের যে ভয়ংকর দৃশ্যের সম্মুখীন আমাদেরকে হতে হবে তার কঠিন ছবি আমাদেরকে বিচলিত করে। আর পবিত্র কোরআনে বিধৃত এ বর্ণনা একাধারে দুনিয়ার জীবনের এ পরীক্ষা গৃহের খবর দেয় এবং এ জীবনের খেলা শেষে প্রতিদান ও প্রতিফল দিবসের কথাও জানায়। কালামে পাকের মধ্যে এমন চমৎকারভাবে এ দুটি জীবনের মেয়াদের বর্ণনা পাশাপাশি পেশ করা হয়েছে যে, গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে যে কোনো ব্যক্তির মনে হবে এ দুটি জীবন একটি অপরটির সাথে অংগাংগি জড়িত এবং দুটি জীবন মিলে গঠিত হয়েছে অবিচ্ছেদ্য এক মহা জীবন।

আর এই পর্যায়ে এসে আমরা যেন দেখতে পাই কেয়ামতের দৃশ্যসমূহের মধ্যে সব থেকে কঠিন দৃশ্য, যার বর্ণনা আমাদের কাছে বেশ খোলাখুলি মনে হয়। সেখানকার নানা দৃশ্যাবলীর সমাবেশ মনে হয় খুবই বিস্তীর্ণ ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং সব কিছু মিলে মনের পর্দায় জাগিয়ে তোলে বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। সূরাটির মধ্যে আদম (আ.)-এর কাহিনী এবং শয়তানের ধোকায় পড়ে বিভ্রান্ত হওয়া ও জান্নাত থেকে তার ও তার স্ত্রীর বেরিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরকে আরো জানানো হয়েছে যে, ওই ভয়ানক শয়তান তাদেরকে সেইভাবেই ধোকা দিতে থাকবে যেমন করে জান্নাত থেকে তাদের বাপ মাকে সে ধোকা দিয়ে বের করে নিয়ে এসেছিলো। আরো জানানো হয়েছে যে, দুনিয়াতে তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রসূলরা প্রেরিত হবেন, যারা তাদের কাছে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার নিদর্শনাবলী পেশ করতে থাকবেন। এ ক্ষেত্রে এটাও জানানো হয়েছে যে, মানুষ শয়তানের ধোকায় পড়ে গিয়ে তেমনি বিভ্রান্ত হতে থাকবে যেমন করে তাদের বাপ মা বিভ্রান্ত হয়েছিলো। এইভাবে তারা প্রমাণ করবে যে, তারা লোভের বশবর্তী হয়ে ধোকাপ্রাপ্ত বাপ মায়েরই সন্তান, অতএব তাদের বিভ্রান্তিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। এখন যারা জেনে বুঝে শয়তানের আনুগত্য করবে, তারা নিজেরাই তাদের জান্নাতে ফিরে যাওয়াকে নিজেদের জন্যে অসম্ভব করে ফেলে। শয়তানের তো কাজই এটা যে, সে তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার পথে নানা প্রকার বাধা সৃষ্টি করবে। ওদের বাপ মাকে জান্নাত থেকে বের করে আনার পর তাদের সন্তানরা পুনরায় সেখানে প্রবেশ করুক তা সে কখনও চায় না- চাইতে পারে না। তবে যারা শয়তানের সকল কারসাজির বিরোধিতা করবে এবং সকল কাজে, কথায় ও ব্যবহারে একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করবে, তারা পুনরায় জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানেই তারা চিরদিন থাকবে, কেননা এটাইতো তাদের আদি নিবাস। তাই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর এই অনুগত বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে বলছেন,

'তোমরা যে সব (ভালো) কাজ করতে থেকেছ, তারই পুরস্কার স্বরূপ তোমাদেরকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হবে।' এর ফলে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণকারীরা ফিরে যাবে নেয়ামত ভরা চিরস্থায়ী গৃহে।

আর যে প্রসংগে এসব দৃশ্যের বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে, মানুষকে তার অনন্ত জীবনের সুমহান আনন্দ লাভের সুযোগ দান। সুদীর্ঘ এক পথ পরিক্রমার পর মানুষ এ সুযোগ পাবে। এ পথে চলার সময় তাকে বেশ কিছু কষ্ট করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে এবং বেশ কিছু ত্যাগও স্বীকার করতে হবে। এসব কিছুর বিনিময়েই সে আশা করতে পারে অনন্ত জীবনের শান্তি। আর উপস্থিত এ সব দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করতে যে রাযি নয়, বরং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যে নগদ পেতে চায়,

অনন্ত জীবনের শান্তি পাওয়ার অধিকার তার নেই। এই সব বিষয়ে তাকে সতর্ক করা হচ্ছে এবং জানানো হচ্ছে যে, চিরস্থায়ী জীবনের সুখ শান্তির আকাংখী যে নয়, আর সুখের জন্যে চেষ্টা করতে বা কষ্ট স্বীকার করতেও যে রাযি নয়, তার জন্যে চিরস্থায়ী দুঃখ ও শাস্তি অপেক্ষা করছে। এরাই হচ্ছে ওই সম্প্রদায়ের লোক, যারা মহাগ্রন্থ আল কোরআনের কথাগুলোকে মিথ্যা বলে দাবী করে আর এ কেতাবের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে তারা অলৌকিক কিছু ক্ষমতা বা ঘটনা দেখানোর দাবী করে। এ ধরনের হঠকারী ব্যক্তিদের জন্যে অপেক্ষা করছে পরকালের নিকৃষ্ট ঘর, যেহেতু আল কোরআনের ভাষা এবং যিনি এসব বাণী তাদের কাছে বহন করে এনেছেন তাঁর জীবন তাদের সামনে বর্তমান রয়েছে। এ ভাষার সাথে মানব নির্মিত অন্য কোনো ভাষার যেমন কোনো মিল নেই, তেমনি এর বাহক অন্য কোনো ব্যক্তির মতো সাধারণ লোক নন। ইচ্ছা করলেই এরকম গুণ যে কেউ অর্জন করতে পারে তাও নয়। এসব কথা বুঝা সত্তেও নিছক ব্যক্তি স্বার্থের কারণে ও নেতৃত্বের লোভে তারা জেনে বুঝে সত্যের বিরোধিতা করে চলেছে। অতএব, এ কদর্য ব্যবহারের পরিণতি ভীষণ শাস্তি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি তাদের কাছে যে কেতাব পাঠিয়েছি, তাকে আমি বিস্তারিত জ্ঞানের ভান্ডার হিসাবেই তাদের সামনে পেশ করেছি.........অবশ্যই তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আর যে সব মনগড়া কথা তারা বানিয়ে বানিয়ে বলছে, সেসব কথা অবশ্যই একদিন ভুল প্রমাণিত হবে।' (আয়াত ৫২-৫৩)

আর এই দীর্ঘ সফরের পর...........অর্থাৎ, সৃষ্টির সূচনা থেকে তার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যে সফর, সেই সফরের পর রয়েছে তার পরবর্তী অবস্থা এবং তা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট। এখানেই বুঝা যায় উলুহিয়্যাতের তাৎপর্য এবং সৃষ্টির সকল দৃশ্যাবলীর মধ্যে বিরাজমান রবুবিয়্যাতেরও প্রকৃত অর্থ এখানে ফুটে ওঠে, যা আল কোরআনের নিয়মানুযায়ী এ সব সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং সৃষ্টির সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বিস্ময়কর বস্তু ও দৃশ্যগুলো চিন্তাশীল হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি তার জ্ঞানের চোখ খুলে দেয়, এনে দেয় দৃষ্টিশক্তিতে সত্যকে বুঝবার মতো সমুজ্জ্বল আলো। সৃষ্টির বুকে ছড়িয়ে থাকা রহস্যময় বস্তুগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরানোর আহবানের উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলোর মাধ্যমে মহান স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে দৃঢ়তা আনা। বস্তুতপক্ষে, যারাই সৃষ্টির রহস্যের দিকে খেয়াল করে তাকায় এবং চিন্তা করে, তাদের মধ্যে এসব কিছুর স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য বোধ জাগে। তার মন বলে ওঠে, নিরংকুশ দাসত্ব ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। এমন দ্বিধাহীন দাসত্ব ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী আর কেউই নয়। তিনিই সবার প্রতিপালক এবং তিনিই সবার ওপর শাসন-ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর ইচ্ছা ও কথাই আইন। এইভাবে বিশ্বের কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জোটের কথা বা মত আইনের মর্যাদা পেতে পারে না। সৃষ্টি যার, আইন তাঁর। আর তিনিই সারা বিশ্বের প্রতিপালক, মনিব ও বাদশাহ। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই তোমাদের রব সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয়টি দিনে .... সেই জনপদের জন্যে, যারা শোকরগুজারি করে। (আয়াত ৫৪-৫৮)

আবারও আলোচনার ধারা এগিয়ে চলেছে এবং বিশেষ এক কাহিনীর বর্ণনাও পেশ করা হচ্ছে, যার মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে মহান ঈমানের জয়গান। ভুল পথে চালিত মানবমন্ডলীর পরিণতির কথা পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাদেরকে হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দেয়া হচ্ছে এবং

তাদের নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনের জায়গা সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে তাদের ভয় দেখানো হচ্ছে। অপরদিকে পথভ্রষ্ট মানুষ সত্য কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকার করে। কল্যাণের দিকে আহবানকে তারা হঠকারিতা ও বিদ্রোহাত্মক ব্যবহার দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে। এরপর তারা অহংকার করে ও সত্যের প্রতি দাওয়াত দানকারীর ওপর যুলুম করে। রসূলরা উপদেশ দান ও সতর্ক করার দায়িত্ব পালন করার পর আল্লাহ রব্বুল আলামীনও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এর ফলে তাদের জাতির লোকেরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে এবং মিথ্যাবাদী জ্ঞানে তাদেরকে প্রতিরোধ করে। তারপর আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত পাকড়াও এবং সীমাহীন দুঃখ কষ্ট। আর আকীদার ভ্রান্তির কারণে তাদের জাতির সাধারণ লোকেরা তাদেরকে নিজেদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং সত্যাশ্রয়ীরা একমাত্র আল্লাহকেই গ্রহণ করে ও তাঁর কাছেই সব কিছুর জন্যে প্রার্থী হয়।

এরপর নূহ (আ.)-এর কাহিনীর প্রসংগ আসছে, আসছে হূদ, সালেহ, লূত ও শোয়ায়ব (আ.)-এর ঘটনাবলী একের পর এক। সংগে সংগে তাদের প্রত্যেকের জাতির ভূমিকাসমূহও পেশ করা হচ্ছে। সকল নবী রসূল একই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন এবং সবার শিক্ষার মধ্যে রয়েছে একই সুর, একই দাওয়াত ও কর্মধারা, যার কোনো পরিবর্তন নেই। তাদের দাওয়াতকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে আল কোরআন জানাচ্ছে,

‘হে আমার জাতি, দ্বিধাহীন চিত্তে ও সার্বিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করো। তিনি ছাড়া সর্বময় মালিক, মনিব ও শাসনকর্তা আর কেউ নেই।’

তাদের সবার জাতি একটি কথাতেই তাদের বিরোধিতা করেছে আর তা হচ্ছে, ‘প্রভুত্ব, একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এবং সর্বময় মালিক একমাত্র আল্লাহ। কোনো কিছুতেই মানুষের ওপর হুকুম চালানোর কারো কোনো অধিকার নেই’– এটা কি করে মেনে নেয়া যায়? একই ভাবে, রেসালাত (অর্থাৎ আল্লাহর বার্তা বহনের মহান দায়িত্ব) মানুষের মধ্যে কোনো এক ব্যক্তির ওপর আসবে এতেও ছিলো তাদের ঘোরতর আপত্তি। তাদের মধ্যে এ বিষয়েও অনেকের আপত্তি ছিলো যে, দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহরই বিধান মানতে হবে। তারা মনে করতো পার্থিব কাজ কর্ম পরিচালনার এখতিয়ার তাদের নিজেদের, যেভাবে ইচ্ছা তারা জীবন যাপন করবে, ব্যবসা বাণিজ্য চালাবে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এসব বিষয়ে সৃষ্টিকর্তার হাত থাকা– এতো সব কি করে মেনে নেয়া যায়! সবাইকে প্রতিপালনের ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতে আছে, আর কারো কোনো ক্ষমতা নেই একথাই বা কি করে মানা যায়। যেমন বহু যুগের ব্যবধানে এসে আজকের যুগের বহু মানুষও ওই একইভাবে চিন্তা করতে শুরু করছে এবং প্রাচীনকালের এই মূর্খতাপূর্ণ (জাহেলী) দাবীকে আজকের সমাজে স্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ওরা সব কিছুর ওপর আল্লাহর নিরংকুশ মালিকানার বিশ্বাসকে বলে সেকেলে মনোভাব।

এরপর প্রত্যেক নবীর ইতিবৃত্ত বয়ান শেষে তাদের আগমনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

সূরাটির মধ্যে বর্ণিত প্রত্যেক নবীর কাহিনীতেই দেখা যায়, একই কথা এবং একই আহবান,

‘হে আমার জাতি, (নিরংকুশভাবে) একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য কর, তোমাদের জন্যে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তিনি ছাড়া আর কেউ নেই।’

প্রত্যেক নবীই তাদের কাছে সেই সত্যকে পেশ করেছেন, যা তাদের রব পেশ করতে বলেছেন। সকল নবী তাদের সময়কার জনগণের দুর্ব্যবহার ও সত্য জীবন ব্যবস্থা থেকে গাফেল থাকার পরিণতি দেখতে পাচ্ছিলেন, যার জন্যে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জনগণের জন্যে গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু আফসোস, ওই সকল অপরিণামদর্শী জনগণ তাদের নিকট

আগত নবীদেরকে তাদের কল্যাণকামী মনে করতো না এবং তাদের কাজ ও ব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কে কোনো চিন্তাই করতো না। আর আল্লাহর রসূল যে হৃদয়াবেগ নিয়ে তাদের কাছে আল্লাহর বার্তা পৌছাচ্ছিলেন, তা কিছুতেই তাদের অন্তরে নিষ্ঠার সাথে তারা বুঝার চেষ্টা করছিলো না। তাদের নিকট অন্যান্য নগদ সুবিধাদির গুরুত্ব ছিলো অনেক বেশী। আসলে উপস্থিত সুযোগ সুবিধা থেকে মনকে মুক্ত করে চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে চিন্তা করার ইচ্ছা তারা মোটেই করেনি, গভীরভাবে কোনো কিছু বুঝতেও চায়নি।

নূহ (আ.)-এর কাহিনীই প্রথম কাহিনী, যা উপরোক্ত কথার প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। আর আল কোরআনের মধ্যে বর্ণিত কাহিনীগুলোর মধ্যে শোয়ায়েব (আ.)-এর ঘটনাকে এ প্রসংগে শেষ শিক্ষণীয় ঘটনা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি নূহকে পাঠিয়েছি তার জাতির কাছে.........আর আমি অথৈ পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি তাদেরকে, যারা আমার আয়াতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। আসলে ওরা ছিলো এক অন্ধ জাতি।' (আয়াত ৫৯-৬৪)

'(আরো পাঠিয়েছি) মাদইয়ানবাসীর কাছে তাদের ভাই শোয়ায়বকে। সে বললো, হে আমার জাতি, নিরংকুশ ও সর্বাত্মক আনুগত্য করো একমাত্র আল্লাহর, তোমাদের জন্যে অন্য কোনো প্রভু নেই, মনিব ও বাদশাহ একমাত্র তিনি ছাড়া.......... হে আমার জাতি, অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে আমার রবের বার্তাসমূহ পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের সদুপদেশ দিয়েছি......... তোমাদেরকে সুতরাং (সত্যকে) অস্বীকারকারী জাতির জন্যে কেমন করে আমি আফসোস করবো?' (আয়াত-৮৫-৯২)

এই দুটি জাতির উদাহরণ দ্বারা সূরার মধ্যে বিবৃত বাকী কাহিনীর দৃষ্টান্তগুলো বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য কাহিনী এই দৃষ্টান্তমূলক দুটি কাহিনীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনা কখনও এসেছে সেই একমাত্র আকীদার যথার্থতা পেশ করার জন্যে যা বনী আদমের প্রত্যেক জাতির জন্যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বার্তা বহনকারী হিসাবে তাঁর রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন, অথবা চেয়েছেন তিনি যেন দুনিয়ার অহংকারী নেতৃবৃন্দের সাথে নানা প্রকার দুর্বলতার মধ্যে ঘেরাও হয়ে থাকা এই সত্যের অনুসারীদের মধ্যে সাক্ষাত ও সংযোগ স্থাপিত হোক, অথবা তিনি চেয়েছেন এই আকীদাকে রসূলরা ও তাদের অনুসারীদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিতে, অথবা তিনি চেয়েছেন যেন তাদের নিজ নিজ জাতির লোকদেরকে হেদায়াত করার জন্যে তারা যথাযথ সদুপদেশ দিক ও উৎসাহ দান করুক। এরপর আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন, তাদের সত্য বিরোধিতা ও অন্যায়ের ওপর যেদ করে টিকে থাকার মনোবৃত্তি এবং আল্লাহর ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তুতিসমূহ প্রকাশ হয়ে যাওয়ার এবং তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক, রসূলরাও হঠকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে সকল বন্ধন কেটে দেয়ার পর তাদেরকে পাকড়াও করা হোক। আর এই ছিলো তাদেরকে সতর্ক করা ও উপদেশ দেয়ার চূড়ান্ত ও শেষ পর্যায়, যেহেতু মিথ্যার সেবাদাস হওয়া এবং মিথ্যার ওপর যেদ ধরে টিকে থাকার এটিই হচ্ছে যথার্থ পরিণতি। এরপর এখানে আলোচনার প্রসংগকে একটি ভিন্ন মোড় দেয়ার জন্যে একটু বিরতি দেয়া হচ্ছে যেন এ বিরতিতে ওদের প্রতি প্রদত্ত শাস্তির দৃশ্যটি ওরা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এইভাবে মানুষের সাথে তাঁর নির্ধারিত কার্যাবলী পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় নিয়ম জানাচ্ছেন। তাঁর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার সময় যখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে, মিথ্যা বলে দাবী করে আল্লাহর বাণীকে, তখন প্রথমে তিনি তাদেরকে নানা

প্রকার রোগ ব্যাধি, আপদ বিপদ, দুঃখ দৈন্য ও মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত করে দেন, যাতে এসব প্রতিকূল অবস্থা তাদের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়, গাফলতির ঘুম ভেংগে যায় এবং জেগে উঠে তারা সত্যের ডাকে সাড়া দিতে পারে। কিন্তু এসব দুঃখ দৈন্য যখন তাদের মনে কোনো প্রকার সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় না, তখন তাদেরকে তিনি ঢিল দিয়ে দেন। এটা যে কোনো বিপদাপদ থেকে আরো বড় পরীক্ষা। পরিশেষে নেমে আসে তাদের ওপর আল্লাহর বিধান অনুসারে আরো ব্যাপক কষ্ট। কিন্তু এতেও যখন তারা সাবধান হয় না, তখন হঠাৎ করে একদিন তাদেরকে পাকড়াও করা হয় এবং তাদের প্রতি সর্বাত্মক আযাব এমন ভাবে নেমে আসে যে, তারা বুঝতে পারে না কিসে কী হয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহর শাস্তি বিধানের এ নিয়ম বর্ণনা করার পর সেই ভীষণ বিপদের বর্ণনা তাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে, যা তাদেরকে গাফলতির ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে এবং তাদের অন্তরগুলোকে প্রচন্ডভাবে নাড়িয়ে দিতে পারে। সুতরাং এখন তাদেরকে কে বুঝাবে যে, আল্লাহর শাস্তি, তাঁর চিরন্তন নিয়মানুযায়ী তাদের ওপর নাযিল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে? তাদেরকে কি পেছনে পড়ে থাকা ব্যক্তিদের জন্যে নির্ধারিত ধ্বংসের স্থানগুলো এমন সময় তাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, যখন তারা নিশ্চিন্তে নিজেদের ঘরে বসবাস করছে? দেখুন এ বিষয়ে আল্লাহর ভাষ্য–

'আর আমি যখন কোনো অঞ্চলে কোনো নবী পাঠিয়েছি ..... কিন্তু আমি তো ওদের অধিকাংশকে মহা-অপরাধী হিসাবেই পেয়েছি।' (আয়াত ৯৪-১০২)

এরপর আসছে মূসা (আ.)-এর সাথে ফেরাউন ও তার সভাসদদের তর্ক বিতর্কের বিবরণী, যখন তাঁর সাথে ছিলো বনী ইসরাঈল জাতি। এ কাহিনী আল কোরআনের বিভিন্ন সূরার মধ্যে আলোচিত হয়েছে এবং কোরআনের সব থেকে বেশী স্থান জুড়ে রয়েছে। এখানে তার প্রধান কয়েকটা দিক তুলে ধরা হচ্ছে। কয়েকটি দিকের মধ্যে ওদের শাস্তির বর্ণনা এসেছে, যেমন সূরার শেষের দিকে দীর্ঘ একটি স্থান জুড়ে তাদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বর্ণনা দেখা যায়।

ইতিপূর্বে আল মোযযাম্মেল, আল ফাজর, আল্ ক্বাফ, আল কামার ইত্যাদি সূরাগুলোর মধ্যে পর্যায়ক্রমে মূসা (আ.) ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর বর্ণনা এসেছে। ওই সমস্ত স্থানের বিবরণগুলো সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট ইংগিত দানকারীর ভূমিকাই পালন করেছে। এসব বর্ণনার পর এটিই প্রথম সূরা, যার মধ্যে দীর্ঘ স্থান জুড়ে মূসা (আ.)-এর ঘটনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

এর পর দেখা যায়, এসব বর্ণনার মধ্যে ফেরাউনের যে প্রসংগ এসেছে তাতে তার আকীদা বিশ্বাসের মৌলিক অবস্থাটা তুলে ধরা হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে তার ও তার জাদুকরদের সীমাবদ্ধতাকে। এদুটি বিষয়ে অন্যান্য আরো বহু সূরাতেও উল্লেখিত হয়েছে। ফেরাউনের বংশের লোকদের ওপর উপর্যুপরি কয়েক বছর ধরে দুর্ভিক্ষ ও বিপদাপদ নেমে আসে, নেমে আসে ঝড় তুফান, পংগপাল, উঁকুন, ব্যাঙ ও রক্তের আযাব। এসব আযাবের বিস্তারিত বিবরণ এই সূরা ছাড়া অন্য কোনো সূরাতে আসেনি। বর্ণনা এসেছে এই সূরার মধ্যে ফেরাউন ও তার সভাসদ গণসহ তার জাতির লোকদের সম্পর্কে। এরপর বনী ইসরাঈল জাতির কার্যকলাপের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে মূসা (আ.)-এর কাছে তাদের জন্যে ফেরাউনের জাতির মতোই ধরা ছোঁয়া যায় এমন কোনো মূর্তি বানিয়ে দেয়ার দাবীর কথা, আর তাদের পক্ষ থেকে এ দাবী উত্থাপিত হয় তখন, যখন তারা ফেরাউনের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েছিলো, নীল নদ পার হয়ে কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিলো, এরপর বিপদমুক্ত হয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতে শুরু করেছিলো। এ সূরাতে ওই অধ্যায়ের বর্ণনাও এসেছে যার মধ্যে আল্লাহ পাকের সাথে মূসা (আ.)-এর সরাসরি

বাক্যালাপের একটি সুবর্ণ সুযোগ আসে এবং মূসা (আ.) আল্লাহকে নিজ চোখে দেখার জন্যে আব্দার করে বসেন। পর্বত বিস্ফোরিত হওয়ার ঘটনা ঘটে, মূসা বেহুশ হয়ে পড়ে যান এবং সম্বিত ফিরে পেলে তাঁর কাছে অবতরণ করা হয় আল্লাহর নির্দেশাবলী সম্বলিত ফলকসমূহ।

সূরাটিতে আরো যে বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে, তাঁর (মূসার) অনুপস্থিতিতে তাঁর জাতির বাছুর পূজা করার ঘটনা, দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহর সাথে কথা বলার পর ওই বিজয় আরো তৃপ্তি করার জন্যে মূসা (আ.) জাতির মধ্য থেকে বাছাই করা সত্তর জনের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন এবং যখন তারা দাবী করে বললো, হে মূসা তোমার কথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করবো না যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখবো– তখন তাদের ওপর নেমে আসে এক বজ্রধ্বনি। বনী ইসরাঈল জাতিকে নিকটবর্তী এক এলাকায় প্রবেশ করতে বলা হলে তাদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, শনিবারে মাছ শিকার সম্পর্কিত ঘটনা এবং তাদের মাথার ওপর পাহাড় তুলে ধরার ঘটনা হওয়া। এ সূরার মধ্যেই এসব ঘটনার বিস্তারিত এবং পূর্ণাংগ বিবরণ পেশ করা হয়েছে যা অন্য কোনো সূরাতে পাওয়া যায় না।

এ সূরার মধ্যে যতোগুলো ঘটনার বিবরণ এসেছে সেগুলো সবই শেষ নবী (স.)-এর রেসালাত সম্পর্কে ইংগিত বহন করে। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রকৃতি কেমন হবে এবং কী হবে তার শিক্ষা সে সব কিছুই ওই ঘটনাবলীর বিবরণে ফুটে উঠেছে। আর এই বিষয়টি ওই ঘটনার মধ্যে অধিক পরিস্ফুট বলে দেখা যায় যখন মূসা (আ.) তাঁর রবকে মিনতি জানিয়ে তার জাতির মধ্যে বেহুশ হয়ে পড়ে যাওয়া ওই বিদ্রোহী লোকদেরকে ক্ষমা করার জন্যে আবেদন করেছিলেন এবং আল্লাহর কাছে তার নাযিল করার জন্যে দোয়া করেছিলেন যেন ফেরাউনের সাথে সংঘর্ষে তিনি জয়ী হন। আল কোরআনও কার্যত সকল বিরোধীর মোকাবেলায় জয়লাভ করার জন্যে এইভাবে দোয়া করতে শেখায়। এরশাদ হচ্ছে,

'আমার প্রদত্ত নির্দিষ্ট সময়ে হাযির হওয়ার জন্যে মূসা সত্তর জন লোককে বাছাই করলো..........এবং তারাই সফলকাম।' (আয়াত ১৫৫-১৫৭)

আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এই সত্যও মহাগুরুত্বপূর্ণ খবরের ভিত্তিতে এবং নিরক্ষর নবীর সাথে কৃত সাবেক ওয়াদার কারণে আল্লাহ তায়ালা নবী (স.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি রেসালাতের প্রকৃতি (অর্থাৎ যে বিষয়টি জানানোর জন্যে তাঁকে পাঠানো হয়েছে) তার প্রকাশ্য ঘোষণা দান করেন, জানিয়ে দেন মানুষকে তাঁর দাওয়াতের মূল কথাগুলোকে। জানিয়ে দেন তাঁর প্রকৃত রব সম্পর্কে, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন আর আরো যেন বলিষ্ঠভাবে সবাইকে জানিয়ে দেন সেই মূল তাওহীদ সম্পর্কে যা নিয়ে এর পূর্বে অন্যান্য সকল নবী-রসূলের আগমন ঘটেছে। এরশাদ হচ্ছে সেই মূল দাওয়াত নিম্নরূপ,

'বলো (হে রসূল), হে মানবমন্ডলী, অবশ্যই আমি তোমাদের সবার কাছে প্রেরিত হয়েছি .... আল্লাহর রসূল হিসাবে, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাদশাহ। তিনি ছাড়া বাদশাহ ও সর্বময় কর্তা আর কেউ নেই। তিনিই মৃত্যু দান করেন এবং তিনিই যিন্দা করবেন। অতএব, আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো এবং বিশ্বাস স্থাপন করো নিরক্ষর নবীর ওপর, যিনি (নিজে) আল্লাহ ও তাঁর সকল নিদর্শনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং তাঁর অনুসরণ করো, তাহলেই হয়তো তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।'

তারপর একটু বিরতি দেয়ার পর কাহিনী নিজ গতিতে আবার চলতে শুরু করলো। এই চলতে থাকাকালে আল্লাহ তায়ালা আবার বান্দার সাথে প্রদত্ত তাঁর ওয়াদার দিকে পুনরায় ফিরে এলেন। ফিরে এলেন সেই পাহাড়ের প্রচন্ড বেগে আন্দোলিত হওয়ার ঘটনার দিকে এবং তাঁর

ওয়াদা গ্রহণের দিকে। আর বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে তাঁর প্রদত্ত ওয়াদার কারণে আল্লাহ তায়ালা গোটা মানবমন্ডলীর স্বভাব প্রকৃতির কাছে সে কথা স্মরণ করাচ্ছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর স্মরণ করে, দেখো সেই সময়ের কথা, যখন তোমার রব আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন ..... তুমি কি আমাদেরকে বাতিলপন্থীরা যে অন্যায় করেছে তাদের সেই দোষের কারণে ধ্বংস করে দেবে?' (আয়াত ১৭২-১৭৩)

এরপর নাফরমানদের প্রতি কি কি শাস্তি নেমে এসেছিলো তার ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে- সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে তাদের কাছে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর নিদর্শনাবলী এসেছিলো, তারপর তা আসা বন্ধ হয়ে যায়, যেমন বনী ইসরাঈল এবং অন্যান্য যে সব জাতির কাছে এসব নিদর্শন আসার পর বন্ধ হয়ে গেছে।

এমনিভাবে সূরা আনয়ামের মধ্যে এসব দৃশ্য তৎকালীন জনগণের কার্যকলাপ এবং বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ এসেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর ওদেরকে সেই মহা খবরটি পড়ে শোনাও যা আমি মহান আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছি, সে খবর হচ্ছে আমার নিদর্শনাবলী প্রেরণের খবর .... ওরা তো চতুষ্পদ জীব জানোয়ারেরই মতো (সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত) বরং সেগুলো থেকেও বেশী জ্ঞান বিবর্জিত- ওরাই হচ্ছে উদাসীন ও বেখেয়াল জাতি।' (আয়াত ১৭৫-১৭৯)

এরপর আকীদা বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রাসংগিক আলোচনা এগিয়ে চলেছে, আর এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে থাকা, অন্তরের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করে এমন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর কঠিন আযাব ও তার পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে এবং অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষায় মানুষকে রসূলের মর্যাদা ও তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে বলা হয়েছে এবং তাঁর সাথে যথাযথ ব্যবহার করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

'সুন্দর সুন্দর সকল নাম তো আল্লাহরই; অতএব, ওই নামগুলো ধরেই তাঁকে ডাকো .... আল্লাহ তায়ালা যাকে গোমরাহ করেন তার জন্যে পথ প্রদর্শক আর কেউ নাই, আর তিনি তাদেরকে অহংকার ও হঠকারিতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দিয়ে থাকেন। (আয়াত ১৮০-১৮৬)

তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি ওদেরকে রেসালাতের প্রকৃতি এবং তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানিয়ে দেন। আর একথাটা তাদের প্রশ্নের জওয়াবেই বলা হচ্ছে যেহেতু তাদেরকে তিনি যে কেয়ামতের ভয় দেখাচ্ছিলেন তা কখন সংঘটিত হবে একথাটা জিজ্ঞাসা করার কারণেই তিনি তাঁর নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানাচ্ছিলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে, কখন সংঘটিত হবে সেই কেয়ামত? .... বলে দাও, আমি তো শুধু একজন সতর্ককারী এবং যারা ঈমান আনে তাদের জন্যে সুসংবাদদানকারী মাত্র!' (আয়াত ১৮৭-১৮৮)

এরপর, মানুষের আদি পুরুষ একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের যে ওয়াদা করেছিলেন, যে আনুগত্য বোধ তাঁর প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে এবং শেরক ও অন্যদের গোলামী করা তাঁর প্রকৃতির কাছে হয়ে রয়েছে অপ্রিয়, তার থেকে আজকে মানুষ কেমন করে ফিরে যাচ্ছে তার চমৎকার এক চিত্র এখানে আঁকা হচ্ছে। আর আল্লাহ তায়ালা এই বাক্যটির শেষের দিকে তাঁর রসূল (স.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে একটি সীমার মধ্যে থাকার জন্যে এবং তাদের অক্ষম দেব দেবীদেরকে পরিত্যাগ করার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, ডাক তোমাদের সেই শরীকদারদেরকে (যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিলে) ...... আর তুমি দেখছো তাদেরকে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, অথচ আসলে ওরা কিছুই দেখছে না'। (আয়াত ১৯৫-১৯৮)

এখান থেকে সূরাটির শেষ অবধি রসূল (স.)-কে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে, তাঁকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছিলো সূরাটির গোড়ার দিকে– কথা বলা হয়েছে কেমন করে মানুষ পরস্পর লেন দেন করে এবং কাজে লাগায় একে অপরকে? কেমন করে দ্বীনের এ দাওয়াতকে তারা পাশ কাটিয়ে চলে যায়? কেমন করে তারা ক্লান্তিকর এ জীবন পথে মানুষের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়? কেমন করে সে ক্রোধকে সংবরণ করে, অথচ তারই কাছে তো মানুষের অনিষ্টতা ও ষড়যন্ত্রের জাল থেকে বাঁচার জন্যে সাহায্য চাওয়া হয়ে থাকে? কেমন করে এই মানুষ ও তার পাশাপাশি মোমেনরা খেয়াল করে শোনে আল কোরআনের মধু-মাখা কথাগুলো? কথা বলা হয়েছে কেমন করে সে স্মরণ করে তার রবকে এবং তাঁর সাথে সদা সর্বদা সম্পর্ক বজায় রাখে? এইভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বোচ্চ দরবারে মানুষকে স্মরণ করবেন বলেও জানানো হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'ক্ষমাশীলতার গুণ গ্রহণ করো এবং নির্দেশ দাও (যখন ক্ষমতাসীন হয়ে নির্দেশ দেয়ার অবস্থায় তুমি থাকো) এবং হঠকারী জাহেলদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও .... অবশ্যই সেই সব ব্যক্তি, যারা তোমার রবের কাছে রয়েছে, তারা তাঁর নিরংকুশ ও দ্বিধাহীন আনুগত্য থেকে কোনো সময়েই অহংকার ভরে থেমে যায় না। তারা তাঁর প্রশংসা গীতি গেয়ে চলেছে সদা সর্বদা এবং তাঁর সামনেই তারা সেজদাবনত হয়।

এইভাবে সকল জরুরী কথাগুলো সংক্ষিপ্তভাবে এই সূরাটির মধ্যে একত্রিত করা হয়েছে এবং জীবনের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরার উদ্দেশ্য সম্ভবত ওই বিশেষ মুহূর্তগুলোর দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যার বর্ণনা অনুরূপভাবে সূরা আল আনয়ামের মধ্যেও পেশ করা হয়েছে। আর, এই ভাবে পেশ করতে গিয়েই একমাত্র আল্লাহর প্রতি আকীদার বিষয়টিকে আরো জোরদারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথমে সূরাটির বিষয়বস্তুর উপর একটি সামষ্টিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছি, আর এরপর বিস্তারিত তাফসীরকরার চেষ্টা করবো। আল্লাহর বরকতের ওপর ভরসা করেই আমাদের এই পথ চলা।

সূরা আল আ'রাফ

আয়াত ২০৬ রুকু ২৪

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمٓصٓ ۞ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۞ وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ۞ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۞ فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۞ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. আলিফ লা-ম মী-ম ছোয়া-দ, ২. (হে নবী,) এ (মহা) গ্রন্থ তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে যেন তুমি এর দ্বারা (কাফেরদের) ভয় দেখাতে পারো, ঈমানদারদের জন্যে (এটি হচ্ছে) একটি স্মরণিকা, অতএব (এ ব্যাপারে) তোমার মনে যেন কোনো প্রকারের সংকীর্ণতা না থাকে। ৩. (হে মানুষ, এ কিতাবে) তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে যা কিছু পাঠানো হয়েছে তোমরা তার (যথাযথ) অনুসরণ করো এবং তা বাদ দিয়ে তোমরা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অনুসরণ করো না; (আসলে) তোমরা খুব কমই উপদেশ মেনে চলো। ৪. এমন কতো জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি– তাদের ওপর আমার আযাব আসতো যখন তারা রাতের বেলায় ঘুমিয়ে থাকতো, কিংবা (আযাব আসতো মধ্য দিনে,) যখন তারা (আহারের পর) বিশ্রাম করতো। ৫. (আর এভাবে) যখন তাদের কাছে আমার আযাব আসতো, তখন তারা এছাড়া আর কিছুই বলতোনা যে, 'অবশ্যই আমরা ছিলাম যালেম।' ৬. যাদের কাছে নবী পাঠানো হয়েছিলো অবশ্যই আমি তাদের জিজ্ঞেস করবো, (একইভাবে) রসূলদেরও আমি প্রশ্ন করবো (মানুষরা তাদের সাথে কি আচরণ করেছে)। ৭. অতপর আমি (আমার নিজস্ব) জ্ঞান দ্বারা তাদের (প্রত্যেকের) কাছে তাদের কার্যাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করবো, (কারণ) আমি তো (সেখানে) অনুপস্থিত ছিলাম না! ৮. সেদিন (পাপ-পুণ্যের) পরিমাপ ঠিকভাবেই করা হবে,

الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝٨ وَمَنْ خَفَّتْ

مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝٩

(সেদিন) যাদের ওযনের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফল হবে। ৯. আর যাদের পাল্লা সেদিন হালকা হবে, তারা (হচ্ছে এমন সব লোক, যারা) নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, কারণ এরা (দুনিয়ার জীবনে) আমার আয়াতসমূহ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতো।

তাফসীর
আয়াত ১-৯

আলিফ, লাম, মীম, সোয়াদ।

এই ধরনের কিছু বিচ্ছিন্ন অক্ষর সূরায়ে বাকারার (১) শুরুতে ব্যবহার হয়েছে, ব্যবহার করা হয়েছে সূরায়ে আলে ইমরানের শুরুতেও (২)। এসব অক্ষরের অর্থ খোঁজাখুঁজি না করে আমরা সেই মতটাই গ্রহণ করেছি যা আরবী ভাষাবিদ ও মোফাসসেররা গ্রহণ করেছেন। আর তা হচ্ছে, এসব বিচ্ছিন্ন অক্ষর দ্বারা কিছু অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে এবং জানানো হয়েছে যে, আল কোরআন কিছু সূক্ষ্ম রহস্য প্রকাশের জন্যে আরবী ভাষাবিদদের অনুরূপ এসব অক্ষর ব্যবহার করেছে। তারপর দেখানো হয়েছে যে, আল কোরআন যে বিস্ময়কর চমৎকারিত্বের সাথে এসব অক্ষর ব্যবহার করেছে, আজ পর্যন্ত সেভাবে কোনো মানুষ ব্যবহার করতে পারেনি। এর দ্বারা ওদের কাছেও একথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এ কেতাব কোনো মানুষের রচিত নয়। ওদের সামনেই তো এসমস্ত বিচ্ছিন্ন হরফ দ্বারা আল-কোরআনের বহু সূরার সূচনা করা হয়েছে, কিন্তু কই তারা তো এইভাবে বিচ্ছিন্ন কিছু হরফ দ্বারা আল-কোরআনের অনুরূপ কোনো গ্রন্থ রচনা করতে পারেনি। আর এই না পারাটাই হচ্ছে একথার দলীল যে মহাগ্রন্থ আল কোরআন মানুষের তৈরী কোনো গ্রন্থ নয়। তাইতো তারা হাজারো চেষ্টা করেও এমন ছন্দময়, সুসমঞ্জও অর্থপূর্ণ কথা রচনা করতে পারেনি। সুতরাং, এসব হরফ ও বাক্যগুলোর বাহ্যিক অর্থ ও রূপ যাইই ধারণা করা হোক না কেন, এর মধ্যে যে গূঢ় রহস্য রয়েছে তা অবশ্য আরো অনেক বেশী সূক্ষ্ম, আর আমরা এই কথাটাকেই বেশী গ্রহণযোগ্য মনে করি, যদিও এটা আসলে কোনো চূড়ান্ত কথা নয়। এর সঠিক অর্থ আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

এই অর্থেই, আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় হচ্ছে 'আল্লাহর কেতাব যা তোমার কাছে নাযেল হয়েছে।' অর্থাৎ এ হরফগুলো এই কেতাবটির দিকেই ইংগিত করছে। একথাটিকেই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করেছি সেই দিকেই বিশেষভাবে ইংগিত করেছে উল্লেখিত হরফগুলো। আর 'কেতাব'— এ হচ্ছে এমন বিধেয় (যার সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে)-এর উদ্দেশ্য (যা বলতে চাওয়া হচ্ছে তা) উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ বলতে চাওয়া হচ্ছে কেতাবের কথা অথবা হাঁ এ কেতাব।

(১) দেখুন ১ম খন্ডের ৭২ পৃষ্ঠা, ২য় সংস্করণ
(২) ৩য় খন্ডের ৪২ পৃষ্ঠা

কোরআনের মিশনঃ অতীত বর্তমান ভবিষ্যত

'এ এমন একটি কেতাব যা তোমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং এর সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোনো সংকির্ণতা না থাকে', আর এ কেতাব মোমেনদের জন্যে এক অমিয় উপদেশমালা'

এ কেতাব নাযেল হয়েছে মানুষকে সতর্ক করার জন্যে এবং উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে.........এ কেতাব সেই সত্যকে প্রকাশ করতে চায় যা এর মধ্যে রয়েছে এবং মানুষকে সেই বিষয়ে জানাতে চায় যা তারা পছন্দ করে না, তবু এ কেতাব তাদের মনোযোগকে কিছু বিশ্বাসগত বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করতে চায়, আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ডাকে এবং গড়তে চায় সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক, স্থাপন করতে চায় কিছু নিয়ম শৃংখলা, সুষ্ঠ ব্যবস্থা এবং একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী সমাজ। তবে এ পথে রয়েছে অনেক কাঁটা, অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি। এই সতর্ক করা ও পরকাল সম্পর্কে ভয় দেখানোর কাজ করার পেছনে রয়েছে বহু কষ্ট, যা হঠাৎ করে বোঝা যায় না। বোঝানোও যায় না যেমন সূরাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে ইতিমধ্যে কিছু কথা আমরা বলেছি, কিন্তু যারা এ কেতাবের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে এবং পরস্পরকে সাহায্য করবে তারা সকল বাধা বিঘ্নের মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছায় সকল দিক থেকেই সাহায্য সহযোগিতা পেতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি মানুষের জীবনের মৌলিক পরিবর্তন আনার জন্যে কাজ করতে চাইবে, তাকে পচনশীল সমাজের শেকড় থেকেই সংশোধনের কাজ শুরু করতে হবে এবং এভাবেই ধিরে ধিরে সে শাখা প্রশাখা সব কিছুর মধ্যেই অভূতপূর্ব এবং পরিপূর্ণ সংস্কার আনতে পারবে, যা সর্বপ্রথম নবী কারীম (স.) জাহেল ও বিদ্রোহী আরবদের মধ্যে করতে চেয়েছিলেন এবং অতপর তিনি তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গোটা বিশ্বের বুকে।

শুধু আরব উপদ্বীপের মধ্যেই এ দাওয়াত সীমাবদ্ধ ছিলো না এবং শুধু তৎকালীন বিশ্বের জন্যেও ছিলো না। ইসলাম কোনো ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থা বা ঐতিহাসিক কোনো বিষয় নয়, যা একবার বাস্তবায়িত হবে এবং তারপর ঐতিহাসিক বিষয় হিসাবে পরবর্তী জনগণের জন্যে একটি উদাহরণ হিসাবেই গণ্য হবে; বরং কেয়ামত পর্যন্ত জীবনের সকল সমস্যার সমাধানকল্পেই ইসলামের আগমন। এ ব্যবস্থা, প্রথম বারে যেমন সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে, তেমনি সকল যামানাতেই সমাধান দিতে থাকবে। যতোবারই মানুষ এর থেকে দুরে সরে গেছে এবং জাহেলী অবস্থার দিকে এগিয়ে গেছে, ততোবারই সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও অভাবনীয় কষ্টের মধ্যে পড়ে গেছে। স্থগিত হয়ে গেছে তাদের উন্নতির অগ্রযাত্রা এবং ফিরে গেছে তারা আবার অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকারের দিকে। এই দ্বীন থেকে দুরে সরে যাওয়াই হচ্ছে তাদের জন্যে মারাত্মক অবমাননাকর অবস্থা, আর এই অবমাননাকর অধপতন থেকেই পুনরায় ইসলাম তাদেরকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে এবং শান্তির ব্যবস্থা পুনরায় স্থাপনের জন্যে মানুষকে হাত ধরে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে এসেছে। পেশ করেছে দ্বীন ইসলামের মহান দাওয়াত।

কিন্তু তারপরও এই দ্বীনের দায়ীদেরকে সবসময়ই কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে, মোকাবেলা করতে হয়েছে ভীষণ বিরোধিতা ও নিষ্ঠুর আক্রমণের। অথচ তারা তো গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে মুক্তির দূত হিসাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন এবং উদ্ধার করতে চাচ্ছিলেন মানুষকে জাহেলিয়াতের অন্ধগলী থেকে। বের করে আনতে চাচ্ছিলেন তাদেরকে অহংকার ও বিদ্রোহের অন্ধকার থেকে। বাঁচাতে চাচ্ছিলেন কু-প্রবৃত্তির তাড়ন, অলীক কল্পনার আঁধার, হঠকারিতা ও সত্য-বিরোধিতার জাল থেকে। ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য লাভের অন্ধ আকাংখা এবং নফসের গোলামী থেকে। এই মিশন নিয়েই এসেছিলেন মহা নবী (স.), এসব কদর্যতা থেকে

মুক্ত করে তাদেরকে সত্যের শুভ্র-সমুজ্জ্বল আলোর দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্যেই ছিলো তাঁর আগমন। অথচ তারপরও তাঁকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান, তিরস্কার, আঘাত ও দুঃখ বেদনার সীমাহীন বৃশ্চিক যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। তবু কখনো তিনি ক্লান্তি বোধ করেননি বরং বলিষ্ঠতার সাথে এগিয়ে চলেছেন। ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁর মিশনকে সফলতার দিকে এগিয়ে নেয়ার নিরন্তর সংগ্রামে। প্রকৃতপক্ষে সত্য সংগ্রামী নবী (স.)-এর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ছিলো এক অগ্নিপরীক্ষা। তবু সকল কষ্টের মধ্যে ছিলো অভিনব এবং অভাবনীয় এক আনন্দ।

'এ হচ্ছে একটি কেতাব যা তোমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব এব্যাপারে তোমার মনের মধ্যে যেন কোনো সংকীর্ণতা না থাকে। (এর অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে,) যেন এর দ্বারা তুমি (জনগণকে) সতর্ক করতে পারো এবং মোমেনদের জন্যে এ কেতাব হচ্ছে একটি অমূল্য উপদেশমালা।'

আর স্বাভাবিকভাবেই একথা সত্য যে, আল্লাহ তায়ালাই জানেন প্রকৃতপক্ষে কারা মোমেন, যাদের জন্যে এ কেতাব উপদেশবাণী সরবরাহ করে, আর তিনি অবশ্যই জানেন অবিশ্বাসীই বা কারা যাদের জন্যে এ কেতাব সতর্ককারী ভূমিকা পালন করেছে। লক্ষ্য আমরা বসাই বুঝতে পারবো যে, করলে আল-কোরআন জীবন্ত কেতাব হিসাবে মানবজীবনের যে কোনো বাস্তব অবস্থার মোকাবেলা করার জন্যে বারবার ফিরে এসেছে এবং এর দ্বারাই নবী করীম (স.) অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মহা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

একইভাবে আজকের মানবজাতি সেই যুগের মতো একই রকম জাহেলিয়াতের মাঝে ডুবে হয়ে আছে। তিনি তৎকালীন বিশ্বমানবতাকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে এ কেতাব নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। তেমনি আজও প্রয়োজন একটি কোরআন বাহী দল যারা জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করতে গিয়ে কোনো বাধা বিপত্তির পরোয়া করবেনা এবং সমাজের তৃণ মূল থেকেই গভীরভাবে পরিবর্তন সাধন করবে।

দ্বীন ইসলাম আসার পরও ইসলাম থেকে মানবজাতি ছুরে সরে যাওয়ার কারণে সময়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু দ্বীন ইসলামের মূল শিক্ষা সর্বকালে একই থেকেছে এবং একইভাবে এ ব্যবস্থা মানুষকে মানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ করে এসেছে। তুবও মানুষ বারবার জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে গেছে এবং অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে থেকেছে। জীবনের মৌলিক, শাখা-উপশাখা, গোপন প্রকাশ্য এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়েই তারা চরম মূর্খতার দিকে ফিরে গেছে।

আজকাল মানবজাতি তাদের আকীদা বিশ্বাস থেকে অনেক দুরে সরে গিয়েছে, অথচ তাদের পুর্ব পুরুষরা একসময় ঠিকই এই দ্বীনের ওপর বিশ্বাসী ছিলো। তারা নিষ্ঠার সাথে মেনে নিয়েছিলো যে, দ্বীন ইসলামই একমাত্র সঠিক জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু তারপর তাদের চিন্তা-চেতনা এবং বুঝ শক্তির গভীর তলদেশ থেকে সঠিক এ আকীদা উৎপাটিত হয়ে যায়।

অবশ্যই দ্বীন ইসলাম এসেছিলো সারা বিশ্বের চেহারা পরিবর্তন করার জন্যে, এসেছিলো নতুন আর এক বিশ্ব গড়তে, যে বিশ্বে একমাত্র আল্লাহর কোরআনের শাষন গড়ে উঠবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহদ্রোহী সমস্ত তাগুতী শক্তি হবে, যেখানে একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করা হবে এবং অন্যের দাসত্ব থেকে মানুষ মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

এখানে 'এবাদাত' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত (১) হয়েছে। এর অর্থ একমাত্র আল্লাহরই (নির্দ্বিধা ও নিরংকুশ) দাসত্ব ও আনুগত্য– এ ধরনের আনুগত্য তিনি ছাড়া কোনো মানুষকে দেয়া

(১) দেখুন সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রচিত 'আলমুসতালাহাতু আরবায়াতুল 'ফিল কোরআন' পুস্তকের 'ইবাদাত' অধ্যায়।

যায় না। দ্বীন ইসলাম চায় এমন এক বিশ্ব গড়তে, যেখানে মানুষ কোনো মানুষের গোলামী করবে না এবং মানুষের দাসত্ব থেকে মানুষ পরিপূর্ণভাবে মুক্ত থাকবে। ইসলাম গড়তে চায় এমন এক বিশ্ব, যেখানে প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে, সম্মানজনকভাবে এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে জন্মগ্রহণ করবে, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন থাকবে ও কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনা এবং ভাবাবেগের যাবতীয় তাড়ন থেকে মুক্ত থাকবে, মুক্ত থাকবে সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব থেকে।

এই মহান দ্বীন যে মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তা হচ্ছে, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সর্বময় ক্ষমতার মালিক আর কেউ নেই। এই দাবী নিয়েই মানবেতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে প্রত্যেক নবী তাঁর জাতির কাছে এসেছেন, আর এই বক্তব্যটিই এই সূরা ও কোরআনুল করীমের মুল বক্তব্য। আর আল্লাহ ছাড়া নাই কোনো মালিক মনিব প্রভু বাদশাহ শাসনকর্তা কেউ নেই- একথার অর্থ হলো যে, মানুষের জীবনে সর্বোচ্চ শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে একমাত্র আল্লাহর, যেমন গোটা সৃষ্টির সবখানে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তিনিই মানুষের জীবনের যে কোনো বিষয়ে ফয়সালা দেয়ার ও তার ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়ার অধিকারী, তার জীবন পথ রচনা করার ও আইন কানুন দেয়ার অধিকারীও তিনি। আর এই মূলনীতির ভিত্তিতে একজন মুসলমান বিশ্বাস করে না যে, আল্লাহর সাথে সৃষ্টি-কাজে এবং তাঁর পরিচালনার ক্ষমতায় ভাগ বসানোর মতো আর কেউ আছে বা থাকতে পারে। এমনকি সৃষ্টির সব কিছুকে একমাত্র তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। আর একজন প্রকৃত মুসলমানের অনুভূতির মধ্যেও দেখা যায় যে, সে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করতে চায় না এবং না বুঝে-সুঝে ও চিন্তা ভাবনা না করে কারো অন্ধ আনুগত্যও করতে চায় না। আইন কানুন মানার ব্যাপারেও, মানব রচিত আইন তারা কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারে না। এমনকি কোনো কিছুর মূল্যায়ন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং কোনো ধারণা বা অনুমান করার ব্যাপারেও সে আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনা অনুরসরণ করে। আর কোনো মানুষ যদি আল্লাহর কর্তৃত্বের পাশাপাশি নিজের শাসন কর্তৃত্বের দাবী করে, তাহলে সত্যিকার কোনো মুসলমান নিজেকে তার কাছে সোপর্দ করে দেয় না।

বিশ্বাসগত দিক দিয়ে এই হচ্ছে দ্বীন ইসলামের মূলনীতি, কিন্তু আজকে মানবজাতি কেননা বিশ্বাসের ওপর এগিয়ে চলেছে?

আজকে মানব জাতি যে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে রয়েছে এসব কিছুই হচ্ছে জাহেলিয়াত বা মূর্খতা, অজ্ঞতা ও হঠকারিতা।

এদের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা ধর্মত্যাগী বা নাস্তিক বলে পরিচিত। এরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না। এদের অবস্থা সুস্পষ্ট। এদের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার অপেক্ষা রাখে না। আর একটি দল হচ্ছে মূর্তিপূজারী, এরা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে বটে, কিন্তু তারা তাঁর সাথে প্রকাশ্যে আরো বহু দেব-দেবীকে (তাঁর ক্ষমতায়) অংশীদার মনে করে এবং প্রতিপালক, কর্তৃত্বশীল, আইনদাতা ও শাসনকর্তা মনে করে আল্লাহ ছাড়া অন্য আরো, অনেককে, যেমন দেখা যায় ভারত, নেপাল, আফ্রিকা ও পৃথিবীর আরো বহু দেশে।

আরো একটি দল আছে, যাদেরকে বলা হয় আহলে কেতাব। এরা হচ্ছে ইহুদী ও খৃষ্টান। এরা বহু প্রাচীনকাল থেকে আল্লাহর পুত্র থাকার কথা বলে শেরক করে আসছে, একই ভাবে তারা তাদের ধর্মযাজক ও দরবেশদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অথবা তাঁর অধীনস্থ রব-প্রতিপালক-নিয়ন্ত্রক ও আইনদাতা হিসাবে মেনে নেয়, কারণ এসব ধর্মযাজক বা দরবেশদের

মধ্যে কেউ কেউ নিজেদেরকে শাসন ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করেছে আর কেউ কেউ দাবী করেছে নিজেদেরকে আইনদাতা হিসাবে, যদিও তারা সাধারণ মানুষের কাছে রুকু সাজদা দাবী করেনা। তবে পরোক্ষভাবে তারা গোটা জীবনের জন্যে আল্লাহর যে শাসন ক্ষমতা রয়েছে তার অংশীদার অধিকারী হওয়ার দাবী করে এবং তারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার রাজনৈতিক সংগঠন বানিয়ে রেখেছে, যেমন পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র এবং আরো এ ধরনের কিছু নাম তারা ব্যবহার করে। আর এইভাবে নিজেদের মর্যাদা সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন শাসন পদ্ধতির নাম বানিয়ে নিয়েছে, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি। আর এইভাবে তারা জাহেলিয়াতের আমলে গ্রীক ও রোমের মতো আরো অনেকের অনুরূপ আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা বাদ দিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্যে মনগড়া আইন-কানুন বানিয়ে নিয়েছে।

আর একটি দল হচ্ছে, যারা নিজেদেরকে 'মুসলমান' বলে দাবী করে। এরাও আহলে কেতাবদের দেখানো পদ্ধতি অবলম্বনে এবং তাদের সাথে তালে তাল মিলিয়ে আল্লাহর দ্বীন থেকে একেবারে বেরিয়ে গেছে এবং মানুষের রচিত আইন-কানুন গ্রহণ করে নিয়েছে। একথা এখানে পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, আল্লাহর দ্বীন বলতে বুঝায় তাঁর দেয়া জীবন পথ, নিয়ম কানুন ও আইন বিধান– যা সমগ্র জীবনকে সার্বিকভাবে পরিচালনা করার জন্যে এসেছে। অথচ তারা তা বাদ দিয়ে নিজেদের জন্যে মনগড়া নিয়ম পদ্ধতি, গঠনতন্ত্র ও আইন কানুন বানিয়ে নিয়েছে।

গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে এই পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা নাযিল হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ বহু কাল অতিবাহিত হয়েছে এবং মানুষ অধপতনের দিকে নামতে নামতে একেবারে জাহেলিয়াতের নিম্নতম স্তরে পৌঁছে গেছে। এরা কেউই আল্লাহর প্রেরিত জীবন ব্যবস্থার ওপর নেই। তাই আল কোরআন আবারও গোটা মানবজাতিকে ডেকে ডেকে বলছে, ফিরে এসো তোমরা সবাই তোমাদের সবার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সেই জীবন ব্যবস্থার দিকে, যা তোমাদের জীবনের সকল প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম, যার মধ্যে কোনো ক্রটি, সন্দেহ বা অপূর্ণতা নেই– এ ব্যবস্থা তোমাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান আজও তেমনি করেই দেবে যেমন করে ইতিপূর্বে দিয়েছে। তোমাদের আকীদা বিশ্বাসের শূন্যতাকে ভরে দেবে তৃপ্তিজনক বিশ্বাসে চিন্তা চেতনায় ও বাস্তব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানে। আর এটাও সত্য কথা যে, আজ যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত এ ব্যবস্থা পুরাপুরি অনুসরণ করবে তাকে অবিকল সেই ধরনের প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে হবে যেমন এ জীবন ব্যবস্থার সূচনা কালে রসূলুল্লাহ (স.)-কে মোকাবেলা করতে হয়েছিলো।

তারপরও তিনি পুঞ্জীভূত জাহেলিয়াতের আঁধারে ডুবে থাকা মানুষকে সম্বোধন করছিলেন। অজ্ঞানতার ঘন অন্ধাকারে এমন ভাবে তারা হাবুডুবু খাচ্ছিলো যে তার থেকে বের হয়ে আসা তাদের জন্যে খুবই কঠিন ছিলো, জাহেলিয়াতের বিয়াবানে তারা দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো এবং এইময়দানে শয়তানের কাছে এমনভাবে তারা আত্মসমর্পণ করেছিলো যে, সে মরদূদ শয়তান তাদেরকে নিজের ইচ্ছামতো পরিচালনা করে তার সকল ষড়যন্ত্র তাদের দ্বারাই পূরণ করে চলেছিলো। এমনই কঠিন পরিস্থিতিতে মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (স.) মানুষের হৃদয়ে গড়ে তুলতে চাইলেন তাওহিদী বিশ্বাস, দিতে চাইলেন সঠিক আকীদা বিশ্বাস এবং তাদের বুদ্ধিকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন সুদৃঢ় এক নীতিতে, আর তা ছিলো, আশহাদু আল্লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ। এর উদ্দেশ্য ছিলো পৃথিবীতে যেন সর্বাবস্থকভাবে একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাঁর আনুগত্যের সাথে অন্য কারো আনুগত্য যেন মেশানো না হয় এবং যেন মানবতার নতুন এক

প্রজন্মের সূচনা হয়, যার ফলে মানুষের গোলামী থেকে মানুষ নাজাত পাবে এবং মুক্তি পাবে সে কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে।

ইসলাম কোনো নতুন জিনিস নয়, নয় এটা কোনো শুধু ঐতিহাসিক বিষয়, যা একবার পৃথিবীতে আগমন করার পর শেষ হয়ে যাবে এবং ঐতিহাসিক বিষয়ে পরিণত হয়ে থাকবে। আর তার কল্যাণময়ী আদর্শ থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের লোকদেরকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ইসলাম সেই চির কল্যাণময় আদর্শ যা পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে তার ভূমিকা পালন করে আসছে।। বিভিন্ন পরিবেশের, বিভিন্ন জনপদের বিভিন্ন রুচি ও পোশাকধারী মানুষের, বিভিন্ন অবস্থার, বিভিন্ন সংগঠনের, বিভিন্ন চিন্তা চেতনার, বিভিন্ন আকীদা বিশ্বাসের, বিভিন্ন মূল্যবোধের, বিভিন্ন পরিমাপের ও বিভিন্ন ব্যক্তির অনুসারী মানুষের কাছে ইসলাম আবেদন পেশ করেছে বিবেক খাটিয়ে চিন্তা করার জন্যে। আহ্বান জানিয়েছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকেই একমাত্র মালিক, মনিব, প্রতিপালক ও বিধানদাতা মেনে চলতে এবং বিভিন্ন যুগে আগত আল্লাহর নবী রসূলদের পদাংক অনুসরণ করে চলতে। প্রথম আগমনকালেও এই ইসলাম একইভাবে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলো।

ইসলাম ও জাহেলী সমাজের পার্থক্য

জাহেলিয়াত একটি বিশেষ অবস্থা এবং মানুষের বিশেষ এক ব্যবহার বা চাল চলনের নাম। এ জাহেলিয়াত নির্দিষ্ট কোনো সময়ের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বা ইতিহাসের কোনো এক সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। আজকের দিনে জাহেলিয়াত পৃথিবীর সকল অঞ্চলে, প্রতিটি জাতি, প্রতিটি ধর্মের, প্রতিটি সংগঠনের এবং বিভিন্ন রকম রুচি ও ভাবধারার লোকদের মধ্যে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। এই জাহেলিয়াতের আসন প্রতিষ্ঠার ধারা শুরু হয় একটি মূলনীতির ওপর, আর তা হচ্ছে, মানুষের জন্যেই মানুষের রচিত শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা, অর্থাৎ মানুষের ওপর মানুষের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। এ মতবাদ দাঁড়িয়ে আছে যে মূল বুনিয়াদের ওপর তা হলো, 'জনগণের ইচ্ছাই' সকল সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। একথা মানার অর্থ হচ্ছে, 'আল্লাহর বিধানকে সরাসরি অস্বীকার করা। তারপর এই জনগণের সার্বভৌমত্বের রূপ বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে, জনগণের কর্তৃত্বের বহিপ্রকাশ হয়েছে নানাভাবে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভূখণ্ডে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই জাহেলিয়াতের প্রভাব মানব সমাজে বিস্তৃত হয়েছে এবং এর দ্বারা মুর্খতার পতাকা উড্ডিন। এসব প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষণ ফুটে উঠেছে তার বিভিন্ন ব্যবহারের ভেতর দিয়ে। নানা নামে ও গুণ বর্ণনায়, নানা দলে ও নানা ধর্মের দোহাই দিয়ে বারবার মানুষের প্রভুত্ব কায়েম করার চেষ্টা হয়েছে। অথচ মানুষের মনের মধ্যে নিস্বার্থ কল্যাণকামিতার অনুভূতি না থাকায় এর মাধ্যমে মানুষের স্বার্থপরতা ও তার পশু সুলভ বৃত্তি আরো উম্মাদ হয়ে উঠেছে এবং সব সময়ই এই সব ব্যক্তি ও দলীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে।

এই মৌলিক মাপকাঠি অনুসারে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আজকে সারা পৃথিবীর দেশগুলো জাহেলিয়াতের আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে এবং জাহেলিয়াতই আজ পৃথিবীর সর্বত্র জনজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর ইসলাম বর্তমান বিশ্বে যেন শুধুমাত্র আত্মরক্ষা বা কোনো রকমে বেঁচে থাকার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে। মুসলমান দাবীদার লোকগুলো শুধুমাত্র নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যেই ব্যস্ত। অপরদিকে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীরা তেমনি করেই বিশ্ব মানবকে দাওয়াত দিচ্ছে যেমন করে মোহাম্মদ (স.) মানুষকে ডাকছিলেন। তাদেরকে আল্লাহর দিকে, তাঁরই ভাষায় আহ্বান জানানো হচ্ছে, যেমন, এরশাদ হচ্ছে,

'এ এমন একটি কেতাব, যা নাযিল হয়েছে তোমার কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমার অন্তরে এ বিষয়ে কোনো সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। (একথা তোমাদের এজন্যেই বলা হচ্ছে) যেন (নির্দ্বিধায়) মানুষকে এ কেতাব দ্বারা তুমি সতর্ক করতে পারো এবং মোমেনদের জন্যে যেন এ কেতাব উপদেশমালা হিসাবে কাজ করতে পারে।'

এ সত্যকে সঠিকভাবে গুরুত্ব দানের জন্যে এবং জনগণের সামনে এ সত্যকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি,

অবশ্যই আজকের সমাজ সামগ্রিকভাবে জাহেলী সমাজে পরিণত হয়ে গেছে, আর এ কারণে এ সমাজ হয় 'বিবর্তনশীল' অথবা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এ সমাজ ফিরে গেছে প্রাচীন জাহেলিয়াতেরই দিকে, যেখান থেকে ইসলাম তাদেরকে এক সময় হাত ধরে টেনে তুলেছিলো। কিন্তু হায়, মূর্খতার পংকিলতায় নিমজ্জিত এ সমাজ ইসলামের সুশীতল ও কোমল হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার পূর্বেকার সেই অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে, পাশাপাশি ইসলাম ও তার সত্যিকার ধারক-বাহকরা তাদেরকে ওই ঘোর অমানিশা থেকে উদ্ধার করার জন্যে এবং জাহেলিয়াতের কবল থেকে মুক্ত করার জন্যে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে চলেছে। বর্তমান সভ্যতার অবদানের ক্ষেত্রে এবং পুনরায় আরো অধিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ইসলাম নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আল্লাহর মূল্যায়ন ও পরিমাপকেই তারা ব্যবহার করছে। অর্থাৎ আল কোরআনের আলোকে ও হাদীসের ব্যাখ্যার মাধ্যমেই আল্লাহর পক্ষে আহ্বানকারীরা মানুষকে প্রগতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

মোমেনদের এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সমাজের সর্বত্র একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং সমুন্নত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এজন্যে তারা চায় আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহরই আইন কানুন চালু করতে। একমাত্র এই পদ্ধতিতেই মানুষ মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং একমাত্র এই উপায়েই ইসলামের বাস্তবায়ন অথবা সভ্যতার বিকাশ সম্ভব। এই মত ও পথকেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কালামে পাকে জানিয়েছেন, কারণ মানব জাতির জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে চান তার মূলে রয়েছে প্রতিটি মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মহান ইচ্ছা। কিন্তু কোনো মানুষের গোলামী করে এ মর্যাদা বা স্বাধীনতা কোনোটাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এহেন সমাজে মানুষের কোনো সম্মান থাকে না এবং স্বাধীনতার কোনো স্বাদও পাওয়া সম্ভব নয়। এমন সমাজে কোনো ব্যক্তি মানুষ বা বিশেষ কোনো মানবগোষ্ঠী প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব করতে থাকে এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যায়। এসব সমাজে কিছু কিছু মানুষ ওদের সেবাদাস হতেও প্রস্তুত হয়ে যায় এবং নিছক সাময়িক স্বার্থের জন্যে ওই সকল কর্তৃত্বশীল মানুষের অন্ধ আনুগত্য করতে থাকে! আর আইন রচনার সাফল্য শুধু মাত্র আইন চালু করার ওপরই নির্ভর করে না বরং সঠিক কোনো কাজ করতে গেলে সকল দিকে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। নৈতিকতা প্রসারে এবং আনুগত্য বোধ করতে গেলেও আইন তৈরী ও প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এর জন্যে বিভিন্ন রসম রেওয়ায, রীতি নীতি ও নিয়ম কানুনেরও প্রয়োজন, যার কাছে মানুষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মাথা নত করতে বাধ্য হয়। এই জাহেলী রসম রেওয়াযের গোলামীতে আবদ্ধ সমাজ আসলেই পশ্চাৎপদ সমাজ, অথবা ইসলামী পরিভাষায় ওদের জন্যে যে কথাটা প্রযোজ্য তা হচ্ছে, 'জাহেলী মোশরেক সমাজ'।

আর যকন কোনো সমাজের মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ আকীদা বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মননশীলতা বিদ্যমান থাকে এবং এই দ্বীনী বন্ধনের ভিত্তিতে মধুর সম্পর্ক গাড়ে ওঠে, কোনো মানব

নির্মিত রীতিনীতি মুল্যবোধ বা মনগড়া কোনো ব্যবস্থা দ্বারা তারা পরিচালিত হয়না, তখনই এ সমাজকে মানবরুপী শয়তানরা বলে সেকেলে সমাজ, কিন্তু এ ধরনের সমাজের ইসলামী নাম হচ্ছে, আল্লাহমুখী ইসলামী সমাজ, কারণ এ এমন এক আদর্শ সমাজ যার মধ্যে মানুষ হবে এক নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে এক অবিচ্ছেদ্ধ বন্ধন। এ বন্ধন দ্বীনের বন্ধন চিন্তাচেতনা ও আকীদা বিশ্বাসের। আর যখন বর্ণ জাতি বা কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা বা কোনো বিশেষ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে কোনো সমাজ গড়ে ওঠে তখনই ইসলামী ভাষায় এটা হবে প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদগামী বা মোশরেকী বা জাহেলী সমাজ ....কারণ এ সমাজের ভিত্তি রচিত হয়েছে শ্রেণী, বর্ণ, জাতি ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে। আর এসব সম্পর্কের কারণে মানুষের মধ্যে সদ্ গুণাবলী সৃষ্টি হয় না। হাঁ মানুষ তো শ্রেণী, জাতি ও এলাকার পরিচয়েও গড়ে ওঠে বটে, কিন্তু চিন্তাধারার সঠিক ব্যবহার না করা হলে এই মানুষ প্রকৃতপক্ষে মানুষ থাকে না এবং সমষ্টিকভাবে সকল মানুষ একটি সীমারেখার মধ্যে বসবাস করতে পারে না।

তারপর এই মানুষ নিজে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মালিক হয়ে যায়। এই দ্বীন মানুষকে আকীদা বিশ্বাস, কল্পনা শক্তি ও চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তন এনে দিয়ে, তাকে বুঝবার শক্তি দান করে, তীব্র অনুভূতি-শক্তি দিয়ে তার মধ্যে অল্পে তুষ্টি ও তৃপ্তি দান করে এবং তার মনকে সঠিক গতি দান করে সম্মানিত করে। কিন্তু সে নিজে কিছুতেই পরিবর্তন করতে পারে না তার শ্রেণীকে, তার বর্ণকে, তার জাতিকে, পারে না সীমাবদ্ধ করতে তার জন্মের শ্রেণী বা বর্ণ, যেমন তার পূর্ব প্রজন্মের জাতি ও এলাকার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার ক্ষমতা তার নাই। সুতরাং এমন কোনো এক বিষয়ের ওপর যদি কোনো জনপদ একত্রিত হয়ে যায় যা তার স্বাধীন ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত, তাহলে অবশ্যই ওই সমাজ পৃথিবীর সবচেয়ে, দৃষ্টান্তমূলক উন্নত এবং মযবুত সমাজ, কেননা এখানে মানুষ একত্রিত হয় তাদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বাইরের এমন একটি মুল্যবোধের ভিত্তিতে যার নিয়ন্ত্রক হলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, তাদের কোনো শ্রেণী অন্য কোনো শ্রেণীর জন্যে রীতিনীতি মূল্যবোধ নির্ধারণ করেনা।

আর ইসলাম যখন কোনো সমাজকে পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখে, তখন মানবতার বৈশিষ্ট্য সম্মানিত হয় এবং পরিচালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে, আর তখনই সেই সমাজ হয়ে যায় গঠনমূলক ও অগ্রসরমান। শরীয়তের পরিভাষায় তাকেই বলা হয় ইসলামী সমাজ। আর যে কোনো রূপে ও নানা প্রকৃতির মানুষের মধ্যে যখন এ সমাজ বস্তুমুখী বা বস্তুবাদী হয়ে যায় এবং যখন বস্তুর মূল্যই তার কাছে প্রধান হয়ে ওঠে, তা সে চিন্তার ক্ষেত্রেই হোক– যেমন মার্কসবাদে দেখা যায় অথবা বস্তুর ব্যবহারিক পরিণতির ভিত্তিতেই হোক যেমন আমেরিকা ও ইউরোপে ও অন্যান্য সেই সমাজে দেখা যায়, যেখানে বস্তুর গুরুত্বই সর্বাধিক, সেখানে এই পথে চলার কারণে সকল মূল্যবোধ ও মানবীয় গুণাবলী সবই ব্যর্থ হয়ে যায়, ব্যর্থ হয়ে যায় সর্ব প্রথম চারিত্রিক মূল্যবোধ, এই ধরনের সমাজকে বলা যায় পশ্চাদমুখী ও জাহেলী সমাজ, বা ইসলামী পরিভাষায় ও মোশরেক সমাজ।

নিশ্চয়ই মুসলমানরা বস্তু ও তার ব্যবহারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে না, মতবাদের ক্ষেত্রে তো নয়ই, কারণ বস্তু দ্বারাতেই তো গোটা বিশ্ব জগতের সৃষ্টির সূচনা হয়েছে, আর বস্তুকে ব্যবহার দ্বারা যে বস্তুগত ফায়দা পাওয়া যায় মুসলিম সমাজে সে কথাও অবহেলিত নয়। এর বাস্তব ব্যবহারকেও উপেক্ষা করা হয়নি এবং এর থেকে মানুষ যে উপকার পায় তার কোনোটাকে মোটেই কম মূল্যবান মনে করা হয়নি। সুতরাং আল্লাহরও ওয়াদা ও শর্ত সাপেক্ষে যে খেলাফত দান করার

ব্যবস্থা রয়েছে সেই খলীফাদের পরিচালনায় বস্তুর যে উৎকর্ষ সাধিত হবে এবং এর ফলে মানব জাতির যে কল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাকে পুরোপুরি হালাল করা হয়েছে। এসব কিছুই হালাল ও পবিত্র এবং হালাল বস্তুগুলোকে কাজে লাগানোর জন্যে ইসলাম রীতিমত আহ্বান জানিয়েছে, আহ্বান জানিয়েছে এগুলোকে ভোগ-ব্যবহার করার জন্যে, যেমন এ সূরার মধ্যে বর্ণিত অনেক ঘটনায় আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এই মহান মূল্যবোধকে অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাহ্য করা হয় না। আসলে এর দ্বারা মানুষের নীতি নৈতিকতা, সুস্থ বিবেক বুদ্ধি, মেধা মননশীলতা ও প্রতিভাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়।

আর যখন 'মানবতার' ও মানুষের নৈতিক চরিত্রের তেমনি মূল্যায়ন করা হবে যেমন আল্লাহর বিচারদন্ডে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে, তখনই সমাজে এটা প্রধান পরিচালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করবে, আর তখনই এ সমাজ হবে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক এবং আশানুরূপ প্রগতিশীল সমাজ। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা যায় মুসলিম সমাজ। মানবতার মূল্য ও মানুষের চরিত্র কোনো গোপন বা কোনো তরল বা বায়বীয় পদার্থ নয় যে নযরে পড়বে না বা একটি অবস্থার ওপর এর মূল্যমান স্থির হয়ে থাকবে। অবশ্য এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে যে, কোনো কিছুর মূল্যবান হওয়া মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে, স্থায়ীভাবে কোনো কিছুই মূল্যবান নয়.......কাজেই এখানে এমন কোনো স্থায়ী মৌলিক জিনিস বা মূলনীতি নেই যার দিকে কোনো কিছুর জানার জন্যে রুজু করা যেতে পারে .....কিন্তু অবশ্যই এটা বাস্তব সত্য যে, মানুষের মূল্যবোধ এবং চরিত্র ক্রমান্বয়ে উন্নত হয়, আর এটিই হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিরাজমান সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা শুধু মানুষের মধ্যেই থাকে, জীব জানোয়ারের মধ্যে থাকে না। আর এই গুণাবলী যখন মানুষের মধ্যে বিজয়ী অবস্থায় বিরাজ করে, তখনই সে পশুত্ব থেকে মর্যাদাপূর্ণ ও উন্নত হিসেবে পরিচিত হয় এবং এই সব গুণ তাকে পশু থেকে আলাদা করে।

লক্ষণীয়, যে গুণাবলী বিশেষ কোনো পরিবেশে এবং বিশেষ কোনো শিক্ষার ফলে বিকশিত হয় ও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে সেগুলো মানুষ ও পশুর মধ্যে সমভাবে বা অসমভাবে যে বিরাজ করে তা নয়। এ প্রশ্নটি যখন সামনে আসে তখন এ বিষয়ে পরিষ্কার একটা বুঝ অবশ্যই আসতে হবে, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও পরিবেশের পার্থক্যে গুণাবলীর বিকাশ কম বেশী হয়, কিন্তু পশুর মধ্যে শ্রেণী ভেদে যে সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত, এজন্যে একইভাবে তাদের মধ্যে সেগুলো থেকেই যাবে। কারো মধ্যে থাকবে এবং কারো মধ্যে থাকবে না, বা কারো মধ্যে কম থাকবে এবং কারো মধ্যে বেশী থাকবে বা এসব বৈশিষ্ট্য কমবে বা বাড়বে এমনও কোনো সময়ে হবে না। এটাই চূড়ান্ত কথা। তবে পশুদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ফলে কোনো কোনো সময়ে সাময়িকভাবে তাদের প্রকৃতিগত স্বভাবের মধ্যে হয়তো কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু এ পরিবর্তন স্থায়ী হবে এটা কিছুতেই বলা যায় না, যদিও প্রগতিবাদীরা এ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এখন আমাদের বুঝতে হবে যে, এখানে কৃষি চরিত্র বা শিল্প চরিত্রের কথা বলা হয়নি, বলা হয়নি পুঁজিবাদী নৈতিকতা বা সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতা সম্পর্কে, সালজোকি অথবা বুর্জোয়া নৈতিকতা সম্পর্কেও বলা হয়নি। বিশেষ কোনো পরিবেশের মধ্যে গড়ে ওঠা নৈতিকতা বা জীবনের অন্য কোনো অবস্থার নৈতিকতাও আমাদের বিবেচ্য নয়। এখানে নীতি নৈতিকতা ও মুল্যবোধ গ্রহণ ও বর্জনকে বুঝাতে গিয়ে পশু স্বভাবের সাথে তুলনা করাটা মোটেই মনুষত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে নয়; বরং জীবনের জন্যে কোনো মূল্যবোধ ও চরিত্র গড়ে তোলা এবং তার

ওপর চলতে থাকার জন্যে পশু বৃত্তিগুলো সামনে রেখে তার থেকেই মানবতাবোধের শিক্ষা নেয়া যেতে পারে এবং সেই মানবতাবোধের ওপরই বর্তমান মুসলমানদেরকে চলতে হবে। অপর দিকে বিরোধী অন্যান্য সমাজের লোকেরা ওইসব পশু-স্বভাবকেই অনুসরণ করে চললে এই দুই সমাজের তুলনামূলক অবস্থান আমাদের কাছে স্পষ্ট থাকবে। অথবা ইসলামী ভাবধারার কথাটা এইভাবে বলা যায় যে, জাহেলিয়াতে পরিপূর্ণ সমাজ ও সামাজিক রীতি থেকে ফিরে আসতে হলে আমাদেরকে আল্লাহ মুখী খাঁটি ইসলামী চরিত্র গড়ে তুলতে হবে।

যে সমাজের মধ্যে পশুবৃত্তি বা পশু-স্বভাব বিরাজ করে, তাকে কোনো সভ্য সমাজ বলা যায় না, তা শিল্প কারখানার দিক দিয়ে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বা বিজ্ঞানের উন্নতিতে যতোই অগ্রসরমান হোক না কেন! কেননা মানবতার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে নৈতিক শক্তিই যুগে যুগে প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছে।

অথচ আধুনিক জাহেলী সমাজে এই নৈতিকতার মূল্য খুব কমই দেয়া হয়ে থাকে এবং মানবতাবোধ ও পশু স্বভাবের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য সাধারণত খেয়াল করা হয় না, বরং নারী পুরুষের অবাধ অবৈধ যৌন সম্পর্ককে তারা মোটেই বে-আইনী মনে করে না, এমনকি সম মৈথুনকেও তারা নৈতিকতাবিরোধী বা কোনো অবৈধ কাজ বলে গণ্য করে না। তাদের কাছে নৈতিকতা অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগত লেন দেন, অর্থনৈতিক আদান প্রদান ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপারে কাউকে কষ্ট না দেয়া। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এসব নৈতিকতা রাষ্ট্রের কল্যাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ... অপরদিকে, তাদের বই পুস্তক, সাংবাদিকদের তৎপরতা, পত্র পত্রিকা, প্রচার মাধ্যম এবং অন্যান্য যতো প্রকার যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে সব কিছুই নিরন্তর জাহেলী সমাজের নর নারী ও যুবক যুবতীদের বলে দিচ্ছে যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও স্বাধীন যৌন সম্পর্ক স্থাপন মোটেই কোনো নৈতিক অবক্ষয় নয়।

কিন্তু এসব তথাকথিত সভ্য সমাজের নেতারা মানুষকে চরম অধপতনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই এরা সভ্য নয়। মানবতার দৃষ্টিতে এবং মানুষের অগ্রগতিকে রুখে দেয়ার জন্যে অবশ্যই এসব মানুষ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত, আর ইসলাম এটা কিছুতেই অনুমোদন করে না। কারণ ইসলাম মানুষকে কু-প্রবৃত্তির তাড়ন থেকে মুক্ত করেছে, ইসলাম মানুষের মানবতার বৈশিষ্টগুলোকে জাগিয়ে তুলেছে, রক্ষা করেছে তাকে পশুত্বের ধ্বংসকারিতা থেকে।

আর, বর্তমান মানব সমাজের চারিত্রিক অবনতির যে চিত্র আমরা তুলে ধরলাম এর বেশী বলার আর কিছুই নাই। এতে আমরা দেখতে পেয়েছি কিভাবে জ্ঞানসমৃদ্ধ ও বিবেকবান মানুষ জাহেলিয়াতের অতল তলে ডুবে গেছে, সৃষ্টি সম্পর্কে কি অদ্ভুত মনোভাব ও বিশ্বাস পোষণ করছে, জীবন ও জগত সম্পর্কে কী অবান্তর অবাস্তব চিন্তা তারা করছে। আমরা মনে করি, সংক্ষিপ্ত এই ইশারাগুলো জাহেলিয়াতের কদর্য চেহারা আন্দাজ করার জন্যে যথেষ্ট এবং বর্তমান সভ্যতাগর্বী মানব সমাজ এবং ওই জাহেলিয়াতের ধারক বাহকরা তাদের অনুসারীদের রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে তাও উপরোক্ত আলোচনার আলোকে অনুমান করা সহজ হবে। আর এর পাশাপাশি আমরা ইসলামী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য এবং ইসলামের দিকে যারা আহ্বান করছে তাদের জীবন ও কার্যকলাপের পরিচ্ছন্নতা ও যৌক্তিকতা পর্যবেক্ষণ করছি, লক্ষ্য করছি তারা আমাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, মহান রব্বুল আলামীন মানব জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্যে এবং আল্লাহর মহব্বতে মানুষে মানুষে ভালোবাসাবাসি ও সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্যে যে আহ্বান জানিয়ে গেছেন তারও তুলনামূলক বিচার আমরা করতে পারছি। এমতাবস্থায়

আমাদেরকে আল্লাহর পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে, ডাকা হচ্ছে ইসলামের আকীদা বিশ্বাস, আমল আখলাক, সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে। এতো হচ্ছে সেই মহান প্রচেষ্টারই অংগ, যাকে রসূল (স.)-এর সময়ও প্রতিরোধ করার চেষ্টা হয়েছে, সুতরাং আজকেও স্বার্থান্বেষী মহল একে প্রতিরোধ করতে, খতম করে দিতে চাইবে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। দাওয়াতের এই মূল কেন্দ্র বিন্দু থেকেই তো ইসলামী দাওয়াতী কাজের সূচনা হয়েছিলো এবং আল্লাহর যমীনে তাঁরই প্রভুত্বকে মেনে নেয়া এবং তাঁর বিধান চালু করার মাধ্যমে তাঁর প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হয়ে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালানোর লক্ষ্যে আল্লাহর প্রেরিত কেতাব দিক নির্দেশনা দিয়েছিলো– আহ্বান জানিয়েছিলো আল্লাহকেই একমাত্র প্রভু, প্রতিপালক ও বাদশাহ, আইন-দাতা বলে মেনে নিতে! তাই এরশাদ হচ্ছে,

'এ যে সেই কেতাব যা তোমার কাছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, সুতরাং, এ কেতাব সম্পর্কে তোমার মনের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা যেন না থাকে। এ কেতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তুমি এর দ্বারা মানুষকে সতর্ক করো এবং মোমেনদের জন্যে এ মহান কেতাব এক উপদেশমালা।'

আর যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সম্বোধন করে এ কথাগুলো বললেন, দায়িত্ব দিলেন তাঁর বিধান চালু করতে, তখনই আল কোরআনের এই মহান বাণীকে রসূলুল্লাহ সর্বপ্রথম তাঁর নিজ জাতির কাছে পেশ করলেন এর পর সকল জাতির জন্যে তিনি রেখে গেলেন একই দাওয়াত, একই আদর্শ ও একই জীবন-বিধান। দায়িত্ব বর্তালো উম্মতে মুসলিমাহর ওপর এ বিধানকে পৃথিবীর সকল মানুষের জীবনে চালু করার, যাতে করে ইসলামের এই বিধানের আলোকে তারা মানুষকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে বের করে আনতে পারে। স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হলো যে, এ কেতাবে যে নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছে তা পালন করতে হবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু, অভিভাবক বা পরিচালক হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। এটিই হচ্ছে ইসলামের মূল দাওয়াত। অর্থাৎ জীবনের সকল ব্যাপারে রসূল (স.)-কে পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কে আছে দুনিয়ায় এমন যার পূর্ণাংগ অনুসরণ করা যেতে পারে? যারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলবে, তারাই হবে মুসলমান– যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নির্দেশ অন্ধভাবে মানবে তারাই হবে মোশরেক। এই হচ্ছে দুটি অবস্থা– এ দুই অবস্থা কখনো এক হতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য ও অন্য কারো আনুগত্য এক সাথে চলতে পারে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা সেই কথাগুলোকে অনুসরণ করো যা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, আর তিনি ছাড়া অন্য কাউকে, অভিভাবক (ও আইনদাতা) রূপে গ্রহণ করো না। কিন্তু, খুব কম সংখ্যক লোকই তোমাদের মধ্যে আছে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে।'

এটিই দ্বীনের মূল কথা ও শিক্ষা। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন তার অনুসরণই হচ্ছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। এর নামই হচ্ছে তাঁকে প্রভু প্রতিপালক ও আইনদাতা মানা। শাসন ক্ষমতার মালিক একমাত্র তিনি। যে নির্দেশ তিনি দেবেন তা মানতে হবে এবং তাঁরই আনুগত্য করতে হবে পূর্ণাংগভাবে। আর তাঁর হুকুমের বিপরীত হুকুম কেউ দিলে তা অবশ্যই অমান্য করতে হবে। অপরদিকে কাউকে আল্লাহর বন্ধু মনে করে না বুঝে সুঝে তার হুকুম মানাও হবে শেরক। কেননা এটিও নিষ্ঠার সাথে ও খালেসভাবে আল্লাহ নির্দেশ মানার পরিপন্থী। আর কেমন করে এ ব্যবহার শেরক না হয়ে পারে যেখানে আল্লাহর শাসন ক্ষমতার সাথে সাথে অন্য কাউকে শাসন ক্ষমতার অধিকার আছে বলে মেনে নেয়া হয়!

এখানে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যেহেতু কেতাব তাঁর কাছেই নাযেল হয়েছে, 'এ কেতাব নাযিল করা হয়েছে তোমার কাছে।' আর মানুষকে সম্বোধন করে আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত কেতাব বলছে, 'অনুসরণ করো তোমাদের রবের কাছ থেকে আসা কেতাবের।' এখন দেখুন, রসূল (স.) এলেন, আর তাঁর কাছে এ মহান কেতাব, নাযিল হলো যাতে করে এ কেতাবকে তিনি নিজে আল্লাহর তরফ থেকে আগত কেতাব রূপে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন এবং মানবজাতিকে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে সাবধান করেন এবং তাদেরকে যুক্তিপূর্ণ কথার দ্বারা উপদেশ দেন। অপরদিকে সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে তাদের সবার রবের পক্ষ থেকে আসছে এক কেতাব, যাতে করে এর ওপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করে, এর শিক্ষা অনুসরণে জীবন পরিচালনা করে এবং এ কেতাব ছাড়া অন্য সবার নির্দেশ পরিত্যাগ করে। উভয় অবস্থাতেই আয়াতটি এ কেতাবের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে জানাচ্ছে যে, এ মহাগ্রন্থ বিশেষভাবে গড়ে তোলা ও সম্মানিত এক ব্যক্তির কাছে নাযিল হয়েছে। এ কথা বলায় রসূলুল্লাহ (স.)-এর সম্মান জনগণের অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে, তাঁকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিনিধি ঘোষণা করার মাধ্যমে একজন অসাধারণ শক্তিমান ব্যক্তি হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে এবং জনগণের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব সৃষ্টি করে তাঁকে অনুসরণ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। সুতরাং, যে ব্যক্তির কাজের সুবিধার জন্যে এ মহান কেতাব নাযিল হলো, অবশ্যই তিনি নিজে এর শিক্ষাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করবেন, নিজের জীবনে এ কেতাবের মধ্যে উপস্থাপিত বিষয়গুলোকে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত করবেন, এ নেয়ামত লাভের জন্যে সর্বান্তকরণে তাঁর পরওয়ারদেগারের কাছে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং এ গুরু দায়িত্ব যে কোনো কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করেও পালন করে যাবেন কোনো দুঃখ জানাবেন না।

মানব সমাজে জাহেলিয়াতের ভয়াবহ পরিণতি

এ দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশাল। কারণ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জাহেলিয়াতের শেকড়কে সমূলে উৎপাটন করা, পরিবর্তন করে দেয়া মানুষের মন মগযের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে থাকা জাহেলী চিন্তাধারাকে, আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসা সমাজের মূল কাঠামোর মধ্যে, তার চিন্তা চেতনার মধ্যে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে, মানুষের মূল্যবোধের মধ্যে। আমুল পরিবর্তন সাধন করা প্রচলিত সমাজের সামাজিক কাঠামোতে, এর বৈঠকাদি পরিচালনার গতানুগতিক অভ্যাসসমূহের মধ্যে, এর অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে আরো সহজ করে বলতে গেলে গোটা সৃষ্টি জগত ও মানবমন্ডলীর মধ্যে। এ মিশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা সংক্ষিপ্তভাবে শেষ করা সম্ভব নয়, তাই এ প্রসংগে আলোচনা এগিয়ে চলেছে, এমন ধারালো আলোচনা এমন ধারালো আলোচনা যা বিবেককে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয়, চিন্তা চেতনায় জাগিয়ে দেয় এক অভূতপূর্ব শিহরণ।

জাহেলী কার্যকলাপ গোটা মানব জাতিকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে এবং তারা আজ উভয় সংকটের মধ্যে পড়ে গেছে, ডুবে গেছে মানুষের বিভিন্ন মনগড়া মতবাদের গোলকধাঁধায়, যার থেকে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর আর এসব মনগড়া মতবাদের দিকে আহবানের মধ্য দিয়ে সত্যকে অস্বীকারকারী মানবরূপী শয়তানেরা মানুষকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রাণপণ প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এসব মানুষের পরিণতি যে কতো ভয়ংকর তা চিন্তা করতেও হৃদয় কেঁপে ওঠে। দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে এদেরকে যে আযাবের মধ্যে পড়তে হয়েছে তার চিহ্ন এখনো ইতিহাস থেকে মুছে যায়নি। এরশাদ হচ্ছে,

'আর কতো জাতিকে আমি, ধ্বংস করে দিয়েছি, কখনও তাদের ওপর রাতের বেলায় আযাব নেমে এসেছে, আবার কখনও বা দুপুরের খাওয়ার পর বিশ্রামের সময় তাদেরকে আমার শাস্তি পাকড়াও করেছে।..... নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।' (আয়াত ৪-৯)

অতীতের এসব মানুষের জীবনের অবস্থা, সত্যের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম এবং পরিণতিতে তাদের ধ্বংসের বিবরণী আমাদের জন্যে শিক্ষনীয় ঘটনা। আল কোরআনের মধ্যে এই সব ঐতিহাসিক ঘটনা পেশ করা হয়েছে এবং এ পবিত্র কেতাবের চমৎকার বর্ণনা ভংগি আমাদের মনের ওপর গভীরভাবে রেখাপাত করে, উজ্জীবিত করে তোলে আমাদের মন মগযকে, স্বচ্ছ পথের দিক নির্দেশনা দেয় এবং অলসতা ও উদাসীনতায় বিভোর মানুষকে জাগিয়ে তোলে।

পাপিষ্ঠরা সত্য বিরোধিতা ও সত্যকে অস্বীকার করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে, কখনো ধ্বংস হয়েছে তাদের অহংকার ও ঔদাসীন্যের কারণে, রাত্রিতে অথবা দুপুরে বিশ্রামের সময়ে, যখন মানুষ দিবানিদ্রায় বিভোর হয়ে যায় এবং বিশ্রামের জন্যে শরীরকে এলিয়ে দেয়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'কতো কতো এলাকাকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের ওপর আমার আযাব এসেছে রাত্রিকালে অথবা দিনের বেলায় যখন শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় বিশ্রামের জন্যে মানুষ গড়াগড়ি করে।'

রাত্রিকাল ও দুপুরে বিশ্রামের সময়ের উভয়টিই একই প্রকার গাফলতির সময়। এই দু'সময়েই মানুষ শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে একটু আরামের জন্যে নিজেকে নিদ্রার কোলে সোপর্দ করে এবং প্রশান্তি লাভ করে। ঠিক এমনই শান্তির সময় ভীষণ আযাব নেমে আসার সংবাদ বড়ই কঠিন অবস্থার ইংগিত বহন করে। সুতরাং এ ঘটনার বিবরণ একাধারে মানুষের জন্যে উপদেশবাণী বহন করে, হুঁশিয়ারী হিসাবে কাজ করে, আত্মরক্ষা করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে এবং সাবধানে চলাচল ও ব্যবহারিক জীবনে সততা রক্ষার শিক্ষা দেয়।

তারপর দেখুন, এসব সতর্কবাণী থেকে উদাসীন হয়ে থাকার ফলে বাস্তবে কি করুণ ঘটনাটি ঘটে গেলো ও গাফলতির মধ্যে তারা আযাবে পাকড়াও হয়ে গেলো, তারা (নবীকে) মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো বাস্তব আনুগত্য গ্রহণ করেনি। তারা শুধু মুখে মুখে মেনে নেয়া ছাড়া বাস্তবে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করলো না। ওদের মধ্যে যারা ঈমানদার হওয়ার দাবী করেছিলো মুখের দাবী ছাড়া তাদের জীবনে ঈমানের কোনো বাস্তব প্রতিফলন ছিলোনা। তাই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'যখন তাদের ওপর আমার আযাব এসে গেলো, তখন তাদের পক্ষে এ কথা ছাড়া অন্য আর কিছুই বলার রইলো না যে, 'আমরা অবশ্যই যালেম ছিলাম।'

মানুষ অন্যায় করলেও তা মানতে চায় না এবং তাদের দোষের কথা স্বীকার করতে চায় না এটাই সাধারণত মানব প্রকৃতি। কিন্তু এ ভয়ানক আযাব যখন এসেই যায়, তখন তার অন্তরাত্মার মধ্যে যে সত্য কথাটা লুকিয়ে আছে তা বেরিয়ে আসে এবং সে অকপটে স্বীকার করে বলে, 'আমরা যালেম ছিলাম।' এই অন্যায় কাজ যে তারা একাকী করে তাই নয়। বরং দলবদ্ধ ভাবে তারা এই মারাত্মক অন্যায় কাজ করে বলেই বহুবচন ব্যবহার করে তারা বলে 'আমরা যালেম ছিলাম।' কিন্তু, হায়, ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় যতোই সে দোষ স্বীকার করুক না কেন, এ স্বীকারোক্তি ওই ভয়ানক কঠিন দিনে কোনোই কাজে লাগবে না। আসলে স্বীকার করে সংশোধন করার সময় তখন তার আর থাকে না সুতারাং তখন স্বীকার করেও কোনো লাভ নেই

যুলুম দ্বারা তারা স্পষ্টভাবে এটাই বুঝাবে যে, তারা শেরক করেছে, আল কোরআনেও শেরককেই সব থেকে বড় যুলুম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সারা বিশ্বের যিনি একচ্ছত্র অধিপতি, তাঁকে একমাত্র মালিক বলে স্বীকার না করে এবং তাঁরই সৃষ্ট জীব হয়ে অন্য কারো ক্ষমতার কথা স্বীকার বা দাবী করা থেকে বড় অকৃতজ্ঞতা ও যুলুম আর কী হতে পারে, কাজেই শেরকই হচ্ছে সব থেকে বড় যুলুম এবং আসল যুলুমই হচ্ছে শেরক– এটাই আল্লাহর যে কোনো সৃষ্টির জন্যে সব থেকে বড় যুলুম।

দুনিয়াতে এ দৃশ্যের অবতারণা বারবার হয়েছে এবং এসব মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা আরোপকারীদের ওপর বারবার শাস্তি নাযিল হয়েছে। তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করেছে, তারা

যালেম ছিলো বলেই যে আযাব নাযিল হয়েছে তা তারা নিজেরা বুঝেছে এবং স্বীকারও করেছে। কিন্তু যালেমদের এসব স্বীকারোক্তি অপর যালেমদের জন্যে কোনো শিক্ষা বহন করে আনেনি। তারা তাওবা করেনি, সময় থাকতে তারা অন্যায় থেকে বিরতও হয় নাই এবং পুনরায় এসব অন্যায় করবে না, এমন কোনো সংকল্পও করেনি। হাঁ, লজ্জা, অনুতাপ এসেছে তখন, যখন তাদের মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসার সময় ফুরিয়ে গেছে এবং তাওবা করার সকল পথও বন্ধ হয়ে গেছে।

দুনিয়ায় এসব পরিস্থিতি ঘুরে ঘুরে বারবার এসেছে, আসছে। বিভিন্ন কঠিন শাস্তির দৃশ্য মানুষ বারবার দেখেছে ও দেখবে, তবুও একই ভুল ও ইচ্ছাকৃত দোষের পুনরাবৃত্তি ঘটছেই ঘটছে। দেশ দেশান্তরে ও সময়ান্তরে এসব দৃশ্য বারবার ঘুরে ঘুরে আসছে, সবাই শুনছে এসব আযাবের কথা, তবু খুব কম লোকই শিক্ষা নিচ্ছে। দুনিয়ার আযাবই যে শেষ তা নয়, তাও মানুষ বুঝছে, এই শাস্তির সাথে পরকালেও যে শাস্তি রয়েছে তাও মানুষ অনুভব করে। এ মারাত্মক অপরাধীদের অপরাধ সুদূরপ্রসারী, যার অপকারিতা ও জঘন্যতা কখনো শেষ হয়ে যায় না। সুতরাং এর অবশ্যম্ভাবী ফল যে চরম শাস্তি, দুঃখ-কষ্ট, এটা মানুষ দেখেও দেখে না– দেখতে চায় না। বুঝেও বুঝে না এবং বুঝতে চায় না– এটাই মানুষের জন্যে চরম অবমাননাকর অবস্থা এবং আসল ক্ষতির বিষয়। আর যখন এসব আযাব হঠাৎ করে আসতে শুরু করবে, তখন তা ঠেকানোর আর কোনোই উপায় থাকবে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং অবশ্যই আমি জিজ্ঞাসাবাদ করবো তাদেরকে যাদের কাছে রসূল পাঠানো হয়েছে এবং রসূলদেরকেও জিজ্ঞাসা করবো ....তারাই হবে সেই সব ব্যক্তি যারা আমার আয়াতগুলোর সাথে যুলুম করার কারণে নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।' (আয়াত ৬-৯)

এইভাবে আল্লাহর কাজগুলোকে বলিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করা আল কোরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তিতে বেচে থাকার যে অধ্যায় রয়েছে তা যে কোনো সময়েই গুটিয়ে নেয়া হবে। আর মহান এ কেতাবের প্রতিটি ছত্রে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, দুনিয়ার জীবন আখেরাতের জীবনের সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত– একটি শেষ হওয়ার সাথে সাথেই অপর অংশের আগমন ঘটে– নিয়তই এই শুরু ও শেষের সম্মিলন খেলা চলছে!

কিন্তু মানুষ যখনই তার নিজ দায়িত্ব পালন ছেড়ে দেয় তখনই তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা নানা কষ্টের শিকার হতে হয়। এরপর তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে নানা প্রকার জটিল প্রশ্নের– সম্মুখীন হতে হবে সারা যিন্দেগীর কাজের হিসাবের এবং তাদেরকে কৃতকর্ম অনুযায়ী পুরস্কার কিংবা শাস্তি দেয়া হবে। একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে শুধু মুখে স্বীকার করে, অনুতাপ দেখিয়ে খালাস পেয়ে যাবে, বরং অবশ্যই ওই দুঃসহ আযাবে নিপতিত হতে হবে, তখন তারা দিশেহারা হয়ে বলে উঠবে, 'হায়, আমরা অবশ্যই বড় যালেম ছিলাম।'

খালাস পাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না, বরং সেদিন এই দুর্ভাগাদের প্রতি কৃত সকল প্রশ্ন তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হবে এবং তাদের কৃত সকল কুকর্মের তথ্য সেদিন প্রকাশ করে দেয়া হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি প্রশ্ন করবো তাদেরকে যাদের নিকট রসূলরা প্রেরিত হয়েছিলো, আর অবশ্যই রসূলদেরকেও তাদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। আর আমি জেনে-শুনেই, তাদের ঘটনাবলীকে তাদের সামনে তুলে ধরবো। আর আমি কখনই তাদের থেকে মোটেই দূরে (অনুপস্থিত) নই।'

এ হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম এবং পূর্ণাংগ এক প্রশ্ন। এ প্রশ্নের মধ্যে যা প্রেরিত হয়েছে এবং যাদের কাছে প্রেরিত হয়েছে তা সবকিছুই শামিল রয়েছে। এর মধ্যে ওইসব বিষয়ও পেশ করা হয়েছে যার সম্পর্কে সর্বোচ্চ ও মালিকের দরবারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যেখানে সকল গোপন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের সকল তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। এসব বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে তারা যাদের

কাছে রসূলরা এসেছেন, তখন তারাও ওদেরকে রসূল বলে মেনে নিয়েছে এবং রসূলরাও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করায় তারা জবাব দিয়েছে। তারপর তাদেরকে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা ওইসব বিষয়ে জানাচ্ছেন যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর জ্ঞান ভান্ডারের মধ্যে সংরক্ষণ করে রেখেছেন, অথচ তারা নিজেরাই তা ভুলে গেছে। আল্লাহ তায়ালা ওদেরকে যাবতীয় কাজকর্ম ও তার পরিণতি সম্পর্কে সেই মহাজ্ঞান থেকে জানাচ্ছেন যা সদা সর্বদা বর্তমান রয়েছে। কোনো জিনিস থেকে তিনি কখনোই দূরে নন। এই পবিত্র কেতাবের মধ্যে যে সব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা যেমন তথ্য বহুল, তেমনি গভীরভাবে প্রভাব বিস্তারকারী এবং উপদেশ ও সতর্কবাণীতে পরিপূর্ণ।

'আর সেদিন সকল পাপ পুণ্য সঠিক পাল্লা দ্বারা মাপা হবে।'

এই পরিমাপের ব্যাপারে ভুল ভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই, নেই চূড়ান্ত ফয়সালা দান করায় কোনো জড়তা বা গোপনীয়তা এবং এসব ফয়সালা দেয়ার পর যথার্থতা ও মাপের সঠিকতা সম্পর্কে কেউ কোনো তর্ক বিতর্ক করার সুযোগও পাবে না এবং এভাবে প্রশ্ন করার দুঃসাহসও সেদিন কারো হবে না।

'সুতরাং, সেদিন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে কৃতকার্য।'

আল্লাহর ন্যায়ের মানদন্ডে যার সৎকর্মগুলো ভারী হয়ে উঠবে, অবশ্য অবশ্যই পুরস্কার স্বরূপ তাকে দেয়া হবে চূড়ান্ত সাফল্য। অর্থাৎ দোযখ থেকে মুক্তি দিয়ে পুরস্কার স্বরূপ তাকে জান্নাতে দেয়া হবে। ফিরিয়ে আনা হবে তাকে এই জান্নাতের দীর্ঘ সফরের পর। এটাই কি তার নেক আমলের ন্যায্য পুরস্কার নয়?

'অপরদিকে যে যে ব্যক্তির অপকর্মের দরুন তার নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে যাবে, তারাই আমার আয়াতগুলোর সাথে যুলুম করে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে।'

অবশ্যই তার নেক আমলগুলো মহান আল্লাহর পাল্লায় হালকা হয়ে যাবে, আর নিশ্চয়ই তিনি কাউকে তার পাওনা থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং তিনি কোনো ত্রুটিও করবেন না। তারা নিজেরাই তো তাদের ক্ষতি করেছে, যার ফল অবশ্যই তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

এই চূড়ান্ত পরিণতি থেকে বাচার জন্যে মানুষ কী করবে? মানুষ তো নিজের পক্ষে নানা প্রকার ওযর-আপত্তি দেখাবে এবং যুক্তি-তর্ক পেশ করবে, কিন্তু তার নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে যাওয়ায় সে যে ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সে ক্ষতি থেকে তাকে কিছুতেই বাচাতে পারবেন?

ওরা অবশ্যই, আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করার কারণে নিজেদের ক্ষতি করেছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'এই মন্দ পরিণতির সম্মুখীন তারা এই জন্যে হবে যে, অতীতে আমার আয়াতগুলোর সাথে তারা চরম যুলুম করেছে' এবং যুলুম বলতে আল কোরআনের ভাষায় শেরক এবং কুফরকেই বুঝায়, যা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। 'অবশ্যই শেরক খুব বড় ধরনের যুলুম।'

এ প্রসংগে আমরা পরিমাপের প্রকৃতি কেমন হবে এবং ওই দাঁড়িপাল্লা বলতে কী বুঝায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না। কেননা ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় চিন্তার ক্ষেত্রে তার্কিকরা অনৈসলামী ভাবধারায় বহু তর্ক বিতর্ক করেছে এবং নিজেদের বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে তারা ইসলামের মূল ভাবধারা থেকে বহু দূরে সরে গেছে। সুতরাং, আল্লাহর কাজগুলোকে বাইরের কোনো জিনিসের সাথে তুলনা করে বুঝা যাবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা নিজে কোনো জিনিসের মতো নন। আমাদের জন্যে এখানে বর্ণিত তথ্যগুলোই যথেষ্ট, আর তা হচ্ছে, অবশ্যই সেদিন সবার হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং কারো প্রতি এতোটুকু যুলুম করা হবে না। অর্থাৎ, যার যা পাওনা তা সঠিকভাবেই তাকে দেয়া হবে মোটেই কোনো কম বেশী করা হবে না এবং কারো কোনো কাজকে ব্যর্থও করে দেয়া হবে না।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۚ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِينَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِى مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنْظِرْنِىٓ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿١٥﴾

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرٰطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾

১০. আমিই তোমাদের (এই) যমীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, (এ জন্যে) আমি তাতে তোমাদের জন্যে সব ধরনের জীবিকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি; কিন্তু তোমরা (আমার এ নেয়ামতের) খুব কমই শোকর আদায় করে থাকো।

রুকু ২

১১. আমিই তোমাদের বানিয়েছি, তারপর আমিই তোমাদের (বিভিন্ন) আকার-অবয়ব দান করেছি, অতপর আমি ফেরেশতাদের বলেছি, (সম্মানের নিদর্শন হিসেবে তোমরা) আদমকে সাজদা করো, তখন (আমার আদেশে) সবাই (আদমকে) সাজদা করলো, একমাত্র ইবলীস ছাড়া, সে কিছুতেই সাজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না। ১২. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হে ইবলীস), আমি যখন (নিজেই) তোমাকে সাজদা করার আদেশ দিলাম, তখন কোন্ জিনিস তোমাকে সাজদা করা থেকে বিরত রাখলো? ইবলীস বললো, (আমি কেন তাকে সাজদা করবো), আমি তো তার চাইতে উত্তম, (কারণ) তুমি আমাকে বানিয়েছো আগুন থেকে, আর তাকে বানিয়েছো মাটি থেকে। ১৩. আল্লাহ তায়ালা বললেন, তুমি এক্ষুণি এখান থেকে, নেমে যাও! এখানে (বসে) অহংকার করবে, এটা তোমার পক্ষে কখনো সাজে না- যাও, (এখান থেকে) বেরিয়ে যাও, (কেননা) তুমি অপমানিতদেরই একজন। ১৪. সে বললো (হে আল্লাহ তায়ালা), তুমি আমাকে সেদিন পর্যন্ত (শয়তানী করার) অবকাশ দাও, যেদিন এ (আদম সন্তান)-দের পুনরায় (কবর থেকে) উঠানো হবে। ১৫. আল্লাহ তায়ালা বললেন (হ্যাঁ, যাও), যাদের অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমিও তাদের একজন। ১৬. সে বললো, যেহেতু তুমি (এ আদমের জন্যেই) আমাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করলে, (তাই) আমিও এদের (গোমরাহ করার) জন্যে অবশ্যই তোমার (প্রদর্শিত প্রতিটি) সরল পথে (-র বাঁকে বাঁকে ওঁৎ পেতে) বসে থাকবো।

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمۡ مِّنۡۢ بَيۡنِ اَيۡدِيۡهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ اَيۡمَانِهِمۡ وَعَنۡ

شَمَآئِلِهِمۡ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكۡثَرَهُمۡ شٰكِرِيۡنَ ﴿١٧﴾ قَالَ اخۡرُجۡ مِنۡهَا مَذۡءُوۡمًا

مَّدۡحُوۡرًا ؕ لَمَنۡ تَبِعَكَ مِنۡهُمۡ لَاَمۡلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنۡكُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ﴿١٨﴾ وَيٰۤاٰدَمُ

اسۡكُنۡ اَنۡتَ وَزَوۡجُكَ الۡجَنَّةَ فَكُلَا مِنۡ حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا هٰذِهِ

الشَّجَرَةَ فَتَكُوۡنَا مِنَ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿١٩﴾ فَوَسۡوَسَ لَهُمَا الشَّيۡطٰنُ لِيُبۡدِىَ لَهُمَا مَا

وٗرِىَ عَنۡهُمَا مِنۡ سَوۡاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰٮكُمَا رَبُّكُمَا عَنۡ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ

اَنۡ تَكُوۡنَا مَلَكَيۡنِ اَوۡ تَكُوۡنَا مِنَ الۡخٰلِدِيۡنَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّىۡ لَكُمَا لَمِنَ

النّٰصِحِيۡنَ ۙ﴿٢١﴾ فَدَلّٰٮهُمَا بِغُرُوۡرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتۡ لَهُمَا سَوۡاٰتُهُمَا

১৭. অতপর (পথভ্রষ্ট করার জন্যে) আমি তাদের কাছে অবশ্যই আসবো, আসবো তাদের সামনের দিক থেকে, তাদের পেছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে, তাদের বাঁ দিক থেকে, ফলে তুমি এদের অধিকাংশ লোককেই (তোমার) কৃতজ্ঞতা আদায়কারী (হিসেবে দেখতে) পাবে না। ১৮. আল্লাহ তায়ালা বললেন, বের হয়ে যাও তুমি এখান থেকে অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায়; (আদম সন্তানের) যারাই তোমার অনুসরণ করবে, (তাদের এবং) তোমাদের সবাইকে দিয়ে নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করে দেবো। ১৯. (আল্লাহ তায়ালা আদমকে বললেন,) তুমি এবং তোমার সাথী জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং এর যেখান থেকে যা কিছু চাও তা তোমরা খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেয়ো না, (গেলে) তোমরা উভয়েই যালেমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। ২০. অতপর শয়তান তাদের দু'জনকেই কুমন্ত্রণা দিলো যেন সে তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহ, যা তাদের পরস্পরের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়েছিলো– প্রকাশ করে দিতে পারে, সে (তাদের আরো) বললো, তোমাদের মালিক তোমাদের এ গাছটির (কাছে যাওয়া) থেকে তোমাদের যে বারণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, (সেখানে গেলে) তোমরা উভয়েই ফেরেশতা হয়ে যাবে, অথবা (এর ফলে) তোমরা (জান্নাতে) চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। ২১. সে তাদের কাছে কসম করে বললো, আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের জন্যে (তোমাদের) হিতাকাংখীদের একজন। ২২. এভাবে সে এদের দুজনকেই প্রতারণার জালে আটকে ফেললো, অতপর (এক সময়) যখন তারা উভয়েই সে গাছ (ও তার ফল) আস্বাদন করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থানসমূহ তাদের উভয়ের সামনে খুলে গেলো, (সাথে সাথে) তারা জান্নাতের কিছু লতা পাতা নিজেদের ওপর জড়িয়ে (নিজেদের গোপন

وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ، وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكته وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾

স্থানসমূহ) ঢাকতে শুরু করলো; তাদের মালিক (তখন) তাদের ডাক দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাদের উভয়কে এ গাছটি (-র কাছে যাওয়া) থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদের একথা বলে দেইনি যে, শয়তান হচ্ছে তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য দুশমন? ২৩. (নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে) তারা দুজনেই বলে উঠলো, হে আমাদের মালিক, আমরা আমাদের নিজেদের ওপর যুলুম করেছি, তুমি যদি আমাদের মাফ না করো তাহলে অবশ্যই আমরা চরম ক্ষতিগ্রস্তদের দলে শামিল হয়ে যাবো। ২৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, (এবার) তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও, (আজ থেকে) তোমরা (ও শয়তান চিরদিনের জন্যে) একে অপরের দুশমন, সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকার উদ্দেশে তোমাদের জন্যে সেখানে বসবাসের জায়গা ও জীবন-সামগ্রীর ব্যবস্থা থাকবে। ২৫. আল্লাহ তায়ালা (আরো) বললেন, তোমরা সেখানেই জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের (পুনরায়) বের করে আনা হবে।

তাফসীর
আয়াত ১০-২৫

'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং এখানে তোমাদের জন্যে জীবিকার বিভিন্ন ব্যবস্থা করে দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই শোকরগোযারি করে থাকে। .... তিনি বলে দিলেন, এখানেই তোমরা বেঁচে থাকবে, এখানেই মরবে এবং এখান থেকেই তোমাদের পুনরায় তোলা হবে।' (আয়াত ১০-২৫)

এখানে থেকে শুরু হচ্ছে মহাকালের সফর প্রসংগ .... প্রথমেই, ভূমিকা স্বরূপ বলা হচ্ছে মানুষকে বাস্তবে পৃথিবীর বুকে ক্ষমতা প্রদান করার কথা, মানব জীবন ও তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে স্পষ্টভাবে এ সত্যটি ঘোষণা করা হচ্ছে যে, পৃথিবীতে একমাত্র মানুষকেই, সব কিছুর ক্ষমতা দিয়েছেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর অবশ্যই আমি মানুষকে পৃথিবীর বুকে ক্ষমতা দিয়েছি, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক লোকই তোমরা (এই নেয়ামতের) শোকর গোযারি করছো।'

প্রাকৃতিক জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক

পৃথিবীর যিনি সৃষ্টিকর্তা– মানুষের সৃষ্টিকর্তাও তিনি। তিনিই তো পৃথিবীতে মানুষকে অনেক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনিই মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানের জন্যে এই পৃথিবীতে এতো কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাদের সুখে-শান্তিতে বসবাসের জন্যে পৃথিবীকে সাজিয়েছেন এবং সব কিছুকে তাদের উপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন, দিয়েছেন তাদেরকে প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থ ও সবার ওপর তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যার দ্বারা তারা জীবিকা নির্বাহের এবং আরাম আয়েশে থাকার বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করে।

এই মানুষেরই বৃদ্ধি, প্রসার ও অগ্রগতির প্রয়োজনে বিশাল এই সৃষ্টির মধ্যে অবস্থিত সূর্য ও চাঁদের আলো ও তাপকে তাদের খেদমতে লাগিয়ে দিয়েছেন, আবর্তন করিয়েছেন চাঁদকে সূর্যের চতুর্দিকে, আর তারই প্রয়োজনকে সামনে রেখে বিশ্বের সব কিছুকে তিনি নির্দিষ্ট একটি গতিধারায় টিকিয়ে রেখেছেন- নিয়ন্ত্রণ করেছেন। মানুষেরই প্রয়োজনে এই ধরার বুককে তিনি বানিয়ে দিয়েছেন শস্য ভান্ডার এবং তাদের আরাম আয়েশের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা করেছেন। সৃষ্টির অন্যান্য সকল প্রাণীর ওপর তাদের কতৃত্ব দান করেছেন, দান করেছেন তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল শক্তি, তার বৃদ্ধি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে তাদের মধ্যে দিয়েছেন সকল প্রকার যোগ্যতা। আর তিনিই তো বানিয়েছেন তাদেরকে সৃষ্টির সেরা এবং যোগ্যতা দিয়েছেন তাদেরকে অপর সব কিছুর আনুগত্য ও খেদমত পাওয়ার। এখানে আমরা মানুষকে প্রদত্ত বিভিন্ন ক্ষমতা ও যোগ্যতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি ....।

যদি মানুষকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর বুকে ক্ষমতা না দিতেন, তাহলে কিছুতেই তারা 'প্রকৃতিকে' বশীভূত করতে পারতো না, যেমন প্রাচীন ও আধুনিক জাহেলরা প্রকৃতির শক্তির কথা স্বীকার করে তার পূজা করে। আর এই মহা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বস্তুনিচয়কে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো শক্তিও তার থাকতো না। গ্রীক ও রোম দর্শন আধুনিক দর্শন শাস্ত্রকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। এ দর্শনে প্রকৃতিকে মানুষের শত্রু বলা হয়েছে এবং মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রতিকূল মনে করা হয়। আরো মনে করা হয় পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে নিরন্তর প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে হবে এবং এইভাবে প্রকৃতিকে জয় করা সম্ভব হবে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকার মাধ্যমে প্রকৃতিকে জয় করা সম্ভব, সুতরাং প্রাকৃতিক শক্তি ও মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য ও চিরন্তন।

এসব চিন্তাধারা অত্যন্ত দুর্বল ও স্ববিরোধী– সর্বোপরি এ দর্শন মারাত্মকভাবে বিভ্রান্তিকর।

প্রাকৃতিক নিয়ম যদি মানুষের কল্যাণবিরোধীই হতো, প্রকৃতি যদি মানুষের শত্রু হতো, মানুষের অকল্যাণের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকতো, মানুষের ইচ্ছা ও আকাংখা বিরোধী হতো এবং এর পেছনে কোনো পরিচালিকা শক্তি যদি না থাকতো, তাহলে প্রকৃতপক্ষে মানুষ সৃষ্টিই হতো না। আর সৃষ্টিই যদি না হতো, তা হলে মানুষের উন্নতি অগ্রগতিই বা কি করে সম্ভব হতো? কিভাবে এই পরিবর্তনশীল সৃষ্টি জগতের মধ্যে এর বাইরের কোনো শক্তির ইচ্ছা ছাড়া টিকে থাকতো এবং বৃদ্ধি পেতো? আর যখন দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের জীবন টিকে আছে এবং চলছে, তখন কি করে মনে করা যায় যে, প্রাকৃতিক সকল শক্তি মানুষের বিরোধিতা করছে এবং মানুষকে ধ্বংস করার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে? ওরা তো মনে করে প্রকৃতি নিজে নিজেই চলছে, এর পেছনে কোনো পরিচালক নেই!

একমাত্র ইসলামী চিন্তাধারার মধ্যে এই সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, প্রকৃতির নিজের কোনো শক্তি নেই, ইচ্ছামতো চলারও কোনো ক্ষমতা তার নেই। তার পেছনে রয়েছে মহান সৃষ্টিকর্তার

অদৃশ্য হাত। তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু গতিশীল রয়েছে। তিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা-রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের খেদমতের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন অন্য সব কিছুকে, যার কারণে অন্যান্য সকল সৃষ্টি মানুষের সকল কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, সুতরাং পারস্পরিক বৈরিতার প্রশ্নই এখানে অবান্তর। মানুষের সৃষ্টির পর তার বৃদ্ধি ও জন্যে উন্নতির জন্যে গোটা সৃষ্টি নিয়োজিত। সৃষ্টির যাবতীয় বিধান মানুষের জন্যেই, কাজেই প্রাকৃতিকজগত মানুষের দুশমন হওয়ার পরিবর্তে সকল দিক দিয়ে পরিপূর্ণ সহায়ক। মানুষও তাই প্রাকৃতিক সকল জিনিসকে নিজেদের জন্যে সহায়ক মনে করে কাজে লাগাবে– এটাই ইসলাম চায়।

এই দর্শনকে সামনে নিয়েই ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ বাস করবে এবং প্রাকৃতিক জগতকে বন্ধু মনে করে কাজে লাগাবে, মনে-প্রাণে স্বীকার করবে যে এসব কিছু মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের কৃপার দান এবং তাঁরই পরিচালনায় তাদের খেদমতে নিয়োজিত। একমাত্র ইসলামই প্রকৃতি সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করে। সুতরাং, প্রকৃতির সাথে ইসলামী ব্যবস্থার কোনো সংঘর্ষ নেই, বরং প্রাকৃতিক সব জিনিসের সাথে একজন মোমেন পরম প্রশান্তিতে মিশে যেতে পারে এবং প্রকৃতিকে তার পরম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃতির গতিধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার প্রতিটি পদক্ষেপ হয় দৃঢ়, পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে সে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে, সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ক্ষমতাধর নেই।

একমাত্র ইসলামী চিন্তাধারাই সকল বস্তুর মধ্যে নিহিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণার মধ্যে যে রহস্য আছে তার সন্ধান দিতে পারে এবং ওই রহস্যই মূল শক্তির সাথে সকল কিছুর সম্পর্ক নিরূপণ করতে সাহায্য করে। আল্লাহ তায়ালাই মানবমণ্ডলি এবং গোটা সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন আর সৃষ্টির সকল কিছু পরিচালনার ব্যাপারে একমাত্র তাঁরই ইচ্ছা ও কার্যকরী রয়েছে এবং সব কিছুর মধ্যে তাঁর জ্ঞান ও কৌশল রয়েছে সক্রিয় যার সন্ধান কেউ কোনো দিন পেতে পারে না, তবে তিনি নিজেই যদি তার থেকে সামান্য কিছু কাউকে জানাতে চান তো সেটা ভিন্ন কথা। আরো জানা দরকার যে, মানব সৃষ্টির সাথে বিশ্বের বুকে বিরাজমান রহস্যরাজির এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তিনি দয়া করে মানব সৃষ্টির সাথে অন্যান্য সৃষ্টির সংযোগ বিধান করেছেন এবং মানুষকে সেই যোগ্যতা দিয়েছেন যার দ্বারা সে সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান কোনো কোনো শক্তিকে বশীভূত করতে পারছে এবং তাদের দ্বারা নিজেদের খেদমত আদায় করে নিতে পারছে .... আর তাঁর এই যে সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা সারা বিশ্বের বুকে বিরাজ করছে এটিই তাঁকে বুঝবার জন্যে যথেষ্ট। দেখুন না, কী চমৎকারভাবে তিনি প্রত্যেকটি জীবকে সৃষ্টি করেছেন। এদের কোনোটিকে কোনোটির বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছেন বা পরস্পর তারা শত্রুভাবাপন্ন তা নয়, বরং প্রত্যেকেই একে অপরের সহায়ক, বরং আরও বলতে গেলে বলতে হয় একে অপরের সম্পূরক।

আর এই ধ্যান ধারণার ছায়াতলে যারা আসতে পেরেছে, তারা পরস্পর দরদী বন্ধু হিসাবে শান্তিতে বসবাস করতে পারছে এবং মহা-বিজ্ঞানময় ও শক্তিমান যে বিধাতা সারা বিশ্বকে পরিচালনা করছেন তাঁরই পরিচালনায় তারা জীবন যাপন করছে, নিশ্চিন্ত মনে বাস করছে তারা পরম সুখে, শান্তি ও সমৃদ্ধির সাথে। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সুপরিকল্পিত। তারা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। খেলাফত প্রতিষ্ঠায় তারা হয়ে থাকে পরস্পর সহায়ক, তারা কাজ করে মহব্বতের সাথে এবং সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসের সাথে সহযোগিতা করে। যখনই সৃষ্টির কোনো রহস্য তাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, তখন পরম কৃতজ্ঞতাভরে আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হয়ে যায় এবং নিজের কোনো কৃতিত্বের দাবী না করে সর্বান্তকরণে আল্লাহ

জাল্লাশানুহুর শক্তি ক্ষমতাকে মাথা পেতে মেনে নেয়। আর যখন তারা দেখে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে যে খেলাফত দিয়েছেন তার দায়িত্ব পালনে সৃষ্টির প্রতিটি জিনিস তাকে সহায়তা করছে, আবার যখন সে দেখে প্রতিটি পদক্ষেপে তার কাজ সহজ হয়ে যাচ্ছে, তার অগ্রগতি ও উন্নতির জন্যে নতুন নতুন পথ খুলে যাচ্ছে, তার আরাম-আয়েশ ও দায়িত্ব পালনে সৃষ্টিজগতের সবকিছু তার জন্যে সহায়ক উপাদান হয়ে যাচ্ছে, তখন সে একান্ত কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে আল্লাহর দরবারে নুয়ে পড়ে।

নিশ্চয়ই এধরনের চিন্তা চেতনা সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটনের পথে ও আল্লাহর শক্তিসমূহকে জানার পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, বরং তাকে আরো সাহস জোগায়, তার অন্তর আত্মবিশ্বাস ও তৃপ্তিতে ভরে যায়। এ সময় সে তার পরম প্রিয় মওলা ও বন্ধু মহান আল্লাহ রব্বুল ইযযতের অসীম এই সৃষ্টির আরো নতুন তথ্য জানার জন্যে অগ্রসর হয় এবং সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কোনো কিছু দিতে কুণ্ঠিত নন, বরং তিনি সহৃদয় ও অকৃপণতার সাথে সকল রহস্যদ্বার তার সামনে খুলে দেন এবং তার জন্যে সাহায্য পাওয়ার কোনো পথই বন্ধ করে দেন না। আল্লাহর এ কৃতজ্ঞ বান্দার কখনও মনে হয়না যে, সে কোনো দুশমনের রাজ্যে বিচরণ করছে, যেখানে প্রতি পদেই সে বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়, তার গতিপথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়, তার স্বপ্ন ও আশা আকাংখার দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়।

সৃষ্টিজগতের মধ্যে বিদ্যমান বস্তুনিচয় মানুষের শত্রু এবং প্রকৃতির সব কিছু তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার জন্যে সদা সর্বদা ব্যস্ত– এ ধরনের চিন্তা করাটাই হচ্ছে সব থেকে বড় দুঃখজনক ব্যাপার। বরং এটাই চরম এবং পরম সত্য যে, সামগ্রিকভাবে গোটা সৃষ্টির অস্তিত্বই এসেছে মানুষের জন্যে এবং মানুষের সেবাতেই নিয়োগ করা হয়েছে তাদের সবাইকে। প্রকৃতির সব কিছুর গতি প্রকৃতি, সব কিছুই পরিচালিত হচ্ছে মানব জীবনের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে। এর বিপরীত চিন্তা মানেই হচ্ছে মানুষ থেকে অন্যান্য সৃষ্টিকে দূরে সরিয়ে নেয়া। অবশ্যই এহেন কদর্য চিন্তা মানুষের গোটা অস্তিত্বের জন্যে ক্ষতিকর, গোটা অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয়ার জন্যেই এ জঘন্য ষড়যন্ত্র। এ হচ্ছে আল্লাহবিমুখ মানুষের আত্মপরিচয়কে গোপন করা, নিজেকে খাটো করে দেখা, তার আত্মসম্মানকে নষ্ট করা, নিজেকে অপমান করা, আত্মমর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা এবং পরিণামের চিন্তা না করেই এক মনগড়া দর্শন ছড়িয়ে দেয়ার নামান্তর। অহংকার ও অসাম স্য চিন্তার কুফল। প্রকৃতিকে শত্রু মনে করা ও নিজেকে ছোটো ভাবা মানেই হলো নিজেকে ধ্বংস করা, নিজেকে দুঃখের মধ্যে ফেলা, নিজের বুদ্ধিকে অপমান করা, দিক-বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানো, আত্ম-শ্লাঘায় দিশেহারা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিশেষ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ধ্বংসের দুটো দিকের অবস্থা একই প্রকারের।

ইউরোপীয় বিভিন্ন চিন্তাধারার যে সব ধর্ম আছে, তাদের মধ্যে শুধু অস্তিত্ববাদীদের জন্যেই এটা দুঃখজনক ব্যাপার নয়, বরং গোটা ইউরোপীয় সমাজের লোকদের চিন্তাধারার জন্যেই এটা দুঃখজনক ব্যাপার। সেখানকার সকল ধর্ম ও মতাবলম্বীদের জন্যেও দুঃখজনক বটে। সকল যুগের সকল পরিবেশের সকল জাহেলিয়াতের জন্যেও এটা এক মহা ট্রাজেডী। কিন্তু ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষ তার জীবন ও জগত সম্পর্কে যে সুনির্দিষ্ট আকীদা লাভ করে তাতে তার সমস্ত দুঃখজনক অবস্থা একটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে যায়।

অবশ্য মানুষ এ পৃথিবীর সন্তান, এ সৃষ্টিরই সন্তান। আল্লাহ তায়ালা তাকে এই পৃথিবী থেকেই পয়দা করেছেন, এর মধ্যে তার বসবাসের স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, এরই মধ্যে তার জীবন

জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আর বিশ্ব রহস্য উদঘাটনের জন্যে তাকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা তার জন্যে সহজ করে দিয়েছেন এবং এর মধ্যে বিদ্যমান সবকিছুকে মানব জীবনের অস্তিত্বের জন্যে সম্পূর্ণ উপযোগী বানিয়ে দিয়েছেন। আর যখন মানুষ এসব রহস্যময় শক্তির দিকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকায়, তখন সে দেখতে পায় প্রতিটি জিনিস তাকে সহায়তা করে চলেছে এবং তার জীবন যাপনকে সহজ করে দিচ্ছে।

কিন্তু খুব কম মানুষই এসব নেয়ামতের শোকর গোযারি করে থাকে। এর কারণ, জাহেলিয়াত বা মূর্খতার কারণে তারা সঠিক জ্ঞান রাখে না। আর যাদের জ্ঞান আছে তারাও যে সমস্ত নেয়ামত পেয়েছে, তার শোকর গোযারি সঠিকভাবে করে না। তাহলে কিভাবে তাদের বিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়া যাবে? শোকর আদায়ের সাধ্য থাকা সত্তেও তারা যদি তা না করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের কাজ কেন কবুল করবেন? এদের সম্পর্কেই তো আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'খুব কম সংখ্যক লোকই শোকর আদায় করে থাকে।'

মানব জাতির প্রথম সৃষ্টিলগ্ন

এরপর শুরু হচ্ছে মানব জীবনে যে সব বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটেছে তার বিবরণ। সর্বপ্রথম যে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো তা হচ্ছে তার জন্ম। এক মহান সমাবেশে তার জন্মের ঘোষণা, যেখানে প্রধান প্রধান সকল ফেরেশতা হাযির। মহাশক্তিমান বাদশাহ, মহা-সম্মানিত প্রভু আল্লাহ তায়ালা এই নতুন সৃষ্টির ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে তারা সবাই প্রথম এই মানুষটিকে মোবারকবাদ জানাচ্ছে পরিপূর্ণ আবেগ নিয়ে, কেননা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহর সকল আজ্ঞাবহ এই সব দাস তাকে একইভাবে সম্মান জানাচ্ছে। তার জন্যে ফেরেশতারা একত্রিত হচ্ছে যদিও এদের মধ্যে ইবলীস শামিল নয়। তাদের এই সমাবেশ সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী ও দুইয়ের মাঝে অবস্থিত সবাই দেখছে। সৃষ্টির ইতিহাসে এ সময়টি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ, এ ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং অতীব বিস্ময়কর বিষয়।

এই মহাগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করলাম, তারপর তোমাদের বিভিন্ন ধরনের অবয়ব দান করলাম তারপর আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে (সম্মান সূচক) সেজদা করো। একমাত্র ইবলিস ব্যতিত তারা সবাই সেজদা করলো সে.......... আমি যখন তোমাকে হুকুম দিলাম সেজদা করার জন্যে, তখন কোন জিনিস তোমাকে থামিয়ে দিলো। ....

আল্লাহ তায়ালা বললেন, এক্ষুণি তুমি এখান থেকে নেমে যাও.......।' (আয়াত ১৩)

এটিই হচ্ছে প্রথম দৃশ্য .... এ দৃশ্য মহান বিপ্লবাত্মক .... এটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এই কাহিনীটিকে সর্বপ্রথম দৃশ্য হিসাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং এজন্যে এর সাথে কিছু ব্যাখ্যা যোগ করতে চাই এবং আশা করি আল্লাহ তায়ালা এমন কোনো তৃপ্তিজনক ব্যাখ্যা আমাদের অন্তরে ঢেলে দেবেন যে আমরা পুরোপুরি তৃপ্ত হয়ে যাবো এবং আমাদের অন্তরের সমস্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব পেয়ে যাবো ....

'আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদেরকে দান করেছি নানা প্রকার আকৃতি-প্রকৃতি। তারপর ফেরেশতাদেরকে বললাম আদমকে সেজদা করো .... ইবলীস ছাড়া সবাই সেজদা করলো, সে সেজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না।'

সৃষ্টির অর্থই হচ্ছে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসা এবং অবয়ব অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ আকৃতি এবং তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান। এদুটি জিনিসই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির শুরুলগ্নে একই

সময়ে দান করে মানুষকে পয়দা করেছেন। দুই পর্যায়ে দেননি, এখানে 'ছুম্মা' শব্দ দ্বারা কিছু সময় পরে বা পরবর্তীকালে বুঝানো হয়নি, বরং মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির অর্থের পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা হিসাবে শব্দটি আনা হয়েছে। আর 'তাসবীর'– অস্তিত্ব শব্দের মধ্যে যে ধারণা পাওয়া যায় তারই বাস্তব রূপ হচ্ছে আদম। অস্তিত্ব বলায় এবড়ো খেবড়ো মাটির ঢেলা হতে পারতো, কিন্তু যখন 'তাসবীর' বলা হয়েছে, তখন বুঝতে হবে সুন্দর-সুশ্রী আকৃতি প্রকৃতিসম্পন্ন এক দেহ।

'তাসবীর' বলাতে বুঝায় সাধারণ সৃষ্টি থেকে উন্নততর কোনো পদার্থ। যেন বলা হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে একেবারে তুচ্ছ এবং ক্ষমতাহীন করে সৃষ্টি করিনি, বরং এক মহান সৃষ্টি বানিয়েছি যার মধ্যে ক্রমবর্ধমান শক্তির উৎস নিহিত রয়েছে। সেই কথাটিই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার কথার মধ্যে ফুটে উঠেছে, 'যিনি দিয়েছেন' প্রত্যেকটি জিনিসকে তার বিশেষ রূপ, তারপর তাকে পথ দেখিয়েছেন। সুতরাং, তিনি সৃষ্টির সময়েই প্রত্যেকটি জিনিসকে তার প্রকৃতি তার বৈশিষ্ট্য এবং তার কাজ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আর তাকে তার দায়িত্ব পালনের পথ ও পন্থাও জানিয়ে দিয়েছেন। সৃষ্টি করা, তার মধ্যে বৈশিষ্ট্য দান করা, তার কাজ ঠিক করে দেয়া এবং এসব কাজ করার জন্যে তাকে পথ ও পদ্ধতি বাতলে দেয়ার জন্যে আল্লাহর কোনো সময়ের ব্যবধানের প্রয়োজন নেই। আর তিনিই হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, তাকে তার রবের কাছে যাওয়ার জন্যে তিনিই পথ দেখিয়েছেন-অর্থাৎ মানুষকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছিলো, তখনই তাকে সঠিক পথও দেখানো হয়েছিলো। আর এমনি করেই আদমকে একেবারে সৃষ্টিলগ্ন থেকেই সুন্দরতম আকৃতি প্রকৃতি দেয়া হয়েছিলো, দেয়া হয়েছিলো তার মধ্যে মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ। এরপর যখন 'ছুম্মা' উচ্চারিত হয়, তখন এর দ্বারা বুঝানো হলো অগ্রগতি ও মর্যাদার দিক দিয়েও তাকে বিশেষিত করা হয়, সময়ের ব্যবধান দেখানের জন্যে নয়। এই অর্থটিকেই আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি।

যে কোনো অবস্থায় এটা চরম এবং পরম সত্য কথা যে, আদম সৃষ্টি সম্পর্কে আল কোরআনে যতো কথা এসেছে, এসেছে মানবজাতি সম্পর্কে যতো তথ্য– সব কিছুর মধ্যে এই কথাটাই ফুটে উঠেছে যে, গোটা সৃষ্টির মধ্যে মানুষই সর্বাধিক গুণাবলির অধিকারী এবং সে-ই একমাত্র দায়িত্বশীল। অর্থাৎ একমাত্র তাকেই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। অন্যান্য সকল সৃষ্টি মানুষেরই প্রয়োজনে অর্থাৎ সবাই তার সহকারী। মানব-জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সত্যটিই প্রকাশিত হয় যে, যুগ যুগান্তর ধরে তার মধ্যে বিরাজমান বৈশিষ্ট্যগুলোর উৎকর্ষ সাধন করার চেষ্টা চলেছে। সর্বকালে এই চেষ্টাই চলেছে, মানুষ যেন আরো উন্নত হয়, তার সভ্যতার আরো প্রসার ঘটে এবং পৃথিবীর সব কিছুকে মানুষ যেন নিজেদের প্রয়োজনে আরো বেশী বেশী ব্যবহার করে জীবনকে আরো সুন্দর ও আরো সমৃদ্ধিশালী করতে তুলতে পারে। এই লক্ষ্যে মানুষের সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে, জ্ঞান গবেষণার প্রসার ঘটছে, তারা আরো উন্নততর জীবন যাপনের জন্যে ট্রেনিং নিচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসের কোনো অধ্যায়েই এ কথার সন্ধান পাওয়া যায় না যে, মানব জাতির অস্তিত্বের, অর্থাৎ তার শরীর ও শারীরিক কাঠামোর মধ্যে পর্যায়ক্রমিক কোনো পরিবর্তন এসেছে, যেমন উগ্র কল্পনাবিলাসী দার্শনিক ডারউইন মনে করেন। তার মতে মানুষ পূর্বে ছিলো বানর। ধীরে ধীরে তার উন্নতি হয়েছে, বসার কারণে ঘসা খেতে খেতে তার লেজ খসে পড়ে গেছে। যারা একথায় কান দেয়, তাদের চিন্তা করা দরকার, লেজধারী প্রাণী হওয়াই যদি তার প্রকৃতি হয়ে থাকে, তাহলে লেজ নিয়েই তো জন্ম হতো এবং পরে বসতে বসতে লেজ পড়ে যেতো, মানব নির্মিত জনন-বিদ্যা অনুসারে, জীব-জানোয়ার কালে কালে নতুন

নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। এরই ওপর গড়ে উঠেছে ক্রমবিকাশবাদ (Theory of Evolution)। কিন্তু এসব কথা তো নিছক ধারণা কল্পনার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এটা কোনো নিশ্চিত সত্য নয়। কারণ পৃথিবীর শিলা উপশিলার নিজস্ব গঠন প্রক্রিয়া রয়েছে ও তার মধ্যে যে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং যে নিয়মে এর মধ্যে পরিবর্তন আসে বলে ধারণা করা হয় তাও কাল্পনিক, তার মূলে কোনো নিশ্চিত সত্য নেই, যেমন কল্পনার চোখে দেখা হয় আকাশের নক্ষত্ররাজিকে এবং তার হিসাব-নিকাশ ও তার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তার আলো থেকে কল্পনা করা হয় এবং এর পাশাপাশি আর কোনো মতবাদ না থাকায় ওই কল্পনাই সত্য বলে মানুষ মেনে নেয়।

তবে, এটাও সত্য যে, শিলা উপশিলার মধ্যে যুগের ব্যবধানে ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে তার ধারা ও গতিতে যে পরিবর্তন আসে বলে কাল্পনিক বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে, সেখানেও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে জীব জন্তুরও আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্তন হবে– একথা বলা হয়নি। পৃথিবীতে বিরাজমান বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে জীব-জন্তু বা মানুষের দৈহিক অবয়বে যে কোনো পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করা হয় তাও আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। আজ পর্যন্ত জীব-জন্তুর সারা জীবনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন এসেছে বলে কেউ দাবী করতে পারলো না, তবু ওই ভ্রান্ত দার্শনিকের কথা বিশ্বাস করতে হবে। না কোনো যুক্তিতে, না কোনো বাস্তবে এর প্রমাণ আছে, তবু কেউ কেউ ওই কথাকে গুরুত্ব দেয়! বুঝতে কষ্ট হয় না, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা থেকে মানুষের ধ্যান ধারণা ও মন মগযকে দূরে সরিয়ে দেয়ার ঘৃণ্য নাস্তিকতাবাদের এ এক ঘৃণ্য অপচেষ্টা। এ ষড়যন্ত্রজালে একমাত্র তারাই পা রাখে যারা সাময়িক আনন্দ-উল্লাসে মাতোয়ারা থাকতে চায়, পরবর্তী আসন্ন বিপদ দেখেও তারা দেখতে চায় না এবং অন্যান্য সকল মানুষকেও এই বিভ্রান্তির মধ্যে টেনে এনে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়। অর্থাৎ মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্য ফেলে দিয়ে নিজেদের স্বার্থকে কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। কিন্তু সর্বকালে এবং সকল সমাজেই বিবেকবান ও সত্যাশ্রয়ী কিছু মানুষ থাকে ও আছে, যার কারণে ডারউইনের এ মতবাদ উগ্র কিছু পাশ্চাত্যবাদী ছাড়া আর কেউ গ্রহণ করেনি। যেহেতু এটা অকাট্য কোনো যুক্তি বা নির্ভরযোগ্য কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক কথা নয়। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে বিবর্তন তো এসেছে শুধু জড় পদার্থে সময়, আবহাওয়া ও পরিবেশের বিভিন্নতার কারণে।

এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানব জাতিকে এক স্বতন্ত্র প্রাণী হিসাবে আল্লাহ তায়ালা পয়দা করেছেন, যার জীবনে বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে তার নানা প্রকার কার্যকলাপের দরুন। আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে হয়েছে কখনও তার অগ্রগতি অথবা অবনতি এবং কখনও মানুষ শান্তি পেয়েছে আবার কখনও বা অশান্তির আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরেছে।

জীব বিজ্ঞান (Biology) জীব ও উদ্ভিদ সংক্রান্ত বিজ্ঞান (Physiology), তর্ক শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা এ সকল বিদ্যা অনুসারে সকল দিক দিয়ে মানুষ এক স্বতন্ত্র জীব, যার তুলনা অন্য কারো সাথে করা যায় না। এই স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারটা আধুনিক ডারউইনবাদীদেরকে বিব্রত করে তুলেছে। এদের মধ্যে পুরোপুরি নাস্তিকরাও অন্তর্ভুক্ত। তবে স্বাতন্ত্র্যের এই স্বীকৃতিই, মানুষ যে এক স্বতন্ত্র জীব তার প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট এবং এর দ্বারা এটাও প্রমাণ হয় যে তার অংগ প্রত্যংগের মধ্যে কোনো দিন কোনো পরিবর্তন হয়নি।(১)

যাই হোক, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন, যিনি সকল শক্তি-ক্ষমতার উৎস, যাঁর হাতে মৃত্যু ও জীবনের চাবিকাঠি এবং যিনি সকল মান-সম্ভ্রমের মালিক– তিনি নিজেই সকল ফেরেশতাকুলের মধ্যে দায়িত্বশীল ফেরেশতাদের উপস্থিতিতে এই নতুন সৃষ্টির জন্য ঘোষণা করলেন। বললেন,

(১) আরো বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, 'হাকীকাতুল হায়াত' পুস্তক এবং 'খাসাইসুত্তাসাব্বুরিল ইসলামী' ওয়া মুকাওমাতিহী' বই-এর ২য় খণ্ডের 'হাকীকাতুল ইনসান' অধ্যায়।

'তারপর আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সেজদা করো, তখন ইবলীস ব্যতীত তারা সবাই সেজদা করলো, সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।'

আল্লাহর সৃষ্টিকুলে ফেরেশতারা আর একটি এমন সৃষ্টি যাদের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং রয়েছে কিছু বিশেষ দায়িত্ব। এদের সৃষ্টি বৈশিষ্ট ও কাজ সম্পর্কে আমরা ততোটুকুই জানি যতোটুকু আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জানিয়েছেন। যতোটুকু আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জানিয়েছেন তা এই গ্রন্থে আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। এইভাবে ইবলীস ফেরেশতাকুলের বাইরের এক সৃষ্টি, যার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন, 'নিশ্চয়ই ইবলীস ছিলো জ্বিন জাতির একজন, অতপর সে তার মালিকের হুকুম অমান্য করলো।'........... আবার লক্ষ্যযোগ্য, জিন ফেরেশতাকুলের বাইরের আর এক সৃষ্টি। একইভাবে তার সম্পর্কেও আল্লাহ তায়ালা যেটুকু জানিয়েছেন তার বাইরে আমরা আর কিছুই জানি না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যা জানিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণও আমরা এই তাফসীরে লিখেছিশীঘ্রই এই সূরার মধ্যে একথা আসবে যে, ইবলীস জ্বিন জাতি-উদ্ভূত, কোনোভাবেই সে ফেরেশতাকুলের অন্তর্গত নয়– যদিও ফেরেশতাদের দলে মিশে থাকার কারণে আল্লাহর হুকুম তার ওপরও প্রযোজ্য ছিলো। ওই ফেরেশতাকুলের সেই সমাবেশে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন আদম (আ.)-এর সৃষ্টির ঘোষণা দিলেন, তখন ইবলীসও সেই দলে ছিলো এবং ফেরেশতাদের সমান মর্যাদা ভোগ করছিলো। কিন্তু ইবলীস অহংকার প্রদর্শন করে বিতাড়িত হলো।

এখন ফেরেশতাদের সৃষ্টিগত ধরনই হলো যে তারা কখনও আল্লাহর না-ফরমানী করে না এবং যখন যে নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়, তারা সংগে সংগে তা পালন করে। একারণে দেখা যায়, আল্লাহর নির্দেশকে কার্যকরী করতে গিয়ে তারা পরম আনুগত্য সহকারে তৎক্ষণাত সেজদা করলো। এতটুকু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করলো, কোনো অহংকার প্রদর্শন করলো না এবং কোনো কারণেই আল্লাহর নাফরমানী করার কথা চিন্তা তাদের মনে জাগেনি বা তাদের কল্পনাতেও কথা আসেনি। এই হচ্ছে তাদের প্রকৃতি, এগুলোই হচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের দায়িত্বই হচ্ছে নিরন্তর নির্দ্বিধায় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর আনুগত্য করতে থাকা। আর এখানে এসেই আল্লাহর কাছে গোটা সৃষ্টির মধ্যে মানুষের মর্যাদা কতো বেশী তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কেননা সেসময় যে সব সৃষ্টি ছিলো তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে ফেরেশতা নামক সৃষ্টির মর্যাদা ছিলো সব থেকে বেশী আর তাদেরকে দিয়েই তিনি আদমকে সেজদা করালেন।

এখন দেখতে হবে ইবলীসের অবস্থা। সে মহান আল্লাহর হুকুমকে কেন পালন করলো না এবং কেন নাফরমানী করলো? শীঘ্রই (ইনশাআল্লাহ) আমরা জানতে পারবো, কোন সে জিনিস ছিলো, যা তার বুকের মধ্যে এই না-ফরমানীর কথা জাগালো। কোন সে ধারণা ছিলো যা তাকে তার রবের হুকুম মানতে মানা করলো। অথচ সে তো জানতো যে, তিনিই তার রব, তার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক, তার ও সমগ্র সৃষ্টির যাবতীয় কাজের পরিচালক একমাত্র তিনি এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এইভাবে এই দৃশ্যের মধ্যে আমরা আল্লাহর সৃষ্টির তিনটি উদাহরণ দেখতে পাই। একটি হচ্ছে পরিপূর্ণ ও সার্বিক আনুগত্য ও বিনাবাক্যে মেনে নেয়ার দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় সম্পূর্ণ না-ফরমানী ও ক্ষণস্থায়ী অহংকার আর তৃতীয় যে উদাহরণটি সামনে আসে তা হচ্ছে প্রকৃত মানব প্রকৃতির উদাহরণ। তার বৈশিষ্ট্যগুলো, তার দ্বিমুখী গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা আসছে.......... সেই সৃষ্টির

প্রথম প্রকৃতি হচ্ছে সে হবে নিষ্ঠার সাথে ও পুরোপুরিভাবে আল্লাহর জন্যে নিবেদিত– যার বর্ণনা ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পেয়েছি। অর্থাৎ নিশর্তভাবে আল্লাহর হুকুম মেনে নেয়ার দৃষ্টান্ত, যার প্রমাণ ফেরেশতারা দেখালো। অন্যদিকে, অপর প্রকৃতি-দুটির অবস্থা ইনশাআল্লাহ, শীঘ্রই আমরা জানতে পারবো। এরশাদ হচ্ছে,

'যখন আমি তোকে নির্দেশ দিলাম তখন কিসে তোকে সেজদা দিতে নিষেধ করলো। সে বললো, আমি ওর থেকে ভালো। কেননা আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।'

অবশ্যই ইবলীস যুক্তি ও ব্যাখ্যা সহকারে আল্লাহর সামনে তার মতটি তুলে ধরলো এবং তার বুঝ মতো নিজ ফায়সালা জানিয়ে দেয়াকে সে তার অধিকার বলে জানিয়ে দিলো। যেহেতু সে (তৎকালীন) সৃষ্টির মধ্যে বড়ই মর্যাদাবান ছিলো ....। আর যখন আল কোরআনের চূড়ান্ত অর্থ এবং পরিপূর্ণ ফয়সালা পাওয়া যায় তখন মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনার আর কোনো সুযোগ থাকে না, মানুষের সকল চিন্তা বাতিল হয়ে যায়, নির্ধারিত হয়ে যায় তার আনুগত্য এবং কোরআনের হুকুম পালন করা হয়ে যায় চূড়ান্তভাবে বাধ্যতামূলক ..... আর এই অবাধ্যতার কারণে ইবলীসের ওপর আল্লাহ তায়ালা লানত বর্ষণ করলেন, কেননা সে তো কোনোভাবেই এটা বলতে পারে না এবং প্রকৃতপক্ষে সে বলেও নাই যে, সে আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বলে জানে না, জানে না যে আল্লাহ তায়ালাই সব কিছুর মালিক, তিনিই সব কিছুর পরিচালক-ব্যবস্থাপক, তাঁর হুকুম অনুমতি ছাড়া বিশ্ব জগতে কোনো কিছুই হয় না .... কিন্তু তা সত্ত্বেও হুকুম দেয়া হলে সে হুকুম পালন করেনি এবং এ হুকুমকে সে কার্যকরও করেনি। এখানে সে তার মনগড়া যুক্তিকে মূল্য দিয়েছে। বলেছে, 'আমি ওর থেকে ভালো, আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর একে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।' অতপর তার যুলুমের কারণে তার ওপর আল্লাহর ফয়সালা এসে গেলো এবং তা সাথে সাথে কার্যকর হয়ে গেলো।

'তিনি বললেন, বেশ, বেরিয়ে যা এখান থেকে, এখানে তোর অহংকার করা মোটেই শোভা পায় না। অতএব, বেরিয়ে যা, নিশ্চয়ই তুই বিতাড়িতদের মধ্যে গণ্য হয়ে গেলি।'

এখানে খেয়াল করার বিষয়, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে জ্ঞান তার কোনো কাজে লাগলো না, তাঁর অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কে তার বিশ্বাসও তার কোনো উপকারে আসলো না। এইভাবে যারাই আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার পর সেই বিষয়ের ওপর নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সেটা পালন করবে কিনা তা স্থির করে এবং যে বিষয়ের ফয়সালা ইতিপূর্বে চূড়ান্তভাবে আল্লাহ তায়ালা করে দিয়েছেন সে বিষয়ে নিজেকে ফয়সালাদাতা বানাতে চায়, তখন তার সঠিক জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও 'কাফের' বলে গণ্য হয়ে যায়। এ কারণেই ইবলীসের জ্ঞান ও আকীদা বিশ্বাস কোনো কাজেই লাগলো না।

অবশ্যই সে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হলো, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে গেলো, তার প্রতি আল্লাহর লা'নত অবধারিত হয়ে গেলো এবং তার জন্যে হীনতা ও লাঞ্ছনা চিরদিনের জন্যে নির্ধারিত হয়ে গেলো।

কিন্তু এই হতভাগা যেদী পাজী শয়তান একথা ভুলতে পারলো না যে, তার বিতাড়নের জন্যে এবং তার প্রতি আল্লাহর গযব নেমে আসার জন্যে এই আদমই দায়ী। যেহেতু তার কারণেই তার আজ এই দুরবস্থা, তাই সে প্রতিজ্ঞা করলো এই এটাকে বিনা প্রতিশোধে কিছুতেই সে মেনে নেবে না, নিতে পারে না............... তারপর তার কদর্য স্বভাবের উপযোগী কাজ করার জন্যে সে একান্তভাবে লেগে গেলো।

সে বললো, আমাকে পুনরায় কবর থেকে উঠে আসার দিন (পুনরুত্থান দিবস) পর্যন্ত সময় দিন আমি আপনার সেরাতুল মুস্তাকীমের বাকে বাকে তাদের গোমরাহ করার জন্যে বসে থাকবো........আর তাদের অধিকাংশকেই আপনি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনকারী হিসাবে পাবেন না।' (আয়াত ১৪-১৭)

এটাই হচ্ছে অন্যায়ের ওপর যেদ করে থাকা এবং ভুল পথে চলার জন্যে বদ্ধপরিকর হওয়ার দৃষ্টান্ত। আর এইভাবে সৃষ্টির প্রথম পর্বের অবস্থার নিষ্ঠুর চিত্র আমাদের সামনে হাযির হয়। এ নিকৃষ্ট ছবিটি কোনো সাময়িক বা কিছু দিনের জন্যে মাত্র রয়েছে তা নয়-এটাই হচ্ছে সেই জঘন্য কাজ, যা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং যেদের বশবর্তী হয়ে করা শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

এরপর আসছে সেই ছবি, যার দিকে নযর পড়লে নযর যেন পাথরের মতো স্থির হয়ে যেতে চায়, তা হচ্ছে সেই জ্ঞান, অনুভূতি ও দেদীপ্যমান সকল দৃশ্যাবলীর কারণে আগত মানসিক বিপ্লব।

অবশ্যই ইবলীস, কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্যে তার রবের কাছে সময় চেয়ে নিয়েছিলো। কারণ সে ভালো করেই জানতো, তার আকাংখা পূরণ হওয়া একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় এবং তাঁর ক্ষমতার দ্বারাতেই সম্ভব। আল্লাহ তায়ালাও তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তার এই দরখাস্ত মনযুর করে নিয়েছিলেন। তবে সেখানেও একটি শর্ত দেয়া হয়েছিলো, আর তা হচ্ছে, সুপরিচিত বা সুপরিজ্ঞাত এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই ছিলো এ মনযুরী যেমন অন্য আর একটি সূরাতেও বলা হয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়াত এসেছে, যেমন, প্রথম শিংগা ফুঁক দেয়া পর্যন্ত যখন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে, তবে যাকে যাকে আল্লাহ তায়ালা বাঁচিয়ে রাখতে চাইবেন একমাত্র তারা ছাড়া (পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত ইবলীসকে বাঁচিয়ে রাখার ওয়াদা হয়নি।)

এ সময়ে যখন সে আল্লাহর পক্ষ থেকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখার ওয়াদা পেয়ে গিয়েছিলো, সেই সুযোগে অত্যন্ত ঔদ্ধত্য ও অহংকারের সাথে সে বলেছিলো যে, সে অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত করেছেন, আর যার কারণে ইবলীসের এতো সব দুঃখ, এতো অভিশাপ এবং এই বিতাড়ন! তার এই প্রতিজ্ঞার ভাষাটা আল কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এইভাবে উদ্ধৃত করেছেন,

.... অবশ্যই আমি তাদের চলার জন্যে আল্লাহর দেয়া সরল পথের বাঁকে বাঁকে বসে থাকবো, তারপর অবশ্য অবশ্যই আমি তাদের সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান থেকে এবং বাম দিক থেকে আসবো।'

অবশ্যই সে আদম ও তার বংশধরদের জন্যে আল্লাহর দেয়া সত্য সঠিক সরল ও মযবুত পথের বাকে বাকে বসে থেকে তাদেরকে ওই পথে চলতে বাধা দেবে। যে ওই পথে চলার জন্যে এগিয়ে যাবে তাকেই সে সরিয়ে অন্য পথে চালিত করে দিতে চেষ্টা করবে। আর আল্লাহর পথ মানে শুধু মনে মনে বিশ্বাস করার মতো কোনো অনুভূতি নয়। এটি একটি বাস্তব জীবনকে নিয়ন্ত্রন করার মতো কার্যকারী জীবনব্যবস্থা। এ পথের প্রধান প্রধান কথা হচ্ছে আল্লাহর ওপর ঈমান ও সেই আনুগত্য, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের দুরন্ত এক আকাংখা। এই মরদূদ শয়তান সকল দিক থেকেই মানুষের কাছে এগিয়ে আসবে। তাদের সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকে।' .... যাতে করে সে ঈমান এনে আনুগত্য করার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এ হচ্ছে মানবজাতির সফলতার বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র ও পথভ্রষ্ট করার এক

ঘৃণ্য প্রচেষ্টা, যেন মানুষ আল্লাহকে না চেনে এবং তার শোকর আদায় না করে। তবে ছোট্ট একটি মাত্র দলকে সে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তার মুরীদ বানাতে বা তার নিজের মতানুসারে চালাতে পারবে না, তারা শত বাধা সত্তেও ঘুরে-ফিরে চলে আসবে ওই সরল পথে এবং গ্রহণ করবে আল্লাহরই পথ। এজন্যেই বলা হয়েছে,

'তুমি ওদের অধিকাংশকেই শোকর গোযার হিসাবে পাবে না।'

এরপর আসছে শোকর গোযারি বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ, যার সংযোগ রয়েছে সূরাটির প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত বিবরণের সাথে,

'খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই তোমরা আছো, যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।'

কম সংখ্যক লোকের শোকরগোযারির মধ্যে যে কারণ নিহিত রয়েছে তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই মানুষের পথে পথে ইবলীসের বাধা এবং আল্লাহর কাছে পৌঁছুনোর পথে আড় হয়ে তার বসে থাকা এখনও অব্যাহত রয়েছে। একথাটা এখানে প্রকাশের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার গোপন শত্রু সম্পর্কে অবহিত করা, যে সদা-সর্বদা হেদায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। ইবলীসের এই তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করার আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, অধিকাংশ লোক যে শোকরগোযার হচ্ছে না এর আসল কারণ যখন মানুষ জানবে তখন যেন সে সতর্ক হয়ে যায় এবং খেয়াল করে দেখে কোত্থেকে আসছে মহা বিপদ যা তাদের অধিকাংশকে শোকর করা থেকে থামিয়ে দিচ্ছে।

ইবলীসের আকাংখা অনুযায়ী তার আবেদন মনযুর করা হলো, কারণ আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে মানুষকে তার পথ বেছে নেয়ার জন্যে তিনি স্বাধীনতা দান করেন। তার সামনে ভালো ও মন্দ দুটি পথই খোলা রয়েছে এবং এ দুটি পথের যে কোনো একটি অনুসরণ করার ব্যাপারে সে স্বাধীন। প্রত্যেকেই নিজ বুদ্ধি অনুসারে ভালো পথটি বাছাই করে নিতে পারে। আর রসূলদের উৎসাহ দানের মাধ্যমে সত্য সঠিক পথে চলার ব্যবস্থা করে নিতে পারে এবং এ দ্বীনকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে, খুঁজে পেতে পারে সঠিক পথ সঠিক ঠিকানা। এইভাবে কল্যাণ ও অকল্যাণের ক্ষেত্রে নিজ দ্বীন ও ঈমানের ভিত্তিতে নিজের ভূমিকা রাখতে পারে এবং দুই চূড়ান্ত অবস্থার যে কোনো একটায় সে উপনীত হতে পারে, ফলে আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী তাকে তার পরিণাম ভোগ করতে হয়। হেদায়াত বা গোমরাহী উভয় ক্ষেত্রে একইভাবে আল্লাহর নিয়ম সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী যে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার ফলে হয় হেদায়াত আসবে, নয়তো আসবে গোমরাহী।

কিন্তু এ প্রসংগে ইবলীসকে ছাড় দেয়ার ব্যাপারে কতোটা সুযোগ দেয়া হয়েছে তা খুব স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে এটা স্পষ্ট যে, অবশেষে যখন সে পুনরায় আল্লাহর কাছে যাবে তখন তার ওপর লানতই বর্ষিত হতে থাকবে। যেমন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তার দরখাস্ত মনযুর করা এবং তাকে তাড়িয়ে দেয়ার ঘোষণা থেকে জানা যায় যে, এই তাড়িয়ে দেয়া ছিলো ঘৃণা ও তিরস্কারের সাথে এবং সে ও তার অনুসারী মানব সংগীরা সবাই যে জাহান্নামী হবে তা এখানে খুবই স্পষ্ট।

'তিনি বললেন, বেরিয়ে যা এখান থেকে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায়।........ যারা তোর অনুসরণ করবে, তারাসহ (হে অহংকারী বিদ্রোহী শয়তান) তোদের সবাইকে দিয়ে অবশ্যই আমি জাহান্নাম পরিপূর্ণ করব।'

যে ওই মরদুদ শয়তানের অনুসরণ করে সে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে জানে এবং সে এও জানে যে, আল্লাহ তায়ালাই সর্বময়·ক্ষমতার মালিক। তারপরও সে তাঁর অবাধ্যতা করে। এর

দ্বারা আসলে আল্লাহকে মানতেই সে অস্বীকার করে। এই পাপিষ্ঠরাই মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র করে, তাই এদের অবধারিত পরিণতি হলো জাহান্নাম।

হাঁ, এটা ঠিক যে, আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা ইবলীস ও তার বংশধর বা সাংগ পাংগকে মানুষকে ভুল পথের দিকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা দিয়েছেন, সাথে সাথে আদম সন্তানদেরকে এই কুপ্ররোচনাজনিত বিপদজনক পরীক্ষায় পাস করার জন্যে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়তম এ সৃষ্টিকে স্বাধীনতা দিয়ে পরীক্ষা করবেন বলেই চূড়ান্ত ফায়সালা করে রেখেছেন। এভাবে এই পরীক্ষায় পাস করেই সে এক অনন্য সৃষ্টি হিসাবে প্রমাণ দেয় এবং আল্লাহরও ইচ্ছা, এভাবেই যেন তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এবং অন্যদের ওপর তার বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটিয়ে তোলে। তাকে অবশ্যই বুঝতে হবে, সে ফেরেশতাও নয়, শয়তানও নয়, সে এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। তার ভূমিকা ফেরেশতা বা শয়তানের ভুমিকার মতো নয়, তার জীবন সীমা ও ফেরেশতা বা শয়তানের মতো নয়।

মানবজাতির প্রথম পাপ ও পৃথিবীতে অবতরণ

এ অধ্যায়টি এখানেই শেষ হচ্ছে, শুরু হচ্ছে অপর আর একটি অধ্যায়। বিষয়গতভাবে এ অধ্যায়টিও পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। জান্নাত থেকে ইবলীসকে এইভাবে তাড়িয়ে দিয়ে তাকে আদম ও তার সংগীনীর কাছে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে দিলেন। এই প্রসংগেই আমরা প্রথমে জানতে পাই যে, আদম (আ.)-এর একজন সংগীনী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন তার নিজ সত্ত্বা থেকেই সৃষ্টি। আমরা জানি না কেমন করে তিনি অস্তিত্বে এলেন। আমাদের জ্ঞান বিবেচনা এবং আল কোরআন থেকে যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে এ অজানা বিষয়ের ওপর তেমন কোনো আলোকপাত হয় না। আদম (আ.)-এর পাঁজর থেকে বিবি হাওয়ার সৃষ্টি সম্পর্কে যে কথাটা প্রচলিত রয়েছে তা ইসরাঈলীদের বর্ণনা হওয়ায় আমরা তার ওপর মোটেই নির্ভর করতে পারি না। যে কথাটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)-এর মতো তাকেও সৃষ্টি করেছেন। এইভাবে একজোড়া মানুষ বাস্তবে এসেছে। এমনিতে প্রতিটি সৃষ্টির জন্যে যে নিয়ম আমরা জানি তা হচ্ছে জোড়া জোড়া থাকা, অর্থাৎ নর ও নারীর মাধ্যমে সৃষ্টির অস্তিত্ব ও প্রসার। এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'আমি প্রত্যেকটা জিনিসকে জোড়া জোড়া, যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।'

আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে যে নিয়ম আমরা জানি তা হচ্ছে জোড়ার মাধ্যমেই সৃষ্টির ধারা বজায় রাখা। আমরা যখন এই নিয়মকে সামনে রেখে চিন্তা ভাবনা করি, তখন আমরা বুঝি যে আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পর বিবি হাওয়ার সৃষ্টি হতে খুব বেশী সময় দেরী হয়নি, বরং বুঝা যায় যে, আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পরপরই বিবি হাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

এরপর দেখা যায়, সকল সময়েই আদম ও তার স্ত্রী-কে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে, যাতে করে তাদের পারস্পরিক জীবনে তারা আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করতে পারে এবং তাদের জন্যে নির্ধারিত কাজ যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন। তাদের নির্ধারিত কাজ হচ্ছে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করা, যা সূরায়ে বাকারার একটি আয়াতে এসেছে,

'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা যখন তোমার রব ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বললেন, 'আমি পৃথিবীর বুকে খলীফা বানাতে চাই।'

'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী শান্তির সাথে জান্নাতে বসবাস করতে থাকো, তারপর যেখান থেকে খুশী, সেখান থেকে তোমার খাবার সংগ্রহ করে খাও; কিন্তু এই গাছটির ধারে কাছেও যেয়ো না, তাহলে তোমরা সীমা অতিক্রমকারী যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।'

এখানে দেখা যায়, 'এই গাছটি' বলে ঠিক কোন গাছকে আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়েছেন তা সুনির্দিষ্টভাবে আল কোরআন বলেনি, বরং এ বিষয়ে আল কোরআন সম্পূর্ণ নীরব। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে কেন নীরবতা অবলম্বন করলেন তার মর্ম তিনিই জানেন। এই নীরবতা থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, এ বিষয়ে কিছু না বলাটাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি তাদেরকে হালাল জিনিস খেতে অনুমতি দিয়েছেন এবং হারাম জিনিস খেতে নিষেধ করেছেন। আর অবশ্যই এই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা তাদেরকে তিনি এই ট্রেনিং দিতে চেয়েছিলেন যে, তারা যেন আল্লাহর হুকুমে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতে পারেন এবং তাদের জন্যে এ প্রশিক্ষণও হয়ে যায় যে, তারা যেন মালিকের হুকুম পালন করতে কোনো গাফলতী না করেন, বশীভূত রাখেন নিজেদের খোশ খেয়ালকে এবং নিয়ন্ত্রিত করেন নিজেদের লাগামহীন ইচ্ছাকে। পশুদের মতো মনের যে কোনো ইচ্ছার গোলাম তারা যেন না হয়ে যান বরং মনের চাহিদাই যেন তাদের গোলাম হয়ে থাকে, তাহলেই হবে প্রকৃত মানুষের মতো কাজ। ইচ্ছাকে নিজের বশীভূত করাই মানবতার প্রধান কাজ। এই ইচ্ছাই তাদেরকে পশু থেকে পৃথক করবে এবং তখনই তাদের মানব নামের অর্থ সার্থক হবে।

এবারে শুরু হচ্ছে ইবলীসের সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের প্রচেষ্টার বিবরণ। মানবজাতিকে আল্লাহ তায়ালা সর্বদিক দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং যার জন্মের শুভসংবাদ তিনি সব প্রধান ফেরেশতাদের সেই মহা সমাবেশে ঘোষণা করছেন এবং যাকে সকল ফেরেশতাদের দ্বারা সেজদা করিয়ে ছিলেন, আর তারাও খুশীর সাথে সেজদা করেছিলেন। এই কারণে ইবলীসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছিলো এবং মহা-সম্মানিত ফেরেশতাদের দল থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিলো। এই গোটা সৃষ্টিটাই দ্বিমুখী চরিত্রের, দুদিকেই সমান ভাবে গতিশীল; আর তারই মধ্যে নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট একটি বৈশিষ্ট আছে। অর্থাৎ সেখানে এমন কিছু দুর্বল দিক আছে যে দিকে কুপ্রবৃত্তি মানুষকে টেনে নিয়ে যায় যতোক্ষণ না আল্লাহর সাথে মযবুত সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। এই সব দুর্বল অবস্থাই মানুষকে মুসীবতের মধ্যে ফেলে দেয় এবং অপরাধে লিপ্ত করে ফেলে। অবশ্যই তার প্রবৃত্তির কিছু চাহিদা আছে এবং এই চাহিদাগুলো তাকে শুধু প্রলুব্ধই করে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে পরিচালনা করে; আর এই কুপ্রবৃত্তির চাহিদাকে শয়তান উস্কিয়ে দেয়।(১) তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর তাদের উভয়কেই শয়তান প্ররোচিত করলো, যেন তাদের গোপন লজ্জাস্থানগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে..... আর সে তাদের কাছে শপথ করে বললো যে, আমি তোমাদের জন্যে অবশ্যই বড় দরদী উপদেশদাতা' (আয়াত ২০-২১)।

আমরা জানি না, শয়তান এই ওয়াসওয়াসা কেমন করে দেয়, কারণ আমরা শয়তানের মূল শক্তি কী ও কোথায় তা জানি না। তা জানতে পারলে কিভাবে সে কাজ করে তা বুঝতে পারতাম। তখন বুঝতে পারতাম মানুষকে সে কিভাবে প্ররোচিত করে এবং কিভাবে তার কাছে সে পৌঁছায়। এ বিষয়ে আল্লাহর কালাম থেকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য কিছু তথ্য আমরা জানতে পারি। কেননা তিনিই একমাত্র নির্ভূল তথ্যের উৎস এবং একমাত্র তিনিই নির্ভরযোগ্য সেই সূত্র যার কাছ থেকে

(১) দেখুন মোহাম্মদ কুতুব রচিত কেতাব 'মিনহাজুল ফান্নিল ইসলামী'–এর কিসসাতু আদম 'অধ্যায়।'

এই গায়েবের খবরটি সঠিকভাবে পাওয়া সম্ভব। কোরআনের বক্তব্যে আমরা বুঝতে পারি বহু উপায়ের মধ্যে কোনো এক উপায়ে তা সংঘটিত হয় এবং শয়তান সংগে থেকে বহু অন্যায় কাজের দিকে তাকে এগিয়ে দেয়। তবে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় একারণেই মানুষ সত্য থেকে দুরে সরে যায় যে, তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। আর এই সব দূর্বলতা কাটিয়ে ওঠা, একমাত্র মযবুত ঈমান এবং আল্লাহর স্মরনের মাধ্যমেই সম্ভব, আল্লাহর স্মরণের কারণে শয়তান এতখানি দুর্বল হয়ে যায় যে, সে মোমেনের ওপর আর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় না এবং তার দুর্বল ষড়যন্ত্র তার ওপর আর কোনো আছর করতে পারে না।

এভাবেই শয়তান তাদেরকে ওয়াসওয়াসা দিলো যার ফাদে পা দেয়ার কারণে তাদের পোষাক খুলে গেলো, যা দিয়ে তারা নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোকে ঢেকে রেখেছিলেন। শয়তানের আসল লক্ষ্যই ছিলো এইভাবে তাদেরকে উলংগ করে দেয়া। মানুষ হিসেবেই তাদের কিছু গোপন অংগ ছিলো যেগুলোকে তারা ঢেকে রাখতেন, এগুলো দেখাতেন না; শীঘ্রই আমরা এ আলোচনায় ইনশাআল্লাহ জানতে পারবো মানুষের শরীরের মধ্যে এমন কিছু অংগ আছে যা মনের মধ্যে তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি করে, এজন্যে সেগুলো ঢেকে রাখাই প্রয়োজন, যেন এগুলো তাদের গোপন রাখারই জিনিস; কিন্তু স্বাভাবিকভাবে ওই মরদূদ শয়তান তার এই লক্ষ্য অর্জনে সফল হচ্ছিল না, তাই সে অন্য পথে অগ্রসর হলো। এমন পথ ধরলো যেদিকে ঝুঁকে পড়তে তারা বাধ্য হয় এবং গভীরভাবে তাদের মন সে দিকে প্রলুব্ধ হয়ে যায়। তাই দরদী সেজে

'সে বললো, তোমাদের রব এই বৃক্ষের ধারে-কাছে যেতে তোমাদেরকে এজন্যেই মানা করেছেন যে, (এর ফল খেলে) তোমরা হয় ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা হয়ে যাবে অমর ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।'

এভাবে এখনো শয়তান মানুষের সুপ্ত যৌন অনুভূতিকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে দেয় এবং তাকে চিরদিন বেঁচে থাকতে, অথবা এতো বেশী দিন বেঁচে থাকতে প্রলুব্ধ করে যেন তার মনের মধ্যে অমরত্বের একটা তীব্র অনুভূতি পয়দা হয়ে যায়। আর এজন্যে এই সীমাবদ্ধ বয়সের ঊর্ধে ওঠার জন্যে দরকার তার এমন একটি রাজ্যের যার মধ্যে নাই কোনো সীমাবদ্ধতা....

আবার 'মালেকায়নে'– 'লামের' নীচে যের দিয়ে যখন পড়া হয়, তখন তার অর্থ দাঁড়ায় দুজন বাদশাহ। কোরআনের অন্য সূরায় অন্য বানানেও একথা এসেছে যেমন সূরায়ে তা-হা-র মধ্যে বর্ণিত হয়েছে বলা হয়েছে, 'বলবো নাকি তোমাদেরকে একটি চিরদিন বাঁচিয়ে রাখার মতো একটি গাছের কথা এবং এমন একটি বাদশাহীর কথা যা মোটেই শেষ হয়ে যাবে না।' এভাবে পড়াতে একটি ভুল অর্থ বুঝা যায়। অর্থাৎ 'চিরস্থায়ী বাদশাহী ও অমর জীবন,' আর মানুষের মনের চাহিদাগুলোর মধ্যে এটি হচ্ছে সব থেকে বড় চাহিদা যে, সে চিরদিন বেঁচে থাকতে চায়। তার জীবন শেষ হয়ে যাক, কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষ এটা কল্পনাও করতে পারে না। এর সাথেই দ্বিতীয় চাহিদা তাকে পাগলপারা করে তোলে আর তা হচ্ছে ভূসম্পত্তি ও রাজ শক্তির অধিকারী হওয়ার চাহিদা। অবশ্য কখনও কখনও যৌন চাহিদাও বড় হয়ে দেখা দেয়। কারণ এই যৌন শক্তিই যুগ যুগ ধরে বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে, ক্ষমতাকে স্থায়ী করে রাখার জন্যে ওসীলা হিসাবে কাজ করে। আর 'লাম'-এর ওপর যবর দিয়ে পড়লে তার ভালো অর্থ দাঁড়ায় 'তোমরা দুজনে চিরস্থায়ী ফেরেশতা জীবন লাভ করবে। কোনো যৌন চাহিদা তোমাদের থাকবে না, আর থাকবে না কোনো লাগাম-ছেঁড়া স্বাধীন ইচ্ছা। কিন্তু প্রথম কেরাতটি যদিও তেমন প্রসিদ্ধ নয়, তবু আল কোরআনের অন্যান্য বর্ণনা প্রসংগের সাথে এটা বেশী খাপ খায়। আর এতে শয়তানী চাহিদার সাথে মানুষের চাহিদার বেশ সামঞ্জস্যও দেখা যায়।

আর অভিশপ্ত ওই শয়তান যখন জানতে পারলো যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ওই গাছটির ধারে কাছে ঘেঁষতে নিষেধ করেছেন এবং ওই গাছের ফলের প্রতি ঐ দুই ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে নিষিদ্ধতার কারণে আকর্ষণ রয়েছে এবং ফলটির শক্তির প্রতিও তাদের আস্থা আছে, তখন তাদের সেই হৃদয়াবেগকে নাড়া দেয়ার জন্যে সে বদ্ধপরিকর হলো এবং তাদের কুপ্রবৃত্তিকে সে উস্কিয়ে তুললো যাতে করে তার কথায় তারা কান দেয়। এজন্যে সে তাদের কাছে আল্লাহর কসম দিয়ে বললো যে, অবশ্যই সে তাদের কল্যানকামী বন্ধু এবং সে পুরোপুরিই সত্যবাদী। এরশাদ হয়েছে,

'সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বললো, অবশ্যই আমি তোমাদের কল্যাণকামী।'

শয়তানের প্রতারণায় ও বশীভূতকরণ মন্ত্রে এবং তাদের প্রবৃত্তির চাহিদাকে উস্কিয়ে দেয়ার ফলে আদম ও তার স্ত্রী ভুলে গেলেন, ভুলে গেলেন যে সে তাদের দুশমন এবং যে চির দুশমন সে কখনও তাদের কল্যাণ চাইতে পারে না। তারা একথাও ভুলে গেলেন যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তার তাৎপর্য তাদের বোধগম্য হোক বা না হোক তাদেরকে অবশ্যই সে নির্দেশ পালন করতে হবে। তারা আরও ভুলে গেলেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা-ছাড়া কোনো কিছুই হয় না। আল্লাহ তায়ালা যদি তাদের জন্যে চিরস্থায়ী ভাবে বেঁচে থাকার সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকেন এবং তাদেরকে এমন ক্ষমতা দান না করেন তাহলে কিছুতেই তারা তা পেতে পারেন না। এসব কথা ভুলে গিয়ে তারা শয়তানের ধোকায় পড়ে গেলেন।

'অতপর শয়তান তাদেরকে ধোকা দিয়ে নিয়ে নিষিদ্ধ ওই গাছের দিকে এগিয়ে দিলো। তারপর যখনই ওই গাছের ফল থেকে তাঁরা সামান্য কিছু খেলেন তখনই তাদের 'সতর' খুলে গেলো (উড়ে গেলো তাদের পোশাক) এবং তারা জান্নাতের গাছের লতা পাতা দিয়ে সতর ঢাকার চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন তাদের প্রতিপালক আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন,

'তোমাদেরকে কি আমি ওই গাছের কাছে যেতে মানা করিনি এবং তোমাদেরকে কি আমি বলে দেইনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন!'

এইভাবে ধোকাবাজি দ্বারা শয়তান বিজয়ী হলো এবং এর মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হতে হলো তাদেরকে। শয়তান, এইভাবে ধোকাবাজি করে তাদের দ্বারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করালো। যার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দুনিয়ায় নামিয়ে দিলেন। এরশাদ হচ্ছে ,

'অতপর ধোকা দিয়ে তাঁদেরকে সে ভুল পথে এগিয়ে দিলো।'

অবশ্য এই সময়েই তারা বুঝতে পারলেন যে, তাদের কিছু লজ্জাস্থান আছে যা ঢাকা প্রয়োজন। এই জন্যেই পরিধেয় বস্ত্র উড়ে চলে যাওয়ার পর যখন তারা উলংগ হয়ে গেলেন, তখন তাড়াতাড়ি তারা লজ্জাস্থান ঢাকার জন্যে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং গাছের লতাপাতা জড় করে কাটা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে লজ্জাস্থানগুলো ঢাকতে থাকলেন। এতে বুঝা গেলো মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই শরমের একটি অনুভূতি বর্তমান রয়েছে এবং স্বভাবগতভাবেই তারা শরীরের গোপন অংগগুলো ঢাকতে চায়। জাহেলিয়াতের যামানায় মানুষের এই প্রকৃতিগত স্বভাব বিগড়ে গিয়েছিলো এবং এই সময় ছাড়া অন্য কখনো মানুষ উলংগ থেকেছে বলে জানা যায় না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের রব তাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এই গাছের নিকটে যেতে নিষেধ করিনি? আর তোমাদেরকে কি আমি বলিনি, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?

তারা তাদের অপরাধের কারণে আল্লাহর ধমক ও তিরস্কার শুনতে পেলেন, ধমক খেলেন তারা আল্লাহর উপদেশ ভুলে যাওয়ার কারণে। কীভাবে এই ডাক আসলো এবং কেমন করে তারা

এ ডাক শুনলেন? হাঁ, তাদের প্রথম যেভাবে আল্লাহ তায়ালা সম্বোধন করেছিলেন, যেভাবে তিনি ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করেছিলেন এবং যেভাবে সম্বোধন করেছিলেন ইবলীসকে, সম্ভবত সেই একই ভাবে তাদেরকে সম্বোধন করলেন। কিন্তু এসকল সম্বোধনের ধরন প্রকৃতি সবই আমাদের অজানা। যখন এগুলো সংঘটিত হয়, একমাত্র তখনই তা আমরা বুঝি এবং আল্লাহ তায়ালা যা চান, তাই করেন।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন ডাক আসে, তখনও সৃষ্ট মানুষ এ ডাকের কথা ভুলে যায় এবং ত্রুটি করে। তার প্রকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ভুলে যাওয়া ও অপরাধ করার স্বভাব, যার মাধ্যমে শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করে। সে সব সময়ে মানুষের পেছনে লেগে থাকে না, বা সর্বদা মানুষের মধ্যে থাকে তাও নয়; কিন্তু সে মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতি বুঝতে পারে এবং তার কোনো পদস্খলন হলেই সে তা জানতে পারে। আর মানুষের স্বভাব হচ্ছে, সে ত্রুটি বিচ্যুতি করলে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর সাহায্য চায় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে, যার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন, পুরস্কৃত করেন এবং তার তাওবা কবুল করেন। শয়তানের মতো মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে মন্দ কাজের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে না এবং অপরাধ করার জন্যে সে তার রবের কাছ থেকে সময়ও চেয়ে নেয় না। তাই তাদের অনুতাপের কথাগুলোকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে,

'তারা বললো, হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নিজেদের ওপর যুলুম করেছি, এখন আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং রহম না করেন আমাদের প্রতি, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।'

এটাই হচ্ছে মানুষের বিনয় যা তাকে তার রবের নিকটবর্তী করে দেয় এবং তার কাছে পৌঁছানোর দুয়ারগুলো খুলে যায়। মানুষ ভুল করবে, অন্যায় করবে– এটা তার জানা, কিন্তু অন্যায় বা ভুল করার পর যখনই সে তা স্বীকার করে ও লজ্জিত হয় এবং ক্ষমা চায় তখনই আল্লাহ তায়ালা তাকে মাফ করে দেন। তার দুর্বলতার অনুভূতি, তার রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা, তার রহমত পাওয়া এবং নিশ্চিত এ বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে ডাকতে থাকা যে তাঁর রহমত ও সাহায্য ছাড়া অন্য কারো কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নাই, আর মিনতির সাথে বলতে থাকা যে তিনি ক্ষমা না করলে অবশ্য অবশ্যই সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হয়ে যাবে– এ বিনয় নম্রতাই তাকে ক্ষমা পাওয়ার দিকে এগিয়ে দেয়।

প্রথম পরীক্ষার বিবরণ এখানে শেষ হচ্ছে এবং এরপর মানুষের বিরাট বিরাট বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে উঠছে। তাদের মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে আল্লাহ তায়ালা সেগুলো জানিয়ে দিচ্ছেন এবং তাদের রুচি ও সৃষ্টি জগত যোগ্যতার কথাও প্রকাশ করছেন জানাচ্ছেন। খেলাফতের দায়িত্বে টিকে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রস্তুতির কথা এবং আরও জানাচ্ছেন যে, চির দুশমন শয়তানের সাথে যুদ্ধে তাদের জয়ের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তিনি বললেন, তোমরা নেমে যাও পরস্পরের দুশমন হিসাবে, আর পৃথিবীতেই নির্ধারিত হয়ে গেলো তোমাদের বসবাসের যায়গা এবং নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত সেখানে জীবন ধারণের যাবতীয় সামগ্রী পেতে থাকবে। বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে এবং মরবেও সেখানে, আর সেখান থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনা হবে।'

আর বাস্তবিকই তাদেরকে নামিয়ে দেয়া হলো ধূলির ধরার বুকে। কিন্তু কোথায় তারা ছিলেন? জান্নাতই বা কোথায়? জাহান্নামই বা কোথায়– এসবই 'গায়েব'-এর কথা, এ ব্যাপারে তেমন কোনো তথ্য আমাদের কাছে নাই, ততোটুকুই আমরা জানি যতোটুকু আল্লাহর তরফ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে। আর ওহী আসার সিলসিলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর গায়েবের জ্ঞান

লাভ করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ভুল। আর এমনি করে আজকে মানুষ যা কিছু আবিষ্কার করেছে, তার ওপর ভরসা করাও এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং কল্পনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিজ্ঞান নিছক অহংকার ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশেষ করে, গায়েব বা দৃষ্টিসীমা বহির্ভূত বস্তু বা বিষয় জানার জন্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক যে চেষ্টা করা হয় তা সম্পূর্ণ বাতুলতা বৈ আর কিছুই নয়। কারণ নিছক কল্পনা ছাড়া গায়েবের বিষয় জানার আর কোনো উপায় তাদের কাছে নেই। আর গায়েবের সব কিছুকে এসব বিজ্ঞানীরা যখন অস্বীকার করে তখন তা হয় একমাত্র অহংকারেরই নামান্তর। গায়েব তো তাদের সবাইকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে, অর্থাৎ তারা কতটুকু দেখে? অধিকাংশ অদেখা বস্তু বা বিষয়ই তাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যেগুলোকে তারা উপেক্ষা করতে পারে না, বা করে না।

আদম (আ.) তার স্ত্রী, ইবলীস ও তার সাংগ পাংগ সবাই নেমে এলো দুনিয়ায়। যেন এখানেই তারা পরস্পরের সাথে লড়াই করে টিকে থাকার চেষ্টা করে। তখন থেকেই এই দুই ভিন্ন প্রকৃতি ও সৃষ্টির মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। এ দুই সৃষ্টির একটি শুধু অন্যায় করবে বলেই বদ্ধপরিকর হলো এবং অন্য জনের মধ্যে ন্যায় অন্যায় উভয় আচরণ করার ক্ষমতা বর্তমান রয়েছে। এই ভাবে আল্লাহ তায়ালা চাইলেন তাদের পরীক্ষা পূর্ণ হোক এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন তা বাস্তবায়িত হোক।

আদম সন্তানদের জন্যে নির্দ্ধারিত করে দেয়া হলো যে, তারা পৃথিবীর বুকেই বসবাস করবে এবং পৃথিবীর সব কিছুকে তারা পরিচালনা করবে, আর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত বস্তুগুলোকে তারা ভোগ দখল করবে। তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা আরও নির্ধারণ করে দিলেন, যে তারা এখানেই বেঁচে থাকবে এবং এখানেই মৃত্যু বরণ করবে, তারপর এখান থেকে তাদেরকে বের করে নেয়া হবে এবং তাদেরকে পুনরায় তুলে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে। যাতে করে তারা তাদের মনিবের কাছে ফিরে যায় এবং এ মহা সফর শেষে তিনি তাদেরকে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করাতে পারেন।

পৃথিবীতে নামার পর তাদের এই প্রথম মেয়াদটি শেষ হলো এবং পরের মেয়াদগুলো পরপর আসতে থাকলো। এসময়ে মানুষ যে সব বিষয়ে পানাহ চেয়েছিলো সে সকল মন্দ কাজ ও ব্যবহার থেকে বাঁচার জন্যে সে সাহায্য চাইতে থাকলো এবং তার দুশমন যে সব ফেতনার মধ্যে তাকে লিপ্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলো সেগুলোতে মানুষ তার শত্রুকে হারাতেও থাকলো।

এরপর আমাদের বুঝতে হবে যে, এসব বর্ণনা শুধু কাহিনী বলার উদ্দেশ্যেই পেশ করা হয়নি। মানুষের সঠিক অবস্থানটি কী, তার মর্যাদা জানানো এবং যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা স্পষ্ট করে তুলতেই এতো বিস্তর আলোচনা। আর যে কাজে জীবন কাটানো, যে লক্ষ্য আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেখানে অবশ্যই তাকে পৌছতে হবে কেননা এর উপরেই নির্ভর করে তার চিরস্থায়ী পরকালীন জীবনের পরিণতি..... এসব কিছুই ইসলামী দৃষ্টিভংগির অন্তর্ভুক্ত।

ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আমরা এই গ্রন্থের মূল দৃষ্টিভংগিটি তুলে ধরবো এবং এ জীবন বিধানের জন্যে কোন কোন বিষয় বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং এর বৈশিষ্টগুলোই বা কি, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

মানব জন্মের ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা ও বিজ্ঞান

মানুষের জন্মের ইতিহাস থেকে আমরা প্রথম যে মহা সত্যটি জানতে পারি তা হচ্ছে, মানব জাতির সৃষ্টি ও জীবন যাপনের সাথে বিশ্ব প্রকৃতির সব কিছুর এক গভীর যোগসূত্র রয়েছে, প্রতিটি সৃষ্টিই মানুষের সহায়ক হিসাবে কাজ করে চলেছে। আল্লাহরই ইচ্ছাতে প্রকৃতির সাথে মানুষের এই সামঞ্জস্য বর্তমান রয়েছে। আর মহান রব্বুল আলামীনই এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্যে প্রাকৃতিক সকল বস্তু নিরন্তর মানুষকে সহায়তা করে যাচ্ছে। মানুষকে যথেচ্ছাচার করার জন্যে এবং দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে তিনি ছেড়ে দেননি।

আর যারা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাকে চেনেনা বা চিনতে চায় না এবং তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না, তারা তাঁকে ও তাঁর কর্মকৌশলকে পরিমাপ করে মানবীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি ও মানবীয় মাপকাঠি দ্বারা। তারপর যখন বিশ্ব প্রকৃতির দিকে সে তাকায়, তখন মানুষকে পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টির মতোই সে এক বিশেষ সৃষ্টি হিসাবে দেখতে পায় এবং এই ধরণীটাকে একটি ক্ষুদ্র কণা হিসাবে দেখতে পায়। দেখতে পায় মহাসাগরের বুকে এটা যেন ভেসে বেড়াচ্ছে একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণার মতো। ওরা বলে, এই মানুষ সৃষ্টির কারণটা কি তা যুক্তি বুদ্ধিতে আসে না, এটাও বুঝে আসে না যে সৃষ্টির বুকে মানুষকে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী করে কেন সৃষ্টি করা হলো। আবার কেউ কেউ এটাও ধারণা করেছে যে, মানুষ সৃষ্টির পেছনে কোনো পরিকল্পনা নাই, নাই কোনো বিশেষ লক্ষ্য, বরং সৃষ্টিকর্তার আপন খোশ খেয়ালের কারণেই গোটা সৃষ্টি অস্তিত্বে এসেছে। 'এই মানব জাতি, আর আশ-পাশের সব কিছু তার হুকুমবর্দার হিসাবে তার খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে। এসব কথার পেছনে কোনো যুক্তি নেই।' এসব কথা তারাই বলে, যারা আল্লাহর মর্যাদা না জানার কারণে গর্ধবের মতো যাচ্ছে না তাই বলতে থাকে। মানবীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ দিয়েই আল্লাহর মর্যাদা সম্পর্কে তারা এসব আজে বাজে কথা বলতে থাকে।

আর একথা সত্য যে, মানুষ যদি এই বিশাল পৃথিবীর মালিক হতো, তাহলে এ পৃথিবী মানুষের জন্যে কিছুতেই নিরাপদ থাকতো না এবং আজকে যেভাবে মানুষ এর বুকে চলাফেরা করছে সে ভাবে সুখে-শান্তিতে এখানে বসবাস করতে পারতো না। কারণ এই বিশাল সাম্রাজ্যের সৃষ্টি জগতকে যেভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন, মানুষ ভারসাম্য বজায় রেখে সেভাবে সব কিছুকে ব্যবহার করতে পারতো না, যেমন আজ সব কিছুর সাথে ভারসাম্য রেখে মানুষ চলছে। একথা চরম সত্য যে, আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে কোনো জিনিস নাই, তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কোথাও কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে না। তিনিই এ মহান সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিপতি। তাঁর পরিচালনাতেই সকল কিছু চলছে। একইভাবে এটাও সত্য যে, একমাত্র তাঁরই ইচ্ছায় সব কিছুর অস্তিত্ব টিকে রয়েছে। আল্লাহর হেদায়াতকে উপেক্ষা করে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের মনগড়া মতে চলে মানুষ যতোই উন্নতি করুক না কেন পরিশেষে মানুষের ওপর নানা দিক দিয়ে এবং নানা ধরনের বিপদ এসে পড়বেই। কারণ আল্লাহকে ভুলে থাকলে মানুষের ওপর এসব বিপদ আপদ আসা অবশ্যম্ভাবী। সে মনে করে আল্লাহ তায়ালা তো তাই করেন যা তাঁর মন চায়। অপরদিকে বিজ্ঞানের নামে তারা বেপরোয়াভাবে যা করে এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তারা যে ভুল চিন্তা করে তা তাদের অহংকারের বহিপ্রকাশ এবং সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্যার জেমস জিনস তাঁর পুস্তক The obscure universe- এ মানুষের চিন্তা প্রবাহের বহু ভ্রান্ত দিকের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন,

আমরা একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাই যে আমরা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এক আকর্ষণীয় মরুভূমিতে বাস করছি। এখানে আমরা বিশ্বের সেই রহস্য রাজির দ্বার উদ্ঘাটনের জন্যে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যা মহাশূন্যে আবর্তনশীল ধরার বুকে অনাদিকাল ধরে আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি এসব কিছুর অস্তিত্বের উদ্দেশ্য জানার জন্যে। এ চিন্তার ক্ষেত্রে বিচরণ করতে গিয়ে আমরা শুধু বারবার হোঁচটই খাচ্ছি এবং নিশিদিন অস্থির হয়ে আমাদের সসীম এই অস্তিত্ব নিয়ে অসীমতার সন্ধানে ঘুরে ঘুরে হয়রান হচ্ছি। আর মহা বিশ্বের এই সীমাহীন ব্যাপকতা আমাদে অভ্যন্তরে ভয়ংকর এক অনুভূতি পয়দা না করেই বা পারে কেমন করে– যখন সদূর মহাশূন্যের দূরত্ব পরিমাপ করা কোনো দিনই কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি, আর যুগ যুগ ধরে এ ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা চালিয়েও এর কোনো হদীস পাওয়া যায়নি।

মানব জাতির ইতিহাস এ বিষয়ে আমাদেরকে তেমন কোনো তথ্য সরবরাহ করতে পারেনি এবং অতীতের দিকে তাকালে মনে হয় চোখের এক পলকেই মাত্র এ জীবন শেষ হয়ে গেলো। এটা এমন ভয়ংকর এবং ভীতিপ্রদ অনুভূতি যা আমাদের মধ্যে এক দারুণ ভয় জাগায়, আর এই মহা শূন্যের মধ্যে আমাদের যে অবস্থান এবং তার সময়কাল যে কতো ক্ষণস্থায়ী তা একটু খেয়াল করলেই বুঝা যায়। যেন আমাদের জীবনের সময়কাল সাত সাগরের মহা বারিধির মধ্যে এটা একটা তুচ্ছ বিন্দু! কিন্তু, এ বিশ্বের বয়সের দিকে তাকালে এক সীমাহনি স্তব্ধতা আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। এসব ভয়াবহ দৃশ্যাবলীর দিকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকালে মনে হয় এ জীবন সম্পূর্ণ অসার, আমাদের জীবনের মতো অন্যদের জীবনও আসর। আর আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আশা আকাংখা, আমাদের কর্মতৎপরতা, আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান এবং আমাদের রচিত জীবন বিধান এসবই আমাদের কাছে অজানা-অচেনা। এর কোনটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্যে উপকারী আমরা তার কিছুই জানি না এবং কিভাবে প্রয়োগ করলে আমাদের জীবন সুন্দর হয়ে উঠবে তাও আমরা বুঝি না। আমাদের পক্ষে সম্ভবত একথাটা বলাই উচিৎ হবে যে, মহাশূন্য ও আমাদের জীবনের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে এক বিস্ময়কর ব্যবধানের সম্পর্ক। কারণ এক দিক দিয়ে মহাশূন্যের মধ্যে যা কিছু আছে তার অধিকাংশই হচ্ছে এত ঠান্ডা যা আমাদের সবাইকে জমাট করে দিতে পারে। পাশাপাশি যখন আমরা মহাশূন্যের বস্তুগুলোর অপর দিকে দেখি, তখন মনে হয় সেগুলো এতো বেশী উত্তপ্ত যে, সেখানে কোনো প্রাণীর বেঁচে থাকাটা অসম্ভব বলে মনে হয়। এই মহাশূন্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের আলোক রশ্মি রয়েছে, কিন্তু মহাকাশের মধ্যে কোনোটি অন্য কোনোটির সাথে সংঘর্ষশীল নয় এবং এসব রশ্মির বেশীর ভাগই প্রাণীজগতের বেঁচে থাকার জন্যে অপরিহার্য।

এই মহা বিশ্বের নানা প্রকার পরিবেশে আমাদেরকে বাস করতে হয়। আর যখন একথা সত্য যে, পৃথিবীতে আমাদের আগমন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, নয় এই আগমন কোনো ভুলের ফলশ্রুতি, বরং এটা আল্লাহর পূর্ব পরিকল্পিত এক অমোঘ সিদ্ধান্ত। সুতরাং বেহেশত থেকে নেমে আসায় আমাদের আফসোস করার কিছু নাই।

ইতিপূর্বে বলেছি যে, প্রাণীর জীবন যাপন, বিশেষ করে মানুষের জীবন যাপনের জন্যে পৃথিবীর সব কিছুকে পুর্বেই যথাযথভাবে প্রস্তুত ও সজ্জিত করা হয়েছিলো। একইভাবে একথাও সত্য যে, মহান আল্লাহর শক্তিমান ইচ্ছাতেই আমরা সবাই পয়দা হয়েছি। এক্ষেত্রে এটাও সত্য যে, মহান স্রষ্টার কাছে উপকরণ বা মাধ্যম কোনো আসল ব্যাপার নয়, বরং শুধু তাঁর ইচ্ছাতেই মানুষকে পৃথিবীর বুকে আসতে হয়েছে। এটাই সত্য, কিন্তু কেন আসতে হয়েছে তা কোনো

বুদ্ধিমানের বোধগম্য নয়। তবে একজন আলেমের বুদ্ধিতে কিছু আসলেও আসতে পারে, তা না হলে এক মহাশক্তিধর পরিচালকের বিনা ইচ্ছায় এই সীমাবদ্ধ বিশ্বের মধ্যে এক নতুন জীবনের আগমন কেমন করে সম্ভব হলো তা পুরোপুরি রহস্যাবৃত থেকে যেতো! আমাদের জীবন কি তাহলে বিশাল এই বিশ্ব-প্রকৃতি থেকে বেশী শক্তিশালী! না, শত চেষ্টা সত্ত্বেও এটা বুঝে আসে না, বুঝে আসে না যখন এই বিশাল বিশ্বের গঠন প্রণালীর দিকে নযর পড়ে! তাহলে কি এটাই ঠিক যে, এই বিশ্বকে সৃষ্টি করার পূর্বেই পরিকল্পিত মানুষকে আল্লাহ তায়ালা বেশী শক্তিশালী করে পয়দা করেছিলেন এবং তারই প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছিলেন গোটা বিশ্বকে। তিনি কি এই মানুষের জন্যেই অনুগত বানালেন বিশ্বের সব কিছুকে!

এসব হচ্ছে উন্নত চিন্তাধারা। এ বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে কূল কিনারা পাওয়া যাবে না। আর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকরা স্থির সিদ্ধান্তমুলক যদিকিছু আবিষ্কার করতে পেরে থাকলে আমরা কিছুটা আশ্বস্ত হতাম। কিন্তু তারা অনুমানভিত্তিক দর্শন বা মেটাফিজিকস (Metaphysics) দ্বারা যা আমাদেরকে বুঝাতে চায় তার বাস্তব কোনো ভিত্তিই নাই। মানুষের ইতিবৃত্ত চিন্তা করতে গিয়ে তারা নিজেরাই বিভ্রান্তির শিকার এবং অপরকেও গোলাক ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। নির্ভরযোগ্য কোনো জ্ঞান তাদের কাছে নাই, অত্যন্ত সংকীর্ণ বুদ্ধি নিয়ে তারা আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে গোটা সৃষ্টি রহস্যটাকে পরিমাপ করতে চায়।

আর, আল্লাহর শোকর, আমরা আল্লাহরই মেহেরবানীতে তাঁর প্রেরিত হেদায়াতের আলোকে এই বিশাল সৃষ্টির দিকে তাকাই, কিন্তু কিছুতেই কোনো কিছু বুঝতে পারি না। আমাদের বুদ্ধি অকেজো হয়ে যায় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে, হৃদয় হয়ে যায় ভীত সন্ত্রস্ত ও অবনমিত, যেমন করে স্যার জেমস জিনস (Sir James Jeans) বলেছেন,

'আমরা এ মহাবিশ্বের স্রষ্টাকে সম্পর্কে হৃদয়ের গভীরে অনুভব করি। অনুভব করি মহান স্রষ্টা তাঁর বড়ত্ব ও গোটা সৃষ্টিটাকে অস্তিত্ব দান করার মধ্য দিয়ে তাঁর যে সীমাহীন ক্ষমতার বহিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন সেই আংগিকে, অনুভব করি প্রশান্ত মনে এবং মহব্বতের সাথে এই বাস্তব বিশ্বকে, যাকে এক হুকুম বলে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এর মধ্যে সব কিছুর সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে, আর সব কিছুর সহযোগিতায় আমাদেরকে তিনি আবহমান কাল ধরে দুনিয়ায় টিকিয়ে রেখেছেন। এর বিশালত্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা চলছি, আর যেসব জটিলতা আছে তাও আমরা মানিয়ে নিতে পারছি। এর বিশালত্ব দেখে আমরা ভয় পাই না, ঘাবড়েও যাই না, এখানে আমরা ক্ষয় হয়ে যাবো বা মহা বিশ্বের ব্যাপকতার মধ্যে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো এটাও আমাদের কখনও মনে হয় না। কারণ আমাদের এবং এ বিশ্বের সবার রব একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আমরা সবাই পারস্পরিক সহযোগিতা, সরল সহজ ভাব পারস্পরিক আন্তরিকতা, শুভাকাংখা ও পারস্পরিক আস্থা নিয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছি। আর গভীর আশায় আমাদের বুক ভরে রয়েছে যে এই সৃষ্টির সব কিছু থেকে আমরা প্রয়োজনীয় সকল সহযোগীতা লাভ করবো। পাবো আমাদের উপযোগী খাদ্য, খাবার, জীবন ধারণ সামগ্রী ও আরাম আয়েশের বস্তুসমূহ। আর অবশ্যই আমরা আশা রাখি যে, আমরা মহান আল্লাহর কাছে যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে সক্ষম হবো। এই ঘোষণা আসছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।

'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং বানিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে জীবন ধারণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা (কিন্তু) স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিই তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় থাকো।'

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

মানব সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে দ্বিতীয় যে সত্যটি আমরা আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যে লাভ করেছি, তা হচ্ছে, গোটা সৃষ্টির মধ্যে অবস্থিত জীব জগতে মানুষই একমাত্র সৃষ্টি, যাকে আল্লাহ তায়ালা সুমহান এক মর্যাদা দান করেছেন, অনুপম এ মর্যাদা তিনি আর কাউকে দেননি, তাকে তিনি বানিয়েছেন সৃষ্টির সেরারূপে। খেলাফতের যে মহান দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছেন, তা আর কাউকে দেননি। একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার কারণে তার সামনে খুলে যায় দিগন্তব্যপি ছড়িয়ে থাকা রহস্যরাজির বদ্ধ দুয়ার, বিশ্বের বুকে পরিভ্রমণরত সকল বস্তু তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে মানুষের অনুভূতিযোগ্য ও বস্তুগত যে সব জ্ঞান রয়েছে, তার দ্বারা এ রহস্যরাজি বুঝতে না পেরে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রহস্য ভান্ডার সম্পর্কে অনেক সময় সে বিরূপ মন্তব্য করে বসে। আসলে সীমাবদ্ধ দৃষ্টি ও জ্ঞানের অধিকারী মানুষের পক্ষে অসীম স্রষ্টার জ্ঞানের পরিমাপ করার চিন্তা করা নিছক বাতুলতা মাত্র। যেটুকু তিনি নিজে জানান তার বাইরে জানার ক্ষমতা কারো নেই। অবশ্য এর অর্থ মোটেই এটা নয় যে, বস্তুগত জিনিস ও তার ওপর জ্ঞান গবেষণার গুরুত্ব নেই এবং এসব গবেষণা আমাদের জীবনে কোনো কাজে লাগে না।

বস্তুর রূপান্তরের ওপর অনুমান করে ফ্রয়েড যে মতবাদ পেশ করেছেন তা হচ্ছে মানুষ নিজে নিজেই এসেছে এবং এক সময়ে সে মারা যাবে ও পচেগলে মাটির সাথে মিশে যাবে। এছাড়া তার অন্য কোনো পরিণতি নাই। সেও সেইভাবে মাটির সাথে মিশে যাবে যেমন করে অন্যান্য জীব-জন্তু মাটির সাথে মিশে যায় এবং তাদের হিসাব নিকাশের কোনো প্রশ্ন আসে না। তবে, তার মতে মানুষের বিশেষ মর্যাদা এই দিক দিয়ে নিরূপিত হয়েছে যে, সে কোনো মানুষকে ইলাহ বা সর্বময় ক্ষমতার মালিক, নিরংকুশ শক্তি ক্ষমতার অধিকারী ও চূড়ান্ত ক্ষমতাধর মনে করে না। আর মানবতাবাদের এই অত্যাধুনিক দৃষ্টিভংগির ধারক বাহকরা স্বীকার করেছেন যে, একমাত্র ইসলামই পরিপূর্ণ ভারসাম্যের সাথে মানুষকে এই মর্যাদার আসনে বসিয়েছে, ঘোষণা করেছে একমাত্র আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার কারণে সকল মানুষ ভাই ভাই এবং পরস্পর সমমর্যাদার অধিকারী।(১)

আল কোরআনে উল্লেখিত মানব সৃষ্টির ইতিকথা সবার কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত বলে স্বীকৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, মানুষকে সৃষ্টি করার পর বিশেষ মর্যাদাবান ফেরেশতাদের মহা সমাবেশে তার সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হলো। এতে বুঝা গেলো যে, সে নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়নি।

আল্লাহ তায়ালা তার জন্মের কথা ফেরেশতাকুল ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির সামনে ঘোষণা করলেন। সূরা বাকারাতে বলা হয়েছে মানব সৃষ্টির সূচনালগ্নেই ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো যে, তাকে পৃথিবীর খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পয়দা করা হয়েছে। আর জান্নাতে থাকতেই এই মহান খেলাফতের দায়িত্বে সে কতোটুকু সফলতা দেখাবে তার পরীক্ষাও নেয়া হলো। আসলে এটা ছিলো তার যোগ্যতা প্রমাণের এক অগ্নিপরীক্ষা। এমনি করে আল কোরআনের আরও বহু স্থানে বলা হয়েছে যে, এই খেলাফতের দায়িত্ব পালনের কারণে শুধু পৃথিবীই নয়, বরং অন্যান্য সকল সৃষ্টি তাকে সদা সর্বদা সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছুকে তার নিয়ন্ত্রণে এনে দেয়া হয়েছে।

এইভাবে মানুষের সৃষ্টিকর্তা তার দায়িত্বের গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন। জানানো হয়েছে আল্লাহর খেলাফতের মহান মর্যাদাপূর্ণ প্রাসাদের ভিত্তি গড়ে উঠবে এই পৃথিবীতেই। এ মর্যাদা কতো বড় তা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্যে এ দায়িত্বই সব থেকে গুরুত্ববহ ও মর্যাদাপূর্ণ।

(১) দেখুন, খাসাইসুত্তাসবীরুল ইসলামী ওয়া মুকাওয়ামাতিহী পুস্তকের ১ম অধ্যায়।

আর যে বিষয়টা আল কোরআনের সর্বত্র বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে তা হচ্ছে শুধু পৃথিবীর বুকেই মানুষকে মর্যাদাবান বানানো হয়নি, বরং সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই তাকে সম্মানিত করা হয়েছে। সুতরাং ফেরেশতা ও জ্বিন এবং অন্যান্য সকল সৃষ্টি, যাদের খবর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না, তাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দায়িত্ব রয়েছে, প্রত্যেককেই সৃষ্টি করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ কাজ দিয়ে এবং প্রত্যেককেই তাদের কাজের উপযোগী করে সৃষ্টি কাঠামো ও প্রয়োজনীয় শক্তি দেয়া হয়েছে। আর মানুষকেও সৃষ্টি করা হয়েছে তার মহান দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে এবং এজন্যেই সে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা আল্লাহর ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে,

'অবশ্যই আমি পেশ করলাম খেলাফতের মহান আমানত আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে, তখন তারা সবাই এ গুরু দায়িত্ব বহন করতে অস্বীকার করলো এবং তারা এ কঠিন দায়িত্বের কথা চিন্তা করে প্রচন্ডভাবে ভয় পেয়ে গেলো। কিন্তু মানুষ এ দায়িত্ব বহন করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। আসলে এ দায়িত্ব নিয়ে সে ভীষণ যালেম ও দারুণ অজ্ঞ হিসাবে নিজেকে প্রমাণিত করলো।'

এ ঘটনায় বুঝা গেলো যে, গোটা সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষই এ গুরু দায়িত্ব বহন করতে সাহস করেছিলো এবং এ দায়িত্ব বহন করার মতো যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য তার মধ্যেই রয়েছে। তবে এ বৈশিষ্ট্যসূমহের মধ্যে যুলুম ও ভুল করার প্রবণতাও যে রয়েছে তাও স্পষ্ট। অর্থাৎ মানব জাতির অস্তিত্ব শুরু থেকে এ প্রমাণ দিয়ে এসেছে যে, যেমন তার মধ্যে মর্যাদা পাওয়ার গুণাবলী রয়েছে, তেমনি যুলুম করা ও ভুলে যাওয়ার মতো নিকৃষ্ট খাসলাতগুলোও তার মধ্যে রয়েছে। আরো রয়েছে ব্যক্তিগত ইচ্ছা খাটানোর শক্তি এবং ইনসাফ করা ও জ্ঞানকে কাজে লাগানোর মতো যোগ্যতা। অর্থাৎ যুলুম করা ও ভুলে যাওয়া এ দুটি নিকৃষ্ট খাসলাতের পাশাপাশি ইনসাফ করা ও জ্ঞানকে কাজে লাগানোর মতো মহান যোগ্যতাও তার মধ্যে রয়েছে। এ দু'ধরনের (পরস্পর বিরোধী) গুণাবলীর সমাবেশই তাকে অন্যান্য সকল সৃষ্টি থেকেও।

এ সব বৈশিষ্ট্যকে একত্রিত করে মানুষের মর্যাদা নিরূপণ করতে গেলে দেখা যায় যে, কিছু দুর্বলতা থাকা সত্তেও মানুষ সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী, অর্থাৎ বিশ্বের সকল বড় বড় সৃষ্টির মধ্যে মানুষের বড়ত্ব সব দিক দিয়েই বেশী। কিন্তু শুধু বড় মর্যাদার অধিকারী হয়ে বসে থাকলে চলবে না এবং দায়িত্ব পালন না করলে এ মর্যাদা জোর করে তার সাথে লেগে থাকবে তাও নয়, সত্যকে জানা ও চেনার উদ্দেশ্যে তাকে অবশ্যই তার বুদ্ধি ও জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে এবং দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে তার মহান গুণাবলীকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। নিজেকে আবদ্ধ রাখতে হবে আল্লাহর নিরংকুশ আনুগত্যের মধ্যে, তার ইচ্ছা শক্তিতে স্বাধীনতা থাকা সত্তেও নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে এবং আল্লাহর ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তার আচরণের এই সব বৈশিষ্ট্যই তাকে সুমহান মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবে এবং তার মর্যাদাকে সমগ্র বিশ্বের সব কিছুর ওপরে সমুন্নত করবে। প্রকৃতপক্ষে স্যার জেমস জিনসের মতো আরো অনেকেই একথা বলেছেন যে, মানুষ তার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে এই মহান মর্যাদা লাভ করতে পারে। এই বৈশিষ্টটাই আলোচ্য অধ্যায়ে এবং আল কোরআনের অন্যান্য স্থানে উল্লেখিত হয়েছে, অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করাই মানুষের প্রধান কাজ, তার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এটাই। এই কারণেই সবার ওপর তার মর্যাদা, কিন্তু কিভাবে সে তার এই দায়িত্ব পালন করবে তা তাদের নিজেদেরকেই চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করতে হবে, যেন গোটা সৃষ্টির সব কিছুকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা যায়। বিশেষ করে তার পরিচালনায় যেন সারা জগতের সকল মানুষ আল্লাহর বিধান মতো জীবন যাপন করে শান্তি পেতে পারে।

এই পরিচালনার দায়িত্ব সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাকে দেয়া হয়েছে। যেহেতু তিনি নিজ হাতে (কুদরতী ক্ষমতায়) তাকে পয়দা করেছেন এবং তার জন্মের ঘোষণা দিয়েছেন ফেরেশতাকুলের মাঝে তথা গোটা সৃষ্টির সামনে। শক্তি ও অধিকার দিয়েছিলেন তাকে কথা বলার এবং জান্নাতের সর্বত্র বেড়ানোর এবং একটি মাত্র বৃক্ষ ছাড়া অন্য সকল গাছ গাছালির ফল ভক্ষণ করার আর তারপরই তাকে পৃথিবীর বুকে খেলাফাতের দায়িত্ব দান করলেন। এ দায়িত্ব পালনের জন্যেই তাকে সব কিছুর মৌলিক জ্ঞান দান করলেন। যেমন সূরায়ে বাকারাতে উল্লেখিত হয়েছে,

'এবং আদমকে তিনি শিখিয়ে দিলেন। সকল কিছুর নাম (পরিচয়)।'

অর্থাৎ সকল কিছুর জ্ঞান দান করে তাদেরকে পরিচালনা করার ক্ষমতা দিলেন-এই জ্ঞানই হচ্ছে কোনো কিছুকে পরিচালনা করার মূল শর্ত যেমন সেই সূরায় বলা হয়েছে। বাবা আদমকে জান্নাতে থাকতে এবং জান্নাতের বাইরেও আল্লাহ তায়ালা প্রয়োজনীয় সকল উপদেশ দান করলেন এবং তাকে এমন সব যোগ্যতা দান করলেন যা তাকে অন্যান্য সকল সৃষ্টি থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করলো। এখানেই শেষ নয় এরপর তাকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে বহু রসূল পাঠালেন। আর তিনি নিজের ওপর এটা ফরয করে নিয়েছেন যে, মানুষের ওপর তাঁর রহমত বর্ষণ করতে থাকবেন এবং তওবা করে তাঁর কাছে ফিরে আসলে তাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো মাফ করে দেবেন। সর্বশেষে তিনি অবশ্যই তাঁর এই বিশেষ সৃষ্টির প্রতি তাঁর নেয়ামতের বারিধারা বর্ষণ করবেনই করবেন- এটাই তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

মানবপ্রকৃতি ও অন্যান্য সৃষ্টির সাথে তার সম্পর্ক

এরপর মানুষ ফেরেশতাকুলের সাথে (তাদের সহযোগিতার মধ্যে থেকে) তার কাজ করে যাবে। ফেরেশতাদের দ্বারা বাবা আদমকে সেজদা করানোর মধ্য দিয়ে পূর্বেই তিনি বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন। তাদের দ্বারা তাকে হেফাযত করিয়েছেন। একজন ফেরেশতার মাধ্যমেই রসূলদের নিকট তিনি ওহী পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন এবং যারা বলবে, 'আমাদের রব আল্লাহ এরপর তারা এই কথার ওপর মযবুত হয়ে থাকবে' তাদেরকেও ফেরেশতাদের দিয়ে সাহায্য করেছেন অর্থাৎ, আল্লাহকে রব মনিব ও আইনদাতা বলে ঘোষণা দেয়ার পর এ কথার ওপর দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকবে এবং অন্য কাউকে রব বলে মানবে না। এদেরকে আল্লাহ তায়ালা সুসংবাদ দিচ্ছেন। আরো সুসংবাদ জানাচ্ছেন, যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে, তাদেরকে তিনি অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং তাদেরকে বিজয়ী করবেন কাফেরদের ওপর। ফেরেশতারা (আল্লাহরই ইচ্ছায়) তাদেরকে হত্যা করবে এবং তাদের রূহগুলোকে ভীষণ জোরে ও কষ্ট দিয়ে বের করে নিয়ে যাবে। ফেরেশতা ও মানুষের মধ্যে সহযোগিতা দুনিয়া জাহান শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত টিকে থাকবে। একইভাবে আখেরাতেও থাকবে।

মানুষ জ্বিনদের সাথেও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করবে। তাদের মধ্যে ভালো ও মন্দ উভয় শ্রেণীই রয়েছে। শয়তান কোনোক্ষেত্রেই তাকে সহযোগীতা করবেনা, মানব সৃষ্টির সূচনাতে শয়তান ও মানুষের মধ্যে শত্রুতার চিত্রও ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পেয়েছি।

এ সংঘর্ষ তো চলতে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। একইভাবে ভালো জ্বিনদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ অবস্থান ও পারস্পরিক সহযোগিতাও চলতে থাকবে- একথা আল কোরআনের বহু স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। আবার অনেক সময় জ্বিনকে বশীভূত করে তার খেদমত নেয়ার কাজও চলতে থাকবে, যেমন সোলায়মান (আ.)-এর কাহিনীতে এর দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।

এইভাবে প্রাণহীন সৃষ্টি জগতের সবার সাথে তার পারস্পরিক সহযোগিতা চলতে থাকবে বলেও জানানো হয়েছে। বিশেষ করে পৃথিবী, গ্রহ ও নিকটবর্তী তারকারাজির সহযোগিতা মানুষ সদা-সর্বদা পায়। সে পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে খলীফা নিযুক্ত হয়েছে। তার শক্তি-ক্ষমতা, জীবন ধারণ সামগ্রী এবং সঞ্চিত দ্রব্যাদি সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত রয়েছে এবং বিশ্বের রহস্যরাজির মধ্য থেকে কিছু কিছু উদ্ঘাটনের জন্যে তার নিকট আল্লাহপ্রদত্ত কিছু কিছু জ্ঞানও রয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিছু কিছু আইন জানার ক্ষমতাও মানুষকে দিয়েছেন, যেন সে খেলাফতের বিরাট দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। এইভাবে গোটা সৃষ্টিজগত মানুষের সাথে তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সহযোগিতা করে চলেছে। প্রকৃতিগত যোগ্যতা ও তার চেষ্টা-সাধনা দ্বারা সে সুমহান যোগ্যতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাবে এটাই তাকে সৃষ্টির কাংখিত উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যে যে সম্ভাবনার বীজ নিহিত রেখেছেন, তার কারণে সে মহা বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পেরেছে বা তাকে চূড়ান্ত সেই সম্মানের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে, যে সম্মান ফেরেশতাদেরকেও দেয়া হয়নি। তাই এটা প্রমাণিত সত্য যে, মানুষের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্তেও সে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর দাসত্ব ও খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার কারণেই তার এই মর্যাদা। আবার একই ভাবে সে তখন পশুর থেকেও অধম হয়ে যায়, যখন সে তার কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব করতে শুরু করে এবং তার প্রকৃতিতে নিহীত বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে সে দূরে চলে যায়, আর সে বৈশিষ্ট্যগুলোর নামই হচ্ছে 'মনুষ্যত্ব'। এসব বিশেষত্ব হারিয়ে সে পশুত্বের পংকিলতায় হাবুডুবু খেতে থাকে। তার মানবতা ও পশুত্ব দুটি এমন অবস্থা যার মাঝে রয়েছে বহু যোজন ব্যাপী দূরত্ব, যার তুলনা করা যায় অনুভূতির জগতে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর দূরত্বের সাথে, বরং এ ব্যবধান তার থেকেও বেশী বললেও অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু, এ ব্যবধান মানুষ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে আসে না। এ কথাটি আল কোরআনের আরো বহু অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

আর তৃতীয় সত্য হচ্ছে, এই যে সুন্দর সুমহান সৃষ্টি, এর স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব থাকা সত্তেও আবার এ কথাও সত্য যে, মানুষ ভীষণ দুর্বল, যার ফলে সে শুধু পশুত্বের স্তরেই নেমে যায় না, বরং অন্যায় কাজের পরিচালক হয়ে সকল সৃষ্টির মধ্যে সে নিজেকে নিম্ন থেকে নিম্নতম স্তরে নামিয়ে দেয়। আর এ অধপতন তখনই হয়, যখন সে তার কুপ্রবৃত্তির লাগামকে ঢিল দিয়ে দেয়। এই ঢিল দেয়ার ফলে প্রথম যে দুর্বলতাটা তাকে পেয়ে বসে তা হচ্ছে, চিরদিন বেঁচে থাকার জন্যে সে অস্থির হয়ে যায়, এরপর আসে ধন দৌলতের মোহ। আর যখনই সে আল্লাহর হেদায়াত থেকে দূরে চলে যায়, তখন সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যে আগ্রহটা সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্যে প্রবল আকাংখা। এর পর তার মধ্যে সর্বনিম্ন যে আগ্রহ সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে ধন দৌলত পাওয়ার আকাংখা। পশুত্বের এই স্তরে নেমে গিয়ে সে নিজ প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে, অথবা আত্মসমর্পণ করে সেই কঠিন দুশমনের কাছে, যে তাকে ছিনতাই করে নিয়ে গিয়ে তার গোলামে পরিণত করে। এই গোলামীর শেকল ছিঁড়ে সে আর সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না এবং একেবারেই নিরুপায় হয়ে যায়।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা নিজ আগ্রহ ও ইচ্ছা নিয়ে তাঁর বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করার ফয়সালা করে নেন। কারণ তাকে তার প্রকৃতির ওপর ছেড়ে দিতে তিনি প্রস্তুত নন এবং তাকে দেয়া বুদ্ধিকেও তিনি তার জন্যে যথেষ্ট মনে করেন না। তাই মানুষকে সতর্ক করার জন্যে এবং তাদের সদুপদেশ দেয়ার জন্যে তাদের কাছে রসূল পাঠানোর সিলসিলা চালু করে দিলেন।

এইভাবে এ কাহিনীর শেষের দিকে আমরা দেখতে পাবো নবীদের আগমন সংবাদের কথা, আর নবী প্রেরণের এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে মানুষের চূড়ান্ত নাজাতের জন্যে। প্রকৃতপক্ষে নবী প্রেরণ মানুষের জন্যে রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করেছে। বাঁচিয়েছে তাকে প্রবৃত্তির দাস হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে এবং ফিরিয়ে রেখেছে আল্লাহ তায়ালা থেকে দূরে সরে যাওয়া থেকে। সেই চিরদুশমন মরদূদ শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচিয়েছে– যে বারে বারে এসে ওয়াসওয়াসা দেয়, দূরে সরে যায়, আবার ফিরে এসে তাকে বিপথগামী করার চেষ্টা করে এবং তার রবের স্মরণ থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রহমত ও গযবের কথা জানিয়ে এবং সওয়াব ও শাস্তির সংবাদ দিয়ে তাকে যথাযথ উপদেশ দিয়েছেন।

আর এসব কিছু ব্যবস্থা সত্যের পথে থাকার জন্যে তার সংকল্প মযবুত বানানোর জন্যেই করা হয়েছে। যেন সে তার দুর্বলতা ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। এসব যোগ্যতা গড়ে তোলার জন্যে তাকে প্রথম বারের মতো জান্নাতেই ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ পরীক্ষায় একটি বৃক্ষের ফল খেতে তাকে নিষেধ করা হয়েছিলো যাতে তার মধ্যে দৃঢ়সংকল্প গড়ার শত্রুতা, ধোকা ও প্রবৃত্তির দুর্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সে জয়ী হতে পারে। কিন্তু প্রথম পরীক্ষায়ই যখন সে বিফল হলো, তখন এ অভিজ্ঞতা, অনাগত ভবিষ্যতের অন্যান্য পরীক্ষায় যেন সে সফল হতে পারে, তার জন্যে শিক্ষামূলক একটি দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো।

বান্দার জন্যে তওবার সুযোগ

আল্লাহর রহমতের আর একটি দিক হচ্ছে তিনি প্রত্যেক বান্দার জন্যে তাওবার দরজা সকল সময়েই খুলে রেখেছেন। সে ভুলে গেলেই তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। যখনই তার পদস্খলন হয়, তখনই তাকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়ে উজ্জীবিত করেন এবং সঠিক পথে তুলে দেন। ভুল করে যখনই সে তওবা করে, তখনই সে তওবার দুয়ার তার সামনে খোলা দেখতে পায়। আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল করেন এবং পিছলে যাওয়া পা-কে সঠিক স্থানে স্থাপন করেন। তারপর সঠিক স্থানে পা রেখে যখন সে দাঁড়িয়ে যায়, তখনই তার মন্দ কাজগুলোকে ভাল কাজে রূপান্তরিত করে দেন এবং যাকে চান তার ভাল কাজগুলোকে বহু গুণে বাড়িয়ে দেন। তার এই পাপের কারণে তাকে বা তার পরবর্তী বংশধরদের শাস্তি দেননা। আল্লাহর নযরে কারো কোনো অপকর্ম কোনো কালো দাগ হিসাবে স্থায়ী হয়ে থাকে না এবং কোনো মন্দ কাজ উত্তরাধিকারী সূত্রে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যেও প্রবেশ করে না। কারণ আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী 'কেউ কারো বোঝা বহন করবে না।'

ইসলামী চিন্তাধারার এই বিশেষ দিকটি খৃষ্ট মতবাদের ওই ধারণাকে নাকচ করে দেয় যাতে বলা হয়েছে, অপরাধী মানুষকে অপরাধমুক্ত করার জন্যে অবশ্যই জরীমানা স্বরূপ গুনাহ অনুযায়ী কিছু ট্যাকস দিতে হয়। এইভাবে বিভিন্ন প্রকারের ট্যাক্স আদায় করার মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধ মাফ হয়ে যায়। এমনকি ওই মতবাদ অনুযায়ী বাবা আদমের অপরাধের বোঝা তার সন্তানদেরকে আজও বহন করে চলতে হচ্ছে। আরো বলা হয়েছে, অবশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা নিজে মানুষের বাচ্চা (মসীহ) আকারে আবির্ভূত হয়ে মানুষের গোনাহের বোঝা নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং যখন তাকে শূলে চড়ানো হয়েছিলো, তখন নিজের রক্ত দিয়ে তিনি সবার পাপ মোচন করে দিয়েছেন। আর এই কারণেই তার নাম হয়েছে 'গোফরান'। সুতরাং, ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবে তার যাবতীয় গুনাহ ঈসা (আ.)-এর সেই রক্তে মুছে যাবে, যার দ্বারা বাবা আদমের অপরাধও মুছে গিয়েছিলো।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী চিন্তাধারায় মানুষের জন্যে আরো অনেক সহজ অবস্থা রয়েছে। আদম (আ.) ভুল করেছিলেন এবং অবশ্যই তার অপরাধ হয়েছিলো। কিন্তু যখন তিনি তাওবা করে ক্ষমা চাইলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা কবুল করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এইভাবে তার প্রথম অপরাধের বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে গেলো। শুধুমাত্র একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি ছাড়া এর জের হিসাবে পেছনে আর কোনো কিছুই থাকলোনা। এ অভিজ্ঞতার স্মৃতি মানুষের স্মরণে জাগরূক করে রাখা হলো যে, পরবর্তীতে লোকেরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং ভবিষ্যতে সতর্ক হয়ে চলতে পারে।

দেখুন, ইসলামী বিধানের প্রশস্ততা কতো ব্যাপক, কতো স্পষ্ট এবং এ আকীদা মানুষের জন্যে কতো সহজ !

চতুর্থ সত্য, এ চরম সত্য অবশ্যই মানুষ বুঝতে পারে যে, মানুষের চির দুশমন হচ্ছে মরদূদ শয়তান, যে তার শয়তানীর কথা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যায় না। একথা মনে রেখেই তার সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং শয়তানের বিরুদ্ধে সদা-সর্বদা সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে চলতে হবে।

মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস থেকে একথা চূড়ান্তভাবে জানা যায় যে, সৃষ্টিলগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে শয়তানের সাথে এ সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষ চিরদিন আছে এবং যতোদিন পৃথিবী টিকে থাকবে ততোদিন এ সংঘর্ষ চলতে থাকবে। শয়তানের আক্রমণ আসবে সকল দিক থেকে সবার ওপর এবং প্রতি মুহূর্তে। এ বিষয়ে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তার কথার উদ্ধৃতি দিয়ে তাই আল্লাহর সতর্কবাণী আসছে,

'সে বললো, যার জন্যে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, তার ও তার বংশধরের সবার জন্যে তোমার সেরাতুল মোস্তাকীমের বাঁকে বাঁকে অবশ্যই তাদেরকে বিপথগামী করার জন্যে আমি বসে থাকবো, আসবো তাদের সামনে থেকে পেছন থেকে, তাদের ডান থেকে বাম থেকে এবং তাদের অধিকাংশকে তুমি কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে দেখতে পাবে না।'

অবশ্যই এই অভিশপ্ত মরদুদ শয়তান তার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার জন্যে সংকল্প নিলো এবং কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্যে আল্লাহর কাছে সময়ও চেয়ে নিলো। সে কি অনুতপ্ত হয়ে ও ক্ষমার আশায় কাতর কণ্ঠে আল্লাহর কাছে আরযি পেশ করেছিলো? না, নরম হওয়া তার স্বভাবের বাইরে। এজন্যে যখন সে বেঁচে থাকার অনুমতি পেয়ে গেলো, তখনই দম্ভভরে জানিয়ে দিলো, আল্লাহর রাস্তায় যে চলতে চাইবে, তার সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তাকে সে পথভ্রষ্ট করতে যতো পন্থা ও পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় তার সবটাই সে অবলম্বন করবে এবং সর্বদিক থেকে তাকে বিপথগামী করবে।

এই মরদূদ শয়তান স্থির করলো যে, সে মানুষের দুর্বলতার দিকগুলো থেকে আসবে এবং যে সব দিক ও স্থান থেকে মানুষের মধ্যে যৌন অনুভূতি সৃষ্টি হয়, সেই সব দিক থেকে সে আসবে। কুপ্রবৃত্তির এসব তাড়ন থেকে একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কিছুই তাকে বাঁচাতে পারবে না। এজন্যে ঈমান আনার পর প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখে সদা সর্বদা তাঁর স্মরণকে হৃদয়ের মাঝে টিকিয়ে রাখা প্রতিটি মোমেনের সার্বক্ষণিক কর্তব্য, যাতে করে শয়তান সরল সঠিক পথ থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, কুপ্ররোচনা দিয়ে জয়ী হতে না পারে এবং কুপ্রবৃত্তির চাহিদাকে উস্কিয়ে দিয়ে তাকে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত হেদায়াতের পথ থেকে দূরে সরাতে সক্ষম না হয়।

মোমেনের সার্বক্ষনিক জেহাদ

শয়তানের কুপ্ররোচনার বিরুদ্ধে যুদ্ধই হচ্ছে আসল যুদ্ধ। হেদায়াতের পথে চলার জন্যে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এ হচ্ছে সার্বক্ষণিক সংগ্রাম, এ সংগ্রাম একাধারে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এবং নিজের সহজাত বিবেকের ডাকে সাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যেও। এ সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং শয়তান কর্তৃক তার অনুসারীদের পরিচালিত পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধেও বটে, যাতে করে আল্লাহর বিধান চালু করার মাধ্যমে বিশ্বে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হয়।

এ সংগ্রাম চলতে থাকে বিবেকের মধ্যে এবং জীবনের সকল বাস্তব কর্মক্ষেত্রে। একটি থেকে অন্যটি পৃথক নয়, উভয় স্থানেই মানুষকে শয়তান প্ররোচিত করে।

আর দুনিয়ায় বহু তাগুতী (আল্লাহদ্রোহী) শক্তি রয়েছে, যারা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও তাদের মনগড়া আইন কানুনকে চালু করার জন্যে মানুষকে সদা সর্বদা বশীভূত করার ও দাস বানিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মানুষের মনগড়া মূল্যবোধ ও তাদের বিচার বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়ে চলেছে এবং আল্লাহর কর্তৃত্ব, তাঁর শাসন ব্যবস্থা ও সেই আইন কানুন থেকে সরে থাকতে চাচ্ছে– যা দ্বীন ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংগ। এইসব মানুষ শয়তানদের কাছে এসে জ্বিন শয়তানরা কুবুদ্ধি দেয়, সুতরাং এই মানুষ শয়তানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকলেই প্রকৃতপক্ষে জ্বিন শয়তানের বিরুদ্ধেই জেহাদ করা হবে এবং এ জেহাদ শয়তানের সাথে জেহাদ থেকে কোনো অংশে কম নয়।

এই ভাবে দীর্ঘ এই জেহাদ চূড়ান্ত রূপ নেয় এবং শয়তান ও তার সাংগ-পাংগদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযান চালায়। একজন মুসলিম যখন জেহাদের এই চূড়ান্ত অবস্থাটা বুঝতে পারে, তখন অবশ্যই সে তার লোভ লালসা ও প্রবৃত্তির তাড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে সে শয়তানের চেলা চামুন্ডা ওই আল্লাদ্রোহী চক্র ও তাদের তল্পীবাহক এবং অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ জেহাদ ঘোষণার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সে অন্যায় অবিচার, অশান্তি ও বিশৃংখলার বিরুদ্ধে এবং সমাজের বুকে যে পচনক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে তার বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করে। একজন মুসলমান যখন সঠিক ভাবে নিজ কর্তব্য বুঝতে পারে, তখন অবশ্যই এসব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। চূড়ান্ত ও বিপজ্জনক এ যুদ্ধে সে যে কোনো ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকারের জন্যেও প্রস্তুত হয়ে যায়। কারণ তার চিরশত্রু শয়তান ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা নিয়ে নিরন্তর তার শত্রুতামূলক আচরণ তো করেই চলেছে, সুতরাং তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জেহাদও চলতে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত, সর্বদিক দিয়ে এবং সবখানে।

অবশেষে এ ঘটনা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হচ্ছে , মানুষকে যে দায়িত্ব পালনের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা যদি সে ভুলে যায়, তাহলে অবশ্যই তাকে শাস্তি পেতে হবে। তাকে মনে রাখতে হবে যে, তার মধ্যে অবশ্যই লজ্জা-শরমের অনুভূতি থাকতে হবে– এটাই হবে তার ভূষণ। শরীরের গোপন অংগগুলোকে ঢেকে রাখার প্রবণতা তার সহজাত বৃত্তি। আর এ বিষয়টাকে উপেক্ষা করে নিজ প্রকৃতি বিরুদ্ধ আচরণ করার অর্থ নিজেকে অপমান করা এবং নিজের ইযযত নিজেই ধ্বংস করা। আর সম্ভ্রম নষ্ট হওয়া থেকে বড় ক্ষতি আর কিছুই নেই।

যেহেতু শয়তান মানুষকে অপমান করতে চায় এবং যে কোনো ভাবে তার ক্ষতি করতে চায়, এজন্যে,

'সে তাদেরকে প্ররোচিত করল (নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার জন্যে) যাতে তাদের সামনে তাদের গোপন অংগগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে।'

'এ জন্যে ধোকাবাজির আশ্রয় নিলো (দরদী সেজে উপদেশ দিলো, ফলে) যখনই তারা ওই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলের স্বাদ গ্রহণ করলো, তখনই তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়লো তাদের গোপন অংগগুলো এবং তারা নিজেদেরকে জান্নাতের লতাপাতা দ্বারা ঢাকতে শুরু করলো।'

সংগে সংগে এলো আল্লাহর তরফ থেকে সতর্ক বাণী,

'হে বনি আদম, অবশ্যই আমি, তোমাদের জন্যে নাযিল করেছি এমন পোশাক যার দ্বারা তোমরা তোমাদের গোপন অংগগুলোকে ঢাকতে পারো এবং যেন তা হয় তোমাদের ভূষণ (সৌন্দর্য প্রকাশক এবং শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট-নিবারক)। আর জেনে রেখো, যে পোশাক তোমাদের মধ্যে আল্লাহভীতি জাগাবে তাই হবে সর্বোত্তম। এসব হচ্ছে আল্লাহর (মেহেরবানীর) বিভিন্ন নিদর্শন। তাদেরকে সতর্ক করতে গিয়ে আরো এরশাদ হচ্ছে,

'হে আদম সন্তানেরা, শয়তান যেন (পুনরায় ধোকা দিয়ে) তোমাদেরকে তেমনি করে বিপদের মধ্যে না ফেলে দেয় যেমন করে ধোকা দিয়ে তোমাদের বাপ মাকে জান্নাত থেকে বের করে এনেছিলো, খসিয়ে নিয়েছিলো তাদের পোশাক যেন তাদের গোপন অংগগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ে।'

ওপরে বর্ণিত আয়াতগুলোর প্রত্যেকটি উপস্থাপিত বিষয়ের গুরুত্ব প্রকাশের জন্যে উল্লেখিত হয়েছে এবং সবগুলো আয়াতেই একথা ফুটে উঠেছে যে, লজ্জা শরমের অনুভূতি মানুষের প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে মিশে আছে এবং পোশাক পরাও তার সহজাত বৃত্তি। সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই সে পোশাক পরতে অভ্যস্ত, অভ্যস্ত সে তার লজ্জা স্থান ঢাকতে যা একাধারে সৌন্দর্য বর্ধক এবং শারীরিক গোপন অংগগুলোর জন্যে আবরণও বটে যেমন একই ভাবে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) ও মনের পোশাক এবং মনের গোপন অনুভূতিকে ঢেকে রাখার কাজ করে।

আর মানুষের সুস্থ ও সুরুচিপূর্ণ প্রকৃতি মানুষের শারীরিক ও মানসিক গোপন অংগগুলোকে প্রকাশ করা থেকে দূরে রাখতে চায়। তাকে এসব অংগ ঢেকে রাখতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এগুলোকে মানুষের চোখের অন্তরালে রাখার জন্যে উৎসাহিত করে। আর যারা শরীরকে পোশাকের আবরণ থেকে মুক্ত করতে চায় উলংগ বা অর্ধ উলংগ থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, মনকে তাকওয়া পরহেযগারীর কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে উস্কানি দেয়, মানুষকে আল্লাহর কাছে লজ্জা না করতে ও মানুষের কাছে বে-শরম হতে প্রেরণা দেয়, যারা তাদের এই অপচেষ্টাকে তাদের এই কুরুচিপূর্ণ চিন্তাধারাকে সমাজে বাস্তবায়িত করার জন্যে তাদের সকল চেষ্টা অব্যহত রাখে তাদের লেখনী এবং সর্বপ্রকার প্রচার ও প্রসার মাধ্যম, ব্যবহার করে নিকৃষ্ট শয়তানের প্রস্তাবিত ও প্রদর্শিত সর্ব প্রকার উপায় উপকরণ, তারা আসলে মানুষকে তাদের সৃষ্টিগত সহজাত মানবিক বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে সরিয়ে নিতে চায়। সরিয়ে নিতে চায় তাদেরকে মানবতার সেই বিশেষত্বগুলো থেকে, যার কারণে সে সম্মানিত মানুষে পরিণত হয়েছে। এসব কদর্য প্ররোচনা দ্বারা আসলে তারা চায় মানুষ তার চির শত্রু শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করুক, আর শয়তান তো এটাই চায় যে, মানুষের লজ্জা শরম দূর হয়ে যাক এবং উলংগ হওয়া ও গোপন অংগগুলোকে প্রকাশিত করা সে পছন্দ করুক। এরাই হচ্ছে সেই সব ধুরন্ধর ব্যক্তি যারা ইহুদী চক্রান্তকে বাস্তবায়িত করতে চায় এবং ইহুদীদের ভয়ংকর আচরণসমূহের পদাংক অনুসরণ করে মানুষকে ধ্বংসের অতলে নিমজ্জিত করতে চায়, তারা মানবতাবোধকে পরাজিত করতে চায় এবং চায় যেন বিনা প্রতিরোধে ইহুদীদের ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়। এইভাবে মানবতা যেন যাবতীয় অন্যায়ের নিকট পরাজিত হয়ে যায়।

অবশ্যই উলংগতা পশুদের স্বভাব, অর্থাৎ মানুষকে যেমন পোশাক পরা শেখানো হয়েছে, পশুকে এইভাবে পোশাক পরা শেখানো হয়নি। কাজেই সেই সব মানুষই ওই পশু স্বভাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, যারা নিজেদেরকে পশুর অধম মনে করে অথবা পশুদের থেকে যারা নিজেদের

অবস্থা ও মান মর্যাদাকে উন্নীত করতে ইচ্ছুক নয়। উলংগতাকে যারা সভ্যতা মনে করেছে এবং এটাকেই মনে করেছে সুরুচিপূর্ণ সৌন্দর্য তারা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ও প্রকৃতিগত মর্যাদাবোধকে অপমান করেছে। প্রাচীনকালে মধ্য আফ্রিকার অধিকাংশ মানুষ উলংগাবস্থায় থাকতো। এসব অঞ্চলে ইসলাম যখন তার সভ্যতার আলো নিয়ে প্রবেশ করলো সর্বপ্রথম তাদেরকে কাপড় পরা শেখালো। কিন্তু আধুনিককালের সভ্যতা-গর্বী জাতিসমূহ ইসলামের সৌন্দর্যবোধকে উপেক্ষা করে প্রকারান্তরে মানবতাকে অপমান করে চলেছে এবং নিজেদেরকে পুনরায় প্রাচীনকালের ঘুটঘুটে অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। এরা মানুষকে তথাকথিত এক সভ্যতার দিকে নিয়ে চলেছে যাকে তারা নাম দিয়েছে নব্য ও আলোকোজ্জ্বল সভ্যতা। ইসলামী সভ্যতার বিকাশকে তারা এইভাবে খর্ব করে নিজেরাই ধ্বংসের অতল তলে নিমজ্জিত হতে চলেছে।

আর মানসিক উলংগতা হচ্ছে লজ্জা শরম না থাকা ও আল্লাহর ভয় থেকে দূরে সরে যাওয়া। এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার প্রচারযন্ত্র- রেডিও, টেলিভিশন, ছায়াছবি, ভি,ডি,ও যন্ত্র, লেখনী, পত্র পত্রিকা এবং আরো যতো প্রকার প্রচার মাধ্যম আছে তা সবই আজ ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সবের গতি হচ্ছে প্রাচীন জাহেলিয়াতের দিকে। এটাকে কোনো সুস্থ মানবতা কিছুতেই প্রগতি ও সভ্যতা বলে মেনে নিতে পারে না। কারণ এর দ্বারা মানুষের মধ্যে ভালোবাসাবাসির পরিবর্তে বাড়ছে হানাহানি এবং পশুদের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণতা। তবু শয়তান ধোকা দিয়ে বহু মানুষকে আজ ওই কদর্য মানসিকতার দিকে ঝুঁকিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে।(১)

আর আল কোরআনে মানব সভ্যতা বিকাশের যে ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, প্রকৃতিগতভাবে মানুষ কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢাকতে অভ্যস্ত। যদি কোনো পর্যায়ে কারো ভুল পরিচালনায় কোনো জনপদ এ রুচিবোধ থেকে দূরে সরে যেতে চায়, তাহলে তাদেরকে আল কোরআনের এ মহান বর্ণনাধারার মাধ্যমে দ্বারা পুনরায় তাদের মূল ভাবধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

শোকর মহান আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে তাঁর হেদায়াতের পথ পাওয়ার ব্যাপারে সঠিকভাবে পথ নির্দেশ করেছেন এবং বাঁচিয়েছেন শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং মূর্খতার গভীর গহ্বরে নিপতিত হওয়া থেকে!!

(১) 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর গোড়ার দিকে 'কিতাবুন উনযিল ইলাইকা ফালা ইয়াকুন ফী সদরেকা হারাজুন মিনহু' আয়াতের তাফসীরে দেখুন।

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَلِبَاسُ

التَّقْوٰى لا ذٰلِكَ خَيْرٌ قف ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰبَنِىْٓ

اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا

لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ط اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط

اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً

قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ط قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ

بِالْفَحْشَآءِ ط اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ قف

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط كَمَا

রুকু ৩

২৬. হে আদম সন্তানরা, আমি তোমাদের ওপর পোশাক (সংক্রান্ত বিধান) পাঠিয়েছি, যাতে করে (এর দ্বারা) তোমরা তোমাদের গোপন স্থানসমূহ ঢেকে রাখতে পারো এবং (নিজেদের) সৌন্দর্যও ফুটিয়ে তুলতে পারো, (তবে আসল) পোশাক হচ্ছে (কিন্তু) তাকওয়ার (আল্লাহর ভয় জাগ্রতকারী) পোশাক, আর এটাই হচ্ছে উত্তম (পোশাক) এবং এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহেরও একটি (অংশ, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে), যাতে করে মানুষরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ২৭. হে আদমের সন্তানরা, শয়তান যেভাবে তোমাদের পিতা মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে, তেমনি করে তোমাদেরও সে যেন প্রতারিত করতে না পারে, শয়তান তাদের উভয়ের দেহ থেকে তাদের পোশাক খুলে ফেলেছিলো, যাতে করে তাদের উভয়ের গোপন স্থানসমূহ উভয়ের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে; (মূলত) সে নিজে এবং তার সংগী-সাথীরা তোমাদের এমন সব স্থান থেকে দেখতে পায়, যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না; যারা (আমাকে) বিশ্বাস করে না তাদের জন্যে শয়তানকে আমি অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি। ২৮. (এদের অবস্থা হচ্ছে,) তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরও এর ওপর পেয়েছি, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন; (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা কখনো অশ্লীল কিছুর হুকুম দেন না; তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন কিছু বলছো, যার ব্যাপারে তোমরা কিছুই জানো না। ২৯. তুমি (আরো) বলো, আমার মালিক তো শুধু ন্যায়-ইনসাফেরই আদেশ দেন, (তাঁর আদেশ হচ্ছে,) প্রতিটি এবাদাতেই তোমরা তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে; তাঁকেই তোমরা ডাকো, নিজেদের জীবন বিধানকে একান্তভাবে তাঁর জন্যে খালেস করে; যেভাবে তিনি তোমাদের (সৃষ্টির) শুরু করেছেন সেভাবেই তোমরা (আবার তার কাছে) ফিরে যাবে।

بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا

الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٠﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ

مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ

الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ

مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ

اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩০. (অতপর) একদল লোককে তিনি সঠিক পথ দেখিয়েছেন আর দ্বিতীয় দলটির ওপর গোমরাহী ও বিদ্রোহ ভালোভাবেই চেপে বসেছে; এরাই (পরবর্তী পর্যায়ে) আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে শয়তানদের নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, (এ সত্ত্বেও) তারা নিজেদের সঠিক পথের ওপর মনে করে। ৩১. হে আদম সন্তানরা, তোমরা প্রতিটি এবাদাতের সময়ই তোমাদের সৌন্দর্য (-মণ্ডিত পোশাক) গ্রহণ করো, তোমরা খাও এবং পান করো, তবে কোনো অবস্থাতেই অপচয় করো না, আল্লাহ তায়ালা কখনো অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

রুকু ৪

৩২. (হে নবী,) তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালার (দেয়া) সৌন্দর্য (-মণ্ডিত পোশাক) এবং পবিত্র খাবার তোমাদের জন্যে কে হারাম করেছে? এগুলো তো আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজেই তাঁর বান্দাদের জন্যে উদ্ভাবন করে এনেছেন; তুমি বলো, এগুলো হচ্ছে যারা ঈমান এনেছে তাদের পার্থিব পাওনা, (অবশ্য) কেয়ামতের দিন ও এগুলো ঈমানদারদের জন্যেই (নির্দিষ্ট থাকবে); এভাবেই আমি জ্ঞানী সমাজের জন্যে আমার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করি। ৩৩. তুমি (এদের আরো) বলো, হাঁ, আমার মালিক যা কিছু হারাম করেছেন তা হচ্ছে যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজ, গুনাহ ও অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করা, (তিনি আরো হারাম করেছেন) আল্লাহর সাথে (অন্য কাউকে) শরীক করা, যার ব্যাপারে তিনি কখনো কোনো সনদ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তোমাদের এমন সব (বাজে) কথা বলা, যার ব্যাপারে তোমাদের কোনোই জ্ঞান নেই।৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্যেই (তার উত্থান-পতনের) একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, যখন তাদের সে মেয়াদ আসবে তখন তারা একদন্ড বিলম্বও করবে না, তেমনি তারা এক মুহূর্ত এগিয়েও আসবে না।

তাফসীর

আয়াত ২৬-৩৪

'হে বনী আদম, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্যে এক পোশাক ...... প্রত্যেক জাতির জন্যে দুনিয়ায় টিকে থাকার জন্যে রয়েছে নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ। সে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে তাদেরকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। তারা একটুও দেরী করবে না, আর মেয়াদ পূর্তির আগেও কেউ চলে যাবে না।' (আয়াত ২৬-৩৪)

এ হচ্ছে এক বিরতি। সূরার মধ্যে এক একটি ঘটনার বর্ণনা শেষে যে সব বিরতি এসেছে এখানেও অনুরূপ দীর্ঘ একটি বিরতি দেয়া হয়েছে মানব সৃষ্টির প্রথম মহা ঘটনাটি উল্লেখ করার পর, যেন বলা হচ্ছে এবারে একটু থামো, এপর্যায়ে কি আলোচনা করা হবে, সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে তা একটু ভেবে দেখি।

এ বিরতি দেয়া হয়েছে শয়তান ও মানব জাতির মধ্যে সংঘর্ষ বাধার আগে ভাগে। এ বিরতির উদ্দেশ্য হচ্ছে শয়তানের ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন পদ্ধতি জানানো এবং যে দুর্বলতার সুযোগ সে প্রবেশ করে সে বিষয়ে অবহিত করা। সম্ভবত এ বিরতি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আরো চেয়েছেন, মানুষ যেন শয়তানের অন্যান্য পদক্ষেপগুলোও বুঝে নেয়, বুঝে নেয় তার যাবতীয় চক্রান্তের ধরন ও প্রকৃতি।

কিন্তু আল কোরআনের পদ্ধতি হচ্ছে এ মহাগ্রন্থ আগাম কোনো ব্যাখ্যা করে বুঝায় এবং ইসলামী আন্দোলনের জন্যে জরুরী হওয়ার কারণেই কোনো কেসসা বা ঘটনার উল্লেখ করে। শুধু গল্পচ্ছলে কোনো কাহিনীর অবতারণা করা বা নিছক সাহিত্য চর্চা করা মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের মর্যাদা বিরোধী। শুধু দার্শনিক চিন্তাধারা- যার বাস্তব কোনো প্রয়োগ নাই- এমন বে-ফায়দা আলোচনাও পবিত্র এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। নিশ্চয়ই ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা বাস্তব জীবনকে পরিচালনার জন্যে এসেছে। জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে যতো ব্যাখ্যা ও উপদেশ দান করা হয়েছে এবং সব থেকে বড় ও মুখ্য উদ্দেশ্য বিশ্ব সম্রাটের রাজ্যে তাঁরই আইন কানুন চালু করা ও মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে পরিচালনার জন্যে সকল ক্ষেত্রে তাঁরই ব্যবস্থা প্রয়োগ করার জন্যে আন্দোলন করা- মানুষকে জাগিয়ে তোলা এবং তাদেরকে এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে একত্রিত করে সংগ্রামশীল করে তোলা। এরই নাম 'তাহরীকে ইসলামী বা ইসলামী আন্দোলন।

আরব দেশে যে জাহেলিয়াতের জোয়ার চলছিলো, তাদের কাছে মানব জন্মের ইতিহাসের এ সব ঘটনা বিবৃত করে তাদেরকে কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করাই ছিলো প্রথম ও প্রধান কাজ। কোরায়শ জাতি মনগড়া বহু পন্থা পদ্ধতি অবলম্বন করে আল্লাহর ঘরে হজ্জের উদ্দেশ্যে আগত বহিরাগত মোশরেক কবীলাগুলো থেকে নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্যে সদা সর্বদা তৎপর থাকতো। নিজেদের এই হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে তারা আল্লাহর ঘরকে বাস্তবে মূর্তির ঘর বানিয়ে রেখেছিলো এবং নিজেদেরকে এ ঘরের রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক ও খাদেম হিসাবে পেশ করে তারা নিজেদেরকে ওইসব মূর্তির জন্যে উৎসর্গীকৃত ভেট বেগার গ্রহণ করার অধিকারী বানিয়ে রেখেছিলো। এসব মূর্তির পূজাকে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ধর্ম হিসাবে উপস্থাপিত করে এর আড়ালে নিজেদের স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার জন্যে তারা নানা মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলতো। বলতো, এই মূর্তিগুলোর পূজা অর্চনা করলে এবং এদের জন্যে নানা প্রকার উৎসর্গ পেশ করলেই আল্লাহর বিধান পালন করা হবে। এসব মিথ্যা অজুহাত ছিলো বহিরাগত মোশরেক কাবীলাগুলোকে বশীভূত করার মূলমন্ত্র। আর সকল যুগে ও সকল দেশে এইসব স্বার্থবাদীরা ধর্মের রক্ষক ও

পরিচালক হিসাবে নিজেদেরকে পেশ করে মানুষকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে, তাদেরকে সঠিক জ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং সকলের কাছে থেকে নিজেদের জন্যে ধোকা ও মিথ্যার মাধ্যমে সুবিধাজনক অবস্থা টিকিয়ে রেখেছে, যাকে বলা যায় ব্রাক্ষ্মণবাদ।

সাহসিকতা ও বিরত্বের ব্যাপাড়ে কোরায়শদের বিশেষ একটা সুনাম ছিলো। তারা নিজেদেরকে সমগ্র আরবের মধ্যে অভিজাত বলে দাবী করতো। মনে করতো সবার শ্রদ্ধা লাভ তাদের একচ্ছত্র অধিকার এবং ক'াবা শরীফের মুতাওয়াল্লী হওয়ার কারণে আশপাশের গোত্রগুলোও তাদের এ অধিকার মেনে নিয়েছিলো। কোরায়শরা বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা করে দিতো এবং নিজেদের কাপড় পরে তওয়াফ করার অধিকার একমাত্র তাদেরই ছিলো, অন্যরা এই সাহসী জাতির কাছ থেকে কাপড় করয করে নিতো অথবা এমন নতুন কাপড় খরিদ করতে হতো, যা ইতিপূর্বে আর কেউ কোনো দিন পরেনি। অথবা উলংগ হয়েই তাদের তওয়াফ করতে হতো। এদের মধ্যে পুরুষ ও নারী সবাই ছিলো!

ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, কোরায়শ জাতি ছাড়া আরবের অন্য কোনো গোত্র তাদের ব্যবহৃত পুরাতন কাপড়ে তওয়াফ করতো না। কারণ তারা মনে করতো, যে কাপড় পরে তারা নানা প্রকার পাপ করেছে, সেগুলো পরে আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করা যায় না। তাদের ধারণায় একমাত্র কোরায়শ জাতিই ছিলো এমন পবিত্র যে তাদের পোশাক কখনো অপবিত্র হয় না। কোনো দুর্ধর্ষ কোরায়েশ শার্দুলের কাছ থেকে পোশাক করয করতে না পারলে সম্পূর্ণ আনকোরা নতুন কাপড় পরে তারা তওয়াফ করতো। আর এই ধরনের নতুন কাপড় যারা না যোগাড় করতে না পারতো, তারা নারী পুরুষ সবাই উলংগ হয়েই তওয়াফ করতো। শুধু তাদের লজ্জাস্থানের ওপর কোনো ভাবে একটু আবরণ দিতো যাতে করে লজ্জাস্থানের একটা অংশ আবৃত হয়....... আর অধিকাংশ নারী রাতের বেলায় উলংগ অবস্থায় তওয়াফ করতো। এসব নিয়ম কানুন তারা নিজেরাই তৈরী করে নিয়েছিলো এবং এ বিষয়ে তারা তাদের বাপ দাদাদের অনুসরণ করতো, আর বিশ্বাস করতো বাপ দাদাদের আমল থেকে গড়ে ওঠা সকল প্রথা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা আল কোরআনে আয়াত নাযিল করে এ পোশাকবিহীন অবস্থায় তওয়াফ করার নির্দেশ যে তিনি দেননি তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছেন। বলেছেন, যখন তারা কোনো লজ্জাকর কাজ করতো, বলতো, এসব কাজ আমাদের বাপ-দাদাদের অনুসরণে করে আসছি। আরো বলতো আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তওয়াফ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তাদের এ দাবীকে রদ করে দেয়ার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'বলো হে মোহাম্মদ, আল্লাহ তায়ালা এভাবে তওয়াফ করতে নির্দেশ দেন নাই। এটা লজ্জাজনক কাজ। এমন লজ্জাজনক কাজের নির্দেশ আল্লাহ তায়ালা কখনো দেন না। তোমরা কি এমন এমন কথা বলছো যা তোমরা জানো না?'

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সঠিকভাবে না জেনেই তারা বহু কথা প্রচার করে রেখেছিলো। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কথা হচ্ছে, 'বলো, আমার রব ইনসাফ করার নির্দেশ দিয়েছেন', অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে এবং ন্যায্য পথে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রতিটি এবাদাতের সময় তোমাদের লক্ষ স্থির রাখবে। তাঁকেই একান্তভাবে ডাকবে।.................

অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে তাঁর আনুগত্যের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর রসূলদের যে সব অলৌকিক ক্ষমতা দান করে মানুষের জন্যে তাদের রেসালাতকে গ্রহণ করা সহজ

করে দেয়া হয়েছে, তাদের অনুসারীদের সেই সব বিশেষ ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করে ও পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুগত্য করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাঁর সাল আইন কানুন মেনে নিতে বলেছেন। পরম ঐকান্তিকতার সাথে তাঁর যাবতীয় হুকুম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে মনে রাখতে হবে, দুটি কাজ এক সাথে পালন না করলে, অদের কোনো আনুগত্যই কবুল করবেন না, সে দুটি হচ্ছে 'শরীয়াতের হুকুমগুলো যথাযথভাবে পালন করা এবং শেরক থেকে পুরোপুরি দূরে থাকা।'

সুতরাং এবাদাত বন্দেগী, তওয়াফ ও পোশাক আশাক সম্পর্কে জাহেলী যুগের প্রথাগুলোর দিকে যখন আমরা তাকাই, তখন দেখতে পাই এগুলো এবং খাদ্য খাবার সম্পর্কিত তাদের অনুসৃত বহু নিয়ম নীতিকে তারা আল্লাহর বিধান হিসাবেই গুরুত্ব দিয়ে পালন করতো। প্রকৃতপক্ষে এগুলো মোটেই আল্লাহর বিধান নয়। এজন্যেই এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক ইতিহাসটি তুলে ধরা হয়েছে এবং এ প্রসংগে জান্নাতের নিষিদ্ধ গাছ ছাড়া অন্যান্য গাছের ফল খাওয়া সম্পর্কে ৬ল্লেখ হয়েছে। বিশেষ করে লেবাস সম্পর্কিত কথা এসেছে এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কারণে করে তাদের পোশাক খুলে পড়ে যাওয়ার কথা এসেছে, আরো এসেছে গোপন অংগগুলো প্রকাশ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের লজ্জানুভূতির কথা এবং জান্নাতের লতা-পাতা দ্বারা তাদের সতর ঢাকার প্রচেষ্টার কথাও।

এসব ঘটনার উল্লেখ এবং তাদের পদস্খলনের কারণে প্রথম যে তিরষ্কারটি নেমে এলো, সে বিষয়টি বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে জাহেলিয়াতের যামানায় অনুসৃত মানুষের মনগড়া প্রথা পদ্ধতির ওপর আলোকপাত করা। আর আল কোরআনের অন্যান্য সূরার মধ্যে এবং আরো বিভিন্ন প্রসংগেও এসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ আদি পিতা আদম (আ.) ও তার স্ত্রীর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ধমক নেমে এলো, সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে এবং সত্য পথে আসানীর সাথে চলতে পারে। কিন্তু উল্লেখিত সকল ঘটনার মধ্যে যে মহা সত্যটি ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পুরোপুরি মজবুর বা অসহায় করে দেননি। তাদেরকে ভালো মন্দ জ্ঞান দান করে ইচ্ছা শক্তিতে স্বাধীনতা দিয়েছেন, যেন তারা পরিণতির কথা চিন্তা করে সঠিক পথের দিকে এগিয়ে যেতে পারে এবং অতীতের ঘটনার আলোকে যথাযথভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।(১)

সভ্যতার বিকাশে শালিন পোষাকের ভূমিকা

'হে বনি আদম, অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে এক লেবাস নাযিল করেছি, যা তোমাদের গোপন অংগগুলোকে ঢেকে রাখতে পারে এবং তোমাদের জন্যে সৌন্দর্যবর্ধক ও শীত গ্রীষ্মের কষ্ট নিবারক হবে। আর তাকওয়া বিজড়িত পোশাকই সর্বোত্তম পোশাক। এ পোশাক। হচ্ছে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। আশা করা যায় (এর থেকে) ওরা শিক্ষা গ্রহণ করবে।'

ইতিমধ্যে বর্ণিত কেসসার সাথে সংযোগ রেখেই এ আহ্বানটি জানানো হয়েছে এ ডাকের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে উলংগ হয়ে যাওয়া, কাপড় খসে পড়ে গিয়ে সতর খুলে যাওয়া ও জান্নাতের পত্র-পল্লব দ্বারা সতর ঢাকার চেষ্টা। অবশ্যই ওই ফলটি খাওয়া ছিলো এক মহা অপরাধ, আর সে অপরাধ তো হয়েছিলো আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কারণে ও যা তিনি খেতে নিষেধ করেছিলেন তা খাওয়ার কারণে বিকৃত আর আদি পিতা-মাতার যে অপরাধের কথা লোকেরা সাধারণত বলে থাকে, তা নিছক (বর্তমান) ইনজীল কেতাবে পাওয়া তথ্য। আর পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা এই

(১) দেখুন 'আত্তাসবীরুল ফান্নিউ ফিল কোরআন' পুস্তকের মধ্যে 'আল কিসসাতু ফিল কোরআনি অধ্যায়।

বিকৃত কেতাব নিয়েই ঢাক ঢোল পিটিয়ে তাদের অপরাধের কথা বেশী বেশী করে বলে। আর ইহুদী দার্শনিক ফ্রয়েড তার বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে মেরেছে আল কোরআনের দিকে এবং বাবা আদম ও মা হাওয়াকে ক্ষমার অযোগ্য বলে প্রচার করে। তাদের প্রাচীন কাহিনীতেও এইভাবে তাদেরকে দোষারোপ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, তাদের মারাত্মক ওই অপরাধের কারণে তাদের প্রতি আল্লাহর আক্রোশ এসে পড়েছিলো এবং তার জের ভোগ করতে হচ্ছে গোটা মানব জাতিকে। ওরা বলতো, তারা নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে চিরদিন বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর মতোই অনুরূপ ক্ষমতা লাভের জন্যে লালায়িত হয়ে পড়েছিলেন।(১) আর পাশ্চাত্যের মানুষেরা যেমন যৌন সম্ভোগের কথা বেশী বেশী চিন্তা করে নিজেদেরকে রসাতলে নিক্ষেপ করেছে, তাদের ধারণায় বাবা আদম ও মা হাওয়া ওই নিষিদ্ধ ফল না খেলে যৌন মিলন থেকে বঞ্চিত হবে– এই কথা মনে করেই তারা ওই নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন। এটাই ইহুদী দার্শনিক ফ্রয়েড তাদেরকে শিখিয়েছিলো।

উলংগ হয়ে যাওয়ার ঘটনা, যা বাবা আদম ও মা হাওয়ার অপরাধের শাস্তি হিসাবে সংঘটিত হয়েছিলো বলে মনে করা হয়– এ ধারণার মোকাবেলায় এবং জাহেলী যামানায় যে উলংগ সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো তার প্রতিরোধে আল কোরআন বনি আদমকে আদরের সাথে ডাক দিয়ে তাদের জন্যে লেবাস আকারে আগত আল্লাহর নেয়ামতের কথা ঘোষণা করেছে। আল কোরআন তাদেরকে পোশাক পরার শিক্ষা দিচ্ছে এবং পোশাকের ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে তাদের জন্যে সহজ বলে জানাচ্ছে। নির্ধারণ করছে তাদের জন্যে এমন লেবাস যা তাদের সতর ঢেকে রাখবে এবং এই সতর ঢাকার দ্বারা তাদের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করবে। সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার কথা বলে পরোক্ষভবে জানানো হয়েছে যে, উলংগতা হচ্ছে কদর্যতা ও অশোভন আচরণ। আর এই কারণেই বলা হয়েছে, 'আমি পাঠিয়েছি, অর্থাৎ নির্ধারণ করে দিয়েছি লেবাসের ব্যবস্থাকে'। আর যে পোশাক দ্বারা সতর ঢাকা হয় তা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পোশাক। আর যা গোটা শরীর ঢেকে দেয় এবং শরীরকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তা হচ্ছে বাহ্যিক পোশাক, যেমন আসবাবপত্র, প্রাচুর্য, বিলাসিতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক, তেমনি বাহ্যিক পোশাকও আল্লাহর নেয়ামতের প্রতীক। এসব কথা সবই পোশাকের গুণ বর্ণনা প্রসংগে এসেছে।

এমনিভাবে, এখানে তাকওয়ার পোশাকের কথাও উল্লিখিত হয়েছে এবং এ-পোশাককে কল্যাণকর এবং ভালো বলে মানুষের জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাকওয়ার লেবাস– ওইটাই তো ভালো ওইটাই তো আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম।

আব্দুর রহমান ইবনে আসলাম বলেন, ওপরে বর্ণিত কথার অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে বলেই তারা সতরকে ঢেকে রাখে– এটিই 'তাকওয়ার লেবাস'।

এই সময় থেকেই সতর ঢাকা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে লেবাসের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং তাকওয়ার লেবাসের কথাও বলা হয়েছে। এ দুটোই লেবাস। একটি অন্তরের নানা কদর্য অনুভূতিকে ঢেকে দেয় এবং মনকে সুন্দর করে। অন্যটি শরীরের অপ্রকাশিতব্য অংশগুলোকে ঢেকে রাখে এবং শরীরকে সুন্দর করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে একটি আর একটির পরিপূরক। সুতরাং আল্লাহভীতির চেতনা এবং আল্লাহর সাথে লজ্জা করার কারণে মানুষের কাছে শরীর খোলা রাখতে খারাপ লাগে এবং গোপন অংগগুলো প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ আসে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর

(১) দেখুন, 'খাসাইসুত্তাসাব্বুরিল ইসলামী ওয়া মুক্বাওয়ামাতিহী' কেতাবের প্রথম ভাগে, 'তীহ ওয়াবুকাম অধ্যায়।

সাথে লজ্জা করে না, তাঁকে ভয়ও করে না তার পক্ষে উলংগ হতে, বা উলংগ হওয়ার আহবান জানাতেও অস্বস্তি লাগে না। আসলে স্বভাবগতভাবে লজ্জা-শরম ও আল্লাহভীতির কারণেই উলংগ হওয়া থেকে মানুষ বিরত থাকে। আর একারণে লজ্জা শরম ও আল্লাহভীতি দূর হয়ে গেলেই তার জন্যে যৌন অংগগুলো খোলা রাখা ও কারো সামনে যৌন অংগগুলো প্রদর্শন করাতে কোনো বাধা বা দ্বিধা সংকোচ থাকে না।

সতর ঢাকা হয় লজ্জা শরমের অনুভূতির কারণেই। এটা কোনো প্রথা বা পারিপার্শ্বিক চাপের ফল নয়, যেমন মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্যে প্রগতিবাদীরা ঢাক ঢোল পিটিয়ে নগ্নতার প্রচার করে চলেছে এবং এই ভাবে তারা মানুষের লজ্জা শরম খতম করে দিয়ে তাদেরকে ইহুদীদের পদাংক অনুসরণ করতে বাধ্য করছে। আর এই ইহুদী বৈজ্ঞানিকদের হীন চক্রান্তজালে তারা জড়িয়ে পড়েছে। লজ্জা শরমের অনুভূতি আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে তাদের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই দিয়ে দিয়েছেন। তারপর মানুষের জন্যে তিনি যে বিধান দিয়েছেন তাতেও লজ্জা শরমকে টিকিয়ে রাখতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। পৃথিবীর যে যে এলাকা মুসলমানদের ক্ষমতাধীন অথবা প্রভাবাধীনে আসবে, সে সকল অঞ্চলে যেন শরীয়ত নির্ধারিত পোশাক চালু করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বনী আদমকে লেবাস পোশাক ও সতর ঢাকার নির্দেশ দান করে তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করাচ্ছেন। এর দ্বারাই যে তারা পরিষ্কারভাবে নিজেদেরকে পশু থেকে পার্থক্য করতে পারছে তা অত্যন্ত জোরালোভাবে তিনি জানাচ্ছেন এবং এই পোশাকের মাধ্যমে তারা জীবন ধারণের বহু সামগ্রী যে লাভ করতে পারছে তাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন,

'যাতে করে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।'

এই দৃষ্টান্ত থেকে মুসলমানরা ইহুদীদের ওই কঠিন হামলার জবাব দিতে সক্ষম হয় যা তাদের লাজ-লজ্জা ও চরিত্রের ওপর হানা হিসেবে আসে এবং সৌন্দর্য সভ্যতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার অজুহাতে তাদেরকে ওই নগ্নতা ও বেহায়াপনার দিকে নিরন্তর যে হাতছানি দেয়া হচ্ছে তার করাল গ্রাস থেকে রেহাই পাওয়াও সম্ভব হয়। এর দ্বারা ইহুদীরা চেয়েছিলো তাদের গোলামী করা হোক। এরপর তারা আরও চেয়েছে তাদের পদাংক অনুসরণ করে মানবতা ধ্বংস হয়ে যাক এবং তাদের দখলদারিত্ব কায়েম হয়ে যাক। দ্বীন ইসলামের যে শেকড় এখনও মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত রয়েছে তা যেন উপড়ে ফেলা যায় অর্থাৎ বিশ্বব্যপি ইসলামের শানস ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যের বিকাশ যেন আর কখনো ঘটতে না পারে তার জন্যে ওদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা নিরন্তর জারি রয়েছে। এইভাবে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যে এ সকল আয়াতের ওপর আঘাত হেনে চলেছে। তাদের এই নগ্ন হামলার একটা বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে পোশাক ও পর্দার যে ব্যবস্থা ইসলাম চালু করেছে তা অকার্যকর করে নগ্নতার প্রসার ঘটানো এবং মানুষের যৌন অনুভূতিকে উস্কিয়ে তোলা, যাতে করে সভ্যতার বুনিয়াদ ধ্বংস হয়ে যায় এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পশুত্বের সয়লাব বয়ে যায় ও পাশব বৃত্তি সর্বত্র মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এর জন্যেই নিয়োজিত করা হয়েছে তাদের কূটনীতিকে, তাদের প্রচার যন্ত্রকে এবং তাদের লেখনীকে, যাতে করে সারা পৃথিবীর যুব শক্তির মধ্যে কলুষিত মনোভাবের প্রসার ঘটে। এমতাবস্থায় বিদগ্ধ মানবতার কাছে আমাদের আবেদন, তারা চিন্তা করে দেখুক মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটে কি পাশব বৃত্তির মাধ্যমে? না পোশাকে নগ্ন শরীরকে আবৃত করায়? কিন্তু আফসোস! আজকের আদম সন্তানেরা ঝুঁকে পড়েছে জাহেলিয়াতে এবং এর মধ্যে চলতে চলতে দিশেহারা হয়ে যাওয়ায় তারা পৌঁছে গেছে পশুত্বের জগতে। এর ফলেই মানুষকে রক্ষা করতে এবং তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে তারা আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করতে পারছে না। তাই, আল্লাহ তায়ালা এইসব ভ্রান্ত মানুষকে ডাক দিয়ে সতর্ক করছেন,

'হে বনী আদম, শয়তান তোমাদেরকে যেন তেমনি করে বিপদে না ফেলে দেয়, যেমন করে মিথ্যা ও ধোকাবাজির মাধ্যমে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিলো, শয়তান তাদের উভয়ের কাপড় খুলে ফেলেছিলো, যেন তাদের গোপনাংগগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে .... ওরা মনে করে প্রকৃতপক্ষে ওরাই হেদায়াত প্রাপ্ত (আয়াত ২৭-৩০)।

বনী আদমের জন্যে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় আহ্বান। তাদের আদি বাপ-মায়ের জীবনে ভুলের কারণে যে পরিণতি হয়েছে এবং শয়তানের সাথে তাদের ওপরও যে দুঃখজনক অবস্থাটা নেমে এসেছে সে ইতিহাস থেকে অনেক কিছুই শেখার আছে, তাদের দুশমন শয়তানের কথামতো, তাদের মনিবের কথা অমান্য করায় তাদের লজ্জা-স্থানগুলো খুলে যাওয়ার ফলে যে বিব্রতকর অবস্থায় তাদেরকে পড়তে হয়েছে, তারই প্রেক্ষাপটে তাদের রবের কাছ থেকে এই দ্বিতীয় আহ্বানটি এলো।

এ আহ্বান এলো সেই আরব জাহেলী চিন্তাকে নাকচ করার জন্যে, যার কারণে তারা বায়তুল্লাহ শরীফে উলংগভাবে তওয়াফ করার প্রয়োজন বোধ করতো, যা ইতিমধ্যে আলোচনায় এসেছে। তাদের পাকা পোক্ত ধারণা গড়ে উঠেছিলো, যে বাপ দাদাদের আমল থেকে গড়ে ওঠা এসব প্রথার পেছনে রয়েছে আল্লাহরই নির্দেশ ও তাঁরই ব্যবস্থা।

অশালীন পোশাক একটি শয়তানী কাজ

প্রথম নির্দেশ ছিলো, তাদের বাপ মাকে যে ভুলটি উলংগ করে ছেড়েছিলো, তার থেকে যথাযথভাবে শিক্ষা নেয়া এবং পোশাক পরা, সতর ঢাকা ও সৌন্দর্য প্রকাশের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাকে বান্দার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ নেয়ামত হিসাবে গ্রহণ করা। দ্বিতীয় আহ্বানটি ছিলো সাধারণভাবে সকল বনী আদমের জন্যে এবং সেই মোশরেকদেরকে সতর্ক করার জন্যেও যারা ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই এর বিরোধিতা করে এসেছে। শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণের কারণে তারা নিজেরাই নিজেদের জন্যে জীবন-পথ রচনা করেছে, নিজেদের জন্যে আইন তৈরী করেছে এবং এবাদাত-বন্দেগীর বিভিন্ন মনগড়া পদ্ধতিও তারা নিজেরাই রচনা করে নিয়েছে, যার ফলে তারা নানা প্রকার ফেতনা ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, যেমন করে তাদের পিতা মাতা অতীতে ফেতনার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। তখন সে তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে আনার কারণে তাদের পোশাক খুলে গেলে তাদের গোপন অংগগুলো প্রকাশিত হয়ে ছিলো। সাথে সাথে তারা তাদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন প্রাচীন ও নব্য জাহেলিয়াতের সকল সময়েই এই দুটি অবস্থা মানুষের মধ্যে বিরাজ করেছে। শয়তানের উস্কানিমূলক যতো প্রকার কাজ আছে, যার দ্বারা মানুষকে বিপদে ফেলা যায় তার মধ্যে উলংগ করা একটা বড় কাজ, বরং বলা যায়, উলংগ হওয়াটাই অন্যতম শয়তানী কাজ। আর বাবা আদম ও তাঁর সন্তানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যে চরম শত্রু শয়তানের পদাংক অনুসারে উলংগ সভ্যতা চালু করা চরম শয়তানী কাজ। মানুষ ও শয়তানের মধ্যে এই যে সংঘর্ষতা চিরদিন চলতে থাকবে এবং কোনো সময়েই এই সংঘাত থামবেনা। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, কখনোই যেন সে শয়তানকে এই ভাবে দুশমনী করে তাকে বিপদে ফেলার সুযোগ না দেয়, এই সংঘর্ষে যেন সে বিজয়ী হওয়ার জন্যে সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকে এবং শয়তানের কাছে পরাজয় বরণ করে তার ক্রীড়নকে যেন পরিণত না হয় ও পরিণতিতে জাহান্নামের ইন্ধন যেন না হয়ে যায়। তাই আহ্বান আসছে,

'হে বনী আদম, শয়তান তোমাদেরকে যেন তেমনিভাবে বিপদে না ফেলে দেয় যেমন করে তোমাদের বাপ মাকে জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলো, এমনভাবে তাদের থেকে তাদের পোশাক খুলে ফেলেছিলো, যাতে তাদের গোপন অংগগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে।'

বারবার এবং বেশী বেশী করে তাদেরকে সতর্ক করা এবং তাদেরকে শয়তানের ব্যাপারে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানাচ্ছেন যে, শয়তান ও তার দলবল তাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না এবং এমন এমন স্থান থেকে মানুষের অবস্থা সে প্রত্যক্ষ করতে পারে যেখানে মানুষ তাদেরকে দেখতে পায় না। এই কারণে তাদের গোপন কারসাজির দ্বারা মানুষকে নানাভাবে বিপদাপন্ন করতে পারে। কাজেই শয়তানের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মানুষকে সদা সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে এবং সর্বদাই চরম জাগ্রত মন নিয়ে শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। হুঁশিয়ার থাকতে হবে যেন তার চক্রান্তের মধ্যে তাকে ফেলতে না পারে।

'নিশ্চয়ই সে ও তার স্বগোত্রীয়রা তোমাদেরকে এমন স্থান থেকে দেখে যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখো না।'

তারপর আর একটা ভীতিজনক ও প্রভাবপূর্ণ কথাও বলা হয়েছে ....

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এটা স্থির করে দিয়েছেন যে, যারা ঈমান আনে না তাদের জন্যে তিনি শয়তানদেরকে বন্ধু বানিয়ে দেবেন'।

আর যে আল্লাহর দুশমন সেই তো হবে তার বন্ধু! আর তখনই সে তার ওপর প্রভাব খাটিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং যে দিকে ইচ্ছা সেদিকেই তাকে পরিচালনা করবে। তখন সে এতোই অসহায় হয়ে যাবে যে, তার জন্যে কোনো দিক থেকে কোনো সাহায্য আসবে না এবং কেউই তার জন্যে সাহায্যকারী হবে না। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্যে কোনো বন্ধু বা অভিভাবকও নিয়োজিত হবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আমি শয়তানদেরকে বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি তাদের জন্যে যারা ঈমান আনে না।'

আর এটাই প্রকৃত সত্য কথা যে, যারা ঈমান আনে না শয়তানরাই তাদের বন্ধু এবং আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের বন্ধু .... এটা একটা ভয়ানক সত্য এবং এর ফলও বড়ই বিপজ্জনক .... এর দ্বারা অবশ্যই হৃদয়গ্রাহী এক উপদেশ পাওয়া যায়; তারপর মোশরেকরাও একে একটা বাস্তব অবস্থা হিসাবে গ্রহণ করে এবং তারা ঈমানদাদের মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা শয়তানের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা শুরু করে দেয় এবং মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনকে কলুষিত করার জন্যে তারা ব্যপকভাবে তৎপর হয়ে ওঠে। নীচে তাদের অপচেষ্টার একটা উদাহরণ পেশ করা হলো,

'আর যখন তারা কোনো লজ্জাকর কাজ করে তখন বলে, আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা এইভাবে ব্যবহার করতে দেখেছি এবং আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালাও এই সব কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।'

আরবের মোশরেক গোত্রগুলো এই সব ব্যবহারই করতো এবং এই ভাবেই কথা বলতো। আর তারা সম্মানিত আল্লাহর ঘরে এইভাবে নির্লজ্জতার সাথে উলংগ হয়ে তওয়াফ করতো। তাদের মধ্যে নারীরাও থাকতো। এরপরও তারা মনে করতো যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এ জঘন্য বেহায়াপনার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরকে তাদের বাপ দাদারা এই সব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে তারা ওই সব অপরাধজনক কাজ করতো। তাদের সন্তানরাও তাদের কাছ থেকে ওই সব শিক্ষাই পেতো এবং ওই একই আচরণ করতো। ওরা শেরকের মধ্যে লিপ্ত থাকার কারণেই এই সব কাজ করতো। তারা বর্তমান বিশ্বের আধুনিক জাহেলিয়াতের নিমজ্জিত মানুষের মতোই এসব আচরণে কোনো লজ্জাবোধ করতো না। এসব আধুনিক জাহেলরা বলে, ধর্ম আবার

কী জিনিস? ধর্ম ও বাস্তব জীবনের মধ্যে কিসের সম্পর্ক? এসব মোশরেক গোত্র মনে করতো, বাস্তব জীবনের বিভিন্ন কাজে কথায় চিন্তায় ব্যবহারে, আইন কানুন ও মূল্যবোধের ব্যাপারে, হিসাব নিকাশ, আচার আচরণ এবং অনুকরণ অনুসরণের ব্যাপারে এক কথায়, বাস্তব জীবনের সকল ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার একমাত্র তাদেরই। এতে আল্লাহর হস্তক্ষেপ করার কিছুই নাই। এসব কথা বলে আসলে তারা নিজেদেরকেই ধোকা দিতো, তারা নিজেদের হাতেই আইন কানুন তৈরী করতো। ওরা নানা প্রকার মিথ্যা তৈরী করে বলতো এবং সেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে বলে জানাতো। তৈরী করতো নিজেদের জীবনের জন্যে মনগড়া আইন কানুন, আর বলতো আল্লাহ তায়ালাই আমাদেরকে এসব (আইন তৈরী) করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই আমরা করেছি। এই নিকৃষ্ট মনোভাবই ছিলো তাদের সকল পদক্ষেপের পরিচালিকাশক্তি। কারণ এসব কথা দ্বারা ওই ব্যক্তিদেরকেই তারা ধোকা দিতো যাদের অন্তরের মধ্যে জাহেলিয়াতের আমলে প্রচলিত ধর্মমতের কিছু না কিছু টান তখনো থেকে গিয়েছিলো। এরই ফলে মাঝে মাঝে তাদের মনে হতো, প্রবর্তিত ব্যবস্থাগুলো হয়তোবা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে, অথচ সর্বাবস্থায়ই একথাটা সত্য যে, এদের সংখ্যা তাদের তুলনায় খুবই নগণ্য, যারা মনে করে, তাদের আইন তৈরীর অধিকার আছে এবং তা মানুষের জন্যে আল্লাহর আইন থেকে অনেক বেশী উপযোগী!

একারণে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর নবীকে এ নির্লজ্জ মিথ্যা খন্ডন করার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছেন, আল্লাহর ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়েছে বলে তারা যে দাবী করে থাকে তাকে প্রতিহত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব দিয়েই তিনি নবীকে পাঠিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কোনো লজ্জাকর কাজের নির্দেশ দেন না, তোমরা কি সেই কথা বলছো যা তোমরা জানো না?'

আল্লাহ তায়ালা কখনো লজ্জাকর কাজের নির্দেশ দেন না, আর লজ্জা হচ্ছে, সেই কাজ যা কোনো কিছু পরওয়া না করে মানুষ করে, অর্থাৎ সীমালংঘনকর যে কোনো কাজই লজ্জাকর কাজ। আর নগ্নতা এই ধরনেরই সীমা লংঘনকর কাজ। সুতরাং এধরনের কাজ কিছুতেই আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করতে পারে না। আর কি করে এটা সম্ভব যে, তাঁর রাজ্য সীমার মধ্যে থেকে সীমা লংঘনের কাজের জন্যে তিনি কাউকে হুকুম দেবেন? আর কেমন করেই বা তিনি সতর, হায়া, শরম ও তাকওয়ার বিরোধিতা করবেন? আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এসব অন্যায় কাজের যে হুকুম দিয়েছেন একথাই বা তাদেরকে কে জানালো? আল্লাহর নির্দেশাবলী ও আইন কানুন জানা বা পাওয়া তো কোনো দাবী করার বিষয় নয়। আর, কোনো বিষয়কে আইন মনে করার কোনো অধিকারও কোনো মানুষের নেই। তবে হাঁ, আল্লাহর কেতাব এবং রসূল (স.)-এর হাদীসের বরাত দিয়ে কোনো বিষয়কে আল্লাহর আইন বলে দাবী করা যায়। সুতরাং, এটা স্থিরীকৃত সত্য যে, আল্লাহর কালামের সত্যিকার জ্ঞান তারই আছে বলে মনে করা যায়, যে আল্লাহ তায়ালার দেয়া জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলে এবং এ জীবন ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করতে চায়। আল্লাহর দ্বীনের নামে তা না হলে মনগড়া যে কোনো কাজ সে করবে তার দ্বারা শুধু বিশৃংখলা ও অশান্তিই সৃষ্টি হবে।

অবশ্যই জাহেলিয়াত এমনই এক অন্ধকার, যা চিরদিন মানুষকে অজ্ঞানতার দিকেই ডাকতে থাকে এবং সুযোগ পেলেই মানুষকে অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে দ্ব্যর্থবোধক কথা বলে এবং মনের মধ্যে সন্দেহ সংশয় জাগাতে থাকে। সকল যামানায় এবং সকল দেশে জাহেলিয়াতের চেহারা মৌলিকভাবে একই। আধুনিক যে জাহেলিয়াতের আঁধারে আমরা বাস করছি, সেখানে নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা সৃষ্টিকারী কোনো ব্যক্তি কোনো নির্জলা মিথ্যা প্রচার করতে এতোটুকু

দ্বিধা-বোধ করে না। তার মনে যা আসে তাই সে বলতে থাকে। তার ঔদ্ধত্য এখানেও তাকে থামতে দেয় না। আরো অগ্রসর হয়ে সে বলে– আল্লাহর আইন! সেটা আবার কী! এই অহংকারী নির্লজ্জ ব্যক্তি আল্লাহর সেই সব বিধি নিষেধ মানতে অস্বীকার করে যা কোরআনে রয়েছে। সে বলে, নিশ্চয়ই দ্বীন-ধর্ম তো অনেক পবিত্র জিনিস! তাতো এমন হতে পারে না। ধর্ম এসব কাজ নিষেধ করতে বলবে কেন এবং এসব ব্যবহার করতেই বা নিষেধ করবে কেন? এসব কথার পেছনে তার একমাত্র যুক্তি হচ্ছে তার নিজস্ব বুদ্ধি ও লাগামহীন ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয়! এই জন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'কেন বলছো এমন কথা যা তোমরা জানো না ?'

এইসব নির্লজ্জ কাজের নির্দেশ আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন বলে তারা যে দাবী করছে একথাটিকে তাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি স্পষ্ট করে তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, বরং এর বিপরীত কথার নির্দেশই তিনি দিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ইনসাফ করতে এবং সকল কাজে মধ্যম পথ অবলম্বন করতে। লজ্জাকর ও সীমা লংঘনকর কাজের নির্দেশ কখনোই তিনি দেননি। তিনি আল্লাহর পথে দৃঢ়তার সাথে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টিকে থাকতে বলছেন। সারা যিন্দেগী ভরে একমাত্র তাঁরই নিরংকুশ আনুগত্য করতে বলছেন। চিন্তা চেতনার দিক দিয়ে আল্লাহমুখী হয়ে থাকার জন্যে তিনি উৎসাহিত করছেন এবং রসূলের মাধ্যমে তাঁর কেতাবের যে কথাগুলো এসেছে সেগুলো পুরোপুরিভাবে পালন করতে বলেছেন। কোনো বিশৃংখলা সৃষ্টি নয়। বিশৃঙ্খলা তো তখনই সৃষ্টি হয় যখন কেউ মনগড়া কথা বলে কথাটাকে আল্লাহর বলে চালাতে চায়, অথচ আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন খাঁটিভাবে ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করতে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁরই আইন কানুন মেনে চলতে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি নিজ স্বার্থে কোনো আইন তৈরী করবে না এবং নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে কোনো মানুষের কাছে মাথাও নত করবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, আমার রব নির্দেশ দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে ইনসাফ করতে, আর তোমরা ....।'

এই হচ্ছে সেই হুকুম যা আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষের জন্যে দিয়েছেন। এ হুকুম নাকচ করে দিচ্ছে, নাকচ করছে তাদের বাপ দাদার অন্ধ আনুগত্যকে এবং তাদেরই মতো মানুষ যে সব আইন কানুন রচনা করেছে সেগুলোকেও। তাদের এ দাবী সত্তেও যে, তারা আল্লাহর হুকুমেই এসব আইন কানুন রচনা করেছে এ হুকুম বলে আল্লাহ তায়ালা সেগুলোকে রদ করে দিচ্ছেন, এ হুকুম নাকচ করছে উলংগতার সভ্যতাকে এবং শরীরের প্রদর্শনীকে। আর আল্লাহ তায়ালা বনী আদমের ওপর এই কথা বলে এহসান প্রদর্শন করছেন যে, তিনি তাদেরকে এমন চমৎকার এক পোশাক দিয়েছেন যা তাদের অংগগুলোকে ঢেকে দেবে এবং তাদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবে, আর তাদেরকে শীত গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে বাঁচাবে। আর যে শেরকের মধ্যে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে তার থেকেও তাদেরকে উদ্ধার করে তাদেরকে দেখিয়ে দেবে জীবনের এবং এবাদাতের সঠিক পন্থা পদ্ধতি।

যেখান থেকে শুরু সেখানেই সমাপ্তি

আলোচনার এই পর্যায়ে এসে তাদেরকে একাধারে উপদেশ ও হুঁশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের কাছে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়টাকে পরিষ্কার করে তোলা হয়েছে, যেহেতু এ দুনিয়ায় কিছুদিনের বসবাস ছিলো তাদের জন্যে একটি পরীক্ষা মাত্র। এখান থেকে ফিরে গিয়ে তারা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটা দল আল্লাহর হুকুম পালনকারী অন্যদল শয়তানের অনুসারী। এরশাদ হচ্ছে,

'যেমন করে তিনি তোমাদেরকে (সৃষ্টি করার কাজ) শুরু করেছিলেন, তেমনি করেই পুনরায় তোমাদের তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এদের এক শ্রেণীকে তিনিই সঠিক পথে চালিত করেছেন

এবং অপর শ্রেণীটার পক্ষে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এভাবেই শয়তানদেরকে বন্ধু রূপে মেনে নিয়েছে, এরপরও তারা মনে করে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত।'

অতি চমৎকার এ আয়াতটি। এর মধ্যে মানুষের সৃষ্টির সূচনা এবং তার পরিসমাপ্তির বার্তা খুবই সুন্দরভাবে একত্রিত করা হয়েছে। একত্রিত করা হয়েছে তার জন্মলগ্ন থেকে নিয়ে সুদীর্ঘ সফর শেষে তার পরিসমাপ্তির অবস্থাকে। তাই আবারও বলা হচ্ছে,

'যেমন করে তিনি তোমাদেরকে (সৃষ্টির কাজ) শুরু করেছিলেন, তেমনি করে তোমরা তাঁর কাছে ফিরে যাবে।'

যখন মহান আল্লাহ তাদেরকে তাদের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে এগিয়ে দিলেন ....তখন তারা ছিলো দুটি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত। একটি দলে আদম ও তাঁর স্ত্রী, অপরটি শয়তান ও তার দলবল। এইভাবে আবার তারা ফিরে যাবে সেই প্রথম রওয়ানা হওয়ার স্থানেই। আল্লাহর অনুগতরা তাদের বাপ আদম ও মা হাওয়ার সাথে আত্মসমর্পণকারী আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং আল্লাহর মান্যকারী হিসাবে ফিরে যাবে। অপরদিকে না-ফরমান মানুষের দল শয়তান ও তার গোষ্ঠীর সাথে পৌঁছে যাবে সেই গন্তব্যস্থানে যেখান থেকে তাদের যাত্রা হয়েছিলো শুরু। এদের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে ভর্তি করবেন। দুনিয়ার জীবনে এরা হলো শয়তানের সাথী এবং শয়তানের বন্ধুত্বও রয়েছে এদেরই সাথে। আর, মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, এরা নিজেদের সম্পর্কে মনে করে যে, এরাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।

যে আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে, তাঁকে পরম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাকে তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। আর যে শয়তানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছে, তাকে তিনি ভুল পথের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে দুই দলে বিভক্ত হয়ে তারা সবাই আল্লাহর দরবারেই প্রত্যাবর্তন করবে। এ দুই দল সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলছেন,

'একটি তো সেই দল– যাকে তিনি হেদায়াত করেছেন এবং অপর দল সেইটা– যার জন্যে ভুল পথে চলা নির্ধারিত হয়ে গেছে, যেহেতু তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানদেরকেই বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছে।'

হাঁ এরাই হচ্ছে না-ফরমানের দল। একটা সময় অবশ্যই আসবে, যখন দুটো দলই এক নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হবে আবার এ দুইয়ের মধ্যে একটা হচ্ছে সেই দল যারা আল কোরআনের (দেখানো) পথে চলেছে। অপরটা হচ্ছে যারা আল কোরআনের পথ ধরতে গিয়ে নানা প্রকার ওযর আপত্তি পেশ করেছে।

সুখ সৌন্দর্যের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগি

এরপর আলোচনার ধারাতে দেখা যায়, মানব জাতির দীর্ঘ পথ পরিক্রমার বর্ণনার মাঝে এখানে তাদেরকে বারবার ডেকে ডেকে বলা হচ্ছে,

'হে আদম সন্তানরা প্রতিটি এবাদাতের সময় তোমরা সৌন্দর্যমণ্ডিত পোষাক পরিধান করো এবং খাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। বলো, ... তিনি নিষেধ করেছেন এমন কথা বলতে যা তোমরা জানো না।' (৩১-৩২)

আকীদার যে মৌলিক বিষয়সমূহের ওপর এখানে আলোকপাত করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, জাহেলিয়াতের আমলে আরবের মোশরেকদেরকে বারবার অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বৃহত্তর

মানবগোষ্ঠীর অবস্থা চিন্তা করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যে সব তথ্য এখানে পেশ করা হয়েছে তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হলে, জীবন ধারণের যে সব পবিত্র সামগ্রীকে ওই মূর্খরা নিজেদের ওপর হারাম করে নিয়েছিলো, সেগুলোকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্যেই উৎপন্ন করেছেন, অথচ এ বিষয়ে মত প্রকাশের বা কোনো বিধান রচনার কোনো অধিকার তাদেরকে দেয়া হয়নি। তাদের এই আচরণের সাথে শেরকের যে এক সূক্ষ্ম সম্পর্ক রয়েছে, তাদেরকে সেই কথাটা জানিয়ে দেয়া আল্লাহ তায়ালা জরুরী মনে করেছেন। কারণ হারাম হালালের বিধান সম্পর্কে আল্লাহর হুকুমের পরওয়া না করে তারা নিজেরাই বিধান তৈরী করে এভাবে তারা সরাসরি শেরকে জড়িয়ে পড়েছে এবং এরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন এমন কথা বলতে থাকে যার কোনো ভিত্তিই নেই। মনে যখন যা আসে তখন তাই বলতে থাকে।

এজন্যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ডাক দিয়ে সেই লেবাস পোশাক গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছেন, যা তিনি নিজেই তাদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর এবাদাত বা যে কোনো আনুষ্ঠানিক হুকুম পালন করার সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করা। এই আয়াত থেকেই জানা যায় জাহেলী যামানায় মোশরেকরা উলংগ হয়ে আল্লাহর ঘর তওয়াফ করতো এবং সেই সব পোশাক পরা হারাম মনে করতো যা আল্লাহ তায়ালা হারাম করেননি। বরং তিনি তো পোশাককে বান্দার জন্যে এক নেয়ামত হিসাবে দান করেছেন। সুতরাং সেই পোশাক পরেই তাঁর এবাদাত করা দরকার, যা তিনি তাদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন। এ সব পোশাক খুলে ফেলে বে-হায়া হয়ে এবং দিগম্বর সেজে তওয়াফ করা আদৌ সুস্থবুদ্ধির মানুষের কাজ হতে পারে না। অথচ তারা জাহেলী যামানায় এটাই করে আসছিলো। এরশাদ হচ্ছে,

'হে আদম সন্তান, প্রতিটি এবাদতের সময় সৌন্দর্য মণ্ডিত পোষাক গ্রহণ করো।'

আর এই একইভাবে আল্লাহ তায়ালা তায়ালা তাদেরকে ভালো পবিত্র খাবার ও পানীয় গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছেন। শুধু মানা করছেন অপচয় করতে। বলছেন,

'আর তোমরা খাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় করোনা। অপচয়কারীদের আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসে না।'

এ কথাও এসেছে যে, আরব দেশে পোশাকের ব্যাপারে তারা মনগড়া কিছু নিয়মনীতি বানিয়ে নিয়েছিলো। হজ্জের সময় কাপড় পরাকে তারা নিজেদের জন্যে হারাম বানিয়ে নিয়েছিলো এমনি করে খাদ্য খাবার সম্পর্কেও এ ধরনের অনেক মনগড়া বিধি নিষেধ তারা তৈরী করে রেখেছিলো।

সহীহ মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে জানা যায়, ওরওয়া তার পিতা থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, হেমসের লোক ছাড়া আরবের লোকেরা উলংগ হয়ে তাওয়াফ করতো। এই হেমস বলা হতো কোরায়শ জাতি এবং তাদের ঔরসজাত সন্তানদেরকে। আরবের লোকেরা সাধারণভাবে উলংগ হয়ে তওয়াফ করতো। তবে যাদেরকে হেমসের লোকেরা পরিধেয় কাপড় দান করতো তারা পরতে পারতো। পুরুষরা দিতো পুরুষদেরকে আর নারীরা নারীদেরকে। সবার মতো এই 'হেমস'-এর লোকেরা মুযদালেফায় আসতো না। তারা আরাফাতের মাঠে হাযির হয়ে বলতো, আমরা 'হারাম'-এর রক্ষণাবেক্ষণকারী। সুতরাং আমাদের পোশাক না পরে কারো হজ্জ কবুল হবে না এবং আমাদের খাদ্য ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে খাদ্য ক্রয় করা কারো জন্যে জায়েয হবে না। এতে বহিরাগত লোকদের অনেক সমস্যা হতো। মক্কায় তাদের কোনো বন্ধু বান্ধব না থাকলে বা পোশাক ভাড়া নেয়ার মতো সচ্ছলতা না থাকলে তাকে দুটি অবস্থার যে কোনো একটি গ্রহণ করতে হতো। হয় তাকে উলংগ হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে

হতো অথবা তার পরিধেয় বস্ত্র পরেই তাওয়াফ করতে হতো। কিন্তু তওয়াফ শেষে সে কাপড় খুলে ফেলে দিতে হতো, যা আর কেউ স্পর্শ করতো না এবং এই পোশাককে বলা হতো 'লুফা'।

কুরতুবী রচিত 'আহকামুল কোরআন' নামক তাফসীরে বলা হয়েছে, 'জাহেলিয়াতের আমলে হজ্জের সময় আরবরা চর্বি বা চর্বিদার কোনো খাদ্য গ্রহণ করতো না এবং তারা খুবই সাধারণ খাদ্য খেতো, আর উলংগ হয়ে কাবা শরীফের তওয়াফ করতো। তারপর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর বাণী উচ্চারিত হলো, প্রতিটি এবাদতের সময় তোমরা সৌন্দর্য মণ্ডিত পোষাক পড়ো এবং খাও পান করো তবে অপচয় করো না।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যা তোমাদের ওপর হারাম করেননি, সেগুলোকে নিজেদের ওপর হারাম করে নিয়ে তোমরা বাড়িবাড়ি করো না। আর 'এসরাফ' অর্থ হচ্ছে সীমা-লংঘন করা। হালালকে হারাম করা এবং হারামকে হালাল করা উভয়টাই সীমা লংঘনের শামিল। যেহেতু এটা এক দিক দিয়ে এবং ওটা আর এক দিক দিয়ে সীমার বাইরে ব্যবহৃত হয়। যে কোনো এবাদাত বন্দেগী বা আনুষ্ঠানিক এবাদাতমূলক কাজেই শুধু সৌন্দর্য গ্রহণ করতে বলা হয়েছে বা শুধু পবিত্র খাদ্য পানীয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, তা নয়, বরং আল্লাহ তায়ালা যে সব সৌন্দর্যের বস্তু তাঁর বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন সেগুলোকে হারাম জানাও সীমা লংঘনের সমান। সুতরাং নিজের ইচ্ছা ও মত অনুযায়ী আল্লাহর পয়দা করা সুখ সৌন্দর্যের কোনো বস্তু এবং উত্তম খাদ্য পানীয় ও অন্যান্য জীবন ধারণ সামগ্রীকে নিজেদের ওপর হারাম করে নেয়া সীমালংঘন করার শামিল। আয়াতের ভাবধারায় পরিস্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কোনো আইন ছাড়া নিজ ইচ্ছামতো হারাম বা হালাল করে নেয়াই সীমা লংঘন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, কে হারাম করেছে, ওইসব সৌন্দর্যমণ্ডিত পোষাক ও পবিত্র খাদ্য খাবার, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন?'

আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত হালাল রেযেককে হারাম করায় এবং হারাম বস্তুকে হালাল করার কারণে ওই না-ফরমানদেরকে তিরস্কার করার পর আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, সৌন্দর্যের বস্তুসমূহ ও ভালো ভালো খাদ্য খাবার পাওয়া মোমেনদেরই হক, কারণ যিনি তাদের জন্যে এসব বস্তু পয়দা করেছেন তাঁর প্রতি এদের অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। তবে, এসব জিনিসের মধ্য থেকে যদি অপরকে সাময়িকভাবে কিছু অংশ দেয়া হয়ও, তাহলেও এটা নিশ্চিত যে, কেয়ামতের দিনে একান্তভাবে মোমেনরাই এসব ভালো জিনিস পাবে। সেখানে কাফেররা এসব থেকে কোনো অংশই পাবে না। দেখুন এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, দুনিয়ার জীবনে এসব জিনিস ঈমানদারদের জন্যেই তো, বিশেষ করে রোয কেয়ামতে এসব বস্তু একান্তভাবে তারাই পাবে।'

কিছুতেই এই না-ফরমানেরা এ সব মর্যাদা পাবে না। তাদের জন্যে এসব নেয়ামত হারাম করে দেয়া হবে। মোমেনদেরকে কেয়ামতের দিন বিশেষভাবে যেসব জিনিস দেয়া হবে কাফেরদের জন্যে তা হবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

'এইভাবে আমি সেই জাতির কাছে এসব কথা বিস্তারিত ভাবে পেশ করছি, যারা জানে।'

আর যারা দ্বীন ইসলামের তাৎপর্য ও সঠিকতা জানে ও বুঝে, তারাই এসব ভাষণ থেকে ফায়দা হাসিল করে।

সমাজপতিরা নিজেদের স্বার্থেই পাপাচারের প্রসার ঘটায়

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা মধ্যম ধরনের ও ভারসাম্যপূর্ণ কোনো পোশাককে হারাম করেননি, কোনো ভালো খাদ্য খাবার বা পানীয় যা তাদের মন মেজায ও শরীরের জন্যে উপকারী এগুলোকে আল্লাহ তায়ালা হারাম করেননি। তিনি অপচয় করতে নিষেধ করেছেন এবং নিষেধ

করেছেন ওইসব মনগড়া কাজ ও আচরণ নিবদ্ধ করেছেন যা মানুষের জন্যে ক্ষতিকর! এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, নিশ্চয়ই আমার রব প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল ফাহেশা কাজকে হারাম করেছেন। আরও হারাম করেছেন পাপ ও অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাত্মক কাজকে, তিনি আরো হারাম করেছেন আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা, যার ব্যাপারে আল্লাহ তয়ালা কোনো সনদ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন কোনো কথা বলা, যার ব্যাপারে তোমাদের কোনোই জ্ঞান নেই।

এখানে খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে আরব জাহেলিয়াতের সময় মোশরেকদের মোকাবেলা করার জন্যে তাদের আকীদা সম্পর্কে মৌলিক যে সব তথ্য দেয়া হয়েছে, সেগুলোকে বারবার গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা পেশ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির প্রতি আহবান আকারে এবং বৃহত্তর মানব সমাজের ঘটনাবলী তুলে ধরে।

আল্লাহ তায়ালা তো এই বিষয়টাকেই হারাম করেছেন, অর্থাৎ লজ্জাকর সকল প্রকার কাজ, যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সীমা লংঘিত হয়, তা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য। ইচ্ছাকৃত কোনো অপরাধকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অপরাধের সংক্ষিপ্ত অর্থ হচ্ছে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা এবং অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করা। এটি এমন এক যুলুম যা সত্য ও ন্যায় নীতির পরিপন্থী। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা নিজেই এই অপরাধের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সব থেকে বড় গুনাহের কাজ হচ্ছে শেরক করা, যে ব্যাপারে কারো কাছে কোনো যুক্তি প্রমাণ নেই, অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলী, শক্তি-ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যসমূহের অনুরূপ কোনো বৈশিষ্ট্য কোনো সৃষ্ট জীবের নাই। এসব শেরক অতীতে জাহেলী যুগে ছিলো, এখনও বাস্তবে আছে, আর তা হচ্ছে, আইন রচনা করার অধিকার– এটা তো বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, রাজ্য যার আইন তার। যিনি সর্বজ্ঞ, চিরন্তন এবং যিনি সকল মানুষের অবস্থা এক সাথে দেখেন এবং যার দৃষ্টিতে সবাই সমান, একমাত্র তিনিই সকল যুগের সকল মানুষের জন্যে বিধান দিতে পারেন। সীমাবদ্ধ বয়সের মানুষ, এক সাথে যে বেশী কিছু দেখতে-বুঝতে পারে না এবং যে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধে উঠতে পারে না, সে কি করে সকল মানুষের জন্যে কোন আইন উপযোগী তা বুঝবে? অতএব এ ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা। কাজেই এব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র ক্ষমতা আছে বলে স্বীকার করাই মারাত্মক শেরক এবং সব থেকে বড় যুলুম। তাই বলা হয়েছে, হে অর্বাচীন মানুষ, কেন বল এমন কথা বলো যা তোমরা জানো না? হালাল-হারাম বিধান যারা দিতে চায়, তারা তো এই শেরকটাই করে। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নাই। স্থির বিশ্বাসও নাই।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সর্ব প্রথম যখন মোশরেকদের কাছে এই আয়াতটি এলো, তখন তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে গেলো। কারণ আল্লাহর ক্রোধব্যঞ্জক একথাটা– 'বলো, কে হারাম করেছে আল্লাহর সৃষ্টি সৌন্দর্যপূর্ণ বস্তুগুলোকে এবং ভালো ভালো খাদ্য-খাবার ও জীবন ধারণের যাবতীয় সামগ্রীকে, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যেই (পৃথিবীর মধ্য থেকে) বের করেছেন?– এ আয়াত তাদের বিবেককে নাড়িয়ে তুললো। কালবী নামক প্রখ্যাত আলেম এ বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন,

যখন মুসলমানরা কাপড় পরে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলো– এ দৃশ্য তাদেরকে অত্যন্ত লজ্জিত করে তুললো। তারপর এ আয়াতটি নাযিল হলো।

এখন চিন্তা করে দেখুন জাহেলী যামানার সভ্যতা তৎকালীন মানুষের সাথে কী জঘন্য ও ন্যাক্কারজনক ব্যবহারটাই করেছে। কী ধিক্কারজনক ছিলো এ দৃশ্য! মানুষ আল্লাহর ঘরে উলংগ হয়ে

তাওয়াফ করে, বিপর্যস্ত হয়ে গেছে তাদের বিবেক ও মানব প্রকৃতি, কিন্তু সামাজিক রীতিনীতির চাপে তাদের বিবেকের আবেদনকে তারা উপেক্ষা করে সঠিক পথ থেকে সরে গেছে। বাবা আদম ও মা হাওয়ার জান্নাতে থাকাবস্থায় কী ঘটেছিলো তা থেকেও আমরা এ ব্যাপারে পরিস্কার ধারনা পাই। বলা হচ্ছে, যখন ওই দুজন মানুষ উক্ত গাছ থেকে কিছু খেলেন, তখন তাদের সামনে তাদের সতর খুলে গেলো, লজ্জাস্থানগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের পাতাপুতি দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করলেন। তারপর ওরা মুসলমানদেরকে সেই সুন্দর সুন্দর কাপড় চোপড় পরে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে দেখলো, যা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর নেয়ামতস্বরূপ দান করেছেন। তিনি চেয়েছেন সতর ঢাকার মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করতে। আরো চেয়েছেন মানুষের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত স্বাভাবিক শান্তি ও সৌন্দর্য ফুটে উঠুক, তার বৈশিষ্ট্যগুলোর আরো উন্নতি হোক এবং সে ল্যাংটা জীব জানোয়ার থেকে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে সে যে কতো উন্নত তা প্রমাণিত হয়ে যাক। তাই ওই মূর্খ নাদান লোকরা যখন আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সৌন্দর্যসহকারে মুসলমানদেরকে বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করতে দেখলো, তখন তারা ভীষণ লজ্জিত হয়ে গেলো।

এইভাবে জাহেলিয়াতের রীতি নীতি মানুষের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করেছে, মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে তাদের প্রকৃতিপ্রদত্ত রুচিশৈলীকে এবং অপমান করেছে তাদের সৌন্দর্যবোধ, চিন্তাধারা ও মূল্যবোধকে, লাঞ্ছিত করেছে তাদের ভালো মন্দ যাচাইয়ের বিবেককে! আর দেখুন আধুনিক জাহেলিয়াত মানুষের সাথে সেই পোশাকের ব্যাপারে কী ব্যবহার করছে? আরবের মোশরেকদের মধ্যে যে জাহেলিয়াত ছিলো তাদের তুলনায় কী আজকের জাহেলদের অবস্থা কি একটুও ভালো? রোমানরা, ফরাসীরা আজ কী করছে? প্রাচীন জাহেলিয়াতের চেয়ে এদের অবস্থা কি কোনো অংশে ভালো? উপায় উপকরণ ধরণ প্রকৃতি পরিবর্তন হলেও মৌলিকভাবে এরা সবাই সেই একই জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে গেছে।

আজ জাহেল সমাজ ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে, তাদেরকে লেবাস পোশাকের ঝামেলা থেকে মুক্ত করে দিগম্বর হওয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছে! বরং আরো বড় সত্য কথা হচ্ছে তাদেরকে আল্লাহভীতি থেকে মুক্ত করে লজ্জাহীনতার সাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছে। তথাকথিত প্রগতিবাদীরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে চলেছে। তারপর তারা রুচিশীলা স্বাধীন বিবেকের অধিকারিণী নেক চরিত্র মুসলমান মহিলাদেরকে একথা বলে লজ্জা ও ধিক্কার দিচ্ছে যে, তারা সেকেলে, প্রগতি বিরোধী ও ধর্মান্ধ।

ইহুদী নাসারা ও নাস্তিকরা এমনভাবে এই প্রগতিবাদীদের মস্তিষ্ক ধোলাই করেছে যে, তারা তাদের স্বাভাবিক রুচিশীলতা হারিয়ে ফেলে জীবনের সঠিক মূল্যায়ন করতে ভুলে যাচ্ছে। এরপর অহংকারে তাদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, তারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যাচ্ছে। তারা অপরের মধ্যেও এই অহংকারের বীজ রোপণ করছে– এইভাবেই প্রকৃতপক্ষে তারা এক বিদ্রোহী দলে পরিণত হয়েছে।

তাহলে হিসাব করে দেখুন এবং বলুন নগ্নতা ও পোশাক পরিধানের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পশুত্ব, অহংকার, শেরক, আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মানা– যারা তাদের জন্যে আইন বানায় এবং এক আল্লাহকে মানার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

জাহেলী যুগের মোশরেক ক্ষমতাসীনরা নিজেদেরকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্যে এবং পার্থিব সুযোগ সুবিধা লাভের জন্যে সাধারণ মানুষকে ভেড়া বানিয়ে রেখে ছিলো এবং তাদের

বিবেক বুদ্ধির বিকাশ ও ব্যবহার হতে না দিয়ে তাদেরকে মূর্খ বানিয়ে রেখেছিলো, উলংগ হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, ঠিক একইভাবে আজকের কায়েমী স্বার্থবাদীরাও তাদের প্রাধান্য টিকিয়ে রাখতে উলংগতার দিকে, পশুত্বের দিকে এবং বিবেকহীনতার দিকে মানুষকে এগিয়ে দেবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই।

খোজ নিয়ে দেখেন, এই সমাজপতিরাই এসব পতিতালয়, ক্লাব, নাইট ক্লাব, মদের বার, জুয়ার ক্লাব সহ সকল পাপাচারের কেন্দ্রগুলোর মালিক ও পরিচালক। তারা এসব চরিত্র হননকারী কর্মকান্ডের পেছনে লুকিয়ে থেকে এমনভাবে মানুষকে বিলাসিতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখে যে, তারা জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে এসব পাপাচারের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে দেয়। সমাজের এসব পাপিষ্ঠ নেতারাই বিভিন্নভাবে পাপ ছড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনকে সর্বপ্রকার কলুষতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ওইসব পাপ কাজের পরিচালকরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে নারী-পুরুষদেরকে মদ-জুয়ার আড্ডাখানায় একত্রিত করে বিবস্ত্র হতে উদ্বুদ্ধ করছে ও সর্বপ্রকর পাপ কাজ করতে বাধ্য করছে, সভ্যতা ও কৃষ্টির নামে তারা আজ নামিয়ে দিচ্ছে মানুষকে পশুর স্তরে। সৌন্দর্য বিকাশের দোহাই দিয়ে অবলীলাক্রমে চলেছে তাদের এই রমরমা ব্যবসা। যারা এর থেকে দূরে থাকতে চাইছে তাদেরকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, তারা সেকেলে, গোঁড়া, ধর্মান্ধ, মৌলবাদী ইত্যাদি। এসব কাজে সত্যিকারে তাদের কোনো উপকার আছে কি না আছে তা চিন্তা করার মতো অবসর তাদের নাই। এমন মাদকতায় তারা মত্ত হয়ে গেছে যে, কোন রসাতলের দিকে তারা এগিয়ে চলেছে তার কোনো খবরই তাদের নাই। তথাকথিত সমাজসেবীদের মায়া কান্নায় ভ্রান্ত মানবতা আজ অসহায় অবস্থায় তাদের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

হে দিশেহারা মানবজাতি, একবার ভেবে দেখো! এইভাবে মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানকে বিলুপ্ত করে তাদেরকে কে বা কারা এমন করে ভাবের আবেগে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে, কে তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মদের বারের দিকে, ওইসব সৌন্দর্য বিপনীতি, ওইসব নগ্ন সরাইখানাতে? কে কাজ করে যাচ্ছে এই চিত্র জগতের আড়ালে, সয়লাব করে দিচ্ছে গোটা সমাজকে নগ্ন ছবি, অশ্লীল পত্র পত্রিকা, বিকৃত রুচির সাহিত্য ও সংস্কৃতির বইপত্র দ্বারা। কে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এই সভ্যতা ও কৃষ্টি প্রসারের জন্যে চীৎকার করে চলেছে? নিসন্দেহে সারা বিশ্ব জুড়ে এই আনন্দ ফুর্তির রমরমা ব্যবসায়ের নেপথ্যে নিরন্তর অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে চরম নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন অভিশপ্ত ইহুদী-জাতি।

এই ইহুদী জাতি পশু স্বভাব ধারণ ও পাশববৃত্তির পরিচালনার সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সর্বত্র এবং সবার মধ্যে যৌনতা, কুপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য, তাদের লক্ষ্য গোটা পৃথিবীকে বিলাস দ্রব্যের বাজারে পরিণত করা। এজন্যে প্রয়োজন যৌন আবেগকে উস্কিয়ে তোলা, প্রয়োজন প্রচার অভিযান চালিয়ে মানুষের চরিত্রের বুনিয়াদকে ধ্বংস করে দেয়া। আর এই লক্ষ্যেই তারা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা অবৈধভাবে টাকার পাহাড় বানাতে চায়। এজন্যে মানুষকে তারা উদ্বুদ্ধ করছে অপচয় করতে, পোশাক আশাক ও বিলাস দ্রব্যের যথেচ্ছা ব্যবহার করাতে এবং সুখ-সৌন্দর্যের নানা প্রকার বস্তু ও বিভিন্ন শিল্পজাত ও বিলাসবহুল খাদ্য খাবার ও ব্যবহার্য নানাবিধ সামগ্রীকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে।

পোশাক ও সৌন্দর্যের উপকরণকে ইসলাম যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে বা জীবনের জন্যে এগুলোকে অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেছে এমন নয়। ইসলাম শিক্ষা দেয় ঈমানের সাথে

সংগতি রেখে এগুলোকে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে, অপচয় করতে নয়। যে কাজ, কথা, চিন্তা ব্যবহারে মানুষ শেরকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাবে আল্লাহর বিধান সেখানেই মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

বিভিন্নভাবে মানুষের জীবন পরিচালিত হয় আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং তাঁর বিধান দ্বারা। মানব জীবনের সবকিছুর ওপর প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্বের সাথে তাঁকে মনিব ও বাদশাহ মানার ওপরেই তার জীবনের গতিধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই দেখা যায় জীবনের সকল কিছুর ব্যাপারেই আল্লাহ জাল্লা শানুহুর বিধান বর্তমান রয়েছে। আল্লাহর কালাম মানুষের জীবনের সব কিছুকে পরিচালনা করছে। মানব জীবনের জন্যে যা যা প্রয়োজন– ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, সম্পর্ক-সম্বন্ধ, মোট কথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগের ওপর আল কোরআন গভীর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে।

এ সকল ব্যবস্থা অনুসরণের শর্তসাপেক্ষেই মুসলমানদেরকে গোটা মানবমন্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানো হয়েছে। এই কোরআনের কথা পালন করতে গিয়েই তারা সরে রয়েছে পশুত্বের স্বভাব-প্রকৃতি ও অভ্যাসসমূহ থেকে অনেক অনেক দূরে। তারা জীবনের কোনো পর্যায়েই কু-প্রবৃত্তির দাসত্ব করে না, বরং সকল কিছুর ব্যাপারে নিজেদেরকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সোপর্দ করে।

জাহেলিয়াত বা ও অজ্ঞানতা এমন এক ব্যাধি যা মানুষের চেতনাকেই বিগড়ে দেয়, চিন্তাধারাকে সঠিক পথে প্রবাহিত হতে দেয় না। রুচিবোধকে নষ্ট করে দেয়, জীবনকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার পথে নানা প্রকার বাধা সৃষ্টি করে মানব চরিত্রের বুনিয়াদকে ধ্বংস করে দেয়, মানুষকে পশুর মতো বানিয়ে দেয়, নিজেদের পারস্পরিক গোপনীয়তাকে প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে, মানবতাবোধে কাজ করতে বাধা দেয়, আর এর কারণেই মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় এবং তার মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।

এরপর আমাদের সমাজের জাহেলরা বলে, দ্বীন-ধর্মের সাথে বিলাসিতাপূর্ণ পোশাকের আবার কিসের সম্পর্ক? ধর্মের সাথে নারীদের পোশাকেরই বা কিসের সম্পর্ক? ধর্মের সাথে নগ্ন সৌন্দর্য-চর্চারই বা বিরোধ কোথায়? জাহেলিয়াতের বিষাক্ত ছোবলে মানুষের বুদ্ধি ও বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণেই নেমে আসে নানা প্রকার বিড়ম্বনা, বিপদ ও বিপর্যয়!!

আর যদিও (পোশাকের) এ সমস্যাটা সাধারণ দৃষ্টিতে একটা গৌণ সমস্যা বা তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে হয় কিন্তু ইসলামের নিক্তিতে এর গুরুত্ব অনেক। কেননা বিষয়টি ঈমান ও শেরকের সাথে সম্পৃক্ত এবং মানুষের স্বভাব চরিত্রের সংশোধন ও সামাজিক জীবনের শান্তির সাথেও এর গভীর সংযোগ বিদ্যমান। এর সঠিক ব্যবহারের অভাবেই মানব জীবনে নেমে আসে নানা প্রকার বিশৃংখলা ও অশান্তি। এজন্যেই এখানকার আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিষয়টাকে পেশ করা হয়েছে। বড় যে সব বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে প্রকৃতিগতভাবে এ বিষয়টা সেগুলোর অন্যতম।

এর পর মানবজাতিকে জানানো হচ্ছে যে, পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা বেঁচে থাকবে এবং তা পূর্বেই স্থির করা রয়েছে। সুনির্দিষ্ট ওই সময়টা পার হয়ে গেলেই তাদের বিদায়ের পালা আসবে। সেই মুহূর্তটা যখন এসে যাবে, তখন তারা একটুও দেরী করতে পারবে না, একমুহূর্ত আগেও আসতে পারবেনা। এরশাদ হচ্ছে,

'প্রত্যেক জাতির বেঁচে থাকার জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যখনই নির্দিষ্ট ওই সময়টা এসে যাবে, তখনই তাদেরকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং এক মুহূর্ত আগেও নয়– পরেও নয়।'

এ হচ্ছে মানুষের আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে মৌলিক সত্য, যা বে-খেয়াল ও অপরিণামদর্শী মানুষের হৃদয়েও প্রচন্ড সাড়া জাগায়, সাড়া জাড়ায় সেই মানুষের মনে যারা আল্লাহকে স্মরণ করে না বা তাঁর নেয়ামতের কোনো শোকরিয়াও আদায় করে না। মৃত্যুর বার্তা বারবার যখন হৃদয়কে কাঁপিয়ে তোলে, তখন জীবনের মোহ আর তাদেরকে ধোকা দিতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সে সময়টা আসার সাথে সাথেই তাদেরকে ভূপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিতে হয়। এসময়ের সদ্ব্যবহার করে কোনো জাতি পরবর্তীদের কাছে সুনাম সুখ্যাতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো জনপদ এমনও আছে, যারা সময়ের সদ্ব্যবহার না করার কারণে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কেউ তাদেরকে মনে করে না, আর করলেও করে অত্যন্ত ঘৃনাভাবে। পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার এ সময়টা সবার জন্যেই নির্দিষ্ট। কাজেই নির্দিষ্ট দিন ক্ষণ এসে গেলে এক মুহূর্ত কেউ দেরীও করতে পারবে না বা আগেও যাবে না।

সেকাল ও একালের জাহেলিয়াত

এ প্রসংগের আলোচনা শেষ করার পূর্বে আমরা সূরায় আনয়াম-এ বর্ণিত, জাহেলী যামানায় পশু জবাই করা, মানত করা এবং কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম বানিয়ে নেয়ার যে রীতি চালু ছিলো, তার সাথে বর্তমান জাহেলী যুগের চালচিত্রের তুলনামূলক কিছু আলোচনা করতে চাই।

প্রথমেই দেখা যাক, বর্তমান জগতে পশু যবাই করার ও জীবজন্তু ও ফলমূল মানত করার কি কি প্রথা চালু আছে। অতীতেই বা কি ছিলো এবং বর্তমানের জাহেলিয়াতের মধ্যে অতীতের জাহেলী প্রথার কোনো অনুসরণ করা হচ্ছে কি না অথবা আল্লাহর আইনকে এড়িয়ে চলার জন্যে, তথাকথিত প্রগতিবাদীরা মনগড়া কিছু কথা বানিয়ে নিয়ে একথা বলছে কিনা যে, আমরা যা কিছু হারাম করেছি আল্লাহ তায়ালাও তাই হারাম করেছেন আর আমরা যেগুলো হালাল মনে করি আল্লাহ তায়ালাও তো সেইগুলোকে হালাল করেছেন। এই মনোভাবের জবাবে বলা হচ্ছে,

'তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এসব নির্দেশ দিচ্ছিলেন?'

তাহলে ভেবে দেখুন ওই ব্যক্তি থেকে যালেম আর কে হতে পারে, যে না জেনে-শুনে এবং মানুষকে ভুল পথে চালানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে? নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা যালেম জাতিকে হেদায়াত করেন না। এরপর আল্লাহর মেহেরবানীতে আজ তাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হচ্ছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শেরকবাদীদের কর্তৃত্বও ইনশাআল্লাহ শেষ হয়ে যাবে। একদিন অবশ্যই তারা বাধ্য হবে আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা মেনে নিতে, যখন তিনি যার মাধ্যমে ইচ্ছা করেন তাদের দ্বারাতেই তাঁর হুকুম আহকাম চালু করেন।

'শীঘ্রই যারা শেরক করছিলো, তারা বলে উঠবে আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই শেরক করতাম না, আমাদের বাপ দাদারাও শেরক করতো না এবং আমরা কোনো কিছু হারামও করতাম না। এসব কথা বলে পূর্ববর্তীরাও এভাবে সত্যকে এড়িয়ে গেছে এবং সত্যের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যার ফলে তাদেরকে আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে। বলো, তোমাদের কাছে কোনো নিশ্চিত জ্ঞান আছে কি? থাকলে আমাদেরকে তা শোনাও। আসলে

তোমরা নিছক ধারণা-কল্পনারই অনুসরণ করে চলেছ, বরং আসল সত্য কথা হচ্ছে এই যে, তোমরা মনগড়া কথারই জাল বুনে চলেছো। বলো (হে রসূল) পরিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তি-প্রমাণ তো একমাত্র আল্লাহর হাতেই রয়েছে। এমতাবস্থায় চাইলে একমাত্র তিনিই হেদায়াত করতে পারেন। সরল সঠিক পথে পরিচালনা করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে রয়েছে। যদি তিনি চাইতেন, তাহলে সকল মানুষকেই তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করতেন। বলো, নিয়ে এসো তোমাদের সেই সাক্ষীদেরকে-যারা বলছে যে, আল্লাহ তায়ালা এগুলো হারাম করে দিয়েছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবু তুমি তাদের সাথে মিলে এই ভুল সাক্ষ্য দিয়ো না, আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানকারী ওইসব মিথ্যাবাদীদের খাম-খেয়ালীর অনুসরণ করো না– অনুরসণ করো না তাদের, যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না এবং তাদের রবের সাথে অন্য-কাউকে সমকক্ষ জ্ঞান করে।'.........

অবশেষে যখন আল্লাহ তায়ালা সেই মিথ্যা প্রচারকে থামিয়ে দিলেন, যার দিকে ওরা ডাকছিলো এবং নানা প্রকার বানোয়াট মিথ্যার প্রচার করে চলেছিলো, তখন তাদেরকে বললেন, যে সব জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন এসো তার তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেই এবং জানিয়ে দেই আল্লাহর হালাল করা দ্রব্যাদির রহস্য যা একমাত্র সেই সঠিক উৎস থেকে এসেছে যা পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য এবং যা অন্য কারো কাছ থেকেই গ্রহণ করা যায় না।

'বলো, এসো, আমি তোমাদেরকে সেই কথাগুলো পড়ে শোনাই যা তোমাদের রব তোমাদের ওপর হারাম করেছেন। তা হচ্ছে, তাঁর সাথে কাউকে (কোনো কিছুকে) শরীক করো না.......শেষ পর্যন্ত।

আর এখানে আলোচনার ধারাতে এবং আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে উলংগপনা ও শেরকের কদর্যতাকেই এখানে প্রধানত তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, লেবাস- পোশাক ও খাদ্য-খাবারকে হালাল বা হারাম করার এখতিয়ার মানুষ অন্যায়ভাবে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এরপর, তাদের নির্লজ্জ অবস্থায় শেরকের মধ্যে ডুবে থাকার কারণে যে কঠিন শাস্তি পেতে হবে সে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে। এ প্রসংগে বলা হয়েছে তাদের বাপ-মা শয়তানের ধোকায় পড়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলেন, ফলে পোশাক উড়ে যাওয়ার কারণে কী নিদারুণ মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে তারা পড়ে গিয়েছিলেন। এ প্রসংগে আরও জানানো হয়েছে পোশাক ছিলো তাদের জন্যে একাধারে সতর ঢাকা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপায়। তারপর মানুষের এই আচরণের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে যে, একে তো পোশাকে ও খাদ্য পানীয় বস্তুকে অন্যায়ভাবে তারা হালাল হারাম বানিয়ে নিয়েছে, তার ওপর এগুলোকে তারা আল্লাহর বিধান বলে প্রচার করেছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'বলো কে হারাম করেছে আল্লাহর সৌন্দর্যের বস্তুগুলোকে, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে পয়দা করেছেন। আর কেইবা হারাম করেছে ভালো ভালো খাদ্য-খাবার? বলো, এগুলো তো দুনিয়ার জীবনে ঈমানদারদের জন্যে, বিশেষ ভাবে কেয়ামতের দিন এগুলো তাদের জন্যেই নির্দিষ্ট। এমনি করে আমি বিস্তারিতভাবে আয়াতগুলো বর্ণনা করছি সেই জাতির জন্যে, যারা জানে।'

ইংগিতে এখানে নিশ্চিত জ্ঞানের কথারই উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো ধারণা কল্পনা বা মনগড়া কোনো কথা নয়, যার ওপর তাদের জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে, গড়ে উঠতে পারে

তাদের পরিচয়, তাদের প্রতীকী এবাদাতসমূহ এবং তাদের বাস্তব জীবনের আইন কানুন। অবশেষে তাদের সেই দাবীকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হলো যাকে তারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছিলো।

'বলো, অবশ্যই আমার রব প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার লজ্জাকর কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, অপরাধজনক ও নাহক যে সব বিদ্রোহাত্মক কাজ রয়েছে, তাও নিষিদ্ধ করেছেন এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক ঠাওরাতেও হারাম করেছেন। কারণ এ বিষয়ে কোনো যুক্তি প্রমাণ তিনি পাঠাননি। আরও মানা করেছেন আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন কথা বলতে যা তোমরা জানো না।'..........

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা চূড়ান্ত ভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন সেই সব জিনিসের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতে, যাদের নিজেদের কোনো ক্ষমতা নাই বলে ওরা জানে। তবু তারা মনে করে ওদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে পৌঁছানো যাবে। 'বলো আমার রব সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন (আরও বলেছেন) এবাদতের সময় সৌন্দর্য মণ্ডিত পোষাক পরিধান করো, পানাহার করো কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। (২৯ আয়াত)

উভয় স্থানেই বিষয়টা ঈমান ও শেরকের সাথে সম্পর্কিত। কারণ এর মূলে রয়েছে শাসন ও কর্তৃত্বের প্রশ্ন। আর এই প্রশ্নটা নিয়েই তো মানুষের জীবনে যতো প্রকার ঝগড়া ফাসাদ এবং মানুষের গোলামী করানোর জন্যে চেষ্টা সাধনা!

মানুষ অন্যের গোলামী পেতে চায়, এজন্যে সে নানা প্রকার পথ ও পদ্ধতি রচনা করে, এ বিষয়ে তার সকল পদক্ষেপের মূলে রয়েছে এই একই উদ্দেশ্য ....মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন (যে, দুনিয়ার যতো সমস্যা আছে সব কিছুর মূলে রয়েছে এই মানুষের দ্বারা মানুষের গোলামী করানোর সমস্যা।) তাই এরশাদ হচ্ছে,

'কোরআন সম্পর্কে কি তারা চিন্তা করে না? যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে থেকে এ গ্রন্থ নাযিল হতো, তাহলে তারা এর মধ্যে বহু স্ববিরোধী কথাবার্তা পেতো।' (সূরা আন নেসা ৮২)

দেখুন, আল কোরআন একমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবন পদ্ধতিরই গুরুত্ব প্রকাশ করছে এবং এ কেতাবের তাৎপর্য বাড়িয়ে দিয়েছে, বিশেষত যখন আমরা সূরায়ে আনয়াম ও সূরায়ে আ'রাফের মধ্যে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করি তখন দেখতে পাই বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার মধ্যে আকীদার বিষয়টাই বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। এ দুটো সূরায় যে সব আলোচনা এসেছে, সেগুলো জাহেলিয়াতের মোকাবেলায় দ্বীন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে, বিভিন্ন প্রসংগের আলোচনা থাকা সত্ত্বেও মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ইসলামী আকীদার মূল কথাগুলো সব কিছুর মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

يَبَنِيٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ لا فَمَنِ اتَّقٰى

وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ اَظْلَمُ

مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ

مِّنَ الْكِتٰبِ ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ لا قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ

كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾ قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ

وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ط كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ط حَتّٰٓى اِذَا

ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا لا قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ

৩৫. হে আদম সন্তানরা (শুরুতেই আমি তোমাদের বলেছিলাম), যখনি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে রসূলরা আসবে, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনাবে, তখন যারা (সে অনুযায়ী) আমাকে ভয় করবে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না, তারা কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। ৩৬. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং বড়াই করে এ (সত্য) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। ৩৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে? এরা হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যারা কেতাবে (বর্ণিত দুর্ভাগ্য থেকে) তাদের নিজেদের অংশ পেতে থাকবে; এমনিভাবে (তাদের মৃত্যুর সময়) তাদের কাছে আমার ফেরেশতারা যখন এসে হাযির হবে, তখন তারা বলবে (বলো), তারা (এখন) কোথায় যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার বদলে ডাকতে; তারা বলবে– আজ সবাই (আমাদের ছেড়ে) সরে গেছে, তারা (সেদিন) সবাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা সত্যিই কাফের ছিলো। ৩৮. আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তোমাদের আগে যেসব মানুষের দল, জ্বিনের দল গত হয়ে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও আজ সবাই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করো; এমনি করে যখন এক একটি জনগোষ্ঠী (জাহান্নামে) দাখিল হতে থাকবে, তখন তারা তাদের (আদর্শগত ভাই) বোনদের ওপর লানত দিতে থাকবে, এভাবে (লানত দিতে দিতে) যখন সবাই সেখানে গিয়ে একত্র হবে, তখন তাদের শেষের দলটি পূর্ববর্তী দলের ব্যাপারে বলবে, হে আমাদের মালিক, এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা আমাদের গোমরাহ

عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ أُولٰهُمْ لِأُخْرٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۫ أُولٰئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ

করেছিলো, তুমি এদের জাহান্নামের শাস্তি দ্বিগুণ করে দাও; আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (আজ) তোমাদের প্রত্যেকের (শাস্তি) হবে দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা তো বিষয়টি জানোই না। ৩৯. তাদের প্রথম দলটি তাদের শেষের দলটিকে বলবে, (হাঁ, আমরা যদি অপরাধী হয়েই থাকি, তবে) তোমাদেরও আমাদের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো না (এ সময়ই আল্লাহর ঘোষণা আসবে), এখন তোমরা সবাই নিজ নিজ কর্মফলের বিনিময়ে (জাহান্নামের) আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো।

রুকু ৫

৪০. অবশ্যই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং দম্ভভরে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্যে কখনো (রহমতভরা) আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত একটি সুঁচের ছিদ্রপথ দিয়ে একটি উট প্রবেশ করতে না পারবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; আমি এভাবেই অপরাধীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি। ৪১. (সেদিন) তাদের জন্যে (নীচের) বিছানাও হবে জাহান্নামের, (আবার এই জাহান্নামই হবে) তাদের ওপরের আচ্ছাদন, এভাবেই আমি যালেমদের প্রতিফল দিয়ে থাকি। ৪২. (অপরদিকে) যারা (আমার ওপর) ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি (তাদের) কারো ওপর তাদের সাধ্যের বাইরে দায়িত্বভার অর্পণ করি না, এ (নেক) লোকেরাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। ৪৩. তাদের মনের ভেতর (পরস্পরের বিরুদ্ধে) যে ঘৃণা-বিদ্বেষ (লুকিয়ে) ছিলো তা আমি (সেদিন) বের করে ফেলে দেবো, তাদের (জন্যে নির্দিষ্ট জান্নাতের) পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, (এসব দেখে) তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আমাদের এ

الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا ۣ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَنُوْدُوْۤا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ۝ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّاۢ بِسِيْمٰىهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۣ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ۝ وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(পুরস্কারের স্থান)-টি দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের (হেদায়াতের) পথ না দেখালে আমরা নিজেরা কিছুতেই হেদায়াত পেতাম না, আমাদের মালিকের রসূলরা এক সত্য বিধান নিয়ে এসেছিলো। (এ সময়) তাদের জন্যে ঘোষণা দেয়া হবে, আজ তোমাদের সে (জান্নাতের) উত্তরাধিকারী করে দেয়া হলো, (আর এটা হচ্ছে সেসব কার্যক্রমের প্রতিফল) যা তোমরা দুনিয়ার জীবনে করে এসেছো। ৪৪. (এরপর) জান্নাতের অধিবাসীরা জাহান্নামী লোকদের ডেকে বলবে, আমরা তো আমাদের মালিকের (জান্নাত সংক্রান্ত) ওয়াদা সত্য পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের মালিকের ওয়াদাসমূহ সঠিক পাওনি? তারা বলবে, হাঁ, অতপর তাদের মাঝে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, যালেমদের ওপর আল্লাহ তায়ালার লানত হোক, ৪৫. যারা মানুষদের আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিরত রাখতে চাইতো এবং তাকে শুধু বাঁকা করতে চাইতো, আর তারা শেষ বিচারের দিনকেও অস্বীকার করতো। ৪৬. (জান্নাত ও জাহান্নাম,) তাদের উভয়ের মাঝে একটি দেয়াল থাকবে, (এই দেয়ালের) উঁচু স্থানের ওপর থাকবে (আরেক দলের) কিছু লোক, যারা (সেখানে আনীত) প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের নিজ নিজ চিহ্ন অনুযায়ী চিনতে পারবে, তারা জান্নাতের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এরা (যদিও) তখন পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু (প্রতি মুহূর্তে) এরা সেখানে প্রবেশ করার আগ্রহ পোষণ করছে। ৪৭. অতপর যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামের অধিবাসীদের (আযাবের) দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, (তখন) তারা বলবে, হে আমাদের মালিক, (তুমি) আমাদের এ যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ

রুকু ৬

৪৮. অতপর (পার্থক্য নির্ণয়কারী সে দেয়ালের) উঁচু স্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তিরা (জাহান্নামের) কিছু লোককে- যাদের তারা কোনো (বিশেষ) লক্ষণের ফলে চিনতে পারবে- ডেকে বলবে, (কই) তোমাদের দলবল কোনোটাই তো (আজ) কাজে এলো না, না (কাজে এলো) তোমাদের অহংকার, যা তোমরা করতে! ৪৯. (অপরদিকে আজ চেয়ে দেখো মোমেনদের প্রতি,) এরা কি সে সব লোক নয়, যাদের ব্যাপারে তোমরা কসম করে বলতে, আল্লাহ তায়ালা এদের তাঁর রহমতের কোনো অংশই দান করবেন না; (অথচ আজ এদেরকেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,) তোমরা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের কোনোই ভয় নেই, না তোমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে। ৫০. (এবার) জাহান্নামের অধিবাসীরা জান্নাতের লোকদের ডেকে বলবে, আমাদের ওপর সামান্য কিছু পানি (অন্তত) ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে রেযেক দান করেছেন তার কিয়দংশ (আমাদের দাও); তারা বলবে, আল্লাহ তায়ালা (আজ) এ দুটি জিনিস (সে সব) কাফেরদের জন্যে হারাম করেছেন, ৫১. যারা দ্বীনকে খেল-তামাশায় পরিণত করে রেখেছিলো এবং পার্থিব জীবন তাদের প্রতারণা (-র জালে) আটকে রেখেছিলো, তাদের আজ আমি (ঠিক) সেভাবেই ভুলে যাবো যেভাবে তারা (আমার) সামনা সামনি হওয়ার এ দিনটিকে ভুলে গেছে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে। ৫২. আমি তাদের কাছে এমন একটি কিতাব নিয়ে এসেছিলাম, যা আমি (বিশদ) জ্ঞান দ্বারা (সমৃদ্ধ করে) বর্ণনা করেছি, যারা (এর ওপর) ঈমান আনবে, এ কিতাব (হবে) তাদের জন্যে (সুস্পষ্ট) হেদায়াত ও রহমত। ৫৩. এরা কি (চূড়ান্ত কোনো) পরিণামের জন্যে অপেক্ষা করছে? যেদিন (সত্যি সত্যিই)

قَدْ جَاۤءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَاۤءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَاۤ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

সে পরিণাম তাদের কাছে আসবে, সেদিন যারা ইতিপূর্বে এ (দিনটি)-কে ভুলে গিয়েছিলো– তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে আমাদের রসূলরা (এ দিনের) সত্য (প্রতিশ্রুতি) নিয়েই এসেছিলো, আমাদের জন্যে (আজ) কোনো সুপারিশকারী কি আছে, যারা আমাদের পক্ষে (আল্লাহর কাছে) কিছু বলবে, অথবা (এমন কি হবে যে,) আমাদের পুনরায় (দুনিয়ায়) ফিরিয়ে দেয়া হবে, যাতে আমরা (সেখানে গিয়ে) আগে যা করতাম তার চাইতে ভিন্ন ধরনের কিছু করে আসতে পারি, (মূলত) এরাই (হচ্ছে সেসব লোক যারা) নিজেরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে এবং (আল্লাহর ওপর) যা কিছু তারা মিথ্যা আরোপ করতো, তাও তাদের কাছ থেকে (আজ) হারিয়ে গেছে।

তাফসীর

আয়াত ৩৫-৫৩

'হে আদম সন্তানরা শুরুতেই আমি তোমাদের বলেছিলাম, যখনি তোমাদের মধ্য থেকে এমন কোনো রসূল আসবে যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতগুলো পড়ে শোনাবে তখন যারা .... তারা নিজেদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আর যাদেরকে তারা নিজেদের মনগড়া প্রভু বানিয়ে নিয়েছিলো, সেদিন তারা সব দূরে সরে যাবে।' (আয়াত ৩৫-৫৩)

প্রথম মানব সৃষ্টির দীর্ঘ ইতিবৃত্ত এবং আরবসহ সারা বিশ্বের জাহেলী সমাজে প্রচলিত পোষাক আসাক ও আল্লাহভীতি দ্বারা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা সম্পর্কে যে হঠকারিতা ও মূর্খতা চলছিলো তার সাথে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ কর্তৃক উপস্থাপিত আকীদার এক দীর্ঘ তুলনামূলক আলোচনা পেশ করা হলো।

এখন সম্পূর্ণ এক নতুন কায়দায় আদম সন্তানদেরকে ডাকা হচ্ছে........... তবে এ আহবানের মধ্যে যে কথাগুলো রয়েছে তাও ইতিপূর্বে বর্ণিত লেবাস পোশাকের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দ্বীন ইসলামের হৃদয়গ্রাহী চিন্তা চেতনা এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত আইন কানুন তথা সার্বিকভাবে গোটা জীবনের যাবতীয় বিষয় নিয়েই এই আলোচনা। এর মধ্যে আলোচনাকে আরও সীমিত করে রসূলদের প্রচারের মূল কথাগুলোকে পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে রসূলদের ডাকে সাড়া দেয়া-না দেয়ার ওপরই নির্ভর করে পরকালীন জীবনে সফলতা ও ব্যর্থতা।

মানবজাতির প্রতি কোরআনের আহবান

'হে আদম সন্তান, যখন তোমাদের মধ্য থেকে রসূলরা এসে তোমাদেরকে আমার আয়াতগুলো বর্ণনা করবে এবং আজকের এই দিনের কথা বলে তোমাদেরকে সতর্ক করবে তখন যারা সে অনুযায়ী ভয় করবে এবং সংশোধন করে নেবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তওহবে না। আর যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করবে এবং অহংকার করে দূরে সরে থাকবে, তারাই হবে দোযখবাসী যেখানে তারা চিরদিন থাকবে।'

এই হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদম সন্তানদের জন্যে দেয়া ওয়াদা এবং তাঁর খেলাফত লাভের শর্ত। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা পয়দা করেছেন এবং তাদের জীবন ধারণের সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন উদ্দেশ্য, হলো আল্লাহর যমীনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। এই খেলাফতের যোগ্যতা অর্জনের মূল শর্ত হচ্ছে অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখে শুধরে যাওয়া। তারপর এই মানব জাতির মধ্যেই আল্লাহর খলীফা হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজননীয় ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এভাবেই আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন হবে। যদি আল্লাহকে ভয় না করে কেউ চলতে চায়, তাহলে তার পার্থিব জীবনের অন্যান্য সকল কাজকে বাতিল করে দেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা তাকে ও তার কোনো কাজকেই কবুল করবেন না, সে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে মুসলমান হয়েছে একথাও মেনে নেবেন না এবং পরকালে তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তার পক্ষে কারো কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কিছুতেই তার আযাবকে দূর করাও হবে না। আবারও এরশাদ হচ্ছে,

'তবে যে আল্লাহর ভয়ে বাছ বিচার করে চলবে, তার কোনো ভয় থাকবে না এবং সে দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।'

কারণ 'তাকওয়া'– আল্লাহর ভয় মনে রেখে বাছ বিচার করে চলার এই গুণটিই তাকে অপরাধজনক ও লজ্জাকর কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আর যতো লজ্জাকর কাজ আছে তার মধ্যে সব থেকে বড় এবং জঘন্য কাজ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, তাঁর ক্ষমতায় জোর করে ভাগ বসানো এবং তাঁর সার্বভৌমত্বের গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার দাবী করা। এই তাকওয়াই তাকে পবিত্র হালাল খাদ্য-খাবার গ্রহণ করতে বাধ্য করবে এবং আল্লাহর যাবতীয় হুকুম পালন করতে এই তাকওয়াই তাকে উৎসাহ দেবে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করবে এবং অহংকার করে দুরে সরে যাবে, তারাই হবে দোযখবাসী, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।'

কারণ অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহর সাথে করা চুক্তির ব্যাপারে অহংকারই এই অহংকারীদেরকে তাদের বন্ধু শয়তানের সাথে জাহান্নামে একত্রিত করে দেবে, যেখানে গিয়ে আল্লাহর ওয়াদা পূরণ হওয়া তারা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

কেয়ামতের দৃশ্যের জীবন্ত চিত্রায়ন

ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে জীবনের দীর্ঘ সফর শেষে কিভাবে মানুষ গন্তব্য স্থানে পৌঁছুবে সেই দৃশ্যের বর্ণনা, বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকটি জাতির জন্যে রয়েছে এখান থেকে বিদায়ের একটা নির্দিষ্ট সময়– ....। এরপর আসছে রোয হাশরের ময়দানে সবার হাযির হওয়া ও অতীতে করা সকল কাজের হিসাব নিকাশের দৃশ্যের বিবরণ, আসছে তাদের ফয়সালা ও প্রতিদানপ্রাপ্তির বর্ণনা.......এর পর আসছে মোত্তাকী পরহেযগার ও অহংকারী লোকদের পরিণতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তাদের অবস্থাকে এমনভাবে পেশ করা হচ্ছে যেন পাঠকের সামনে তাদের ছবি ভাসতে থাকে। আল কোরআনের এমন এক বিশেষ বর্ণনাভংগিতে দৃশ্যটি পেশ করা হচ্ছে যেন পাঠক ও শ্রোতা উভয়েই সে চিত্রগুলো জীবন্ত ও সচল অবস্থায় সামনে দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে তার প্রত্যেকটি গতিবিধি। এরপর তুলে ধরা হয়েছে কেয়ামতের নানাবিধ দৃশ্য, কবর থেকে উঠে আসা , হিসাবের জন্যে একত্রিত হওয়া এবং কর্মফল অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি লাভ ইত্যাদি। এই দিন এসে যাওয়ার পর তারা কখনোই আর এই মানবজীবন ফিরে পাবেনা। অর্থাৎ পুনর্জন্ম লাভ করে বর্তমানের কর্ম জগতে আর কখনো ফিরে আসবে না। এতোটুকু বর্ণনাই যথেষ্ট, বরং আমি মনে

করি, আল কোরআন তাদের যে চিত্র তুলে ধরেছে, তা যে কোনো পাঠকের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তারা যেন দৃশ্যের ছবিগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তারপরও তারা ভোগবিলাসে মেতে রয়েছে। তবে হাঁ এসব দৃশ্যের বিবরণ তাদের অন্তরাত্মার ওপর নিসন্দেহে গভীরভাবে রেখাপাত করছে। সংগে সংগে তাদের অন্তর কেঁপে উঠছে, ভয়ে কুঁচকে যাচ্ছে তাদের শরীরের চামড়াগুলো। কখনও সন্ত্রস্ত অবস্থায় জড়সড় হয়ে পড়ছে।

আবার কখনো প্রশান্তিতে ভরে যাচ্ছে মন, জান্নাতের সুশীতল ও সুবাসিত মৃদু মধুর সমীরণ দোলা দিয়ে যাচ্ছে তাদের অন্তরে। ওয়াদা করা ওই দিবসটা আসার অনেক পূর্বেই তারা অনাগত জীবনের ওই অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারছে। আর যার অন্তরে ও চেতনায় আখেরাতের জীবনের এই কথাগুলো দোলা দিয়ে যাচ্ছে, সে যেন অনুভব করছে যে, এ জীবনের তুলনায় সে আরো নিশ্চিন্তে এবং পরকালের ওই জীবনে বাস করছে। তাদের তীব্র অনুভূতি তাদেরকে সেই জগতের দিকে যেন ঠিক তেমনি করে নিয়ে যাচ্ছে, যেমন করে কোনো মানুষ এক বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ীতে চলে যায়। আরো বড় সত্য হচ্ছে যাদের জীবন আখেরাতমুখী, তাদের কাছে ওই জীবনটাকে 'ভবিষ্যত জীবন' মনে হয় না, মনে হয় প্রকৃতপক্ষে ওইটাই আসল জীবন এবং সে জীবনকে যেন তারা নিজেদের চোখে দেখতে পাচ্ছে।

আল কোরআনের আরো বহু স্থানে কেয়ামতের এ দৃশ্য আরো সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে, আরো সজীব করে তুলে ধরা হয়েছে তার চিত্রগুলোকে, আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছে পর্যায়ক্রমিকভাবে এর দৃশ্যগুলো সে সব বর্ণনায়। এসব বর্ণনায় বিমুগ্ধ হয়ে যায় মোমেনের অন্তর-প্রাণ। বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে পেশ করা এসব দৃশ্য তাদেরকে জাহেলিয়াতের নিকষ অন্ধকার থেকে হাত ধরে টেনে তুলছিলো।

শয়তানের ধোকাবাজির কারণে যারা আদম ও হাওয়ার জান্নাত থেকে বের হয়ে আসার পর কেয়ামতের এ দৃশ্য সম্পর্কে কথা এসেছে। প্রতারণার মাধ্যমে আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতা করিয়ে শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে ছেড়েছিলো। তাই মানবজাতিকে সতর্ক করা হচ্ছে এই পুরাতন শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সদা সর্বদা সাবধান থাকতে হবে, যেহেতু সর্বদাই সে মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে চলছে। নিষেধ করা হচ্ছে তাদেরকে শয়তানকে মুরব্বী অভিভাবক ও পরিচালক বলে মানতে এবং রসূলদের মাধ্যমে তাদের যে সব নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যদি কোনো শয়তানী শক্তি তার বিপরীত কোনো কথা বা পরামর্শ দেয়, তাহলে তা না মানার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। তারপরই তাদের কাছে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার কেয়ামতের দৃশ্য এমনভাবে পেশ করা হচ্ছে যেন দুটি দৃশ্য পাশাপাশি এবং এ দুইয়ের মধ্যে সময়ের কোনো ব্যবধান নেই। চির-শত্রু শয়তান সর্বদাই চায় মানুষকে বিপদে ফেলতে, যেমন করে জান্নাত থেকে বের করে আদম ও হাওয়াকে বিপদে ফেলেছিলো। আর যে শয়তানের বিরোধিতা করবে এবং আল্লাহর কথা মতো চলবে তাকে পুনরায় জান্নাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহর মহান দরবার থেকে তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, তোমরা যা কিছু (ভালো) কাজ করেছো তারই পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী হিসাবে তোমাদেরকে এই জান্নাতে প্রবেশ করানো হচ্ছে। এ জান্নাত হলো নিরাপদ আশ্রয় এবং সীমাহীন আরাম আয়েশের স্থান।

আলোচনার এ ধারাতে দেখা যায়, কেয়ামতের দৃশের যে বর্ণনা এসেছে তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক অভিনব সৌন্দর্যে ভরা। এ হচ্ছে সেই কাহিনীর শেষ দৃশ্য যার শুরু হয়েছে মানব জাতি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তাইতো এখানে আলোচনা এসেছে সেই পরম পবিত্র ক্ষণটির কথা যখন আল্লাহ

রব্বুল আলামীন বাবা আদম ও তাঁর স্ত্রী মা হাওয়াকে পয়দা করলেন এবং জান্নাতের মধ্যেই তাঁদের বাসস্থান বানিয়ে দিলেন। কিন্তু শয়তান তাদের দুজনকেই ধোকা দিয়ে আল্লাহর একনিষ্ঠ দাসত্ব ও আনুগত্যের মর্যাদা থেকে সরিয়ে নিয়ে এলো এবং তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে আনলো। এইভাবে সর্বোচ্চ মর্যাদার জান্নাত থেকে আসার ইতিকথা এখানে শেষ হচ্ছে। তারপর মানব সৃষ্টির শুরুর সাথে শেষের এক অসাধারণ সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে ....পৃথিবীতে জীবন যাপন পুনরায় যাত্রা শুরুর মধ্যে চমৎকার এক মিল তুলে ধরা হয়েছে। কোরআনের অতুলনীয় বর্ণনাভংগীর কারণে এ দু' অবস্থার মাঝে কোনো ব্যাবধান আছে বলে মনে হয় না।

এবারে আমরা হাযির হচ্ছি সর্বকালের সর্বপেক্ষা বড় মহা সম্মেলনের দৃশ্যের সামনে। এ সম্মেলন তারাও উপস্থিত রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা মানব জীবনে এসে ভংগ করেছে। তারা খুব দাবী করছে যে, বাপ দাদাদের আমল থেকে মৌরুসী সূত্রে প্রাপ্ত এসব পৌত্তলিকতাই সঠিক পথ। আর নবী রসূলদের সম্পর্কে তারা মন্তব্য করছে যে, এরা নিজেরা মনগড়া কিছু আইন কানুন ও সমাজ ব্যবস্থা রচনা করে নিয়েছে। অথচ সঠিক অর্থে জ্ঞানী যে কোনো মানুষ জানে যে, এটা আল্লাহর দেয়া সন্দেহমুক্ত বিধান। এর ওপর ওরা নিজেদের অনুমান সর্বস্ত কথার স্থান দিয়েছে, স্থান দিয়েছে জল্পনা কল্পনাকে নিশ্চিত ও সঠিক জ্ঞানের ওপর। তাই বলা হয়েছে হাঁ, তারা দুনিয়াতে তাদের সেই অংশ পেয়ে গেছে, যা আল্লাহ তায়ালা তাদের তকদীরে বরাদ্দ করে রেখেছিলেন, পেয়েছে তারা তাদের জন্যে বরাদ্দকৃত কিছু সুখ শান্তি, যা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দেবেন বলে পূর্ব থেকেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'থেকে বড় যালেম আর কে হবে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা তৈরী করলো অথবা আল্লাহর আয়াতগুলোকে প্রত্যাখ্যান করলো? ওরাই সেসব মানুষ, যারা তাদের জন্যে বরাদ্দ করা অংশ পেয়েছে। .... আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলছে , অবশ্যই তারা কাফের ছিলো। (আয়াত ৩৭)

আমরা এখন যেন সেই সকল পাপিষ্ঠ মানবগোষ্ঠিটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা তৈরী করে বলেছিলো এবং আল্লাহর আয়াতগুলো অস্বীকার করেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো পালিয়ে কোথাও যেতে পারবে না। সময় ফুরিয়ে গেলে অবশ্যই আল্লাহর ফেরেশতা দূতরা এসে তাদের জান কবয করবে– এসময় তাদের মধ্যে যেসব প্রশ্নোত্তর হবে তার দৃশ্য দেখুন। 'তারা বলবে, এখন তারা কোথায় যাদের তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে (সাহায্যের জন্যে) ডেকেছিলে? '

অর্থাৎ, কোথায় সে দেব দেবতা, যাদের তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ক্ষমতাধর বানিয়ে নিয়েছিলে। কোথায় তোমাদের সে সব নেতারা যাদেরকে তোমরা দুনিয়াতে ক্ষমতাসীন বানিয়ে রেখেছিলে। রসূলদের মাধ্যমে তোমাদের সাবধান করা হয়েছিলো না? কোথায় সে অমোঘ ও সুনিশ্চিত জীবন, যা তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে? হায়, আজকে মৃত্যু থেকে বাঁচার আর কোনো উপায়ই তোমাদের নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর জন্যে যে সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা পরিবর্তন করার কোনোই উপায় নেই।

একটা মাত্র উত্তরই আসবে! না, পালানোর কোনো পথ নেই। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, কোথায় তোমাদের সেসব মাবুদ, যারা তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলো? তাদের যে জবাব দেবে তা আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন তা হচ্ছে,

'তারা বলবে, আমাদের থেকে ওরা দূরে সরে গেছে এবং পালিয়ে গেছে।'

অর্থাৎ তারা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তারা বুঝে গেছে, তারা নিজেরাই ভ্রান্ত পথে চলেছিলো, এজন্যে আজ তাদের আমরা আশ্রয়স্থল মনে করিনা, আর তারাও আজকে আমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না। সুতরাং দেখুন, তাদের কী করুণ দুর্দশা হবে! আজকের এই অবশ্যম্ভাবী কঠিন মুহূর্তে ওরা তাদের কোনোই কাজে আসবে না! আর কতো ব্যর্থ ও ক্ষমতাহীন সেসব মনিব, যারা তাদের অনুসারীদের পথ দেখাতে অক্ষম হয়ে যায়।

'আর ওরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলবে, অবশ্যই ওরা কাফের ছিলো।'

এমনি করে তাদের বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে আলোচ্য সূরার মধ্যে দেখতে পেয়েছি, যখন দুনিয়ায় তাদের প্রতি শাস্তি নেমে আসার বর্ণনা এসেছে, আবার যখন তাদের ওপর শাস্তি নেমে আসবে, তখন তারা একথা ছাড়া আর কিছুই বলবে না, 'অবশ্যই আমরা যালেম ছিলাম।'

ইসলাম বিবর্জিত মতাদর্শবাদীরা দোযখে সমবেত

এই দৃশ্য শেষে আমরা পরবর্তী দৃশ্যের দিকে যখন তাকাই, তখন এক দলকে দেখতে পাই দোযখের আগুনে! ...... এ দুইর মধ্যে যে ব্যবধান সেখানে দেখতে পাই পূর্ণ নীরবতা। আরো দেখতে পাই মৃত্যু, পুনরুত্থান ও হাশরের ময়দানের মধ্যে এক ব্যবধান, যেন মনে হয় ওই মহাসমাবেশের মধ্য থেকে একটি দলকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এ অবস্থা সামনে রেখেই এরশাদ হচ্ছে—

'আল্লাহ তায়ালা বলবেন, দাখেল হয়ে যাও (এই) বহুজাতিক দলে। তোমাদের পূর্বে বহু জ্বিন ও মানুষ দোযখের এই আগুনে প্রবেশ করেছে............ অতএব স্বাদ গ্রহণ করো এই আযাবের, যা কিছু উপার্জন করেছো তারই প্রতিদান এটা। (আয়াত ৩৮)

'প্রবেশ করো দোযখে তোমাদের পূর্বে প্রবিষ্ট বহুজাতিক দলে।'

অর্থাৎ, তোমাদের জ্বিন ও মানুষ সহকর্মীদের দলে মিশে যাও, যারা আগুনের মধ্যে রয়েছে........... ইবলীস কি তার রবের না-ফরমানী করেনি? সে-ই তো আদম ও তার স্ত্রীকে জান্নাত থেকে বের করে এনেছিলো! আর তার সন্তানদের মধ্যে যারা বিপথগামী হয়েছে, তাদের সে-ই তো বিপথগামী করেছে। তাকে এবং যাদেরকে সে পথভ্রষ্ট করেছে তাদের সবাইকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন বলে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন। অতএব হুকুম হবে, তোমরা সবাই দোযখে প্রবেশ করো। দোযখে পূর্বে যারা আছে এবং পরবর্তীতে যারা প্রবেশ করবে, সবাই সমান এবং সবাই পরস্পরের বন্ধু! দুনিয়াতেও দেখা যায় ওই নাফরমানদের বিভিন্ন জাতি, দল ও শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। কারণ পরবর্তী প্রজন্ম প্রথম প্রজন্মের মানুষকে অনুসরণ করে এবং অনুসারীরা পরিচালকদের বেশ কদর করে, ...কাজেই দেখা যাক, আজকে কেমন করে তাদেরকে ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং তাচ্ছিল্যপূর্ণ নামে ডাকাডাকি করা হয়। এরশাদ হচ্ছে,

'যখনই কোনো নতুন দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখনই তারা তাদের (আদর্শিক ভাই) বোনদের অভিশাপ দিতে থাকবে।'

কি এক চরম বিব্রতকর অবস্থা হবে যখন ছেলে বাপের বিরুদ্ধে এবং দাস মনিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে ও অভিশাপ দিতে থাকবে! পরবর্তীতে তারা সবাই জাহান্নামের আগুনে একইভাবে পুড়তে থাকবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'এভাবে (একেক করে) যখন তারা সবাই জাহান্নামে একত্রিত হবে।'

মিলিত হবে পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সাথে এবং সবাই একত্রিত হবে। তখন তাদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক ও ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের বলবে, হে আমাদের রব, এরা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিলো, সুতরাং, তাদের দ্বিগুণ আযাব দান করুন।'

এইভাবে তারা একে অপরের সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করে দেবে এবং একই পথের পথিকদের ও বন্ধু বান্ধবদের একত্রে উপস্থিতির দৃশ্য পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশ পাবে। সেদিন দুনিয়াদার ও আল্লাহবিমুখ লোকেরা একে অপরকে বিদ্বেষের চোখে দেখতে থাকবে, দোষারোপ করতে থাকবে পরস্পরকে এবং অভিশাপ দিয়ে একে অপরের শাস্তি বাড়িয়ে দেয়ার দাবী জানাতে থাকবে। সেদিন তারা দোয়া করবে হে আমাদের 'রব' হ্যাঁ এরাই তো আমাদেরকে বিপথগামী করেছে সুতরাং তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও। সেই কঠিন দিনে একমাত্র তাঁরই দিকে তারা রুজু করবে এবং তাঁর কাছেই দোয়া করতে থাকবে। তাদের প্রার্থনার জবাব ঠিকই আসবে কিন্তু কী জবাব আসা সম্ভব? এরশাদ হচ্ছে,

'হাঁ, প্রত্যেকের জন্যেই রয়েছে দ্বিগুণ আযাব, কিন্তু তোমরা জানো না।'

অর্থাৎ তোমাদের ও তাদের উভয় পক্ষের জন্যেই থাকবে সেদিন দ্বিগুন শাস্তি! আর এসময় ওই কাফেরদের অবস্থাটা এমন হবে যে, প্রত্যেক একে অপরের অকল্যাণকামী হবে, তারপর যখন আল্লাহর কাছ থেকে দোয়ার জওয়াব মিলবে তখনও তারা একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে। আসলে কুকর্মের প্রতিদান সেদিন সবারই সমান হবে। যে যতোটুকু করেছে ততোটুকু শাস্তি তাকে পেতেই হবে। কেননা দুনিয়ার জীবনে প্রত্যেককেই ভালো মন্দ বুঝার শক্তি দেয়া হয়েছিলো। দেখুন এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের বলবে, আমাদের ওপর তোমাদের কোনো দিক দিয়েই কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ছিলোনা। অতএব, তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি তোমরাই ভোগ করো।'

এভাবে শেষ হচ্ছে পরস্পরের দোষারোপ ও বেদনাদায়ক অবস্থার দৃশ্য পর্ব। কিন্তু এভাবে পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকলেও তাদের কারও অবস্থার কোনো উন্নতি হবে না। অপরদিকে আল্লাহর নেয়ামতের ঘরে উপস্থিত মোমেনদের সাথে তাদের সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে পারস্পরিক দোষারোপের এই প্রতিযোগিতা। এরশাদ হচ্ছে–

'নিশ্চয়ই, যারা আমার আয়াতগুলো অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এগুলোর সাথে অহংকারপূর্ণ ব্যবহার করেছে, কিছুতেই তাদের জন্যে আকাশের কোনো দরজা খুলে দেয়া হবে না, আর............... এভাবেই আমি যালেমদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। (আয়াত ৪০-৪১)

থামুন, দেখুন ও চিন্তা করুন। এ আশ্চর্যজনক দৃশ্য যখন আপনার কল্পনার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তখন আপনার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া জাগতে পারে একবার খেয়াল করে দেখুন এবং সাধ্যমতো বুঝার চেষ্টা করুন। একটি সুঁচের ছিদ্র দিয়ে একটি উঁট পার হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এ শাস্তির কোনো পরিবর্তন হবে না, অর্থাৎ ওই ক্ষুদ্র পথ দিয়ে এতো বড় জন্তুটি পার হওয়া যেমন অসম্ভব। তেমনি ওদের শাস্তির অবস্থার পরিবর্তন হওয়া এবং জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব, অতএব, ওই মিথ্যা দোষারোপকারীদের জন্যে আকাশের দরজা খোলার অপেক্ষায় আপনি চেয়ে থাকুন, অপেক্ষা করতে থাকুন তাদের দোয়া বা তাওবা কবুল হওয়ার মুহূর্তটির জন্যে। আসলে জীবনের সকল সময় তো পারই হয়ে গেছে। সময়ের কাজ সময়ে না করলে পরিণাম তো ভোগ করতেই হবে! তখন দুঃখ করে আর কিইবা হতে পারে। সুঁচের ছিদ্রপথে উঁট পার হয়ে যাওয়ার মতো অসম্ভব এই পরিস্থিতিতে আপনি কিইবা করতে পারেন আর কতোটুকুই বা আশা করতে

পারেন। সুতরাং সেখানে দোযখের আগুনে পোড়া ছাড়া তাদের কোনো উপায়ই থাকবে না। ইসলামের ডাকে সাড়া না দিয়ে সহজাত বিবেকের বিরুদ্ধে যারা কাজ করেছে। মনচাহি জীবন যাপন করেছে, তাদের সবার এই একই করুণ পরিণতি।

এর কোনোই পরিবর্তন হবার নয়, তা যতোই পারস্পরিক দোষারোপ, বা অভিশাপের আদান প্রদান হোক না কেন। একদিন যারা অন্যায় অপকর্মে ছিল পারস্পরিক বন্ধু ও সহযোগী, তাদের সবাইকে একই করুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর এ ভাবেই তো আমি অপরাধীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।'

এরপর আপনিই চিন্তা করে দেখুন, দোযখের মধ্যে তাদের অবস্থা কী হতে পারে? এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের বিছানাও হবে জাহান্নামের (আগুনের) এবং তাদের ওপর দিয়েও থাকবে (আগুনের) চাদর।'

অর্থাৎ তারা যে রসূলুল্লাহ (স.)-কে বিদ্রূপ করতো তার প্রতিদানে আগুনের বিছানায় তাদেরকে আরাম (?) করতে দেয়া হবে। এ বিছানা আসলে না হবে কোনো মাটির সমতল স্থল আর না হবে কোনো নরম শয়নের স্থান, আর না হবে আরামদায়ক কোনো ফুলের বিছানা, বরং জাহান্নামের আগুনই হবে তাদের চাদর যা ওপর দিয়ে তাদের ঢেকে রাখবে।

'এভাবেই আমি যালেমদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।'

আর যালেমরাই হচ্ছে অপরাধী, আর মোশরেকরাই যালেম। তারাই বরাবর আল্লাহর আয়াতগুলোর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী এবং তারাই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার আয়াতগুলোর প্রতি মিথ্যা বানিয়ে বানিয়ে বলে। আল কোরআনের ব্যাখ্যা দেখা যায়, এসব গুণের একটি অপরটির সমার্থক।

প্রাচুর্যময় জান্নাতে মোমেনদের অবস্থান

এরপর সেসব মানুষের সফলতার দৃশ্য, নায নেয়ামত ও আনন্দ উপভোগের দৃশ্য— যারা দুনিয়াতে আল্লাহর নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তারই গোলামী করেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করে চলেছে .... আমি তাদের কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত (কাজের বোঝা তার ওপরে চাপিয়ে দিয়ে তাকে) কষ্ট দেবো না— ওরাই হবে জান্নাতবাসী, সেখানেই তারা থাকবে চিরদিন ..... আর তাদের ডেকে বলা হবে, তোমরা (জীবনে যা কিছু করে তারই প্রতিদানে এই জান্নাত, তোমাদেরকে (মৌরুসী সূত্রে প্রাপ্য বস্তুর মতো) দেয়া হয়েছে।' (আয়াত ৪২-৪৩)

ওরাই সেসব মানুষ, যারা ঈমান এনেছে এবং সাধ্যানুযায়ী নেক কাজ করেছে, সাধ্যের বাইরে আল্লাহ তায়ালা কোনো কাজ তাদের দেবেন না। ওরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহর হুকুমে এবং তাঁরই রহমতে ওরা হবে তার অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়ায় তাদের জান্নাতের উত্তরাধিকারী করবেন। ঈমানসহ যে ভাল কাজ তারা দুনিয়ার জীবনে করেছে তার প্রতিদানে তাদের সকল নেয়ামতে ভরা জান্নাত দেয়া হবে। তাদেরই দেয়া হবে এ মহান নেয়ামত রসূলদের অনুসরণ করেছে এবং শয়তান ও তার অনুসরণকে অস্বীকার করেছে। তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এই জন্যে, তারা মহাশক্তিমান ও মহা দয়াময় আল্লাহর নির্দেশ পালন করে চলেছে এবং অস্বীকার করেছে তাদের চিরকালের দুশমন মরদূদ শয়তানকে।

সর্বোপরি কথা হচ্ছে, আল্লাহর রহমত না থাকলে শুধু তাদের আমল তাদের জান্নাতের অধিকারী বানানোর জন্যে মোটেই যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'কিছুতেই তোমাদের কোনো কাজ তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না।' সাহাবারা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনাকেও না? তিনি বললেন, না। আমাকেও না, তবে আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁর রহমত ও মেহেরবানী দ্বারা আমাকে মাফ করে দেন তো ভিন্ন কথা (মুসলিম শরীফ)। এখানে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, আল্লাহর বাণী ও রসূলুল্লাহ (স.)-এর কথার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য বা বিরোধ আছে, 'যেহেতু রসূলুল্লাহ (স.) মনগড়া কিছু বলেন না। এটা তো আল্লাহর অসীম মেহেরবানী ও ভালো কাজের জন্যে বান্দার জন্যে উৎসাহব্যঞ্জক কথা যে, 'বান্দাকে তার ভালো কাজ জান্নাতে প্রবেশ করাবে।' অপরদিকে রসূল (স.) জানাচ্ছেন, মানুষ যতো ভালো কাজই করুক না কেন, তার মধ্যে শয়তানের প্ররোচনায় এমন এমন কিছু দুর্বলতা এসেই যায়, যে কারণে সে ভালো কাজগুলোর হক পুরোপুরি আদায় করতে পারে না। অবশ্য অবশ্যই তার কিছু না কিছু ক্রটি হয়ে যায়। যেহেতু তিনি রহমান, তিনি রহীম, মহা দয়াময় তিনি, সীমা নেই শেষ নেই তাঁর মেহেরবানীর, তাই সে ক্রটিগুলো না ধরে তিনি বান্দার ভালো কাজগুলোই ধরেন এবং তার প্রতিদান দিতে চান— আনুগত্যশীল মন নিয়ে যখন সে ভালো কাজ করতে শুরু করে, তখন তার ক্রটিগুলো তুচ্ছ জ্ঞান করে তার ভালো কাজের উদ্যোগ ও তার ভালো কাজগুলোই তিনি হিসাব করেন। রসূল (স.) আল্লাহর ইশারা জানাচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা যদি হিসাব করতেন এবং ক্রটিবিচ্যুতিগুলো ক্ষমা না করে পাকড়াও করতেন, তাহলে বান্দার কোনো উপায়ই থাকতো না। আল্লাহ ও রসূলের কথার মধ্যে পার্থক্য আছে বলে যারা মনে করে, তাদের জ্ঞানের স্বল্পতাই প্রধানত দায়ী।

এরপর দেখুন উভয় দলের অবস্থা। এক দলের লোকেরা মিথ্যার ব্যবসায়ী, যারা বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলে, অপরাধপ্রবণ, অত্যাচারী, কাফের ও মোশরেক—এরা দোযখের আগুনে থেকেও পরস্পর দোষারোপ ও অভিশাপ দিতে ব্যস্ত এবং তর্ক-বিতর্ক ও ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণকারী, তাদের বুকে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার আগুন টগবগ করে জ্বলছে, যদিও এক সময়ে তারা ছিলো একের জন্যে অন্য জন আন্তরিক বন্ধু ও সহযোগী। অপরদিকে মোমেন ও সৎ কর্মশীল লোকদের অবস্থা জান্নাতে দেখা যাবে— তারা হবে পরস্পর ভাই ভাই, মহব্বত বিনিময়কারী, পরস্পর দোষ ক্রটি মোচনকারী এবং শুভেচ্ছা প্রদর্শনকারী। এদের ওপর বর্ষিত হতে থাকবে শান্তি ও শুভেচ্ছার আশিসবাণী। তাই এরশাদ হচ্ছে,

আমি মহান আল্লাহ তাদের থেকে দূর করে দেবো তাদের মধ্যে অবস্থিত সকল গ্লানি।'

এরাই প্রকৃত মানুষ, মানুষ হিসাবে এরা জীবন যাপন করেছে ....। দুনিয়ার জীবনে মাঝে মাঝে এদের মধ্যে রাগ ও মনোক্ষুণ্নতা এসেছে, এসেছে বিদ্বেষের গ্লানি, কিন্তু তারা তা দমন করেছে এবং এসব মন্দ খাসলতের ওপর বিজয়ী হয়েছে, ...কিন্তু বিদ্বেষের দাগ বা প্রভাব হয়তো কিছু কিছু থেকেই গেছে, সেগুলো আল্লাহ তায়ালা দূর করে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

কুরতুবী তাঁর আহকামুল কোরআন নামক তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি হাদীস এনেছেন। এতে বলা হয়েছে, রসূল (স.) বলেছেন, জান্নাতের দরজায় মোমেনদের বুকের মধ্য থেকে বের করে ফেলা ঘৃণা-বিদ্বেষগুলো উটের আস্তাবলের মতো জমা হয়ে যাবে যেগুলো আল্লাহ রব্বুল আলামীনই মোমেনদের অন্তর থেকে বের করে নেবেন। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি কামনা করি আমি ওসমান, তালহা ও যোবায়রের মতো হই। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তাদের অন্তরের বিদ্বেষের গ্লানি আমি আল্লাহ বের করে ফেলবো।'

আর ঠিক যে সময় দোযখবাসীরা ওপর ও নীচে থেকে আগুনের তাপে দগ্ধীভূত হতে থাকবে, একই সময় জান্নাতবাসীরা থাকবে এমন সব বাগ বাগিচাভরা জান্নাতে, যার পাশ দিয়ে প্রবহমান

থাকবে কুলুকুলু নাদিনী শান্ত সুমধুর ছোট ছোট নদী, এসব কিছুর ওপরে সুবাসিত বাতাস প্রবাহিত হতে থাকবে, সুগন্ধে মৌ মৌ করতে থাকবে গোটা পরিবেশ। এরশাদ হচ্ছে,

'প্রবাহিত হতে থাকবে তার পাদদেশে ছোট ছোট নদীসমূহ।'

একদিকে যখন ওইসব নাফরমান লিপ্ত থাকবে পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ ও ঝগড়া বিবাদে, নেককার মোমেনরা মগ্ন থাকবে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর প্রশংসায় ও আত্মসমালোচনায়।

এরশাদ হচ্ছে,

'আর তারা বলবে, যতো প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র আল্লাহর, যিনি এই প্রশংসাগীতি গাওয়ার ও আনুগত্য করার দিকে আমাদের এগিয়ে দিয়েছেন, কিছুতেই আমরা এ পথে চলতে পারতাম না যদি তিনি (মেহেরবানী করে আমাদের এ পথে) না চালাতেন। অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর রসূলরা সত্য সঠিক মত ও পথ নিয়েই আমাদের কাছে এসেছেন।'

জাহান্নামীদের প্রতি জান্নাতীদের কটাক্ষ

আবারও দেখুন, ওই বিশ্বাসঘাতক পাপাচারীদের দিকে, তারা পরস্পর দোষরোপ, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা ও গালাগালি দেয়ার কাজে নিয়োজিত। তাদের সম্পর্কে নাযিল হবে আল্লাহর শাস্তির ফরমান,

'দাখেল হয়ে যাও জ্বিন ও মানুষের সেসব লোকের দলে, যারা তোমাদের পূর্বে গুযরে গেছে এবং আগুনের মধ্যে বাস করছে। আর অন্যদিকে জান্নাতবাসীরা পরস্পরকে আপন করার ও সম্মানিত করার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

তাদের সম্পর্কে আল্লাহর এরশাদ প্রণিধানযোগ্য,

'আর তাদের ডাক দিয়ে বলা হবে, যেসব আমল তোমরা করেছ তার ফল হিসাবে রয়েছে তোমাদের জন্যে এই জান্নাত যার উত্তরাধিকারী হিসাবে তোমরা সেখানে থাকবে।'

এ ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে তুলনামূলক অবস্থান।

এরপর ওই দৃশ্যগুলো বার বার এবং বার বারই আমাদের সামনে আসছে। এখন আমরা এমন একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি, যা পূর্ববর্তী দৃশ্যেরই অনুরূপ। জান্নাতবাসীরা তাদের বাসস্থানে থেকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন, পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন তারা এবং দোযখবাসী নিশ্চিত হবে তাদের কর্মফলপ্রাপ্তি, শাস্তি ও প্রত্যাবর্তনস্থল হিসাবে দোযখ সম্পর্কে। আর জান্নাতীরা জাহান্নামীদের ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে, তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা যে ওয়াদা করেছিলেন তা তারা পেয়েছে কিনা। দেখুন আল্লাহর বাণী,

'আর জান্নাতবাসী দোযখবাসীকে ডেকে বলবে, হাঁ, আমাদের রব আমাদের সাথে যা ওয়াদা করেছিলেন আমরা তা সত্যই পেয়েছি। তোমরাও কি তোমাদের সাথে তাঁর কৃত ওয়াদা সত্য হিসাবে পেয়েছো ওরা বলবে, হাঁ পেয়েছি। ঠিক এ সময় একজন ঘোষণাকারী হাঁক ছেড়ে বলবে, সেসব যালেম অত্যাচারীদের প্রতি লানত (অভিশাপ) বর্ষিত হোক, যারা মানুষকে আল্লাহর পথে আসা থেকে বাধা দিতো, নানা প্রকার বাঁকা পথ তালাশ করতো (সত্যকে পর্যুদস্ত করার জন্যে)। আর তারা ছিলো আখেরাত অস্বীকারকারী।'

এ প্রশ্নের মধ্যে যে তীব্র কটাক্ষপাত রয়েছে তা হচ্ছে, ... যালেমদের প্রতি আল্লাহর আযাবের যে ধমক ছিলো তা সত্য সত্যই যে বাস্তবায়িত হবে, সে বিষয়ে মোমেনরা অবশ্যই নিশ্চিত ছিলো, যেমন নিশ্চিত ছিলো তাদের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদা সম্পর্কে। তবু তারা জিজ্ঞেস করবে। এক কথাতেই এর জবাব আসবে, বলা হবে ......হাঁ।

এখানেই জওয়াব শেষ হয়ে যাবে এবং সকল বিস্ময়ের হবে অবসান। এরশাদ হচ্ছে—

'তাদের মধ্য থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে, আল্লাহর অভিশাপ যালেমদের জন্যে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথে আসা থেকে বাধা দিতো, আর নানা প্রকার বাঁকা পথ অবলম্বন করতো, আসলে এরা ছিলোই আখেরাত অস্বীকারকারী।'

যেসব যালেম ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে চাওয়া হয়েছে সে 'যালেমদের' শব্দটি তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছে– এটা 'কাফেরদের' শব্দটিরই প্রতিশব্দ। অর্থাৎ একই অর্থের এ দুটি শব্দ। তারা এ শব্দদ্বয়ের দুটিই ব্যবহার ও প্রয়োগ করতো এবং চাইতো, বাঁকা পথটাই মানুষ বুঝুক এবং দ্বীন ইসলামের ওপর না দাঁড়াতে পারুক। এরাই ছিলো প্রকৃতপক্ষে আখেরাতে অবিশ্বাসী।

এই যে দোষ 'তারা বক্রতা চায়'– এ কথা দ্বারা এ সত্যটাই তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে যে, ওরা মানুষকে আল্লাহর পথে চলায় বাধা দিতে চায়, ওরা চায় বাঁকা পথে চলতে। কিছুতেই সরল সঠিক ও মযবুত পথে চলতে ওরা রাযি নয়। সর্বদা খোঁজে তারা জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত পথ পরিহার করে মানুষের তৈরী বাঁকা পথ। কিছুতেই চিরস্থায়ী সুন্দর পথে চলতে তারা প্রস্তুত নয়। সরল সঠিক ও মযবুত পথের চেহারা তো একটাই। সে চেহারা হচ্ছে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা ও বাস্তব জীবনের জন্যে তাঁর প্রদত্ত বিধান অনুসরণ করা। এ ছাড়া অন্য যতো মত ও পথ আছে সবগুলোই বাঁকা পথ। আর এ পথে চলতে চাওয়া হচ্ছে আখেরাত অস্বীকার করার নামান্তর। আখেরাতের জীবনে যে বিশ্বাসী নয়, সে মনগড়া অথবা কোনো মানব রচিত বিধানের ওপর জীবন যাপন করতে চায়।

এখন যে ব্যক্তি আখেরাত বিশ্বাস করে বলে দাবী করে, আরও দাবী করে, সে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে, তাকে তার পরওয়ারদেগারের কাছে ফিরে যেতে হবে– এরপরও মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয় এবং তাঁর মত ও পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য কারো মতে পথে চলে, তার প্রকৃতি ও রূপ হচ্ছে আল্লাহবিমুখ এবং আল্লাহর বিধান-পরিপন্থী রূপ। এদের প্রকৃত অবস্থা ফুটে ওঠে বাস্তব ব্যবহারে ও জীবন যাপনে এবং তাদের সকল কথা-কাজ ও ব্যবহার তাদের মনের আসল অবস্থার কথা জানায়।

পাপ পুণ্য সমান হলে আ'রাফে অবস্থান

তারপর দেখুন ওই দৃশ্যের দিকে, যা দেখে বাহ্যিক দিক থেকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে একটা স্থান এমন হবে যেখানে কিছু লোক থাকবে। জান্নাতবাসীরা ও জাহান্নামবাসীরা তাদের চেহারা ও লক্ষণাদি দেখে একইভাবে চিনতে পারবে। এখন আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার, তারা কারা এবং তাদের সম্পর্ক জান্নাতবাসীর সাথে কতটুকু এবং দোযখবাসীর সাথেই বা কতোটুকু। ওদের সম্পর্কে কালামে পাকে এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের মাঝে থাকবে একটা পর্দা এবং আরাফ নামক ওই মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে একদল লোক, যারা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী লোকদের তাদের লক্ষণ দেখে (পৃথক পৃথক পরিচয় জানতে পারবে এবং) তাদের চিনতে পারবে ....(তাদের বলা হবে,) দাখেল হয়ে যাও জান্নাতে, কোনো ভয় নেই তোমাদের জন্যে এবং তোমরা কোনো দুঃখিতও হবে না)। (আয়াত ৪৬-৪৯)।

এ আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, যেসব লোক আরাফে থাকবে, তাদের ও জান্নাতবাসী এবং দোযখবাসীর মধ্যে থাকবে বাধার এক প্রাচীর। এরা হবে এমন একদল লোক, যাদের নেকী বদী হবে সমান সমান, যার কারণে না তারা জান্নাতীদের সাথে মিলিত হতে পারবে, আর না ফেলা

হবে তাদেরকে দোযখে। তাদের অবস্থা হবে সমান সমান। তারা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার দয়া ও মেহেরবানীর অপেক্ষায় থাকবে। তারা জান্নাতবাসীদের তাদের চেহারার বিদ্ধমান চিহ্নের কারণে চিনতে পারবে। সম্ভবত তাদের চিনতে পারবে তাদের চেহারার শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতার কারণে, অথবা চিনতে পারবে শুভ্র সমুজ্জ্বল আলোর দরুন যা তাদের আগে আগে ও ডান দিকে চলতে থাকবে। আবার একই কায়দায় দোযখবাসীদেরও চিনতে পারবে তাদের চেহারায় দৃশ্যমান চিহ্নের কারণে। আর সম্ভবত তাদের চেহারা থাকবে কলুষ-কালিমালিপ্ত অথবা চিনতে পারবে সেই দাগ দেখে, যা তাদের নাকের ডগায় লেগে থাকবে। যেহেতু দুনিয়ার জীবনে এ নাক ফুলিয়ে ফুলিয়ে তারা অহংকার প্রদর্শন করেছে, যেমন সূরা কলাম-এ এসেছে, 'শীঘ্রই আমি (সর্বশক্তিমান আল্লাহ) তার নাকের ডগার ওপর দাগ লাগিয়ে দেবো।'

এসব আরাফবাসী জান্নাতবাসীদের সালাম দিয়ে তাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, বুক ভরা আশা নিয়ে তাদের সাথে কথা বলতে থাকবে, যেন তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। তাদের নযর যখন কোনো দোযখবাসীর ওপর পড়বে তখন আপনা থেকেই তাদের নযর সরে আসবে, ইচ্ছা করে সরানো লাগবে না। তারা আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে, যেন তাদের ঠিকানা ওদের সাথে না হয়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর থাকবে আরাফের ওপর এক শ্রেণীর মানুষ, যারা সবাইকে তাদের চেহারার ওপর দাগ দেখে চিনে নেবে..........হে আমাদের রব, আমাদের যালেম জাতির অন্তর্ভুক্ত বানাবেন না।' (আয়াত ৪৬-৪৭)

তারপর দেখবে তারা কবীরা গোনাহকারী লোকদের, যারা তাদের চেহারার দাগের কারণে পরিচিত হবে, তখন তাদের দিকে রাগ ও তীব্র তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকাবে। আল্লাহর বাণী দেখুন,

'আরাফবাসীরা কিছু লোককে ডাকবে, যাদেরকে তাদের চেহারার ওপর লেগে থাকা দাগের কারণে ওরা চিনবে, (তাদের) বলবে, তোমাদের জনবলের বড়াই ও দলীয় শক্তি আজ কোনোই কাজে লাগলো না।'

এরপর মোমেনদের সম্পর্কে ওরা যে বলতো, তারা পথভ্রষ্ট, আল্লাহ তায়ালা তাদের কোনো প্রকার দয়া করবেন না– তাদের একথাগুলো তাদের সামনে পেশ করে তাদের স্মরণ করানো হবে। এ বিষয়ে আল্লাহর কথা–

'এরাই কি সেসব ব্যক্তি, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে, আল্লাহ তায়ালা এদের প্রতি কোনো দয়া করবেন না?' আজ দেখো ওরা কোথায়, তাদের বলা হবে, 'জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমাদের কোনো ভয় নেই, আর তোমরা কোনো দুশ্চিন্তাও করবে না।'

জাহান্নামীদের করুণ মিনতি

আর শেষের দিকে আমরা শুনতে পাচ্ছি দোযখের দিক থেকে আসা এক করুণ শব্দ। এ শব্দের মধ্যে রয়েছে কাতর কণ্ঠে সাহায্যের জন্যে আবেদন ও পানির জন্যে কাকুতি মিনতি। বলা হবে,

'দোযখবাসীরা জান্নাতবাসীদের ডেকে ডেকে বলবে, দাও না আমাদেরকে একটু পানি অথবা সেসব নেয়ামত থেকে কিছু যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দিয়েছেন।' অপরদিক থেকে আল্লাহর জবাব যেন আমরা শুনতে পাচ্ছি, যার মধ্যে রয়েছে অপমান, ধিক্কার ও লাঞ্ছনা। এরশাদ হচ্ছে,

‘ওরা বলবে, অবশ্যই এ সব নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা হারাম করে দিয়েছেন সেসব কাফেরের জন্যে, যারা তাদের দ্বীনকে বানিয়ে নিয়েছিলো খেল তামাশার বিষয় এবং দুনিয়ার জীবন তাদের ধোকার মধ্যে ফেলে রেখেছিলো।’

তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই দৃশ্য, যা দেখে সকল মানুষের কণ্ঠ যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। আজ আল্লাহ তায়ালা যে ফয়সালা করবেন তাই চূড়ান্ত। কেননা তিনিই তো সব কিছুর মালিক, তিনিই তো বিচার ফয়সালার একমাত্র কর্তা। তাই তাঁর ভাষাতেই দেখুন,

‘আজকে আমি তাদের ভুলে যাবো, যেমন করে তারা ভুলে গিয়েছিলো তাদের আজকের দিনের এ সাক্ষাতকে। আর যেহেতু তারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছিলো ....ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আর যেসব মনগড়া জিনিস তারা তৈরী করে নিয়েছিলো তা সব আজ ব্যর্থ হয়ে গেলো।’ (আয়াত ৫১-৫৪)

এভাবে দৃশ্যের পাতাগুলো যেন আসছে ও চলে যাচ্ছে– এ দৃশ্যের একটি অধ্যায় হচ্ছে আখেরাত আর একটি অধ্যায় দুনিয়ার জীবন সম্পর্কিত, এখন যেন আখেরাতে সেই সব লোকের সাথে আমরা সময় কাটাচ্ছি, যারা দোযখের আগুনে আজকের দিনের সাক্ষাতকে ভুলে থাকার শাস্তি পাচ্ছে। আর, অবশ্যই তাদের কাছে লিখিত আকারে এবং অত্যন্ত বিশদভাবে এদিন সম্পর্কে অনেক সতর্কবানী এসেছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীতে এসব ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন– আন্দাজে নয়, সকল বিষয়েই তাঁর ভান্ডারে যে জ্ঞান রয়েছে, সে ভান্ডার থেকেই জ্ঞানগর্ভ কথাগুলো তিনি বলেছেন। কিন্তু জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ এসব কথাও তারা উপেক্ষা ও পরিত্যাগ করেছে। তারা চলেছে খোশ-খেয়ালমতো, নিছক ধারণা কল্পনা ও কুসংস্কারের পেছনে তারা ধাবিত হচ্ছে।

তাদের পাশেই আর একটি দলের সাথে একটি সুন্দর মুহূর্ত আমরা কাটাচ্ছি। এ দলটা অপেক্ষা করছে এই কেতাবে উল্লেখিত ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির জন্যে এবং সে ফল ভোগের জন্যে যার সম্পর্কে আল্লাহর নবী সাবধান করেছেন। তাদের পার্থিব এ জীবনে বার বার সাবধান করা হচ্ছে, ভালো বা মন্দ যে কোনো কাজের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। সুতরাং আজকে এ কেয়ামতের ভয়ংকর দিনে বাস্তবিকই সেই ফল দেখতে পাচ্ছি।

’এই বিশ্ব প্রকৃতির উন্মুক্ত দৃশ্যাবলীর মধ্যে প্রাণের যে স্পন্দন নিরন্তর বয়ে যাচ্ছে তা বড়ই বিস্ময়কর। এর যথাযথ খবর এ মহা বিস্ময়কর কেতাব ছাড়া অন্য কিছুতে সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। এভাবে এ বিরাট বিস্ময়কর প্রতিবেদন সমাপ্ত হচ্ছে এবং এর পরপরই আসছে মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী সেই পরিণতির কথা, যা তার সৃষ্টিলগ্নের ঘটনাবলীর সাথে পুরোপুরিই সংগতিপূর্ণ। এসব বিবরণ আজও মানুষের বিবেকে সাড়া জাগায়, অন্যায় অত্যাচার এবং মিথ্যা দুর্নীতি ও আল্লাহর না-ফরমানী থেকে দূরে থাকতে মানুষকে উৎসাহ যোগায়। আর এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সীমাবদ্ধ হলেও এখানে সেই পরিণতি স্থলের একটা ব্যাখ্যা দেয়া হলো যেখানে তাওবা করার কোনোই সুযোগ থাকবে না, কোনো সুপারিশও কেউ কারো পক্ষে করতে পারবে না এবং যে কাজ করা হয়েছে তার পুনরায় সংশোধন ও পরিবর্তনেরও কোনো সুযোগ থাকবে না।

হাঁ, এ ভাবেই এ প্রসংগের বিস্ময়কর আলোচনা শেষ হচ্ছে।

যেভাবে এসব দৃশ্য থেকে আমি শিক্ষা পেয়েছি এবং আমার বিবেকে যেভাবে সাড়া জেগেছে, সেভাবেই এই মহাগ্রন্থের তাফসীর করতে গিয়ে অপরের মধ্যেও সাড়া জাগানোর চেষ্টা করেছি।

পুনরায় আমরা ফিরে যাচ্ছি এই নশ্বর দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে। আর ইতিমধ্যে আলোচনার ক্ষেত্রে এক দীর্ঘ সফর আমরা অতিক্রম করেছি, পার হয়েছি এ সফরের এক বিস্তারিত অধ্যায়। এটাই হচ্ছে গোটা জীবনের সফরের কথা। এরপর আলোচনা এসেছে হাশর, হিসাব নিকাশ এবং বিচার শেষে প্রত্যেককে কর্মফল অনুযায়ী দেয়া প্রতিদান সম্পর্কে, এসেছে মানব জীবনের ইতিহাস, যাতে বলা হয়েছে সৃষ্টিলগ্ন, দুনিয়ায় নেমে আসা এবং এখানে জীবন যাপনের যাবতীয় অধ্যায়গুলোর সাথে আমরা পরোক্ষভাবে জড়িত।

এই কোরআনুল কারীম মানব মনে তার মধ্যে নিহিত অবর্ণনীয় ও অপার সম্ভাবনার কথা জাগিয়ে দিচ্ছে, বিশ্বের বুকে ও মহাকাল পরিক্রমায় তাকে দেখানো হয়েছে সে কী করেছে, কী অবস্থায় তাদের জীবনে কী নেমে এসেছে এবং ভবিষ্যতে তার কি অবস্থা হতে চলেছে তার বিস্তারিত প্রতিবেদন। এসব অবস্থা তুলে ধরার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার ভুলে যাওয়া ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করা এবং তার বিবেক জাগিয়ে তোলা, আল্লাহর তরফ থেকে আগত বার্তাবাহক রসূলে কারীম (স.)-এর কথা শুনতে তাকে উদ্বুদ্ধ করা। দেখুন সে বার্তায় কি বলা হচ্ছে,

এ হচ্ছে সেই কেতাব, যা তোমাদের কাছে নাযেল হয়েছে। সুতরাং তোমার বুকে (এ ব্যাপারে) কোনো সংকীর্ণতা যেন সৃষ্টি না হয়– এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তুমি মানুষকে সতর্ক করো এবং এ কেতাব যেন মোমেনদের জন্যে স্থায়ী ও এক অমোঘ উপদেশবাণী হিসাবে প্রতিভাত হয়। অনুসরণ করো তোমরা সেই মহা-গ্রন্থের, যা তোমাদের পরওয়ারদেগার মালিক মনিবের কাছ থেকে নাযিল হয়েছে এবং অনুসরণ করো না তাঁকে বাদ দিয়ে কোনো মুরব্বী অভিভাবক দায়িত্বশীল বা বন্ধুর (অর্থাৎ, আল্লাহর বিধান উপেক্ষা করে, বা তাঁর কথা ও ইচ্ছার বিপরীত, কোনো মানুষের কোনো কথা বা ইচ্ছার তাবেদারী করবে না। না বুঝে-সুঝে বা চিন্তা-ভাবনা না করে করা কথা মানবে না এবং কারো অন্ধ অনুসারীও হবে না), কিন্তু (বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, তোমাদের অধিকাংশই ভুল পথে চলে এবং) খুব অল্প সংখ্যক লোকই শিক্ষা গ্রহণ করে।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٤﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتّٰى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۗ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

রুকু ৭

৫৪. অবশ্যই তোমাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা, যিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি 'আরশের' ওপর অধিষ্ঠিত হন। তিনি রাতের পর্দাকে দিনের ওপর ছেয়ে দেন, দ্রুতগতিতে তা একে অন্যকে অনুসরণ করে, (তিনিই সৃষ্টি করেছেন) সুরুজ, চাঁদ ও তারাসমূহ, (মূলত) এর সব কয়টিকেই আল্লাহ তায়ালার বিধানের অধীন করে রাখা হয়েছে; জেনে রেখো, সৃষ্টি (যেহেতু) তাঁর, (সুতরাং তার ওপর) ক্ষমতাও চলবে একমাত্র তাঁর; সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত দয়ালু ও বরকতময়। ৫৫. (অতএব) তোমরা (একান্ত) বিনয়ের সাথে ও চুপিসারে শুধু তোমাদের মালিক (আল্লাহ তায়ালা)-কেই ডাকো; অবশ্যই তিনি (তাঁর রাজত্বে) যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের পছন্দ করেন না। ৫৬. (আল্লাহর) যমীনে (একবার) তাঁর শান্তি স্থাপনের পর (তাতে) তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তোমরা ভয় ও আশা নিয়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই ডাকো; অবশ্যই আল্লাহর রহমত নেক লোকদের অতি নিকটে রয়েছে। ৫৭. তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি বাতাসকে (বৃষ্টি ও) রহমতের (আগাম) সুসংবাদবাহী হিসেবে (জনপদের দিকে) পাঠান; শেষ পর্যন্ত যখন সে বাতাস (পানির) ভারী মেঘমালা বহন করে (চলতে থাকে), তখন আমি তাকে একটি মৃত জনপদের দিকে পাঠিয়ে দেই, অতপর (সে) মেঘ থেকেই আমি পানি বর্ষণ করি, অতপর তা দিয়ে (যমীন থেকে) আমি সব ধরনের ফলমূল বের করে আনি; এভাবে আমি মৃতকেও (জীবন থেকে) বের করে আনবো, সম্ভবত (এ থেকে) তোমরা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. উৎকৃষ্ট যমীন- (তা থেকে) তার মালিকের আদেশে তার (উৎকৃষ্ট) ফসলই উৎপন্ন হয়, আর যে যমীন বিনষ্ট হয়ে গেছে তা কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন করে না; এভাবেই আমি আমার নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করি এমন এক জাতির জন্যে, যারা (আমার এসব নেয়ামতের) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

তাফসীর

আয়াত ৫৪-৫৮

নিশ্চয়ই তোমাদের রব আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয়টি দিনে সৃষ্টি করেছেন .... এমনি করে আমি আয়াতগুলোকে বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি সেই জনপদের জন্যে যারা কৃতজ্ঞতা আদায় করে।'

সৃষ্টির সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সফরের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে প্রসংগক্রমে মানব জীবনকে কেন্দ্র করে আর একটা সফরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যা বিরাজ করছে এমন সব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে যা অতি সহজেই নজরে ধরা পড়ে। অতপর মানব সৃষ্টির ইতিবৃত্ত জানানোর পরপরই আসমান যমীনের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে অনেক তথ্য দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের বাহ্যিক ও অন্তর্দৃষ্টিকে রহস্যে ভরা বিশাল সৃষ্টি জগতের দিকে ফেরানো হচ্ছে, তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান স্রষ্টার নিদর্শনের দিকে। তাদেরকে চিন্তা করতে বলা হচ্ছে আবর্তনশীল এই পৃথিবীতে প্রতিদিন আগত রাত সম্পর্কে, যা দিনের পেছনে পেছনে আসে, দৃষ্টি ফেরাতে বলা হচ্ছে সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজির দিকে, যারা আল্লাহর হুকুমে সার্বক্ষনিকভাবে নিয়ন্ত্রিত, তাদের তাকাতে বলা হচ্ছে মহাশূন্যে প্রবহমান বায়ুর দিকে, যা আল্লাহরই হুকুমে মেঘকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে শুষ্ক মৃত অঞ্চলে, যা বৃষ্টির পানি পাওয়ার সাথে সাথে পুনরায় যিন্দা হয়ে ওঠে এবং গাছ থেকে ফল আবার ফল থেকে গাছ হয়ে সৃষ্টির প্রক্রিয়া বজায় রাখে।

এই হচ্ছে আল্লাহর সাম্রাজ্যের বিশাল চিত্র। মানব সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণনা করার পর সৃষ্টিকুলের মহাকাল ব্যাপী পরিক্রমা জানাতে গিয়ে আগমন প্রত্যাগমনের দুটো দিক সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। অহংকারী মন নিয়ে ও রসূলদের অনুসরণ বাদ দিয়ে শয়তানের অনুসরণ অনুকরণ বিষয়ে কথা বলার পর মানুষের মনগড়া ও জাহেলিয়াতের সেই সকল ধ্যান ধারণার উল্লেখ করা হয়েছে যা আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে মানুষ নিজের হাতে তৈরী করে নিয়েছে। তার পর সকল কিছুর পালাক্রমিক পরিক্রমণ ও পরিভ্রমণ সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে, যাতে মানুষ তাদের পরওয়ারদেগারের দিকে ফিরে আসে। যিনি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন ও নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন, তিনিই সবাইকে তাঁর বিধান দ্বারা পরিচালনা করছেন এবং নিজ ক্ষমতা বলে তাদের সকল প্রয়োজন পুরা করেছেন, সুতরাং গোটা সৃষ্টির তিনিই একমাত্র মালিক এবং তিনিই একমাত্র বিধানদাতা।

সকল সৃষ্টি গভীরভাবে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে তাদের পরওয়ারদেগারের আনুগত্য করে চলেছে। একমাত্র মানুষই মরদূদ ও অহংকারী শয়তানের পাল্লায় পড়ে অহংকারী হয়ে গেছে। আবার যে জিনিসটি মানুষের এই অহংকার প্রকাশ করে দিচ্ছে তা হলো, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা

করে সৃষ্টিকে নিজেদের তৈরী বিধান মতো পরিচালনা করার অপচেষ্টা। এইভাবে এই বিদ্রোহীরা সৃষ্টির বুকে তাদের প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়।

ওই সব দৃশ্যের ছায়াতলে এবং এই ঘটনার মোকাবেলায় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ডেকে বলছেন,

'তাঁকে বিনয় নম্রতার সাথে ও সংগোপনে ডাকো ..... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা যারা এহসান করে তাদের) সাথে রয়েছেন। (৫৬ আয়াত)

সর্বাত্মকভাবে সবাইকে একমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থারই অনুসরণ করতে হবে এবং একমাত্র তাঁরই জন্যে মানব জাতির আনুগত্য নিবেদিত হতে হবে। অর্থাৎ গোটা মানব জাতির মধ্যে তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আপ্রাণ সংগ্রাম করতে হবে। এটা আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক আনুগত্যের একটা অংশ, কেননা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে পৃথিবীতে চালু করার মাধ্যমেই গোটা সৃষ্টিকে আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। এটাই হচ্ছে কোরআনুল করীমের মূল লক্ষ্য। দুনিয়ার সর্বত্র আল্লাহর আইন চালু করা এবং মানুষের অন্তরে এই আসমানী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্মানোই কোরআনের মূল উদ্দেশ্য। আর যে-ই এ লক্ষ্যে কাজ করবে, এর হেফাযতের জন্যে চেষ্টা করবে, এই সহজ সরল জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও সৃষ্টির বুকে এর শ্রেষ্ঠত্ব জাগিয়ে তোলার জন্যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবে, তার ওপর কোরআনের এমন গভীর প্রভাব পড়বে যা দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা দূর করতে পারে না। তখন অবশ্যই সকল সার্বভৌমত্বের মালিক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর চেতনা তার বোধশক্তির গভীরে এমন রেখাপাত করবে, যার প্রতিফলন দেখা দেবে তার চিন্তা চেতনা ও প্রতিটি কর্মকাণ্ডে। এজন্যেই এ প্রসংগে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা ও সকল ব্যাপারে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করার সংকল্প হচ্ছে এমন এক পদক্ষেপ, যা আল্লাহর রসূলের ডাকে সাড়া দিতে তাকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সেই সুমহান ও সর্বশক্তিমান ক্ষমতাধরের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে, যার সামনে অবনত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সৃষ্টির ক্ষুদ্র থেকে বিশাল সবকিছু। পাপিষ্ঠ ব্যতীত এই আনুগত্য মেনে নিতে কেউই ত্রুটি করে না।

এখানে আল কোরআনে আলোচনা এসেছে সৃষ্টির প্রথম বস্তুকে নিয়ে, যাতে করে সুস্পষ্টভাবে সব কিছুর মালিকের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে মানুষ একমাত্র তাঁর দাসত্ব মেনে নেয় এবং হৃদয়ংগম করে যে, তাদের গোটা অস্তিত্বই তাঁর দাসত্বের শেকলে আবদ্ধ। কেননা একমাত্র এভাবেই তারা পরিপূর্ণ তৃপ্তির সাথে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণের স্বাদ পেতে পারে। এহেন পরিতৃপ্ত বান্দা তার চারিদিকের পরিবেশ পরিস্থিতি ও আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টি রহস্য বুঝতে পারে, আর তখনই তাঁর ডাকে যথাযথভাবে সে সাড়া দিতে পারে।

এটা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণই নয়, বরং এর তত্ত্ব সেই বান্দাই বুঝতে পারে যে কোরআনে কারীমের দেখানো পদ্ধতি অবলম্বন করে বুঝতে চায় যে, গোটা সৃষ্টি মহান স্রষ্টার দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং সবাই একমাত্র তাঁরই হুকুমে চলছে। আর এভাবেই সৃষ্টির সব কিছু সুখে দুঃখে, সংকটে সচ্ছলতায় গভীরভাবে বুঝতে পারে তাঁর হুকুম ও তাঁর ফয়সালার তাৎপর্য। আসলে এ হচ্ছে আলাদা এক উপলব্ধি, এ শুধু বুদ্ধিগত যুক্তি প্রমাণ দ্বারা অর্জন করা যায় না। এই বুদ্ধিগত যুক্তির সাথে সব কিছু থেকে সাড়া পাওয়ার মধ্যে রয়েছে এক অকল্পনীয় স্বাদ, পরম প্রশান্তি ও সহজ সরল এক অভিনব আনন্দ। এইভাবে ঈমানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপগুলো হয়ে উঠেছে বলিষ্ট থেকে আরো বলিষ্ট।

এ স্বাদ সৃষ্টি হয় দুটো জিনিসের সমন্বয়ে, দাসত্ব ও প্রভুত্ব। আল্লাহ তায়ালা সবার করুণাময়, প্রতিপালক ও মালিক। আর আমরা সবাই তাঁর অনুগত ও অতি প্রিয় বান্দা। যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর সন্তোষপ্রার্থী ও তাঁর হুকুমের সার্বক্ষণিক অনুগত। আন্তরিক মহব্বতের সাথে এই স্বতস্ফূর্ত গোলামী করার মধ্যে রয়েছে এক অবর্ণনীয় স্বাদ। যেহেতু কোনো জবরদস্তির কারণে এ গোলামী নয় এবং বাধ্যবাধকতার কারণেও এ আনুগত্য নয়, বরং অন্তরের স্বাভাবিক তাগিদেই এই আনুগত্য মেনে নেয়া হয়। সুতরাং, হে ভ্রান্ত দিশেহারা মানবজাতি, আল্লাহর হুকুম থেকে পালানোর চেষ্টা যেন কোনো অবস্থাতেই না করা হয় এবং আল্লাহর হুকুমকে সমাজে চালু করা কঠিন মনে করে নির্জনে কিছু নামায কালাম পড়াকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে না করা হয়। কারণ, আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সঠিক অর্থে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়। আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করা এমন একটা বিষয়, যা মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি দেয়। এর মাধ্যমে আত্মসমপর্পণ একমাত্র সুমহান ও মর্যাদাপূর্ণ আল্লাহরই জন্যে নিবেদিত হয়।

এই আত্মসমর্পণ বা নিশেষে আল্লাহর কাছে বিলিয়ে দেয়ার নামই ঈমান। এর মধ্যেই জীবনের সঠিক মুল্যয়ন। এই গোলামীর নামই হচ্ছে ইসলাম। জীবন এবং আত্মার প্রশান্তি এই গোলামীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আত্মসমর্পণের এই মূলনীতিকে সদা সর্বদা টিকিয়ে রাখতে হবে ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে জীবনের সকল সংকট সমস্যায় এবং সকল ক্ষেত্রে। প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই স্বতস্ফূর্তভাবে এই অনুভূতি আসতে হবে। ইসলামী পোশাক আশাক, নিয়ম নীতি ও বিধান তথা সকল কাজে এই আত্মসমর্পণ বোধ পয়দা হতে হবে। আর তখনই কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোরআনে করীমে আসা নির্দেশাবলী, আইন কানুন ও নিয়ম নীতির তাৎপর্য বুঝা সহজ হবে।

আসমান যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টির তত্ত্ব

'নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে ...... হাঁ, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও মহা বরকতময় বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক।' (আয়াত ৫৮)

নিশ্চয়ই তাওহীদ বিশ্বাসসীদেরকে একথা ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এমন ক্ষমতা দেননি যে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে কল্পনা করতে পারবে অথবা তাঁর কর্মপ্রক্রিয়া বুঝতে পারবে। আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা অতি পবিত্র, তাঁর সমকক্ষ অথবা তাঁর সাথে তুলনীয় কেউ নেই। এজন্যে তাঁর কোনো প্রতিকৃতি বা ছবি বানানোর ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। মানুষের যাবতীয় ধারণা কল্পনা তো আবর্তিত হয় শুধুমাত্র তারই চেনা জানা সৃষ্টিজগত ও দেখা আকৃতি প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে, যখন আল্লাহ তায়ালা এসবের কোনোটার মতোই নন, তখন কোনো নির্দিষ্ট জিনিস দিয়ে কেমন করে সে তাঁকে চিনতে পারবে? আর তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা করা তো দূরের কথা, তাঁর সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই কি মানুষ সঠিক জ্ঞান রাখে? তার আশপাশের বস্তুগুলোর মধ্যে আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলোর ওপর চিন্তা করতে করতেই তো তার জীবন শেষ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে আল্লাহর সাম্রাজ্য ও তাঁর বিস্তৃতির এক উপমা।

এভাবে চিন্তা করলে পর পর যে সব প্রশ্ন আসতে থাকে তা হচ্ছে, কেমন করে আল্লাহ তায়ালা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন? কেমন করে তিনি সমাসীন রয়েছেন তাঁর সিংহাসনে? কেমন সে 'আরশ' (সিংহাসন) যেখানে আল্লাহ তায়ালা সমাসিন হয়েছেন? এই ধরনের অনেক

প্রশ্নই মনের কোণে উদিত হয়ে থাকে, যা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের মূলনীতির পরিপন্থী। এর জবাবও কেউ কোনো সংজ্ঞা দিয়ে দিতে পারবেনা এটা শুধু অনুভবের বিষয়। এটা শুধু সে-ই অনুভব করতে পারবে যে সত্যিকার আন্তরিকভাবে ইসলামী মূলনীতি মেনে চলতে চায়। দুঃখের বিষয়, ইতিহাসে দেখা যায় বহু ইসলামী চিন্তাবিদ শুধু শুধু এ বিষয়ে অনেক চিন্তা-গবেষণা করে গেছেন। এ বিষয়ের ওপর গবেষণা আসলে মুসলমানরা শুরু করেনি এটা সংক্রামক ব্যাধির মতো গ্রীক দর্শন থেকে আরব দেশে এসেছিলো।

এরপর দেখুন আল্লাহর বাণী– ছয় দিনে তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন– এটাও একটা রহস্য, যা কোনো মানুষ দেখেনি এমনকি আল্লাহর সৃষ্ট আর কেউই এই সৃষ্টি কাজ দেখেনি। সুতরাং এ বিষয়ে যা কিছুই বলা হয়েছে তার পেছনে কোনো যুক্তি বা নিশ্চিত প্রমাণ নাই।

তবে ওপরের আয়াতে এতোটুকু বুঝা যাচ্ছে যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিক্রিয়া ছয়টি পর্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে এবং ছয় প্রকারে বা ছয়টি সময়ে চলেছে এই সৃষ্টিক্রিয়া। আর এমনও হতে পারে যে, আল্লাহর দিনগুলোর মধ্যে যে বিশেষ ছয়টি দিনে এসব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, সে দিনগুলোকে আমাদের সময়ের মাপ অনুযায়ী পরিমাপ করা যাবে না, যার দ্বারা আজ আকাশের গ্রহ উপগ্রহের গতি প্রকৃতির আন্দাজ করা হচ্ছে। এখনকার গ্রহ-উপগ্রহের আবর্তনের ওপর ভিত্তি করে কোনো আন্দাজ এই জন্যে করা যাবে না যে, যখন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি কাজ চলছিলো তখন তো ওই সব গ্রহ উপগ্রহ বর্তমানই ছিলো না যেহেতু আকাশেই তো ওইগুলোর অবস্থান। সুতরাং আকাশ না থাকলে ওগুলো কোথায় ছিলো? হয়তো ছিলো অন্য কিছুর অস্তিত্ব, কিন্তু সে অন্য কিছু যে কী তাও আমাদের জানা নাই। আর এ আয়াত এবং এ বিষয়ে আরো যেসব তথ্য আছে, সে সম্পর্কে যে চিন্তা ভাবনা করা হয় তা শুধু আন্দায অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আজকে এই সব আন্দায অনুমানকে 'বিজ্ঞান' বলে চালানো হচ্ছে। মুলত এগুলো কোনো বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞান তো হচ্ছে অজানাকে জানার জন্যে নিরন্তর এক গবেষণা, কিন্তু এভাবে যখন এই গবেষণা চরমভাবে বস্তুবাদী চেতনায় পরিণত হয় তখন তা হয়ে যায় বিজ্ঞানের সামনে আত্মা বা রূহের পরাজয় স্বীকার। এতে বস্তুজগতের জ্ঞান গবেষণার কাছে আধ্যাত্মিকতার চিন্তা-বিশ্বাস তুচ্ছ বিষয়ে পরিণত হয়। কিন্তু যে বিষয়টিকে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকরা বাস্তব বিজ্ঞান বলে দাবী করছে তা নিছক কল্পনা ও অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্যে দেখা যায় বৈজ্ঞানিক সত্য বলে যে সব বিষয়কে দাবী করা হয়েছে তার অনেকগুলো ইতিহাসে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন পৃথিবীর চারিধারে সূর্য ঘুরতো মনে করা হতো, পরে এ তথ্য ভুল বলে স্বীকার করে বলা হলো পৃথিবী সূর্যের চারিধারে ঘুরে। এ বিষয়ে আল কোরআন বলে, 'সব কিছুই নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণরত রয়েছে।' এই বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিকরা বাধ্য হয়ে এ তথ্যটিকেও অবশেষে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে!(১)

এ আলোচনা থেকে আমরা যে সঠিক তথ্যটি পেলাম তাতে আল কোরআনে পরিবেশিত তথ্যের ওপর নতুন অন্য কোনো কিছু যোগ হয়নি যাতে করে আমরা কোরআনকে নিয়ে সৃষ্টির দৃশ্যমান এলাকায় সুন্দর ও প্রাণবন্ত সফর করতে পারি এবং গুপ্ত তথ্যও লাভ করতে পারি।

---

(১) ইদানীং মহাকাশ অভিযানে এমন সব তথ্য আবিষ্কার হচ্ছে– যা আগের বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেই মিথ্যা প্রমাণ করে দিচ্ছে।–সম্পাদক

'নিশ্চয়ই তিনিই তোমাদের রব, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয়টি দিনে সৃষ্টি করেছেন .... মহা বরকতময় সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা। (আয়াত ৫৪)

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এ মহাবিশ্বকে বিশাল ও বিস্ময়কর করে সৃষ্টি করেছেন। আর যিনি এর সৃষ্টি তিনিই একে পরিচালনা করছেন এবং এর মধ্যকার সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি রাতকে ঢেকে দেন দিন দ্বারা এবং একটির বিদায়ের সাথে সাথেই অপরটি এসে যায়। এই পর্যায়ক্রমিক আগমন ও নির্গমনের ধারা নিরন্তর চলছে। এ মহাকাশের মধ্যে রাত আসছে দিন শেষ হওয়ার সাথে সাথে। আর যিনি এ সবকে নিয়ন্ত্রণ ও আবর্তন করে চলেছেন তিনিই চাঁদ সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্রকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেছেন। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সবকিছুর ওপর তদারককারী, তাদের পরিচালক। এ সবকিছুকে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি 'তোমাদের রব' অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তিনিই তোমাদের রব হওয়ার অধিকার রাখেন, এ ক্ষমতাও একমাত্র তাঁর। তিনি তোমাদেরকে তাঁর পথে পরিচালনা করেন, একত্রিত করেন তোমাদেরকে তাঁরই ব্যবস্থাপনার মধ্যে, তাঁর নিজ ইচ্ছা ও মেহেরবানীতে তিনি তোমাদের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করেন এবং তাঁর যুক্তি বুদ্ধি ও ফয়সালা অনুসারে তোমাদের মধ্যে তিনি সকল বিষয়ের মীমাংসা করেন। তিনিই সৃষ্টিকারী ও হুকুমদানকারী.... আর যেমন তাঁর সাথে সৃষ্টি কাজে তাঁর কোনো সহযোগী নেই, তেমনি করে হুকুম দান করার কাজেও তাঁর শরীকদার কেউ নেই। এটাই হচ্ছে এখানকার আলোচনার সারকথা.........

এখন আসছে সার্বভৌমত্ব, প্রতিপালন ও শাসনকর্তৃত্বের পশ্নটি। এসব বিষয়ে বলা হয়েছে, আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাই একমাত্র মালিক। অপরদিকে মানুষের মর্যাদা হচ্ছে, দাসত্ব ও আনুগত্যদানের মর্যাদা, জীবনে তাদের প্রয়োজনেই তাদেরকে তাঁর আইন কানুন মেনে চলতে হয়। এ বিষয়ের দিকেই আলোচ্য প্রসংগের ইংগিত বুঝা যাচ্ছে, যা লেবাস পোশাক ও খাদ্যকে সামনে রেখে বর্ণিত হয়েছে। সূরায়ে আনয়াম-এও একইভাবে গবাদি-পশু সম্পর্কিত রীতি নীতি ও নযর মানত ইত্যাদি বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে কথা বলা হয়েছে।

আমরা যেন সেই মহান লক্ষ্যকে ভুলে না যাই, যা বর্ণনা করা আল কোরআনের মূল লক্ষ্য। আর তা হচ্ছে– যেন আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, তার মধ্যকার শক্তি, প্রচন্ড গতি ও একে অপরকে শক্তি যোগানোর যে আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে সে সবের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে তাকাই এবং একটু গভীরভাবে 'চিন্তা' করি। কারণ যে মহান উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা বুঝার জন্যে অবশ্যই এসব বিষয়ের ওপর মানুষকে চিন্তা করতে হবে।

মহাকাশে পরিভ্রমণরত গ্রহাদির আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলশ্রুতিতে এই যে রাত-দিনের আনাগোনা, এ নিয়ে চিন্তা করলে অবশ্যই মানুষের মধ্যে সঠিক চেতনা জাগে। তাই বলা হচ্ছে, রাত দ্রুতগতিতে চলে দিনকে ধরে ফেলে, অর্থাৎ যেন দুরন্ত চেষ্টা করেই তার দিনকে ধরতে হয়। এ হচ্ছে এমন এক হুকুম যা পালন না করে কারো পক্ষে স্থির হয়ে থাকা সম্ভব নয়। অবশ্যই পরস্পর পেছনে চলতে হয়। একই সাথে তারা কখনও চলতে পারবে না। কোনো শক্তি এমন নেই যা রাত ও দিনের এই কঠিন নিয়ম ভেংগে দিতে পারে। বিষয়টা চিন্তা করতে গেলে হয়রান হয়ে যেতে হয়, কিভাবে চলছে এ মহা বিশ্ব! কী মহা প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যেই এসব সৃষ্টি করেছেন। এ সবের প্রত্যেকটা একটা অপরটার জন্যে অপেক্ষা করে যাচ্ছে।

সব কিছুর মধ্যে বিরাজমান আবর্তন, গতি ও সজীবতা এ এক মহা লীলা খেলা। এর সৌন্দর্য ও সজীবতা, বিশেষ করে বিদগ্ধ হৃদয়ে রাত ও দিনের সুনিশ্চিত আবর্তনের মধ্যে যে চমৎকারিত্ব

ধরা পড়ে তা সেই দয়াময় ও কর্তৃত্বশীল সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাতে সংঘটিত হয়– যাঁর ইচ্ছাই হচ্ছে সব কিছুর ওপর ক্রিয়াশীল। সৃষ্টির এই সৌন্দর্য এত অনুপম যার পুরোপুরি বর্ণনা দেয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

যে সম্মেলন গোটা সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেবে এবং ধ্বংস করবে সেই সকল এলাকাকে, যেখানে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে এবং প্রতিটি সৃষ্টিই এই ধ্বংসলীলার স্বীকার হবে। তবে তার যাবতীয় তথ্য গোপন রহস্য হিসাবে রয়ে গেছে চিরদিন, যার রহস্য জাল কেউ ভেদ করতে পারে না। এই সম্মিলন হবে হঠাৎ করে, যার পূর্বে এর আগমনবার্তা থাকবে সম্পূর্ণ গোপন। নির্দিষ্ট সময়েই ঘটে যাবে সেই মহা বিস্ময়কর পরিস্থিতি, যা হবে গোটা সৃষ্টির জন্যে সম্পূর্ণ নতুন ও চরম ভীতিজনক। তখন আর রাত-দিনের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। কেননা পার্থিব জীবনেই রাত ও দিনের প্রয়োজন এবং এখানেই এদের পার্থক্য বুঝা যায়। জীবনকে আরামদায়ক ও গতিশীল রাখার জন্যেই রাত ও দিনের দুটি অবস্থাকে আল্লাহ তায়ালা অপরিহার্য বানিয়েছেন।

এমনি করে এই জীবনের জন্যে প্রয়োজন সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজির। এগুলোও এক প্রকার জীবিত সত্ত্বা। এগুলোর মধ্যেও রয়েছে প্রাণ প্রবাহ, এরা আল্লাহর অনুগত এবং তাঁর হুকুম পালন করে চলেছে। এরা সর্বদাই তাঁর সামনে অনুগত ও বিনয়ী থাকে। সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহর হুকুম পালন করতে এদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। জীবন্ত প্রাণী যেমন নড়ে-চড়ে বেড়ায় এবং আল্লাহর প্রবর্তিত আইন কানুন মেনে চলে, তেমনি করে এরা সবাই সদা সর্বদা আল্লাহর কথা মতো চলে। এদেরকে কাউকে নিজের ইচ্ছামতো কোনো কিছু করার অধিকার বা ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

এসব দৃশ্য যখন মানুষের মানসপটে ভেসে ওঠে, তখন তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। তার বিবেকে প্রচন্ড সাড়া জাগে এবং সে আল্লাহর কাছে আনুগত্য ভরা মন নিয়ে নুয়ে পড়ে এবং যতোদিন সে জীবিত আছে, ততোদিন সে অনুগত থেকে যায়। আর এই হচ্ছে আল কোরআনের মহাশক্তির তেলেসমাতি। যে এ মহাগ্রন্থকে ধীর স্থিরভাবে অধ্যয়ন করবে ও বুঝার চেষ্টা করবে, অবশ্যই তাকে এ গ্রন্থ পথ দেখাবে– এ শক্তি কোনো মানুষের কথায় থাকা সম্ভব নয়। এ পাক কালাম মানুষের প্রকৃতিকে আকর্ষণ করে কথা বলে এবং এমন অভিনব পদ্ধতিতে কথা বলে যে তার প্রভাব থেকে কদাচিত কেউ দূরে সরে যেতে পারে, যেহেতু এ পাক কালামের কথাগুলো পাক-পরওয়ারদেগারের নিজস্ব কথা, যিনি অন্তরের সব কথা জানেন এবং প্রকৃতির সকল গোপন রহস্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত।

আল্লাহর শেখানো যেকেরের পদ্ধতি

আলোচনার ধারা এ পর্যন্ত গড়ানোর পর এবং সৃষ্টিজগতের মধ্যে অবস্থিত জীবন্ত এসব কিছুর সংস্পর্শে এসে মানুষের অজান্তেই তার ওপর আল কোরআনের অমোঘ প্রভাব পড়তে থাকে এবং সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার নিদর্শনগুলো তার মনে সাড়া জাগাতে থাকে। আর তখনই সে আনুগত্য ভরা মন নিয়ে তার আল্লাহর সামনে মাথানত করে দেয়। তখনই সে বুঝতে পারে যে, তার প্রভু-পরিচালক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নয় এবং তাঁকে ভক্তি ভরে ও বিনয়ের সাথে ডাকতে শুরু করে, আর তখনই তাদের জন্যে তাঁর পরিচালনা ও প্রতিপালন ক্ষমতাকে সে মেনে নিতে পারে। অতএব বলা হচ্ছে, তাঁর দাসত্বের সীমার মধ্যে যেন সে দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করে। তাঁরই রাজ্যে বাস করে তারা যেন কোনো সীমা লংঘন না করে এবং তাদের সেচ্ছাচারিতা চরিতার্থ করতে গিয়ে আল্লাহর আইন তরক করে সেই পৃথিবীতে যেন অশান্তি না ঘটায় যে পৃথিবীকে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য সৃষ্টি দ্বারা তাদের বসবাসের উপযোগী বানিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'ডাকো তাকে বিনয়ের সাথে ও চুপে চুপে .... অবশ্যই তিনি এহসানকারীদের সাথে আছেন।' (আয়াত ৫৬)

এ আয়াতে মানুষকে শেখানো হয়েছে যেন মহা দয়াময় আল্লাহর কাছে পরম মিনতির সাথে তার অন্তরের আকুতি জানায়। নেক পথে থেকে, নেক কাজ করে সে যেন বিনয়াবনত মন নিয়ে আল্লাহর কাছে গিরিয়া যারি করতে থাকে, ডাকে যেন চুপে চুপে, চীৎকার করে নয়, প্রকাশ্যেও নয়। মহান আল্লাহর দরবারে কিভাবে প্রার্থনা জানাতে হবে তা তিনি নিজেই শিখিয়ে দিচ্ছেন। জানাচ্ছেন যে, চুপে চুপে ও ভক্তি গদগদ কণ্ঠে কাকুতি মিনতি করে তাঁর কাছে মনের ভাব প্রকাশ করাই গোলাম ও প্রভুর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করার বেশী উপযোগী ও বেশী আকর্ষণীয়।

মুসলিম শরীফ আবু মূসা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে একটি হাদীস এনেছেন। তিনি বলেন, 'আমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম (অন্য রেওয়ায়াতে আছে, যুদ্ধাভিযানে ছিলাম)। এ সময়ে আমাদের অনেকে জোরে জোরে তাকবীর (আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব সূচক কথা– আল্লাহু আকবর ধ্বনি) দিচ্ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'হে জনগণ, নরম হও; নরম আওয়াযে ডাকো এবং বিনয়সহকারে ডাকো, তাঁকে তোমাদের নিজেদের জন্যে (নিজেদের উপকারার্থে), তোমরা তো কোনো বধির সত্তাকে ডাকছো না বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছো না। অবশ্যই তোমরা ডাকছ তাঁকে– যিনি শুননেওয়ালা (সর্বদা সব কিছু শুনেন), কাছে আছেন। তিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন।'

এটিই ঈমানী অনুভূতি যে, মহান পরওয়ারদেগার আছেন আমার অতি নিকটে, একান্তভাবে আমার সাথে। প্রিয় নবী (স.) পবিত্র কোরআন পড়ার নিয়ম এবং এ পাক কালাম পেশ করার পদ্ধতি আমাদেরকে জানাচ্ছেন এবং দোয়া করার সময় কাতর কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করা শেখাচ্ছেন, যিনি তাঁর মর্যাদা যথাযথভাবে জানেন। ওই মহান রব্বুল ...... আলামীনের সামনে তিনি চীৎকার করে কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন, শরম লাগে তাঁর কাছে বড় আওয়াযে দোয়া করতে, যিনি সঠিকভাবেই তাঁর নৈকট্য অনুভব করেন তাঁর কাছে উচ্চস্বরে চাওয়ার প্রয়োজন তিনি মনে করেন না।

এইভাবে নিম্নস্বরে তাঁর কাছে চাওয়ার সময় এবং অনুনয় বিনয়ের সাথে তাঁর কাছে অন্তরের কথাগুলো পেশ করতে গিয়ে মোমেনের যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, তা তাকে অন্যায় কাজ ও ব্যবহার থেকে বাঁচায় এবং আল্লাহর রাজ্যে বিদ্রোহাত্মক ও সীমালংঘনকর আচরণ করা থেকে রক্ষা করে, রক্ষা করে জাহেলী যুগের অভ্যাস অনুসারে অহংকার করতে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে চূড়ান্ত ফয়সালাদাতা মানতে। যেমন করে নিজেদের মনগড়া ব্যবস্থা চালু করে তারা পৃথিবীর বুকে অশান্তি ছড়ায় অথচ তাঁর বিধান দ্বারা অন্যায় অবিচার দূর করে মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেছেন। আর যে ব্যক্তি বিনয় নম্রতার সাথে ও চুপে চুপে আল্লাহকে ডাকে, সে না করে অহংকার, আর না শান্তি শৃংখলা স্থাপিত হওয়ার পর কোনো প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করে। ওপরে বর্ণিত মানুষের যে দুটি অবস্থার কথা বর্ণনা করা হলো, তার মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিদের অন্তরে একমাত্র আল্লাহর ভয় ও মহব্বতের চেতনায় গড়ে ওঠে সংশোধন, মনোভাব। আর আল কোরআনের শিক্ষা ও পদ্ধতি মানুষের অন্তরের ব্যাধিকে দূর করে, যেহেতু আল-কোরআনের এসব পদ্ধতি তাঁরই দান, যিনি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সকল সূক্ষ্ম ও গোপন বিষয়ের খবর রাখেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর ডাকো তাঁকে ভয় ও আশা আকাংখা নিয়ে।'

অর্থাৎ তাঁর ক্রোধ ও শাস্তির ভয় থাকতে হবে, সাথে সাথে তাঁর সন্তুষ্টি ও প্রতিদানের আশা আকাংখাও মনের মধ্যে রাখতে হবে। তাহলেই (দেখতে পাবে)–

'অবশ্যই আল্লাহর রহমত মোমেনদের খুব কাছে।'

যারা আল্লাহর যাবতীয় বিধি নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে এমনভাবে আনুগত্য করে যেন তারা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাকে দেখছে। আর যে ব্যক্তি এতোখানি মনে করতে না পারে, সে এতোটুকু অবশ্যই মনে করবে যে তিনি তাকে দেখছেন। এই কথাটাই নবী (স.) মোমেনদের গুণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

মেঘ, বায়ু ও ফল-ফসলের মাঝে আল্লাহর নিদর্শন

আবারও আলোচনার এ ধারা এবং বর্ণনাভংগি মানুষের অন্তরের চোখের সামনে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্য থেকে আর একটি পাতা খুলে দিচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, বে-খেয়াল মানুষ এ দৃশ্য দেখেও দেখছে না, অন্যমনস্ক হয়ে চলে যাচ্ছে এসব রহস্য ভরা দৃশ্যের পাশ দিয়ে। এসব বিস্ময়কর দৃশ্যের মধ্য থেকে অহরহ যে সব কথা ভেসে আসছে তার উদাসীনতার কারণে তা সে শুনতে পায় না, এর থেকে তার মনে কোনো চেতনাও জাগে না। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ রহস্য ভরা পাতা আল্লাহর অপার মেহেরবানীর কথা জানায়। আল্লাহর রহমতের এক উত্তম নমুনা হচ্ছে এ যেন মুষলধারে নেমে আসা বৃষ্টিধারা, মনোরম ফসল এবং শুষ্ক ঠনঠনে মৃত মাটির মধ্যে বৃষ্টি পাওয়ার পর নব জীবনের আগমন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি পাঠিয়ে দেন সুসংবাদবাহী তাঁর রহমতের বারিধারা বর্ষণের পূর্বে ...... এমনি করে আমি বের করবো মৃতদেরকে (একথাগুলো তোমাদের জানানো হচ্ছে) যাতে করে তোমরা চিন্তা করো।'

উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, বৃষ্টির পূর্বে রহমতের প্রতীক স্বরূপ বায়ুর আগমন মৃতভূমির পুনরায় জীবন লাভ ও সবুজ ফল ফসলে মাঠ ভরে যাওয়া ইত্যাদি সবই সৃষ্টির বুকে আল্লাহর রহমতের বিভিন্ন চিহ্ন মাত্র এবং তাঁর কর্তৃত্ব, শাসন ও তাঁর পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনার পরিচায়ক। এসব কিছুই মহান আল্লাহর কীর্তি, তিনি ছাড়া মানুষের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তারকারী আর কেউ নাই। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই রেযেকদাতা এবং তিনিই সেই সব উপকরণাদি সরবরাহকারী তিনিই। তাঁর বান্দাদের জন্যে সকল খাদ্যশষ্য উৎপন্ন করেছেন। প্রতি মুহূর্তে বায়ু সৃষ্টি হচ্ছে এবং এ বায়ু বহন করছে পানি ভরা মেঘমালাকে এবং কিছু দিন পরপর এই মেঘমালা বর্ষণ করছে আল্লাহর রহমতের বারিধারা। কিন্তু এর প্রত্যেকটির একের সাথে অপরের এই যে নিকট সম্পর্ক– এসব আল্লাহরই মেহেরবানীতে সংঘটিত হচ্ছে। এ ক্রিয়া তো বরাবরই চলছে, আল কোরআন নতুন করে এ বাস্তবতাকে এমনভাবে তুলে ধরছে যেন আমাদের চোখগুলো সেগুলোকে বাস্তবে দেখছে।

আল্লাহ তায়ালাই মহান মালিক, যিনি নিজ রহমত বলে ও সুসংবাদকারী হিসাবে ওই বায়ুপ্রবাহ পাঠাচ্ছেন এবং সৃষ্টির মধ্যে যে সব জিনিস আল্লাহর শক্তি হিসাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়, সেগুলোর মধ্যে এই বায়ু একটি অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রকৃতি নিজে নিজেই কোনো জিনিস গড়ে তুলবে এবং মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী হিসাবে প্রকাশ পাবে তা কখনও হতে পারে না বরং ইসলাম মোমেনদেরকে এই বিশ্বাস ও চেতনা দিয়েছে যে, গোটা বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে আশ্চর্যজনক যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে তা আল্লাহর ইচ্ছাতে এবং পূর্ব-পরিকল্পনা মাফিক সংঘটিত হচ্ছে। তিনি যে নিয়ম করে দিয়েছেন, সারা বিশ্বের সব কিছু সদা সর্বদা সেই নিয়মের অধীনেই

কাজ করে যাচ্ছে, যা দেখে আপাতত হয়তো কারো কাছে মনে হতে পারে যে, এসব নিজের থেকেই চলছে। সুতরাং এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, সাগর মহাসাগরের বুক থেকে বাষ্পীভূত হয়ে যে মেঘমালা পানি বহন করে স্থল ভাগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং বিশেষ বিশেষ এলাকায় বৃষ্টি বর্ষণ করছে, তা সবই আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনার ফলেই সংঘটিত হয়ে চলেছে। কোথায় কতোটুকু পানি বর্ষণ করতে হবে সবই তাঁর জানা এবং তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে।

আল্লাহর হুকুমে বায়ু মেঘমালা বহন করে নিয়ে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে এবং তাঁরই আইন অনুযায়ী এসব বায়ু বৃষ্টি বর্ষণ করে, বর্ষণ করে এক বিশেষ পরিমাপ মতো। তারপর মৃত অঞ্চলগুলোকে বৃষ্টিধারা সজীব করে তোলে, মরু অঞ্চলকে পরিণত করে মরুদ্যানে এবং অনুর্বর জমিকে উর্বর জমিতে। এই সব এলাকায় এতো পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় যে, তার ফলে এসব জমিতে প্রয়োজনীয় সব রকমের ফলমূল উৎপন্ন হয়, যা সে এলাকার মানুষ ও জীবজন্তুর জন্যে প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভংগি হচ্ছে, সৃষ্টির সূচনা ও অগ্রগতিকালে যতো প্রকার পরিবর্তন এসেছে এবং যতো উন্নতি হয়েছে তা যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে, এজন্যে এসব পরিবর্তনের পথে যতো বাধাই এসেছে, কোনো কিছুই তা রোধ করতে পারেনি। যেমন করে কোনো কারখানার উৎপাদনে যতো বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হোক না কেন, সবই ধীরে অপসারিত হয়ে যায়। যন্ত্র-নির্ভর মানুষেরা ধারণা করে, গোটা বিশ্ব একটি যন্ত্র মাত্র। এ যন্ত্র বানিয়ে দিয়ে এর সৃষ্টিকর্তা এখন পুরোপুরি অবসর নিয়ে নিয়েছেন এবং জীব জগৎসহ অন্যান্য যতো সৃষ্টি আছে সবাইকে নিজে নিজে চলার জন্যে তিনি দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছেন যেমন করে অন্ধভাবে চলছে প্রাকৃতিক সকল বস্তু!

কিন্তু মোটেই এমন নয়, বরং এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এ সৃষ্টি জগতকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, যা সুনির্দিষ্ট এক সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। তারপর সব কিছুর জন্যে বানিয়েছেন একটি স্থায়ী আইন ও কর্মপদ্ধতি যা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু কোনো বস্তু সুনির্দিষ্ট একটা সময় ও নিয়মের অধীনে সঞ্চালিত হচ্ছে, যা গোটা আবর্তনশীল বিশ্বের সাথে সম্পর্কিত এবং এক বিশেষ নিয়মের অধীন কার্যরত। এই নির্দিষ্ট নিয়মে থাকার কারণেই বুঝা যায় যে, এর পেছনে আছেন একজন নিয়ন্তা যাঁর ইচ্ছায় সব কিছু চলছে এবং ততোদিন চলতে থাকবে যতোদিন তিনি চালাতে চাইবেন।

এ হচ্ছে এক জীবন্ত ও বাস্তব চেতনা, যা হতাশা থেকে সেই হৃদয়কে জাগিয়ে তোলে, যে বস্তুবাদীতার বিষাক্ত ছোবলে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হয়ে গেছে। সে নিজেকে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার কাছে চরম অসহায় মনে করে এবং মনে করে তার কোনো কিছুই করার নেই। সে তাকে দেয়া শক্তি সমর্থ কোনো কাজে লাগিয়ে সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে বেকুবের মতো বলে, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। নিজের দায়িত্বহীনতার কারণে যখনই কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তখনই সে বলে, যা ঘটেছে আল্লাহর নিয়মেই ঘটেছে। তাদেরকে দেয়া মানবিক শক্তি সামর্থ জ্ঞান বুদ্ধিকে অপমান করে, বিবেকের দাবীকে দলিত মথিত করে, পক্ষান্তরে যারা মোমেন তারা তাদেরকে দেয়া শক্তি সমর্থকে আল্লাহ দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী কাজে লাগায়, তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করে। তবে তারা ফলাফলের ব্যাপারে আল্লাহকেই চূড়ান্ত ফয়সালাকারী হিসাবে বিশ্বাস করে,

আল্লাহর প্রশংসায় সে থাকে নিমগ্ন, তাঁর স্মরণ তাকে অভিভূত ও সতর্ক রাখে এবং যন্ত্রের মতো তাকে কর্তব্য পালন থেকে উদাসীন বানায় না এবং আল্লাহকে এক মুহূর্তের জন্যেও।

এহেন চেতনা হৃদয় মনকে করে তোলে, মানুষের অন্তর প্রাণকে করে উজ্জীবিত, বুদ্ধিকে করে শানিত এবং নতুনভাবে সৃষ্টিকর্তার সাথে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। বিশ্বপালক মহান যে সত্ত্বা তাদেরকে প্রত্যক্ষ করছেন তাঁর সকল ইচ্ছাকে কার্যকর করার জন্যে সে বদ্ধপরিকর হয়ে যায়।

এমনি করে আল কোরআন মানুষের জীবনের রহস্য জানাতে গিয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিচ্ছে যে, পৃথিবীতে তার আগমন সম্পূর্ণ আল্লাহরই ইচ্ছায় এবং এক বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং আখেরাতের দিকে তার যাত্রা এবং শেষ বিচারের দিনে পুনরুত্থান তাও তাঁরই ইচ্ছা ও বিশেষ উদ্দেশ্যে– সেই নিয়মেই এ মহা যাত্রা সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে, যেভাবে জীবনের দিকে তার প্রথম আগমন ঘটেছিলো। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'এমনি করেই আমি, মহান আল্লাহ, যিন্দা করবো মৃতদেরকে, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারো।'

মৌলিকভাবে মানুষের আকার আকৃতি, চেহারা, পোশাক আশাক সবই একই রকম একথাটাকেই এখানে বিশেষ গুরুত্বসহকারে পেশ করা হয়েছে। এ বিস্ময় মানুষের জন্মলগ্ন থেকে একই প্রকার, অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে জন্ম ও পৃথিবীতে আগমনের ধারায় যে একই নিয়ম বিরাজ করছে তা, কারো পক্ষেই বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর সেই একই কায়দায় ও একই নিয়মে পুনরায় তাকে ফিরে যেতে হবে তার যাত্রা শুরুর স্থলে।

মানুষ এ সত্যটাকে তার সামনে অহরহ সংঘটিত হতে দেখেও অবলিলাক্রমে তা ভুলে যাচ্ছে এবং ডুবে রয়েছে নানা প্রকার ভ্রান্তির মধ্যে এবং নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যে!

আলোচনার এ প্রসংগ শেষ হচ্ছে বিশ্ব জগতের সীমা ও মানব জাতির অস্তিত্বের রহস্য সম্পর্কে কিছু কথা পেশ করার মধ্য দিয়ে, বর্ণনা করা হয়েছে অন্তরের ভালো ও মন্দ প্রবণতা সম্পর্কে যে সব অবস্থা মানুষের জীবনে আসে, যা সে দেখে ও শুনে, আর প্রকৃতির বুকে নিশিদিন যা ঘটে চলেছে সেই সব বস্তুকে সামনে নিয়ে এবং সেই সবের ওপর ভিত্তি করেই তার মনের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্তন দেখা দেয়। এক দিকে রয়েছে পবিত্র ও বরকতপূর্ণ এক দেশ যা বের করছে তার উৎপন্ন দ্রব্যকে তারই পরওয়ারদিগারেরই হুকুমে, আর এক দিকে দেখা যায় আর একটা দেশ যা উর্বরতায় মোটেই আশা ব্যঞ্জক নয়, সেখানে যা কিছু পয়দা হয় তার খুবই কম মূল্যবান।

'এমনি করে আমি, বিভিন্ন নিদর্শনাবলীর বর্ণনা পেশ করছি শোকর গোযারে জাতির সামনে।'

পবিত্র অন্তরের উদাহরণ আল কোরআনে যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে হাদীস শরীফেও, পবিত্র (উর্বর) ভূমির সাথে তুলনা করা হয়েছে সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পৃক্ত হৃদয়ের। আর অপবিত্র বা খারাপ মনের উদাহরণ দেয়া হয়েছে অপবিত্র ভূমি এবং অনুর্বর মাটির সাথে। দু'জায়গাতেই অন্তর ও মাটি শব্দ দুটিকে ব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু দুটি থেকে কিছু উৎপন্ন হয়।

এ মানব হৃদয়ের মধ্যে উৎপন্ন চিন্তা ও চেতনা (মানব জাতির প্রয়োজনে) নানাবিধ চেতনা ও নানা কর্মপ্রেরণা। অর্থাৎ আমাদের অন্তরে গড়ে তোলে নানা প্রকার কর্মপ্রবাহ এবং তার গ্রহণযোগ্যতা, আমাদের অন্তরই আমাদের চলার গতি নির্ধারণ করে এবং আমাদের সংকল্প গড়ে

তোলে। এই সংকল্প গড়ে ওঠার পরই আসে নানা প্রকার কর্মকান্ড, বিভিন্নভাবে যার প্রভাব পড়ে বাস্তব জীবনের ওপর। অপরদিকে ভূমি উৎপন্ন করে ফসল ও ফল, যার উপকারিতা, বর্ণ ও স্বাদ বিভিন্ন।

'আর পবিত্র যে দেশ, আল্লাহর হুকুমেই সে দেশে ফসল উৎপন্ন হয়।'

অর্থাৎ সে ফসল পবিত্র, ভালো উপকারী ও সুস্বাদু সহজপ্রাপ্য যা উৎপন্ন করতে বেশী কষ্ট হয় না।

'আর যে ভূমি নিকৃষ্ট মানের, তাতে খুব অল্প ফসলই উৎপন্ন হয়।'

অর্থাৎ সেখানে ফসল উৎপন্ন করতে খুবই বেগ পেতে হয়, বহু পরিশ্রম করেও সেখান থেকে আশানুরূপ ফসল পাওয়া যায় না।

হেদায়াত, আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শনাবলী, ওয়ায-নসীহত ইত্যাদি তেমনি করে মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, যেমন করে মাটির ওপর বৃষ্টির পানি পড়লে মাটি স্বজীব হয়ে ওঠে। এখন যদি কোনো ভালো ও উর্বর অঞ্চলের মতো হৃদয় পবিত্র ও ভালো হয়, তাহলে তার দুয়ার ভালো কথা গ্রহণ করার জন্যে খুলে যাবে এবং উত্তম বীজ পড়ার মতো ভালো ও উপদেশমূলক কথা তার কাছে পেশ করার সাথে সাথে সে তা গ্রহণ করবে, সে পবিত্র হয়ে যাবে এবং বহু কল্যাণের অধিকারী হয়ে যাবে। আর যদি সে বিশৃংখল ও দুষ্ট মানুষ হয় তাহলে তার অবস্থা হবে নিকৃষ্ট ও অনুর্বর জমির মতো– যার ওপর বীজ পড়লে ফসল হতে চায় না। যে জমি হয় বন্ধ্যা ও শক্ত, পানি পড়লে তা নরম হয় না, আর নরম হলেও নিকৃষ্ট মানের চারা গজায় এবং অনেক সময় সে ফসল উপকারের পরিবর্তে অপকারী হয়ে যায়। আবার দেখা যায় উত্তম বীজ ছড়ানো ও উপযুক্ত পরিচর্যা করা সত্তেও ভালো ফসল হওয়ার পরিবর্তে ঝোপ-ঝাড় ও কষ্টদায়ক কাঁটা গজায়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'এমনি করে আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছি আয়াতগুলোকে সেই জাতির জন্যে, যারা শোকরগোযারি করে।

শোকরগোযারি বা কৃতজ্ঞতাবোধ পবিত্র হৃদয়ের অভ্যন্তরে পয়দা হয়। ভাল কাজ গ্রহণ করার দিকে এহেন হৃদয় মানুষকে এগিয়ে দেয় এবং উত্তম ও পবিত্র কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর অবশ্যই যে সব কৃতজ্ঞচিত্ত মানুষ ভালো কাজ করতে পছন্দ করে এবং যে কোনো ভালো জিনিস গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়, তারা আল্লাহর কেতাবের আয়াতসমূহ এবং তাঁর শক্তির নিদর্শনসমূহ দেখলেই তা অন্তর প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে। এসব থেকে ফায়দা হাসিল করে এবং এসব আয়াত থেকে সংশোধন হওয়ার প্রেরণা লাভ করে।

আলোচ্য সূরার মধ্যে ভীতি প্রদর্শন ও উপদেশ দানের সাথে সাথে শোকরগোযারির কথাটা বারবার উল্লেখিত হয়েছে। আর অবশ্যই আমরা পেছনের আলোচনাতে এ বিষয়টাকে একাধিকবার বর্ণনা করেছি এবং প্রসংগক্রমে সামনে আবারও কিছু ব্যাখ্যা দেবো ইনশাআল্লাহ। শোকর গোযারির এই বিষয়টা এ সূরার মধ্যে বর্ণিত বিষয়াদির বেশ বড় রকমের একটা স্থান দখল করে আছে, যেমন আছে ভীতি প্রদর্শন ও উপদেশ দান সম্পর্কিত বহু আয়াত।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥٩﴾ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦١﴾ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ

রুকু ৮

৫৯. আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছি, অতপর সে তাদের বললো, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব কবুল করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই; আমি তোমাদের ওপর এক কঠিন দিনের আযাবের আশংকা করছি। ৬০. তার জাতির নেতারা বললো (হে নূহ), আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি এক সুস্পষ্ট গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) রয়েছো। ৬১. সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আমার সাথে কোনো গোমরাহী নেই, আমি তো হচ্ছি সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে (আসা) একজন রসূল। ৬২. (আমার কাজ হচ্ছে) আমি আমার মালিকের বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবো এবং (সেমতে) তোমাদের শুভ কামনা করবো, (কেননা আখেরাত সম্পর্কে) আমি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এমন কিছু কথা জানি যা তোমরা জানো না। ৬৩. তোমরা কি এতে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো যে, তোমাদের কাছে তোমাদেরই (মতো) একজন মানুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার বাণী এসেছে, যাতে করে সে তোমাদের (আযাব সম্পর্কে) সতর্ক করে দিতে পারে, ফলে তোমরা (সময় থাকতে) সাবধান হবে এবং আশা করা যায় এতে করে তোমাদের ওপর দয়া করা হবে। ৬৪. অতপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় (আরোহণ করে) ছিলো, তাদের সবাইকে (আযাব থেকে) উদ্ধার করেছি, আর যারা আমার আযাবসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের আমি (পানিতে) ডুবিয়ে দিয়েছি; এরা ছিলো (আসলেই গোঁড়া ও) অন্ধ।

রুকু ৯

৬৫. আমি আ'দ জাতির কাছে (পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই এক ভাই হূদকে, সে (তাদের) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব স্বীকার করো, তিনি ছাড়া

أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ

তোমাদের দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই; তোমরা কি (তাঁকে) ভয় করবে না? ৬৬. তার জাতির সরদাররা, যারা (তাকে) অস্বীকার করেছে, তারা বললো, আমরা তো দেখছি তুমি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত আছো এবং আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদেরই একজন। ৬৭. সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আমার সাথে কোনোরকম নির্বুদ্ধিতা জড়িত নেই, বরং আমি (হচ্ছি) সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (আগত) একজন রসূল। ৬৮. (আমার দায়িত্ব হচ্ছে) আমি আমার মালিকের (কাছ থেকে আসা) বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবো, তোমাদের জন্যে আমি একজন বিশ্বস্ত শুভাকাংখী। ৬৯. তোমরা কি (এটা দেখে) বিস্মিত হচ্ছো যে, তোমাদের কাছে তোমাদেরই (মতো) একজন মানুষের ওপর তোমাদের মালিকের কাছ থেকে তোমাদের (আযাবের) ভয় দেখানোর জন্যে (সুস্পষ্ট কিছু) বাণী এসেছে; স্মরণ করো, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা নূহের পর তোমাদের এই যমীনে খলীফা বানিয়েছেন এবং অন্যান্য সৃষ্টির চাইতে তিনি তোমাদের বেশী ক্ষমতা দান করেছেন, অতএব (হে আমার জাতি), তোমরা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহগুলো স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। ৭০. তারা (হূদকে) বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্যেই এসেছো যে, আমরা কেবল এক আল্লাহর এবাদাত করবো এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের বন্দেগী করেছে তাদের বাদ দিয়ে দেবো (এটাই যদি হয়), তাহলে নিয়ে এসো আমাদের কাছে সে (আযাবের) বিষয়টি, যার ব্যাপারে তুমি আমাদের (এতো) ভয় দেখাচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও! ৭১. সে বললো, তোমাদের ওপর তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে আযাব ও ক্রোধ তো নির্ধারিত হয়েই আছে; তোমরা কি আমার সাথে সে (মিথ্যা মাবুদদের) নামগুলোর ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা (এমনি এমনিই)

سَمَّيْتُمُوْهَآ أَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا إِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾ فَأَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَإِلٰى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِيْٓ أَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ وَاذْكُرُوْٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

রেখে দিয়েছো, যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোনো রকম সনদ নাযিল করেননি; (অতএব) তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকবো। ৭২. অতপর (যখন আযাব এলো, তখন) আমি তাকে এবং তার সাথে যেসব (ঈমানদার) ব্যক্তি ছিলো, তাদের আমার রহমত দ্বারা (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে আমি তাদের নির্মূল করে দিলাম, (কেননা) এরা ঈমানদার ছিলো না।

রুকু ১০

৭৩. সামুদ জাতির কাছে আমি (পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই (এক) ভাই সালেহকে। সে (এসে) বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই; তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে হাযির হয়েছে, (আর তোমাদের জন্যে) এ (নিদর্শনটি) হচ্ছে আল্লাহর উষ্ট্রী, একে তোমরা ছেড়ে দাও যেন তা আল্লাহ তায়ালার যমীনে (বিচরণ করে) খেতে পারে, তোমরা তাকে কোনো খারাপ মতলবে স্পর্শ করো না, তাহলে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কঠোর আযাব এসে তোমাদের পাকড়াও করবে। ৭৪. স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তায়ালা আদ জাতির পর তোমাদের (দুনিয়ার) খলীফা বানিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার যমীনে তিনি তোমাদের প্রতিষ্ঠা দান করেছেন, (যার) ফলে তোমরা এর সমতল ভূমি থেকে (মাটি নিয়ে তা দিয়ে) প্রাসাদ বানাচ্ছো, আর পাহাড় কেটে কেটে নিজেদের ঘর-বাড়ি তৈরী করতে পারছো, অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালার এ সব (জ্ঞান ও প্রকৌশল সংক্রান্ত) নেয়ামত স্মরণ করো এবং কোনো অবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালার যমীনে বিপর্যয় ঘটিয়ো না।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا بِالَّذِيْۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٧﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

৭৫. তার জাতির সেসব নেতৃস্থানীয় লোক, যারা নিজেদের গৌরবের বড়াই করতো– অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীর লোকদের– যারা তাদের মধ্য থেকে তার ওপর ঈমান এনেছে– বললো, তোমরা কি সত্যিই জানো, সালেহ আল্লাহ তায়ালার পাঠানো একজন রসূল; তারা বললো (হাঁ), তার ওপর যে বাণী পাঠানো হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি। ৭৬. অতপর (সে) অহংকারী লোকেরা বললো, তোমরা যা কিছুতে বিশ্বাস করো আমরা তা অস্বীকার করি। ৭৭. অতপর, তারা উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেললো এবং (এর দ্বারা) তারা তাদের মালিকের নির্দেশের স্পষ্ট বিরোধিতা করলো এবং তারা বললো, হে সালেহ (আমরা তো উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেললাম), যদি তুমি (সত্যিই) রসূল হয়ে থাকো তাহলে সে (আযাবের) বিষয়টা নিয়ে এসো, যার ওয়াদা তুমি আমাদের দিচ্ছো। ৭৮. অতপর এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প তাদের গ্রাস করে ফেললো, ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো। ৭৯. তারপর সে তাদের কাছ থেকে অন্যদিকে চলে গেলো এবং সে নিজের জাতিকে বললো, আমি আমার মালিকের (সতর্ক) বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের জন্যে কল্যাণও কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা তো কল্যাণকামীদের পছন্দই করো না। ৮০. (আমি) লূতকেও (পাঠিয়েছিলাম), যখন সে তার জাতিকে বলেছিলো, তোমরা এমন এক অশ্লীলতার কাজ করছো, যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের আর কেউ (কখনো) করেনি। ৮১. তোমরা যৌন তৃপ্তির জন্যে নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাও, তোমরা বরং হচ্ছো বরং এক সীমালংঘনকারী জাতি।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ

৮২. তার জাতির (তখন) এ কথা বলা ছাড়া আর কোনো জবাবই ছিলো না যে, (সবাই মিলে) তাদের তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, (কেননা) এরা হচ্ছে কতিপয় পাক পবিত্র মানুষ! ৮৩. অতপর (যখন আমার আযাব এলো, তখন) আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রীকে ছাড়া– সে (আযাব কবলিত হয়ে) পেছনের লোকদের মধ্যে শামিল থেকে গেলো। ৮৪. আমি তাদের ওপর প্রচন্ড (আযাবের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম; (হাঁ) অতপর তুমি (ভালো করে) চেয়ে দেখো, অপরাধী ব্যক্তিদের পরিণাম (সেদিন) কী ভয়াবহ হয়েছিলো।

রুকু ১১

৮৫. আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে (আমি পাঠিয়েছিলাম) তাদেরই ভাই শোয়ায়বকে; সে তাদের বললো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই; তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে, অতপর তোমরা (সে মোতাবেক) ঠিক ঠিক মতো পরিমাপ ও ওযন করো, মানুষদের (দেয়ার সময়) কখনো (কম দিয়ে তাদের) ক্ষতিগ্রস্ত করো না, আল্লাহ তায়ালার এ যমীনে (শান্তি ও) সংস্কার স্থাপিত হওয়ার পর তাতে তোমরা (পুনরায়) বিপর্যয় সৃষ্টি করো না; তোমরা যদি (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনো তাহলে এটাই (হবে) তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। ৮৬. প্রতিটি রাস্তায় তোমরা এজন্যে বসে থেকো না যে, তোমরা লোকদের ধমক (দেবে ভীত সন্ত্রস্ত করবে) এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিরত রাখবে, আর সব সময় (অহেতুক) বক্রতা (ও দোষত্রুটি) খুঁজতে থাকবে; স্মরণ করে দেখো, যখন তোমরা

وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ وَاِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا

بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ

بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۞ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ

لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ

مِلَّتِنَا ۚ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ۞ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا

فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ

يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا

افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ۞ وَقَالَ الْمَلَاُ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۞

সংখ্যায় ছিলে নিতান্ত কম, অতপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন এবং তোমরা (পুনরায়) চেয়ে দেখো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো। ৮৭. আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার ওপর কোনো একটি জনগোষ্ঠী যদি ঈমান আনে, আর একটি দল যদি তার ওপর আদৌ ঈমান না আনে, তারপরও তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা নিজেই আমাদের মাঝে একটা ফয়সালা করে দেন, তিনিই হচ্ছেন উত্তম ফয়সালাকারী। ৮৮. তার সম্প্রদায়ের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক- যারা বড়াই অহংকার করছিলো– বললো, হে শোয়ায়ব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো, অথবা তোমাদের অবশ্যই আমাদের জাতিতে ফিরে আসতে হবে; সে বললো, যদি আমরা ইচ্ছুক না হই তাহলেও (কি তাই হবে)? ৮৯. সেখান থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের (একবার) মুক্তি দেয়ার পর যদি আমরা আবার তোমাদের জীবনাদর্শে ফিরে আসি, তাহলে আমরা (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করবো; আমাদের পক্ষে এটা কখনো সম্ভব নয় যে, আমরা সেখানে ফিরে যাবো, হাঁ আমাদের মালিক যদি আমাদের ব্যাপারে অন্য কিছু চান (তাহলে সেটা ভিন্ন কথা); অবশ্যই আমাদের মালিকের জ্ঞান সব কিছুর ওপর ছেয়ে আছে; আমরা একান্তভাবে আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করি; (এবং আমরা বলি,) হে আমাদের মালিক, আমাদের এবং আমাদের জাতির মাঝে তুমি (সঠিক একটা) ফয়সালা করে দাও, কারণ তুমিই হচ্ছো সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। ৯০. তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোক– যারা (আল্লাহ তায়ালার নবীকে) অস্বীকার করেছে, তারা (সে জাতির সাধারণ মানুষদের) বললো, তোমরা যদি শোয়ায়বের অনুসরণ করো তাহলে তোমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ৯১. (নবীর

فَاَخَذَتۡهُمُ الرَّجۡفَةُ فَاَصۡبَحُوۡا فِیۡ دَارِهِمۡ جٰثِمِیۡنَ ﴿۹۱﴾ الَّذِیۡنَ كَذَّبُوۡا شُعَیۡبًا كَاَنۡ لَّمۡ یَغۡنَوۡا فِیۡهَا ۚۛ اَلَّذِیۡنَ كَذَّبُوۡا شُعَیۡبًا كَانُوۡا هُمُ الۡخٰسِرِیۡنَ ﴿۹۲﴾ فَتَوَلّٰی عَنۡهُمۡ وَقَالَ یٰقَوۡمِ لَقَدۡ اَبۡلَغۡتُكُمۡ رِسٰلٰتِ رَبِّیۡ وَنَصَحۡتُ لَكُمۡ ۚ فَكَیۡفَ اٰسٰی عَلٰی قَوۡمٍ كٰفِرِیۡنَ ﴿۹۳﴾

কথা অমান্য করার কারণে) একটা প্রচন্ড ভূকম্পন এসে তাদের (এমনভাবে) আঘাত করলো যে, অতপর দেখতে দেখতে তারা সবাই তাদের নিজ নিজ ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো। ৯২. যারা শোয়ায়বকে অমান্য করলো, তারা এমন (-ভাবে ধ্বংস) হয়ে গেলো (দেখে মনে হয়েছে), এখানে কোনোদিন কেউ বসবাসই করেনি, (বস্তুত) তারাই সেদিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা শোয়ায়বকে অস্বীকার করেছে। ৯৩. এরপর সে (শোয়ায়ব) তাদের কাছ থেকে চলে গেলো, (যাবার সময়) সে বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে আমার মালিকের বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং আমি (আন্তরিকভাবেই) তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম, আমি কেন এমন সব মানুষের জন্যে (আজ) আফসোস করবো যারা আল্লাহকেই অস্বীকার করে!

তাফসীর
আয়াত ৫৪-৯৩

এখানে আমরা ঈমানের দাওয়াতবাহী নবীদের পবিত্র কাফেলাকে দেখতে পাচ্ছি। এই কাফেলার বৈশিষ্ট্য লক্ষ উদ্দেশ্য এবং তার যাত্রাপথের নিদর্শনসমূহ দেখতে পাচ্ছি। মানব জাতি পৃথিবীতে তার সুদীর্ঘ অবস্থানকালে এই কাফেলার সাক্ষাত বারবার পায়। মানব জাতি এই কাফেলার সাক্ষাত পায় তখনই, যখন সে প্রবৃত্তির লালসার চাপে ও শয়তানের কুপ্ররোচনায় আল্লাহর সরল ও সঠিক পথ হারিয়ে ফেলে। কুচক্রী শয়তান যখন মানুষকে বিপথগামী করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন এই পূত পবিত্র কাফেলা তার সামনে হেদায়াতের আলো ও জান্নাতের সুগন্ধি নিয়ে উপস্থিত হয়। তাকে জাহান্নাম থেকে ও তার প্রাচীনতম শত্রু শয়তান থেকে সতর্ক করে।

এটা একটা চমকপ্রদ দৃশ্য। একটা চিরন্তন ও শাশ্বত সংঘাতের দৃশ্য। সমগ্র ইতিহাস জুড়ে এ সংঘাত বিস্তৃত।

মানব জাতির ইতিহাস এক জটিল সংঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। মানুষ এক পরস্পর বিরোধী জটিল সৃষ্টি। এ সত্ত্বা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী দুটি উপাদান দ্বারা গঠিত। এই দুটি উপাদানের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছে আল্লাহর শক্তি ও পরিকল্পনা। উপাদান দুটো হলো যে মাটি থেকে সে জন্মেছে সেই মাটি এবং আল্লাহর রূহ থেকে প্রদত্ত একটি ফুঁক, যা উক্ত মাটি থেকে মানুষকে তৈরী করেছে। এই মানুষ তার গোটা ইতিহাসের রাজপথ ধরে এগিয়ে যায় বিভিন্ন সংঘাতমুখর উপকরণ ও বিভিন্ন জটিলতার মধ্য দিয়ে। এই প্রকৃতি নিয়ে সে যখন এগিয়ে যায়,

তখন তাকে ওই সব জগতের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়, যার কথা ইতিপূর্বে হযরত আদমের কাহিনীর প্রেক্ষাপটে আলোচনা করে এসেছি। তাকে কোনো না কোনোভাবে চলতে হয় আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা, ক্ষমতা, আধিপত্য, দয়া ও অনুগ্রহ ইত্যাদির সাথে, আল্লাহর সর্বোচ্চ ও ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতাদের সাথে, ইবলীস ও তার সাংগ-পাংগের সাথে, এই দৃশ্যমান বিশ্ব, এ বিশ্বে প্রচলিত রীতিনীতি ও আল্লাহর নিয়ম কানুনের সাথে, পৃথিবীতে বিরাজমান প্রাণীকুলের সাথে এবং অন্যান্য মানুষের সাথে। এই সকল জিনিসের কোনোটির সাথে সংঘাতমুখর এবং কোনোটির সাথে সংগতিশীল স্বভাব নিয়েই তাকে আচরণ করতে হয়।

এই সব সংঘাতপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়েই তার ইতিহাস আবর্তিত হতে থাকে। মানুষের সত্ত্বার সাথে ক্ষমতা ও অক্ষমতা, সততা ও অসততা, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের সাথে যে মিল, বিশ্বজগতে বিরাজমান বস্তুগত উপকরণ ও আধ্যাত্মিক উপকরণগুলোর সাথে যে সম্পর্ক ও আচরণ এবং আল্লাহর নির্ধারিত পরিকল্পনার সাথে যে ব্যবহার করে, তা দ্বারাই তার ইতিহাস নির্মিত হয়। আর এই মারাত্মক জটিলতার ভিত্তিতেই তার ইতিহাসের বিশ্লেষণ করা হয়।

কিন্তু যারা মানুষের ইতিহাসের শুধু অর্থনৈতিক, শুধু রাজনৈতিক, শুধু জৈবিক, শুধু আধ্যাত্মিক, শুধু মনস্তাত্ত্বিক কিংবা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা দেয়, তারা সবাই ওই সব সংঘাতপূর্ণ উপকরণ ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন জগতের দিকে নিতান্তই স্থূল দৃষ্টিতে তাকায়, যেগুলোর ওপর তার ইতিহাস নির্মিত হয়। একমাত্র ইসলামই মানুষের জীবনের প্রশস্ত, উদার ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয় এবং একই সাথে সকল দিকের ব্যাখ্যা দেয়।

'আমরা কোরআনের পাতায় মানুষের এই বিশাল জীবনের কয়েকটি বাস্তব দৃশ্য দেখেছি। মানব জাতি সৃষ্টির দৃশ্য দেখেছি, আর এই দৃশ্যের মধ্যে সমবেত হয়েছে সকল জগত ও সকল উপাদান ও সকল দিগন্ত, চাই তা গোপন বা প্রকাশ্য যাই হোক না কেন। আমরা মানুষের মৌলিক যোগ্যতা ও ক্ষমতা দেখেছি। উচ্চ পদস্থ ফেরেশতাদের কাছে তার মর্যাদা, ফেরেশতাদের দিয়ে তাকে সেজদা করানো এবং মহান স্রষ্টা কর্তৃক তার সৃষ্টির ঘোষণা দেয়ার দৃশ্য দেখেছি। তার দুর্বলতাও দেখেছি যে, কিভাবে তার শত্রু তাকে নিষিদ্ধ কাজের দিকে টেনে নিয়ে যায়, দেখেছি কিভাবে সে পৃথিবীতে নেমে এলো এবং পৃথিবীর সকল রীতিনীতি ও উপায় উপকরণ ব্যবহার করে এই পৃথিবীর সাথে নিজেকে মানিয়ে নিলো।

আমরা দেখেছি, মানুষ আপন প্রতিপালকের প্রতি অবিচল ঈমান নিয়ে, নিজের গুনাহর জন্যে ক্ষমা চাইতে চাইতে ও খেলাফাতের দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। তখন তাকে বলা হয়েছে, সে যেন শুধু আল্লাহর বিধান মানে, শয়তান ও প্রবৃত্তির হুকুম না মানে এবং তার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে। ওই সব জটিল ও সংঘাতময় উপকরণ তার নিজ সত্ত্বার ভেতরে এবং তার পারিপার্শ্বিক জগতে সক্রিয় থেকে তার কর্মজগতে ও বিবেক বুদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে। এভাবেই ওই সব উপকরণ তাকে জাহেলিয়াতের দিকে নিয়ে।

সামান্য প্ররোচনায়ই সে তার দায়িত্বের কথা ভুলে যায়। সামান্য প্রলোভনেই সে দুর্বল হয়ে যায়। শয়তান বার বার তাকে গোমরাহীর পথে নিয়ে যায়। তাই পুনর্বার তাকে উদ্ধার করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

মানুষ তাওবা করে, এক আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে ও সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে এই পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু কালের আবর্তনে আজ তাকে দেখতে পাই সে মানুষই বিপথগামী ও মোশরেক।

মানুষ বিপথগামী হলেই তাকে সঠিক পথ দেখাতে নবী ও রসূলরা এসেছেন। তাকে অবস্থায় অসহায় যে ছেড়ে দেয়া হয়নি, সেটাও আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ।

এ সূরায় আমরা ঈমানী কাফেলার সাক্ষাত পাই, যার পতাকা বহন ও নেতৃত্ব দান করেন নূহ, হূদ, সালেহ, লূত, শোয়ায়ব ও মূসা প্রমুখ নবী ও রসূলরা। এই সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর শিক্ষা ও নির্দেশে মানব জাতিকে কিভাবে জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তান যে ভাগাড়ে ফেলে দিয়েছিলো তা থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন, তা দেখতে পাই। আরো দেখতে পাই হেদায়াত ও গোমরাহী। হক ও বাতিল, আর জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তান এবং নবী ও রসূলদের মধ্যে লড়াই। আর প্রত্যেক লড়াইয়ের পরিণামে অবিশ্বাসীদের ধ্বংস ও মোমেনদের মুক্তি দেখতে পাই।

কোরআনের কেসসা কাহিনী সব সময় ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অনুসরণ না করলেও এই সূরায় সেই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়েছে। মানব জাতির প্রথম সৃষ্টিযুগ থেকে শুরু করে শয়তানের কুপ্ররোচনায় বিপথগামী হয়ে জাহান্নামগামী হবার উপক্রম হতেই নবী রসূলদের আগমন ও তাদেরকে উদ্ধারের ইতিহাস এ সূরায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

পথভ্রষ্টতা ও হেদায়াতের সুদীর্ঘ ইতিহাস

আয়াতগুলোর তাফসীর শুরু করার আগে মানব জাতির হেদায়াত ও গোমরাহীর এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের একটা সঠিক সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি।

মানব জাতি পৃথিবীতে পদচারণা শুরু করেছে পরিপূর্ণ ঈমানদার, একত্ববাদী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত অবস্থায়। এরপর মানব সত্ত্বার মধ্যে জটিল ও পরস্পর বিরোধী উপকরণসমূহের সংঘাতের পরিণতিতে পারিপার্শ্বিক জগতে বিরাজমান পরস্পর বিরোধী উপকরণসমূহের সংঘাতে সে ক্রমান্বয়ে মোশরেক, বিপথগামী ও জাহেলিয়াাতের অনুসারীতে পরিণত হয়। ঠিক এই পর্যায়েই একজন রসূল আসেন এবং তার গোমরাহী ও শেরকে লিপ্ত হওয়ার আগে সে যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, সেই সত্যকে স্মরণ করিয়ে দেন। এরপর একদল ধ্বংসের পথে ধাবিত হয় এবং একদল রক্ষা পায়। যারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের দিকে ফিরে আসে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্মণ করে, তারাই রক্ষা পায়। তারা তাদের রসূলদের এই কথাটা শোনে ও গ্রহণ করে যে, 'হে আমার জাতি, আল্লাহর এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।' এটাই সেই একমাত্র মহাসত্য, যার ওপর আল্লাহর শাশ্বত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত এবং ইতিহাসের সকল যুগে নবী ও রসূলরা এই একই বক্তব্য নিয়ে এসেছেন। সকল নবী রসূল এই কালেমারই দাওয়াত দেন আর এর ভিত্তিতেই হক ও বাতিলের সংঘাত চলতে থাকে। যারা এই দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শাস্তি দেন, আর যারা মেনে নেয় তাদেরকে মুক্তি দেন। নবী ও রসূলরা যদিও বিভিন্ন 'ভাষায় এই কলেমার দাওয়াত দেন, কিন্তু কোরআন তাদের সকলের দাওয়াতকে একই ভাষায় উপস্থাপন করে, 'হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।' এর উদ্দেশ্য হলো, ইতিহাসের সকল যুগে ইসলামের মূল আকীদা-বিশ্বাস যে একই ছিলো এবং এমনকি তার ভাষাও একই রকম ছিলো, তা প্রমাণ করা। কেননা এই বাক্যগুলো তাওহীদ বিশ্বাসকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রকাশ করে। তাছাড়া এই আকীদা বিশ্বাসকে কোরআনে অবিকল ভাবে তুলে ধরার দ্বারা একে নিছক তত্তকথা নয় বরং একটা বাস্তব সত্য হিসাবে চিত্রিত করা হয়। আর এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী আকীদা ও আদর্শ প্রচারের ইতিহাস বর্ণনার কোরআনী ভংগি কতো সার্থক ও সফল।

এই বিবরণ থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোরআনী বাচনভংগির সাথে অন্যান্য ধর্মের বাচনভংগির কতো ব্যবধান। জানা যায় যে, ইসলামের আকীদা বিশ্বাসের মূল তত্ত্বে কখনো কোনো পরিবর্তন বা ক্রমবিকাশ ছিলো না। এ আকীদা বিশ্বাসকে সকল নবী রসূল অবিকল এভাবেই নিয়ে এসেছেন। যারা এতে ক্রমবিকাশের উদ্ভট কথাবার্তা বলে এবং ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে অন্যান্য মতবাদের মতো ক্রমান্বয়ে বিকশিত বলে আখ্যায়িত করে, যারা ইসলামকে অন্যন্য মতবাদের সমন্বয়ে আধুনিকায়ন করতে চায় তারা আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন তার বিপরীত কথা বলে। কোরআনে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামী আকীদা বিশ্বাস সব সময় একই রকম। এর শাব্দিক রূপ সবসময় এই–'আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।' আর এই যে ইলাহ, যার দিকে নবী ও রসূলরা দাওয়াত দিয়েছেন, তিনি হলেন 'রব্বুল আলামীন' অর্থাৎ সকল জগতের প্রতিপালক ও মনিব। তিনি সেই মনিব, যিনি কেয়ামতের ভয়ংকর দিনে সকল মানুষের হিসাব নেবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোনো নবীরসূল কখনো আসেননি, যিনি কোনো গোত্রের প্রভু, জাতির প্রভু বা কোনো গোষ্ঠীর প্রভুর দিকে ডেকেছেন। অথবা একাধিক ইলাহ বা প্রভুর দিকে ডেকেছেন, অথবা কোনো প্রকৃতি পূজা, নক্ষত্র পূজা, আত্মা-পূজা বা প্রতিমা পূজার আহবান জানিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে কখনো এমন কোনো ধর্মও আসেনি, যাতে পরকালের অস্তিত্ব নেই বলে কোনো কথা আছে। অথচ আজকাল একশ্রেণীর স্বকথিত 'ধর্ম বিশেষণের উদ্ভব ঘটেছে, যারা বিভিন্ন রকমের জাহেলিয়াত নিয়ে গবেষণা করে আর দাবী করে যে, এই সব জাহেলিয়াত তথা বাতিল ও মানবরচিত্র ধর্মমতের আকীদা বিশ্বাসের সাথেই মানব জাতি যুগে যুগে পরিচিত হয়েছে–অন্য কোনো আকীদার সাথে নয়।

আসলে যুগে যুগে পালাক্রমে আগত নবী ও রসূলরা নির্ভেজাল একত্ববাদ, আল্লাহ তায়ালাই মানুষের একমাত্র প্রতিপালক এবং কেয়ামতের দিন মানুষকে তাঁর কাছে প্রতিটি কাজের হিসেব দিতে হবে–এই সত্য তত্ত্ব ও বিশ্বাস বয়ে এনেছেন। এই তত্ত্ব ও বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি, প্রত্যেক নবীর পরবর্তীতে প্রচলিত জাহেলিয়াত ও গোমরাহী এবং মানব সত্ত্বা ও তার সাথে পারিপার্শ্বিক জগতসমূহে বিরাজিত উপকরণাদির প্রভাব রকমারি জাহেলী ধারণা বিশ্বাসের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এই সব সত্যবিচ্যুত আকীদা বিশ্বাসই তথাকথিত 'ধর্মতত্ত্ব' বিশেষজ্ঞদের গবেষণার বিষয়। আর এই জাহেলী ধ্যান-ধারণাকেই তারা ধর্মের বিকশিত রূপ বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

ইসলাম মানেই হচ্ছে আল্লাহর কথা। আর আল্লাহর কথাই একমাত্র অনুসরণযোগ্য। বিশেষত যারা ইসলামী আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে বা তার সমর্থনে লিখে থাকেন, তাদের পক্ষে এই কথাই অনুসরণ করা উচিত। তবে যারা কোরআনের ওপর ঈমান রাখে না, তাদের দায় দায়িত্ব তাদেরই ওপর বর্তায়। আল্লাহই সত্য কথা বলে থাকেন এবং তিনিই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত প্রদানকারী।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে একটি জাতি যখন পূর্ববর্তী নবীর তাওহীদের শিক্ষা ভুলে গিয়ে শেরকে লিপ্ত হয়েছে, তখনই পরবর্তী নবী এসে তাদের ভুলে যাওয়া তাওহীদের শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আদম (আ.)-এর প্রথম সন্তানেরা স্বয়ং আদম (আ.) ও তার স্ত্রীর ন্যায় তাওহীদের অনুসারী ছিলেন। অতপর সেই সব কারণে তারা বিপথগামী হয়ে গেলো, যার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এরপর নূহ (আ.) এসে তাদেরকে পুনরায় তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। যারা তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো, তারা বন্যার কবলে পড়ে ধ্বংস হলো এবং যারা ঈমান এনেছিলো তারা রক্ষা পেলো। পৃথিবী পুনরায় হযরত নূহ (আ.)-এর তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণকারীদের দ্বারা ও তাদের বংশধরদের দ্বারা পূর্ণ হলো। কিছুকাল পর আবার তারা তাদের

পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিপথগামী হলো। এরপর যখন হূদ (আ.) এলেন, তখন তাঁর দাওয়াত অস্বীকারকারী রাও আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে গেলো। এভাবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে লাগলো।

প্রত্যেক রসূল নিজ জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছেন এবং নিজ জাতিকে বলেছেন, 'হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ বা প্রভু নেই। 'তারা আরো বলেছেন, 'আমি তোমাদের বিশ্বস্ত শুভাকাংখী।' এ কথা দ্বারা তারা তাদের দায়িত্বের গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন এবং তাদের জাহেলী জীবন পদ্ধতির পরিণাম দুনিয়া ও আখেরাতে কতো ভয়াবহ তা ব্যক্ত করেছেন। তারা তারই স্বজন ও স্বগোত্রীয় বিধায় তাদের হেদায়াতের জন্যে তিনি যে আগ্রহী ও ব্যাকুল, তাও তিনি প্রকাশ করেছেন। প্রতিবারই জাতির উচ্চ স্তরের প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা এই সত্যের দাওয়াতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, বিশ্ব প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, এক আল্লাহর এবাদাত আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে–অথচ সকল নবীর মূল দাওয়াত ছিলো এটাই এবং আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তি সর্বকালে এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। প্রত্যেক রসূল তাগুতের বিরুদ্ধে সত্যকে নিয়ে আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেন। অতপর তার জাতি আদর্শের ভিত্তিতে দুটো পরস্পর বিরোধী অংশে বিভক্ত হতো। বংশীয় ও পারিবারিক আত্মীয়তার বন্ধন বিলুপ্ত হয়ে আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শই হয়ে দাঁড়াতো বন্ধনের একমাত্র সূত্র ও ভিত্তি। একটি জাতির স্থলে প্রতিষ্ঠিত হতো দুটো পরস্পর বিরোধী আদর্শ ভিত্তিক জাতি, যাদের মাঝে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন বা সম্পর্ক থাকতো না। এই অবস্থাতেই বিজয় আসতো। আল্লাহ তায়ালা গোমরাহ জাতি ও হেদায়াতপ্রাপ্ত জাতির মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছেদ রেখা টেনে দিতেন। যারা আল্লাহর দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করতো ও দম্ভে লিপ্ত হতো, তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিতেন। আর যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য প্রকাশ করতো, তাদেরকে নিষ্কৃতি দিতেন। একটি বংশভিত্তিক জাতি এভাবে দুটো আদর্শবাদী জাতিতে বিভক্ত না হওয়া পর্যন্ত কখনো বিজয় আসেনি এবং হকপন্থী ও বাতিলপন্থীদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেনি। ইসলামী আদর্শবাদীরা যতোক্ষণ এক আল্লাহর আনুগত্যে সোচ্চার হয়নি ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে যতোক্ষণ আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়নি এবং যতোক্ষণ তারা স্বজাতির আদর্শহীন অংশের সাথে নিজেদের পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ ঘোষণা করেনি, ততোক্ষণ তারা আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় লাভ করেনি। আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের সমগ্র ইতিহাস ব্যাপী এই সত্যটি বিদ্যমান। প্রত্যেক নবী রসূলের আমলেই একটি বিষয়ের ওপর জোর দেয়া হতো। সেটি হলো, মানুষকে একমাত্র সর্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করতে হবে, আর কারো নয়। কারণ মানব জীবনে কোনো ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠিতই হতে পারে না, যতোক্ষণ এক আল্লাহর সর্বাত্মক আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত না হবে এবং সকল বাতিল শক্তির কাছ থেকে সকল ক্ষমতা ছিনিয়ে না নেয়া হবে। সকল নবী ও রসূলের এই সর্বসম্মত মূলনীতি ও মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করার পর কোরআন এ বিষয়ে বিস্তারিত খুঁটিনাটি খুব অল্পই উল্লেখ করেছে। কেননা ইসলামের মূলনীতি বিশ্লেষণ করার পর যতো খুঁটিনাটি বিষয়ই উল্লেখ করা হবে, তার সব এই মূলনীতির আওতাভুক্তই থাকবে, এর বাইরে যাবে না। আল্লাহর দৃষ্টিতে এই মূলনীতি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, কোরআনের বর্ণনাভংগিতেই সর্বত্র এটা প্রাধান্য লাভ করেছে, নবী ও রসূলদের ঈমানী ও দাওয়াতী কাফেলার বিবরণ দিতে গিয়ে এটিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বরং সত্য বলতে কি গোটা কোরআন জুড়েই এটি গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে। সূরা আনয়ামে আমি বলে এসেছি যে, এ মূলনীতি

শুধু মক্কী কোরআনের আলোচ্য বিষয় নয়, বরং মাদানী কোরআনেরও আলোচ্য বিষয়। মাদানী কোরআনে যে কোনো হুকুম বা বিধি আলোচনা প্রসংগে এই মূলনীতি আলোচিত হয়েছে।

প্রসংগত, এ কথাও জানা দরকার যে, ইসলামের যেমন একটা তত্ত্ব ও আদর্শ রয়েছে, তেমনি সেই তত্ত্ব প্রকাশ ও উপস্থাপনের একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা ভংগিও রয়েছে। উক্ত তত্ত্ব ও আদর্শের তুলনায় তত্ত্ব উপস্থাপনের পন্থা বা পদ্ধতি ইসলামে মৌলিকত্ব ও আবশ্যকতার দিক দিয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের জন্যে এই মৌলিক তত্ত্বটা জানা যেমন জরুরী, তেমনি এই তত্ত্বটা উপস্থাপনের পদ্ধতিও আমাদের জানা অত্যাবশ্যক। ইসলামের এই মৌল তত্ত্ব হলো আল্লাহর একত্ব। আর এর উপস্থাপনার জন্যে কোরআনে যে বর্ণনাভংগি বা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তাতে এই মৌল তত্ত্বকে বার বার উল্লেখ করে স্পষ্ট গুরুত্ববহ করা হয়েছে। এ কারণেই আলোচ্য সূরার কেসসা কাহিনীগুলোতেও এ মৌল তত্ত্বের এমন জোরদার, সরব ও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান।

এই কেসসা কাহিনী মানব মনে ঈমান ও কুফরীর প্রকৃতি ও পরিচয় স্পটভাবে তুলে ধরে। অতপর যারা ঈমান আনতে চায়, তাদের জন্যেও একটা নমুনা এবং যারা কুফরীতে লিপ্ত থাকতে চায়, তাদের জন্যেও একটা নমুনা বারবার তুলে ধরে। যারা রসূলের ওপর ঈমান এনেছে, তাদের মনে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও তাঁর রসূলের অনুসরণের পথে কোনো অহংকার বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাদের মধ্য থেকে একজন মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে স্বীয় দ্বীন প্রচার ও তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে মনোনীত করবেন, এতে তারা আশ্চর্যের কিছু দেখতে পায়নি। পক্ষান্তরে যারা রসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই অন্যায় অহংকারে লিপ্ত হয়েছে। এ কারণেই তারা অন্যায়ভাবে ও গায়ের জোরে হস্তগত করা ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও কায়েমী স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে মহান স্রষ্টা ও আইনদাতা আল্লাহ তায়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি। তাদেরই একজন রসূল হয়ে কোনো দাওয়াত বা উপদেশ দেবে আর তা তাদের শুনতে হবে, এটা তাদের মনোপূত হয়নি। কেননা তাদের জাতি বা গোত্রের মধ্যে তারাই ছিলো শাসক, ক্ষমতাধর ও প্রতাপশালী। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি ইসলামকে মেনে নিতে তাদের সমস্যাটা কোথায়। এই সমস্যাটা হলো ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, কায়েমী স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমস্যা। কায়েমী স্বার্থবাদী ক্ষমতাধররা বুঝতে পেরেছিলো নবী-রসূলগণের উক্তি 'হে আমার জাতি, আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো প্রভু নেই' এবং 'আমি তোমাদের জন্যে বিশ্বপ্রভুর প্রেরিত রসূল।' তারা বুঝতে পেরেছিলো যে, এক আল্লাহকে সার্বভৌম ও সর্বময় প্রতিপালক বলে স্বীকার করার সর্ব প্রথম অর্থ দাঁড়ায় তাদের অবৈধ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া এবং এর একমাত্র বৈধ মালিক বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে হস্তান্তর করা। এই জিনিসটাই তারা মরণপণ প্রতিরোধ করে আসছিলো। ক্ষমতালিপসা তাদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, কোনো বর্তমান ক্ষমতাধর ব্যক্তি বেঁচে থাকতে পরবর্তী কারো কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রস্তুত ছিলো না, চাই এজন্যে ধ্বংস হয়ে যেতে বা জাহান্নামে যেতে হয় হোক। আল্লাহর দ্বীনকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংস অবধারিত। এই মূল কথাটা এ সূরার কেসসা কাহিনীগুলোতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, যখনই মানুষ আল্লাহর বিধানকে ভুলে গেছে ও তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, কোনো রসূলকে দিয়ে এই ভুলে যাওয়া মানুষকে তাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। তারা অহংকারের বশে আল্লাহর দাসত্বের পথ অবলম্বন ও বিশ্ব প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেছে। আল্লাহর দেয়া

সুখ-সমৃদ্ধিতে গর্বিত হয়ে সতর্কবাণীকে উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছে এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুত আযাব নিয়ে আসার জন্যে তাড়া দিয়েছে, মোমেনদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের ষ্টিমরোলার চালিয়েছে এবং এসব সত্তেও মোমেনরা তাদের আদর্শে অটল ও আপোষহীন থেকেছে, তখনই আল্লাহর অমোঘ নীতি অনুসারে তাদের ওপর ধ্বংস নেমে এসেছে। সমগ্র ইতিহাস জুড়ে এই দৃষ্টান্তেরই ছড়াছড়ি।

বাতিল তাগুতী শক্তির কাছে শুধু যে সত্যের বিজয় ও প্রতিষ্ঠাই অসহনীয় তাই নয়, সে সত্যের অস্তিত্বও সহ্য করতে পারে না। সত্য যদি বাতিলকে ছাড় দিয়ে ও তার সাথে মোকাবেলার নীতি পরিত্যাগ করে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে শুধু বেঁচে থাকতে চায় এবং উভয় পক্ষের-জয় পরাজয় ও পরিণতি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে চায়, তাহলেও বাতিল শক্তি তাকে টিকতে দেবে না এবং তার এই আপোষমূলক সহাবস্থানের নীতি মেনে নেবে না। সে সত্যকে অনবরত তাড়া করতে, ধাওয়া করতে ও ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে থাকবে। হযরত শোয়ায়ব (আ.) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, 'তোমাদের একটা দল যদি আমার আনীত দ্বীনের ওপর ঈমান এনে থাকে এবং আর একদল ঈমান না এনে থাকে, তা হলে তোমরা এ অবস্থাটা সহ্য করে নাও– যতোক্ষণ সর্বোত্তম ফয়সালাকারী আল্লাহ তায়ালা আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে না দেন।' কিন্তু তার জাতি তার এ প্রস্তাব মেনে নেয়নি এবং সত্যকে বেঁচে থাকতে ও টিকে থাকতে দিতে রাযী হয়নি, রাযী হয়নি এক আল্লাহর আনুগত্যকারী ও তাগূতের ক্ষমতার বিরোধী একটি দলের অস্তিত্ব বরদাশত করতে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'শোয়ায়বের জাতির অহংকারী ক্ষমতাধররা বললো. 'হে শোয়ায়ব, তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে আমরা আমাদের শহর থেকে বহিষ্কার করবোই-যতক্ষণ না তোমরা আমাদের সাবেক ধর্মমতে ফিরে আসবে।' এ পর্যায়ে শোয়ায়ব (আ.) খোদাদ্রোহীদের সাবেক ধর্মে ফিরে আসার প্রস্তাব জোরদার কণ্ঠে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, ' শোয়ায়ব বললো, আমরা যদি ফিরে আসতে অনিচ্ছুক হই, তাহলেও? তোমাদের ধর্মমত থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে উদ্ধার করার পর আমরা যদি তা গ্রহণ করি, তাহলে সেটা হবে আল্লাহর ওপর আমাদের মিথ্যা অপবাদ আরোপের শামিল।'

এ আলোচনা থেকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারীদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, খোদাদ্রোহী তাগূতী শক্তির সাথে তাদের যে যুদ্ধ করতে হয়, সেটা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ। এ যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার যতো চেষ্টাই তারা করুক, তাতে বিন্দুমাত্রও লাভ হবে না। কেননা তাগুতী শক্তি পুরাপুরিভাবে ইসলাম বর্জন ও তাদের বাতিল মতাদর্শে ফিরে যাওয়া ছাড়া তাদেরকে কোনোই ছাড় দেবে না। অথচ এই বাতিল মতাদর্শকে তারা সম্পূর্ণ জেনে-বুঝেই পরিত্যগ করেছে এবং আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে এ থেকে উদ্ধার ও পবিত্র করেছেন। তারা তাগূতী শক্তির আনুগত্য ত্যাগ করে আল্লাহর একক ও সর্বাত্মক আনুগত্যকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে। কাজেই এই বল প্রয়োগকে প্রতিহত করতে যুদ্ধ না করে উপায় নেই। এই চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধকে মেনে নেয়া ও এর মোকাবেলা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ অবস্থার ওপর ধৈর্যধারণ করে ও বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আপোষহীন সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ে শোয়ায়ব (আ.)-এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে হবে, 'আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রব, আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ন্যায়সংগত নিস্পত্তি করে দাও। তুমিই শ্রেষ্ঠ নিষ্পত্তিকারী।' অতপর আল্লাহর যে প্রাকৃতিক বিধান সমগ্র ইতিহাস জুড়ে প্রতিবার কার্যকর থেকেছে, সেই বিধানই কার্যকর থাকবে।

হযরত নূহ (আ.)- এর ঘটনা

কোরআনের কেসসা কাহিনী সম্পর্কে ভূমিকা স্বরূপ এই কটি কথা বলাই যথেষ্ট মনে করছি। এবার আমরা আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

যে ঈমানী কাফেলা আল্লাহর মহান রসূলদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে থাকে, তাদের বিষয়ে আলোচনা করার আগে সমগ্র মাহবিশ্বে যে ঈমানী কাফেলা বিচরণ করছে, তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতটিতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক কেবল তিনিই, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি আরশের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, রাত দিয়ে দিনকে আলোকিত করেন, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পেছনে ছুটে আসে, আর তারই নির্দেশের অনুগত রয়েছে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। সাবধান, সৃষ্টি যার আদেশও তাঁর। সর্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা মহা কল্যাণময়।'

বস্তুত যে আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যে আল্লাহ তায়ালা আরশের অধিপতি, যে আল্লাহ তায়ালা রাতকে সঞ্চালিত করেন যাতে সে দিনের পেছনে ছোটে। যে আল্লাহর হুকুমের অনুগত হয়ে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র আবর্তিত হয় এবং যে আল্লাহ তায়ালা সারা বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও আইনদাতা, একমাত্র সেই আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করার জন্যেই সকল নবী রসূল মানবজাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন। যখনই শয়তান মানুষকে বিপদগামী করে এবং জাহেলিয়াতের দিকে নিয়ে যায়, তখনই নবী রসূলরা এসে তাদেরকে এক আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসার আহবান জানান। এ জাহেলিয়াত বিভিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু মুলত তা অভিন্ন। সব জাহেলিয়াতই আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করার প্ররোচনা দেয়।

কোরআনের বর্ণনাভংগি আল্লাহর প্রতি সৃষ্টিজগতের আনুগত্য, মানুষ যে সৃষ্টিজগতে বাস করে তার সাথে সমন্বয় রক্ষা করার জন্যে তাকে আহবান জানানো, আল্লাহর কাছে সমগ্র সৃষ্টিজগতের আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহর আদেশের পূর্ণ আনুগত্যের ভিত্তিতে সমগ্র সৃষ্টিজগতের সদা তৎপর থাকা এই–সত্যগুলোর মধ্যে অধিকতর সংযোগ গড়ে তোলে। কেননা এই মহাজাগতিক সত্যগুলো বর্ণনা করাই মানুষের মনকে আলোড়িত করা এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও তাকে তার একনিষ্ঠ আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে যথেষ্ট। এভাবে সমগ্র সৃষ্টিজগতের মাঝে সে একটি দাম্ভিকসুলভ আচরণ করে আল্লাহর অবাধ্যতা প্রদর্শন করার মতো খাপছাড়া ব্যাপার সংঘটিত করতে পারবে না।

আল্লাহর রসূলরা মানুষকে কোনো বিরল, নযিরবিহীন ও অভিনব কিছু করার আহবান জানান না। তারা শুধু সেই আসল সত্যের দিকে আহবান জানান, যার ওপর গোটা সৃষ্টিজগত দাঁড়িয়ে আছে। এই সত্য স্বয়ং মানুষেরও জন্মগত স্বভাবের মধ্যে বদ্ধমূল রয়েছে। এ সত্য তার সমগ্র সত্ত্বায় ও অস্থি মজ্জায় মিশে রয়েছে। প্রবৃত্তির লালসা ও শয়তানের কুপ্ররোচনা যখন মানুষকে তার প্রকৃত সত্য থেকে বিপথগামী করে না, তখন তার জন্মগত স্বভাব তাকে এই মহাসত্যের বার্তাই শোনায়।

এটাই এই সূরার ধারাবাহিক আলোচনার সারকথা।

'নিশ্চয় আমি নূহকে তার জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই..................(আয়াত ৫৯ - ৬৪)

এখানে হযরত নূহের কাহিনীটা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে সূরা হূদ ও সূরা নূহ সহ কোরআনের অন্যান্য জায়গায়। এ ঘটনার অনেক বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় আলোচনার প্রেক্ষাপট অনুসারে কম বা বেশী বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক

জায়গায় আলোচনার প্রেক্ষাপট অনুসারে কম বা বেশী বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হলো, সেই সব বিষয় তুলে ধরা, যা একটু আগেই আলোচনা করেছি। অর্থাৎ ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের প্রকৃতি ও ধরন, ইসলাম প্রচারের প্রদ্ধতি, এর সাথে জনগণের আচরণ, রসূলের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এবং সতর্কবাণীর বাস্তব রূপ লাভ। এ জন্যে এ ঘটনার শুধু সেই অংশগুলো তুলে ধরা হচ্ছে, যাতে ওই বৈশিষ্টগুলো প্রতিফলিত হয়েছে। এটাই কোরআনের কেসসা কাহিনী উপস্থাপনার পদ্ধতি।

'আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম'..............

বস্তুত নবী ও রসূল প্রেরণের ব্যাপারে এটাই আল্লাহর স্থায়ী রীতি যে, প্রত্যেক রসূলকে তার জাতির মধ্য থেকেই মনোনীত করেন, তাদের কাছেই পাঠান এবং তাদের ভাষাতেই তিনি দাওয়াত দেন, যাতে করে ওই জাতির যে সব লোকের জন্মগত স্বভাব নষ্ট ও বিকৃত হয়নি, তাদের মন তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ইসলামের দাওয়াত জানা ও বুঝা তাদের জন্যে সহজ হয়। যাদের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি নষ্ট হয়ে গেছে, তারা অবশ্য এই রীতি দেখে অবাক হয়। তারা এ দাওয়াতকে গ্রহণ করে না। তাদেরই মতো একজন মানুষের দাওয়াত অহংকার বশত তারা প্রত্যাখ্যান করে। তারা চায়, তাদের কাছে ফেরেশতারা এসে দাওয়াত দিক। এ সবই তাদের ছল ছুতো ও তালবাহানা মাত্র। আসলে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত হেদায়াতের বাণীকে গ্রহণই করতে প্রস্তুত নয়, চাই তা যে মাধ্যমেই আসুক না কেন। নূহকে যখন তার জাতির কাছে পাঠানো হলো, তখন তিনি সেই একই বক্তব্য তার জাতির কাছে উপস্থাপন করলেন, যা সব রসূল উপস্থাপন করেছেন।

'সে বললো, হে আমরা জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।'

বস্তুত এটা হচ্ছে শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় বাণী। এটা ইসলামী আদর্শের ভিত্তি। এটি ছাড়া ইসলামী আদর্শের অস্তিত্বই থাকতে পারে না। এটি মানব জীবনের একমাত্র স্তম্ভ। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের লক্ষ্যের ঐক্য ও পারস্পরিক সম্পর্কের ঐক্যের নিশ্চয়তা। এটাই মানুষকে প্রবৃত্তির দাসত্ব ও তারই সমকক্ষ অন্যান্য দাসদের দাসত্ব থেকে মুক্তি নিশ্চিত করে। এটাই তাকে সব রকমের লালসা, প্রলোভন ও ভীতির ওপর বিজয়ী হবার নিশ্চয়তা দেয়।

আল্লাহর দ্বীন জীবন যাপনের একটা পদ্ধতি ও বিধান। এর মূলনীতি এই যে, মানুষের সমগ্র জীবনে সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। এটাই একমাত্র আল্লাহর এবাদাতের অর্থ। এটাই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া মানুষের আর ইলাহ না থাকার অর্থ। আর আল্লাহ তায়ালা যে সকল ক্ষমতার মালিক, তার অর্থ এই যে, তিনিই সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক, স্রষ্টা এবং আপন ক্ষমতা ও পরিকল্পনা অনুসারে তার পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। অনুরূপভাবে, তিনি মানুষের বাস্তব ও কর্মময় জীবনেও তার প্রতিপালক ও মনিব। তাঁরই হুকুম ও আইনের আনুগত্য করা মানুষের কর্তব্য। যেমন আনুষ্ঠানিক এবাদাতও একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। এই সবই একই সূত্রে গ্রহিত এবং সবই এবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। কোনোটাই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং বিচ্ছিন্ন হবার যোগ্যও নয়। এর অন্যথা হলেই তা শেরেকে পরিগণিত হবে। তা হবে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করার শামিল। এই কথাগুলো প্রত্যেক মুসলমানকে বিশ্বাস করতে হবে।

নূহ (আ.) তাঁর জাতিকে এই কথাগুলোই বলেছিলেন। তিনি তাঁর জাতিকে তাদের একজন শুভাকাংখী ভাই হিসাবে সতর্ক করেছিলেন এই দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার পরিণাম সম্পর্কে। তিনি বলেছিলেন,

'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করছি।'

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, হযরত নূহ (আ.) কর্তৃক প্রচারিত আল্লাহর এই প্রাচীনতম ধর্মেও আখেরাত তথা কেয়ামতের হিসাব ও কর্মফল সংক্রান্ত আকীদা বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত ছিলো। নূহ (আ.) তার জাতির জন্যে আযাবের আশংকা প্রকাশ করছেন। এভাবে আকীদা বিশ্বাসের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান এবং তথাকথিত ধর্মতত্ত্ববিদ ও তাদের কোরআন বিমুখ শিষ্যদের ধ্যান ধারণায় কতো ব্যবধান, সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে এই দ্ব্যর্থহীন, নির্ভেজাল ও নির্ভুল দাওয়াতপ্রাপ্তির পর নূহের জাতির বিপথগামী ও বিকারগ্রস্ত লোকগুলোর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিলো।

'তাঁর জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বললো, আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি।'

আরবের মোশরেকরাও মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে বলেছিলো, 'সে নক্ষত্র পূজারী হয়ে গেছে এবং ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্ম পরিত্যাগ করেছে।'

এভাবে ভ্রষ্ট লোকেরা ভ্রষ্টতার এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, হেদায়াতের দিকে আহবানকারীকেই ভ্রষ্ট মনে করতে থাকে। আসলে স্বভাব বিকৃত হওয়ার পর মানুষের স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য এভাবে বেড়ে যায়।

আল্লাহর দেয়া অটল ও শাশ্বত মানদন্ডকে যখন মানা হয় না, তখন দুনিয়ার সব মানদন্ড এভাবেই পাল্টে যায়, দুনিয়ার সমস্ত নিয়ম কানুন ভন্ডুল হয়ে যায় এবং সব কিছু চলে যায় প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে।

আজকের দিনেও এই প্রবণতা রয়েছে। আধুনিক যুগের জাহেলিয়াতও আল্লাহর অনুগত ও আল্লাহর হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদেরকে বিপথগামী আর জাহেলিয়াতের নোংরামিতে লিপ্ত লোকদেরকে সুপথপ্রাপ্ত আখ্যা দেয়।

নিজ দেহকে অনাবৃত করতে প্রস্তুত নয় এমন যুবতীকে এবং সহজলভ্য বেপর্দা নারীকে ঘৃণা করে এমন যুবককে আধুনিক যুগের জাহেলিয়াত কী বলে আখ্যায়িত করে থাকে? তাদের এই সতীত্ব শালীনতা ও পবিত্রতাকে তারা রক্ষণশীলতা, অনগ্রসরতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও গেঁয়োপনা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। শুধু তাই নয়, আধুনিক জাহেলিয়াত তার সকল প্রচার মাধ্যম দ্বারা তাদের এই সতীত্ব, শালীনতা ও পবিত্রতার ওপর তার ঘৃণ্য, পচা-নোংরা আস্তাকুঁড়ের সমস্ত ময়লা লেপে দিতে সচেষ্ট।

এ যুগের নিকৃষ্ট ধরনের খেলার প্রতিযোগিতা, অশ্লীল সিনেমা, টেলিভিশন ইত্যাদি এবং অশ্লীল নাচগান ও আমোদ ফুর্তি থেকে যারা দূরে থাকে, আধুনিক জাহেলিয়াত তাদেরকে কী নামে অভিহিত করে থাকে? তাদেরকে 'নরস' কাঠমোল্লা, গোঁড়া ও কু-সংস্কারাচ্ছন্ন বা আনকালচার্ড বলে অভিহিত করে থাকে। আর তাদেরকে এই সব তুচ্ছ কাজে সময় কাটানোর জন্যে ডাকতেই থাকে। বস্তুত, জাহেলিয়াত চিরকালই জাহেলিয়াত। স্থান ও কালের পরিবর্তনে তার আকৃতি ও পরিবেশ ছাড়া আর কিছুই পরিবর্তিত হয় না।

নূহ নিজের ভ্রষ্টতার অভিযোগ অস্বীকার করলেন এবং তাদের কাছে তার উপস্থাপিত দাওয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য ও তার উৎস উন্মোচন করলেন। তিনি জানালেন যে, যে দ্বীনের দাওয়াত তিনি দিচ্ছেন, তা তার কল্পনাপ্রসূত জিনিস নয়। তিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিপালকের পক্ষ

থেকে আগত রসূল। তিনি তাদের জন্যে বার্তা বয়ে এনেছেন। তিনি তাদের শুভাকাংখী ও তাদের বিশ্বস্ত সংগী। আল্লাহর কাছ থেকে তিনি এমন জ্ঞান লাভ করেছেন, যে জ্ঞান তাদের নেই। তিনি আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখেন এবং সেই সূত্র থেকেই এই জ্ঞান লাভ করেছেন। অথচ আল্লাহর সাথে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই।

'নূহ বললো, হে আমার জাতি, আমি পথভ্রষ্ট নই............

এই পর্যায়ে আমরা কোরআনী বর্ণনায় কিছু বাহ্যিক শূন্যতা দেখতে পাই। তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে রসূল করে পাঠানোতে তারা যেন বিস্ময় প্রকাশ করলো। তারা যা জানে না, এই রসূল একাই জেনে ফেললো–এটা যেন তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। এই শূন্যতা পরবর্তী আয়াতের বক্তব্য থেকে পরিস্কার হয়ে যায়।

'তোমরা কি অবাক হয়ে গেছ যে, তোমাদেরই মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের কাজ থেকে স্মারক এসে গেছে?.........'

আসলে এই মনোনয়নে বিস্ময়ের কিছু নেই। মানুষের সব কিছুই তো বিস্ময়কর। সমগ্র বিশ্বজগতের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। আবার তার সত্ত্বার ভেতরে আল্লাহর ফুঁকে দেয়া আত্মার বলে সে তার প্রতিপালকের সাথেও যুক্ত রয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা কাকে রসূল পাঠাবেন, সেটা তিনিই ভালো জানেন। সুতরাং তিনি যখন কাউকে রসূল রূপে মনোনীত করেন, তখন তিনি তার সত্ত্বার ভেতরে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা ও তার বার্তা গ্রহণের যে যোগ্যতা রেখে দেয়া হয়েছে, সেই যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়েই কাউকে রসূল নিযুক্ত করেন। আর এই যোগ্যতাটাই হলো সেই সূক্ষ্ম রহস্য, যাকে মানুষের প্রকৃত সত্ত্বা বলা হয়। এই বিস্ময়কর সৃষ্টিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এত মর্যাদা দেয়ার প্রকৃত কারণ হলো ওই যোগ্যতা। নূহ তার রসূল রূপে প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন আয়াতের শেষাংশে,

'যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে, যাতে তোমরা সংযত হও এবং যাতে তোমাদের ওপর করুণা বর্ষিত হয়।'

অর্থাৎ রসূলের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনে সংযমের চেতনা সৃষ্টি করার জন্যে সাবধান করা, যাতে শেষ পর্যায়ে তারা আল্লাহর রহমত ও করুণা লাভ করে। নূহের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না এবং আর কোনো স্বার্থ ছিলো না একমাত্র এই মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া। কিন্তু মানুষের স্বভাব যখন বিকৃতির একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে যায়, তখন সে আর চিন্তা-ভাবনা করে না, চিন্তা গবেষণা করে না, উপদেশ লাভ করে না, সতর্ক করা ও সাবধান করায় তার কোনো লাভ হয় না।

'অবশেষে তারা তাকে অস্বীকার করলো, আর আমি তাকে ও তার সাথে নৌকায় আরোহণকারীদেরকে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিলো, তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম। তারা ছিলো একটা অন্ধ জাতি।'

হেদায়াত, আন্তরিক সদুপদেশ ও সতর্কীকরণের সকল মহৎ উদ্যোগের সাথে তারা কিরূপ অন্ধের মতো আচরণ করেছিলো, তা আমরা দেখেছি। এই অন্ধত্ব ও অবিবেচনার কারণেই তারা নূহের দাওয়াতকে অমান্য করেছিলো, আর এই অন্ধসুলভ আচরণের কারণেই তারা এহেন শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলো।

ধ্বংসপ্রাপ্ত আদজাতির ইতিহাস

এরপর ইতিহাসের চাকা ঘুরতেই থাকে। কোরআন সেই ঘূর্ণনের সাথে চলতে চলতে আমাদেরকে পৌঁছে দেয় হূদের জাতি আদের সামনে।

'আর আদ জাতির কাছে পাঠালাম তাদের ভাই হূদকে। সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই। তোমরা কি সংযত হবে না?.............(আয়াত ৬৫-৭২)

এই জাতি ও আল্লাহর পক্ষ থেকে একই বার্তা পেয়েছিলো। তাদের সাথে হযরত হূদের একই কথোপকথন হয়েছিলো এবং তারা একই পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলো। এ এক চিরন্তন রীতি। এক শাশ্বত প্রাকৃতিক বিধান এবং এক অমোঘ নিয়ম।

এই আদ জাতি নূহ (আ.)-এর সাথে নৌকায় আরোহণ করে বেঁচে যাওয়া মোমেনদেরই বংশধর। অনেকে বলেন যে, তারা তেরো জন ছিলো। এই সব বেঁচে যাওয়া মোমেনদের সন্তানেরা যে এক সময় পুরোপুরি হযরত নূহ (আ.)-এর আনীত ধর্ম ইসলামেরই অনুসারী ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা এক আল্লাহর এবাদাত করতো, তিনি ছাড়া তাদের আর কোনো মাবুদ ছিলো না এবং আল্লাহকে তারা সমগ্র বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক বলে স্বীকার করতো। নূহ (আ.)ও তাদেরকে এভাবেই বলেছিলেন যে, 'আমি বিশ্ব-প্রতিপালকের প্রেরিত রসূল।' কিন্তু কালক্রমে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে যাওয়ার পর শয়তান তাদেরকে বিপথগামী করতে লাগলো। তারা প্রবৃত্তির খেয়ালখুশী মোতাবেক দুনিয়ার জমি জমা ও সহায় সম্পদ সংগ্রহে নিয়োজিত হলো এবং আল্লাহর দ্বীনকে ভুলে গেলো। অবশেষে আদ জাতিও পুনরায় এক আল্লাহর এবাদতের জন্যে তাদের নবীর আহবানকে অস্বীকার করতে লাগলো।

'আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম। সে বললো, হে আমরা জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই। তোমরা কি সংযত হবে না।'

এটা অবিকল সেই কথা, যা নূহ (আ.) বলেছিলেন। নূহের জাতি এ কথা প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং শোচনীয় পরিণতি ভোগ করেছিলো। তাদের পরে আল্লাহ তায়ালা আদ জাতিকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। এই জাতি কোন এলাকার অধিবাসি ছিলো, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তবে সূরা আহকাফে তাদের আবাসভূমি আহকাফে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ জায়গাটা ইয়েমেন সীমান্তের কাছে ইয়ামামা ও হাযরমাউতের মধ্যবর্তী পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত। তারা নূহের জাতির পথ অনুসরণ করেছিলো। কিন্তু এই পথ অনুসরণকারীদের পরিণাম কী হয়েছে, তা ভেবে দেখেনি। তাই হূদ (আ.) তাদেরকে লক্ষ্য করে এ কথাটাও বলেন,

'তোমরা কি সংযত হবে না।'

এ কথাটা দ্বারা তিনি তাদের খোদা-ভীতির অভাব ও সেই ভয়াবহ পরিণতির পরোয়া না করার প্রবণতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

তার জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কাছে এটা যেন অসহনীয় লেগেছে যে, তাদেরই একজন তাদেরকে হেদায়াতের দিকে ডাকবে এবং তাদের মধ্যে সততা ও সংযমের অভাবের সমালোচনা করবে। এজন্যে তাদের কাছে হুদ (আ.)-কে নির্বোধ সীমা, অতিক্রমকারী ও নিজের মর্যাদার ভুল মূল্যায়নকারী বলে মনে হয়েছে। তাই তারা তাদের নবীকে নির্বোধ ও মিথ্যুক আখ্যায়িত করতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা ও কুণ্ঠা বোধ করেনি।

'তার জাতির মধ্য থেকে যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিলো তারা বললো, আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি নির্বুদ্ধিতার মধ্যে আছ এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।' 'হূদ বললো, হে আমার জাতি, আমার মধ্যে কোনো নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি বিশ্ব-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল ....' (আয়াত ৬৭-৬৮)

কোনো যুক্তি প্রমাণ ও চিন্তা ভাবনা ছাড়াই নির্দ্বিধায় এ সব কথা বললো।

তিনি সরলভাবে ও সত্যবাদিতা সহকারে নিজের ওপর থেকে নির্বুদ্ধিতার অভিযোগ খন্ডন করলেন, যেমন হযরত নূহ (আ.) ভ্রষ্টতার অপবাদ অস্বীকার করেছিলেন। নূহের মতো তিনিও তাঁর রেসালাতপ্রাপ্তির উৎস ও উদ্দেশ্য অবহিত করেছিলেন, আর তিনি যে তাদের পরম শুভাকাংখী ও বিশ্বস্ত প্রচারক, তাও আন্তরিকতা ও প্রীতির সাথে ব্যক্ত করেছিলেন।

হযরত নূহের জাতির মতো হযরত হূদের জাতিও যে তাকে রসূল হিসাবে নিয়োগে বিস্ময় প্রকাশ করবে, এটা ছিলো অনিবার্য। আর এ কারণেই হূদও অবিকল সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন, যা নূহ (আ.) বলেছিলেন। যেন উভয়ের দেহে একই আত্মা সক্রিয় ছিলো। কথাটা ছিলো এই,

'তোমরা কি এতে অবাক হয়ে গেলে যে, তোমাদেরকে সতর্ক করতে তোমাদের মাঝ থেকেই একজন তোমাদের কাছে আগমন করেছে?'

অতপর তাদের বাস্তব অবস্থাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যথা, হযরত নূহের জাতির পর তারাই পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, তাদেরকে জন্মগতভাবে দৈহিক শক্তি ও বিশালত্বের অধিকারী করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রদান করা হয়েছে।

'তোমরা স্মরণ করো যে, আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের জাতির পর পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন ....'

সুতরাং এই স্থলাভিষিক্ত হওয়া এবং এই দৈহিক শক্তি ও বিশালত্বের ন্যায় নেয়ামত লাভের শোকর করা, অহংকার থেকে বিরত থাকা এবং অতীতের জাতিগুলোর পরিণতি থেকে আত্মরক্ষা করা তাদের কর্তব্য। কেননা তারা আল্লাহর কাছ থেকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি পায়নি যে, আল্লাহর অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নীতি তাদের ক্ষেত্রে পাল্টে যাবে। এ প্রাকৃতিক নীতি নির্ধারিত নিয়মেই এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মোতাবেকই চলতে থাকে। আর নেয়ামতকে স্মরণ করতে বলা দ্বারা তার শোকর করতে বলাই বুঝানো হয়েছে। আর নেয়ামতের শোকর করার সাথে সাথে অনিবার্যভাবেই নেয়ামতের কারণগুলোকে অর্থাৎ সৎ কর্মগুলোকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব এসে পড়ে। আর এর মাধ্যমেই নিশ্চিত হয় দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাঙ্গীন সাফল্য।

কিন্তু মানুষের সহজাত স্বভাব প্রকৃতি যখন বিকৃত হয়ে যায়, তখন আর কোনো চিন্তা ভাবনা ও বিচার বিবেচনাই সে করে না এবং অতীতের কোনো কথাই সে স্মরণ করে না। আদ জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা এভাবেই দাম্ভিকতায় মেতে উঠলো, বিতর্ককে দীর্ঘায়িত না করে প্রতিশ্রুত আযাবকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসার দাবী জানালো এবং নবীর হিত কামনায় বিরক্তি প্রকাশ ও তাঁর সতর্কবাণীকে উপহাস করলো।

'তারা বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্যে এসেছো যেন আমরা এক আল্লাহর এবাদাত করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের 'মাবুদ'দের পরিত্যাগ করি? তুমি যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে তা এখনি নিয়ে এসো।'

যেন হযরত হূদ তাদেরকে এমন একটা খারাপ জিনিসের দিকে ডাকছেন, যা শোনাও তাদের পক্ষে অসম্ভব এবং যা বিবেচনা করার ধৈর্যও তাদের নেই।

'তুমি এজন্যেই এসেছো যেন আমরা এক আল্লাহর এবাদাত করি?..........

হৃদয় ও বিবেকবুদ্ধি প্রচলিত ব্যবস্থা ও রীতিপ্রথার গোলাম হয়ে গেলে কতো শোচনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, এটা তারই একটা দৃষ্টান্ত। এই গোলামী মানুষের কাছ থেকে তার

মৌলিক মানবীয় গুণাবলী যথা বিচার বিবেচনা, চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নেয়, তাকে প্রচলিত রীতিপ্রথা ও ঐতিহ্যের দাসানুদাস বানিয়ে দেয়, তার নিজের ও তারই মতো অন্যান্য দাসদের খেয়াল খুশীর গোলাম বানিয়ে দেয় এবং তার কাছে জ্ঞানের আলো পৌঁছার সকল দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়।

এভাবে ওই জাতিটা সত্যের মুখোমুখি হওয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে, বরং আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, তারা যে বাতিলের দাসত্ব বরণ করে নিয়েছিলো তার নিকৃষ্টতা বিবেচনা করতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যে তারা তাড়াতাড়ি আযাব নিয়ে আসার আহবান জানালো এবং তাদের শুভাকাংখী ও বিশ্বস্ত নবীকে বললো,

'বেশ তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে, তুমি যে আযাবের ভয় দেখাও, তা নিয়ে আস।'

এ জন্যে রসূলের জবাবটি ছিলো তাৎক্ষণিক ও চূড়ান্ত।

'হূদ বললো, তোমাদের ওপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আযাব ও গযব নাযিল হওয়া অবধারিত হয়ে গেছে।...........'(আয়াত ৭১)

যে অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য আযাব ও গযবের পূর্বাভাস আল্লাহ তায়ালা হযরত হূদকে দিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে তিনি তার জাতিকে সাবধান করে দিলেন। অতপর তাদের তাড়াহুড়ো অনুসারে আযাবকে ত্বরান্বিত করার পর তাদের আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা কতো নিকৃষ্ট, তা ব্যাখ্যা করছেন,

'তোমরা কি তোমাদের ও তোমাদের বাপ-দাদার নির্ধারিত কতকগুলো নাম সম্পর্কে আমার সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হচ্ছ? অথচ আল্লাহ তায়ালা এগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি।'

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সাথে সাথে অন্য যাদের উপাসনা করে থাকো, তার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। ওসব কেবল তোমাদের বাপ-দাদার রাখা নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা ওগুলোকে নির্ধারণও করেননি, ওগুলোর উপাসনার অনুমতিও দেননি। ওগুলো একেবারেই প্রমাণহীন ও সনদহীন।

কোরআনে 'আল্লাহ ওগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি' একথাটা একাধিকবার বলা হয়েছে। এ কথাটা একটা মৌলিক সত্যের আভাস দেয়, সেটি এই যে, আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেননি এমন যে কোনো বাণী, বিধান, রীতিনীতি বা চিন্তাধারার গুরুত্বও কম, প্রভাবও কম এবং ক্ষণস্থায়ীও। মানুষের স্বভাব প্রকৃতি এসব জিনিসকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে গ্রহণ করে। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বাণী এলে তা ভারী হয়, স্থিতিশীল হয় এবং অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করে। কেননা তার পেছনে আল্লাহর অনুমোদন রয়েছে।

এমন বহু চাকচিক্যময় বাণী, 'মতবাদ, মতাদর্শ, চিন্তাধারা বা বিধি-ব্যবস্থা রয়েছে, যার পেছনে যাবতীয় শক্তির সমাবেশ ঘটানো হয়, কিন্তু অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে আল্লাহর একটা বাণীর সামনে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর হযরত হূদ পরিপূর্ণ আস্থা ও ক্ষমতার বলে তার জাতিকে চ্যালেঞ্জ দেন,

'ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম।'

এই আস্থাই হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত দানকারী শক্তির প্রকৃত উৎস। বাতিল যতোই আস্ফালন ও তর্জন গর্জন করুক, তা যে দুর্বল ও গুরুত্বহীন, সে ব্যাপারে তার বিশ্বাস অটল থাকে। অনুরূপভাবে সে যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা যে আল্লাহর শক্তির বলে বলীয়ান, সে ব্যাপারেও সে সুনিশ্চিত থাকে।

অতপর আয়াতে উল্লেখিত প্রতীক্ষার সময় ঘনিয়ে আসে।

'অতপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে আমার দয়ায় রক্ষা করলাম এবং আমার আয়াতকে যারা অস্বীকার করেছে ও বিশ্বাস করেনি, তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলাম।'

এটা আল্লাহর সেই চূড়ান্ত ও সর্বাত্মক ধ্বংস কান্ড, যা থেকে কেউ রেহাই পায় না। 'কাতয়ুদ দাবের' শব্দটি দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। আভিধানিক অর্থে দাবের হচ্ছে কাফেলার সবচেয়ে পেছনের ব্যক্তি, যে গোটা কাফেলাকে অনুসরণ করে।

এভাবে অবিশ্বাসীদের ইতিহাসের আরেকটি পাতা বন্ধ করা হলো। স্মরণ করানোতে যখন কাজ হলো না, তখন আর একবার সতর্কবাণীর বাস্তবায়ন করা হলো। আ'দ জাতির ধ্বংসের কাহিনীর যতোটা বিস্তারিত বিবরণ অন্যান্য সূরায় দেয়া হয়েছে, এখানে ততোটা দেয়া হয়নি। আমরাও এখানে এর বিশদ বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না। কেননা এখানে সংক্ষিপ্ত ও ত্বরিত পর্যালোচনাই আয়াতের উদ্দেশ্য। বিশদ বিবরণ যথাস্থানেই পর্যালোচনা করা হবে।

ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত সামুদ জাতির ঘটনা

'আর আমি সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর এবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই।............ (আয়াত ৭৩-৭৯)

এ হচ্ছে মানব জাতির ইতিহাসের আরেকটা অধ্যায় জাহেলিয়াতের দিকে মানুষের আর এক ধাপ অধোপতন। হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘাতের আর একটা দৃশ্য এবং অবিশ্বাসীদের আর একটা নতুন নির্মূল অভিযান।

'সামুদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালেহকে। সে বলেছিলো, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহর এবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই।'

হযরত সালেহও সেই একই কলেমা উচ্চারণ করছেন যার মধ্য দিয়ে গোটা সৃষ্টির সূচনা হয়েছিলো এবং সেদিকেই তা প্রত্যাবর্তন করবে। তিনিও বিশ্বাসে, প্রচারে ও সংঘাত সংগ্রামে একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন।

এখানে তিনি সেই মোজেযারও উল্লেখ করছেন, যা তাঁর দাওয়াতের সাথেই যুক্ত ছিলো। তার জাতি যখন তাঁর কাছে কোনো অলৌকিক নিদর্শন চেয়েছিলো, তখন তিনি এ মোজেযার উল্লেখ করেন

'আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটা অকাট্য প্রমাণ নিয়ে এসেছি। এ হচ্ছে একটি নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহর উষ্ট্রী' ...

যেহেতু এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য শুধু দাওয়াতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান এবং এ দাওয়াতে বিশ্বাস করার ও অবিশ্বাস করার পরিণাম অবহিত কর, তাই এখানে সামুদ জাতি কর্তৃক মোজেযার দাবীর বিশদ বিবরণ দেয়া হয়নি, বরং দাওয়াতের অব্যবহিত পর মোজেযার উপস্থিতির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে উষ্ট্রী সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি। শুধু ততোটুকু বলা হয়েছে যে, উষ্ট্রী আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা প্রমাণ ও নিদর্শন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এটি একটি অলৌকিক উষ্ট্রী ছিলো এবং অস্বাভাবিকভাবে তার আবির্ভাব ঘটানো হয়েছিলো। এ কারণেই একে আল্লাহর প্রমাণ ও নিদর্শন এবং 'আল্লাহর উট' বলা হয়েছে। আর এ কারণেই একে তার নবুওতের সত্যতার নিদর্শনও আখ্যা দেয়া হয়েছে। এখানে আমি এর চেয়ে বেশী কিছু উল্লেখ করবো না। এখানে যেটুকু এসেছে, তা অন্য আর কোনো বিশদ বিবরণের অপেক্ষা রাখে না।

'এ উষ্ট্রীটাকে ছেড়ে দাও যেন আল্লাহর যমীনে বিচরণ করে অবাধে ঘাস খায় এবং তোমরা একে ক্ষতিকরভাবে স্পর্শ করো না। তাহলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।'

এখানে আল্লাহর উটনীকে আল্লাহর যমীনে অবাধে বিচরণ করতে ও খেতে দিতে বলা হয়েছে। নচেত খারাপ পরিণতির হুমকি দেয়া হয়েছে।

মোজেযা দেখানো ও পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করার পর সালেহ (আ.) তাঁর জাতিকে বিচার বিবেচনা করতে ও উপদেশ গ্রহণ করতে আহবান জানান। তাদেরকে তিনি অতীত জাতিগুলোর পরিণাম স্মরণ করার এবং তাদের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হবার সুযোগ পাওয়ার জন্যে শোকর করতে বলেন।

'আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে আ'দ জাতির পর তাদের স্থলাভিষিক্ত করলেন, তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করতে দিয়েছেন।.......... (আয়াত ৭৪)

সামুদ জাতির আবাসভূমি কোথায় ছিলো, সে কথা এখানে বলা হচ্ছে না। তবে সূরা আল হেজরে বলা হয়েছে যে, তাদের আবাসভূমি ছিলো হিজর। এ জায়গাটা সিরিয়া ও হেজাযের মাঝখানে অবস্থিত। সালেহ (আ.)-এর স্মরণ করিয়ে দেয়ার ভাষা থেকে মনে হয়, সামুদ জাতি পৃথিবীতে ক্ষমতাশালী ও সমৃদ্ধিশলী জাতি ছিলো। এ থেকে তাদের আবাসভূমির জায়গাটা কি ধরনের ছিলো তাও বুঝা যায়। স্থানটা ছিলো পাহাড় ও সমভূমির সমন্বয়ে গঠিত। তারা সমভূমিতে বড় বড় প্রাসাদ এবং পাহাড়ের গায়ে ঘরবাড়ী বানাতো। এই ক্ষুদ্র উক্তিটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাদের যুগ ছিলো একটা পুরাকীর্তিতে পরিপূর্ণ সভ্যতা। সালেহ (আ.) তাদেরকে তাদের আ'দ জাতির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যদিও উভয়ের আবাসভূমি একই স্থানে ছিলো না। তবে মনে হয়, আ'দ জাতির পর তারা একটা পুরাকীর্তিময় সভ্যতার পত্তন ঘটিয়েছিলো এবং তাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য হেজর অঞ্চলের বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিলো। এভাবে তারা পৃথিবীতে পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিলো। সালেহ (আ.) তাদেরকে অহংকারের বশে পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন এবং অতীতের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন। এখানেও আমরা সংক্ষেপের প্রয়োজনে কিছু বাহ্যিক শূন্যতা দেখতে পাই। সালেহের জাতির একাংশ ঈমান এনেছিলো এবং আর এক অংশ হঠকারিতা বজায় রেখেছিলো। আর ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী এমন কোনো আদর্শের আহ্বানে সাড়া দিতে কখনো প্রস্তুত হয় না, যা তাদেরকে পৃথিবীতে গদিচ্যুত করে ও বিশ্ব প্রতিপালকের অনুগত হতে বাধ্য করে। তারা নিশ্চয়ই সেই মোমেনদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিলো, যারা সামুদ জাতির ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর আনুগত্য পরিত্যাগ করে আল্লাহর আনুগত্য অবলম্বন করেছিলো এবং বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলো।

এজন্যেই আমরা দেখতে পাই যে, সালেহ (আ.)-এর জাতির প্রতাপশালী গোষ্ঠী দুর্বল মোমেনদেরকে হুমকি দিয়েছিলো।

সালেহের জাতির মধ্য থেকে যে প্রতাপশালী লোকগুলো হঠকারিতায় মেতেছিলো, তারা দুর্বল মোমেনদেরকে বলেছিলো, তোমরা কি সালেহকে একজন রসূল মনে করো?

স্পষ্টতই এটা ছিলো হুমকি দেয়া ও ভীতি প্রদর্শন, তাদের ঈমান আনায় অসন্তোষ প্রকাশ এবং সালেহের নবুওতের দাবী মেনে নেয়ার প্রতি উপহাসের নামান্তর।

তবে দুর্বলরা আর দুর্বল থাকেনি। আল্লাহর প্রতি ঈমান তাদের মনোবল, আত্মবিশ্বাস এবং তাদের প্রত্যয়ের দৃঢ়তা এত বাড়িয়ে দিয়েছিলো যে, প্রতাপশালীদের ঐ সব হুমকি, অসন্তোষ ও উপহাসে কোনো কাজ হয়নি।

'তারা বললো, আমরা সালেহের কাছে প্রেরিত আদর্শে ঈমান এনেছি।'

ওদিকে প্রতাপশালী মহল খানিকটা হুমকি মিশ্রিত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলো, 'দাম্ভিকেরা বললো, তোমরা যার ওপর ঈমান এনেছ, আমরা তার প্রতি 'কুফরী' করলাম।'

যদিও হযরত সালেহ (আ.) তার নবুওতের যে সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ এনেছিলেন, তা কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ রাখে না, কিন্তু তার জাতির এই নেতৃস্থানীয় লোকেরা প্রমাণের অভাবে তাকে অস্বীকার করছিলো না। তারা অস্বীকার করছিলো এক আল্লাহর আনুগত্য করতে গেলে নিজেদের স্বৈরাচারী শাসন ক্ষমতা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে এই ভয়ে। একমাত্র ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের পথে অন্তরায় সৃষ্টির আশংকা, সীমাহীন আধিপত্যের লালসা এবং শয়তানের কুপ্ররোচনাই তাদেরকে নবীর দাওয়াত গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিলো।

সামুদ জাতির যে কথা সেই কাজ। তারা তাদের নবীর নবুওতের প্রমাণ স্বরূপ প্রাপ্ত আল্লাহর উষ্ট্রীটির ওপর আক্রমণ চালালো। অথচ আল্লাহর নবী তাদেরকে ওই উষ্ট্রীর কোনো ক্ষতি না করার জন্যে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন এবং ক্ষতি করলে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

'তারা উষ্ট্রীটাকে হত্যা করলো এবং তাদের প্রতিপালকের আদেশ লংঘন করলো। অতপর বললো, হে সালেহ, তুমি যদি রসূল হয়ে থাক, তাহলে যার ভয় দেখাচ্ছিলে, তা নিয়ে এসো।'

এখানে অবাধ্যতার সাথে ধৃষ্টতাও যুক্ত হয়েছে। এখানে 'লংঘন করা' 'বুঝাতে' আতাও শব্দটি এজন্যেই ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে এর সাথে ধৃষ্টতা যুক্ত আছে বুঝা যায় এবং লংঘন করার সময় তাদের মানসিক আবেগটা কী ছিলো তা ফুটে ওঠে। আয়াতের শেষাংশে দ্রুত আযাব নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ প্রদান এবং সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করার ঔদ্ধত্য সম্বলিত বক্তব্য এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে দেয়।

পরবর্তী আয়াতে তাৎক্ষণিকভাবেই তাদের ধ্বংসের ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং তার কোনো বিশদ বিবরণও দেয়া হয়নি।

'তাদেরকে একটা ভূমিকম্পে পাকড়াও করলো। ফলে তারা তাদের বাড়ীঘরে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলো।'

ভূমিকম্প ও নিস্তব্ধতা ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতার ঠিক সমান প্রতিফল। ভূমিকম্পের সাথে ভীতি এবং নিস্তব্ধতার সাথে নড়াচড়ায় অক্ষমতা যুক্ত থাকে। আদেশ লংঘনকারীর জন্যে প্রকম্পিত হওয়া এবং আক্রমণকারীর জন্যে অক্ষমতা অত্যন্ত মানানসই শাস্তি।

তাদেরকে 'নিস্তব্ধ' অবস্থায় রেখে দিয়ে পরবর্তী আয়াত আমাদেরকে সালেহ (আ.)-এর অবস্থা দেখানো হয়েছে, যাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলো ও চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলো।

'সালেহ তাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেলো এবং বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের শুভ কামনা করেছি। কিন্তু তোমরা শুভাকাংখীদেরকেই ভালোবাসো না।'

এভাবে তিনি তার ইসলাম প্রচার ও শুভাকাংখিতার দায়িত্ব পালনের প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেন এবং তারা নবীর অবাধ্যতা ও প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে নিজেদের জন্যে যে শোচনীয় পরিণাম ডেকে এনেছে, তার ব্যাপারে নিজেকে দায়মুক্ত করে নিলেন। এভাবে আল্লাহর নবীকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ইতিহাসের আর একটা অধ্যায় সমাপ্ত হলো। স্মরণ করিয়ে দেয়া ও সাবধান করার পরও যারা উপহাস করে, সব কিছু উড়িয়ে দেয়, তাদের ওপর সতর্কবাণী এভাবেই কার্যকরী হয়ে থাকে।

কওমে লূতের চারিত্রিক বিকৃতি

এরপর আবার ইতিহাসের চাকা ঘুরতে থাকে। এ পর্যায়ে আমাদের সামনে হযরত ইবরাহীমের যুগকে সামনে আনা হয়েছে। তবে এখানে হযরত ইবরাহীমের কাহিনী আলোচনা করা হয়নি। এর কারণ এই যে, এ সূরাটি নবীদেরকে প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্য থেকে যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কেবল তাদের ইতিবৃত্ত আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা সূরার শুরুতে এদিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে, 'বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের কাছে রাতের বেলা অথবা দিনের বেলা বিশ্রামরত থাকা কালে আমার আযাব এসেছিলো।' সূরার কাহিনীগুলো এই আয়াতের বক্তব্যেরই বিশদ বিবরণ স্বরূপ। এর প্রত্যেক কাহিনীই আল্লাহর নবীর সতর্কবাণী প্রত্যাখ্যানকারী কোনো না কোনো জাতির ধ্বংসের কাহিনী। কিন্তু হযরত ইবরাহীমের জাতিকে ধ্বংস করা হয়নি। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর কাছে তাদের ধ্বংস চাননি। তিনি বরং তাদেরকে ও তাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন। এখানে শুধু হযরত ইবরাহীমের সমসাময়িক নবী ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূতের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কেননা এতে সতর্কীকরণ, প্রত্যাখ্যান ও ধ্বংসের বিবরণ রয়েছে, যা কোরআনের অনুসৃত রীতি অনুসারেই চলেছে।

'আর লূতকে পাঠিয়েছিলাম। সে তাদেরকে বললো, তোমরা এমন অশ্লীল কাজে লেগে গেছো, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে আর কেউ করেনি? ...... (আয়াত ৮০-৮৪)

লূত (আ.)-এর জাতির কাহিনী আমাদের সামনে মনুষ্য স্বভাবের বিকৃতির একটা বিশেষ ধরন তুলে ধরে। পূর্ববর্তী সব কয়টি কেসসা-কাহিনীর আলোচ্য বিষয় ছিলো বিশ্ব জগতের আল্লাহ তথা সর্বময় প্রভু আল্লাহ এবং তিনি এক। কিন্তু এ কাহিনীর আলোচ্য বিষয় তা থেকে পৃথক। অবশ্য পৃথক হলেও তা প্রভুত্ব ও তাওহীদের বিষয় থেকে অনেক দূরের কিছু নয়।

এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে সে ঈমান স্বভাবতই মানুষকে আল্লাহর আইন ও তাঁর প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রাকৃতিক নিয়মের দাবী অনুসারে নারী ও পুরুষকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, বংশ বিস্তারের মাধ্যমে মানুষের সংখ্যা বাড়ানোর এবং নারী ও পুরুষের মিলনের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এজন্যে এই নিয়ম অনুসারে উভয়কে মিলনের যোগ্য এবং মিলনের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের যোগ্য বানিয়েছেন। উভয়কে মিলনের উপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক গঠন ও আকৃতি দিয়েছেন। আর এই মিলনকালে উভয়কে গভীর আনন্দ উপভোগ করান এবং এই আনন্দ উপভোগ করার প্রতি তাদেরকে মৌলিকভাবে আকৃষ্ট ও আগ্রহী করে রাখেন। এর উদ্দেশ্য হলো উভয়ের মিলনের মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ ও জীবনের সম্প্রসারণ ঘটানো এবং উক্ত মৌলিক আকর্ষণ ও গভীর আনন্দকে এমন একটা উদ্দীপক শক্তিতে পরিণত করা, যা পরবর্তীকালে সন্তান সন্ততিকে গর্ভে ধারণ, প্রসব ও দুধ খাওয়ানোজনিত দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে উভয়কে উৎসাহ যোগায়। শুধু তাই নয়, সন্তানদের লালন পালন, ব্যয় নির্বাহ ও অভিভাবকত্ব গ্রহণেরও ক্ষমতা যোগায়। অতপর তাদের উভয়কে এমন একটি পরিবারের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে, যা তাদের শিশু সন্তানদের লালন পালনের দায়িত্ব বহন করে। এই মানব শিশুর লালন পালনে পশু শিশুর লালন পালনের চেয়েও বেশী সময় লেগে থাকে।

এই হচ্ছে আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম। এ নিয়মকে হৃদয়ংগম করা ও এর দাবী অনুযায়ী কাজ করা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, তাঁর প্রজ্ঞা এবং তাঁর সুষ্ঠু ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় বিশ্বাস স্থাপন করার সাথে অংগাংগিভাবে জড়িত। তাই এই প্রাকৃতিক নিয়মকে লংঘন করা ও তা থেকে

বিচ্যুত হওয়া ইসলামের মূল আকীদা বিশ্বাস ও আল্লাহ তায়ালার দেয়া গোটা জীবন ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হওয়ারই শামিল।

আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম ও মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি থেকে বিচ্যুতি লূত (আ.)-এর জাতির কাহিনীতে সুস্পষ্ট। এতো স্পষ্ট যে, খোদ হযরত লূত (আ.) তাদেরকে এই বলে তিরস্কার করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিতে ব্যতিক্রম এবং তোমাদের এই ঘৃণ্য বিচ্যুতি তোমাদের আগে আর কারো দ্বারা সংঘটিত হয়নি।

৮০ নং আয়াত 'আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম।' .... লক্ষ্য করুন।

'মুসরেফুন' শব্দটি এসেছে 'ইসরাফ' থেকে। এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। এখানে হযরত লূত (আ.) তার জাতিকে যে সীমা অতিক্রমের দায়ে অভিযুক্ত করছেন, তা দ্বারা তিনি আল্লাহর নির্ধারিত প্রচলিত স্বাভাবিক যৌন সংগম পদ্ধতি থেকে বিচ্যুতিকে বুঝিয়েছেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মানুষের বংশ বিস্তারের ও জীবনের সম্প্রসারণ ঘটানোর ব্যাপারে ভূমিকা পালনের জন্যে যে শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন, তাকে সন্তান জন্মানোর অযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করা বুঝিয়েছেন। বস্তুত সেটা ছিলো একটা নিছক যৌন লালসা চরিতার্থ করার একটা উদ্ভট ও অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই প্রকৃত স্বাভাবিক আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা রেখেছেন। সেই আনন্দ যখন আল্লাহর সেই প্রাকৃতিক নিয়ম লংঘনের মধ্য দিয়ে উপভোগ করা হয়, তখন তা নিসন্দেহে স্বভাবের বিকৃতি ও বিচ্যুতি। এতে করে চরিত্র বিনাশের আগে স্বভাব ও প্রকৃতির বিনাশ ঘটে। আর এই দুটোতে কার্যত কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামী চরিত্র আলাদা কিছু নয়, বিকৃতি ও বিচ্যুতিবিহীন নির্মল ও নিখুঁত স্বাভাবিক চরিত্রই ইসলামী চরিত্র।

নারীর দৈহিক ও মানসিক গঠন ও আকৃতিই বিধিসম্মত বৈবাহিক চুক্তি সম্পাদনকারী পুরুষের জন্যে যৌন সংগমে সত্যিকার প্রাকৃতিক আনন্দ দান করে থাকে। এরূপ সংগমে শুধু 'যৌন লালসা' চরিতার্থ করাই অভিপ্রেত হয় না। এ আনন্দের সাথে আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামতপ্রাপ্তিরও যোগ থাকে। কেননা এর মাধ্যমে তাঁর প্রাকৃতিক নিয়মের বাস্তবায়ন ও জীবনের বিস্তার ঘটানোর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে এবং এই সাথে আনুষংগিকভাবে তিনি এমন আনন্দ ও পরিতৃপ্তি ভোগ করান, যা পরবর্তীকালে পারিবারিক, সামাজিক ও আইনগত দায়িত্ব পালনে মানুষকে উদ্দীপনা ও উৎসাহ যোগায়। এই দায়িত্বের বিনিময়েই সে যৌন আনন্দ উপভোগ করেছে। পক্ষান্তরে পুরুষের যে দৈহিক গঠন, তা অপর একজন পুরুষের জন্যে প্রকৃত ও নির্মল স্বাভাবিক আনন্দ দিতে সক্ষম নয়। বরঞ্চ শুরুতেই একটা ঘৃণার অনুভূতি জাগ্রত না হয়ে পারে না এবং তা কোনো স্বাভাবিক মানুষের মনে যথার্থ তৃপ্তি দিতে পারে না।

আর এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক আকীদা বিশ্বাস ও তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জীবন ব্যবস্থার কার্যকর প্রভাব রয়েছে। আমেরিকা ও ইউরোপের আধুনিক জাহেলিয়াতে এই যৌন বিকৃতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। সঠিক আকীদা বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতি ছাড়া আর কোনো কারণ নেই। সঠিক আকীদা বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে তাদের গোটা জীবন ব্যবস্থাই বিনষ্ট ও বিকৃত হয়ে গেছে।

ওইসব দেশের ইহুদী জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অ-ইহুদীদের আকীদা-বিশ্বাস ও চরিত্র ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে এরূপ উদ্ভট দাবী করা হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন সমাজে নারীরা পর্দা পালন করার কারণে পুরুষরা এই যৌন বিকৃতিতে আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব সাক্ষ্য এর সম্পূর্ণ

বিপরীত। কেননা ইউরোপ ও আমেরিকায় একেবারে পশুর মতো নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা চালু রয়েছে এবং যে কোনো নারী ও পুরুষের যৌন মিলনে কিছুমাত্র বাধা নেই। আর যেখানে যতো বেশী অবাধ মেলামেশা, সেখানেই এই সমকামের ততো বেশী ছড়াছড়ি। এই সমকামও শুধু পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং মহিলাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই সুস্পষ্ট বাস্তবতা যার চোখে পড়ে না, তাকে আমেরিকার 'কানজে' রিপোর্টের 'পুরুষদের যৌনতা' ও 'নারীদের যৌনতা' শীর্ষক দুটো অধ্যায় পড়ে দেখার পরামর্শ দিচ্ছি। এতদসত্তেও উল্লেখিত ইহুদী চক্র এই মিথ্যাচারের পুনরাবৃত্তি করেই চলেছে এবং নারীর পর্দাকে এর জন্যে দায়ী করছে। এ অপপ্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্র ও মিশনারীদের প্রস্তাবসমূহের বাস্তবায়ন।

যা হোক, লূত (আ.)-এর জাতির প্রসংগে আবার ফিরে আসছি। তারা তাদের নবীর উপদেশের যে জবাব দিলো, তাতে পুনরায় বিকৃতির লক্ষণ দেখতে পাই।

'তাদের জাতির জবাব ছিলো শুধু এই যে, ওদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও, ওরা বড্ড বেশী পবিত্র মানুষ।'

কী আশ্চর্য! যারা পবিত্র তাদেরকে বের করে দিয়ে শহরে কেবল অপবিত্র নোংরা লোকদেরই বসবাস করার অধিকার থাকবে?

তবে এতে বিস্মিত হবার কীই বা আছে? আজকের জাহেলী সভ্যতাই বা কী করছে? তারা কি পবিত্র ও সৎ লোকদেরকে বিতাড়িত করছে না এবং প্রাচীন জাহেলিয়াতের মতো সমাজকে নোংরামির ভাগাড়ে পরিণত করে তাতেই হাবুডুবু খাচ্ছে না? আর একেই তারা প্রগতি ও নারী স্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করছে না ? সৎ লোকদেরকে তাদের জীবিকা, জীবন, সহায় সম্পদ এবং চিন্তা ও বাক স্বাধীনতা থেকে কি বঞ্চিত করা হচ্ছে না ? তাদের সৎ জীবন যাপনের প্রতি কি চরম অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা হচ্ছে না? শুধুমাত্র অপবিত্র ও কলুষিত জীবন যাপনকারীদেরকেই কি সর্ব প্রকারে পুরস্কৃত ও অভিনন্দিত করা হচ্ছে না? বস্তুত এটাই সর্বকালের জাহেলিয়াতের চিরন্তন নীতি।

উপসংহারে সংক্ষিপ্তভাবে পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

'অতপর আমি তাঁর স্ত্রী ব্যতীত তাকে ও পরিবার পরিজনকে রক্ষা করলাম এবং সমগ্র জাতির ওপর এক ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। অতপর লক্ষ্য করো, অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়ে থাকে।'

পাপাচারীরা যাদেরকে হুমকি দেয় তাদেরকেই আল্লাহ তায়ালা শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিলেন। এ শাস্তি এসেছিলো আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে। তাই এই নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে হযরত লূতের স্ত্রী তার জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকায় সে অব্যাহতি পায়নি।

একটা ধ্বংসাত্মক বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিলো তার জাতির ওপর। তার সাথে ছিলো ঝড়। যেন ওই জাতির পংকিলতা ও নোংরামি ধুয়ে-মুছে দেশটাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার জন্যেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিলো ও পানি দ্বারা প্লাবিত করা হয়েছিলো।

মোট কথা, এভাবে অপরাধী খোদাদ্রোহীদের ইতিহাসের আরেকটি অধ্যায়ের অবসান ঘটলো।

হযরত শোয়ায়ব (আ.)-এর মিশন

এরপর আসছে সেই যুগের আল্লাহদ্রোহী জাতিগুলোর মধ্যকার সর্বশেষ জাতিটার বিবরণ। এ হচ্ছে মাদইয়ানের অধিবাসী ও তাদের ভাই হযরত শোয়ায়বের কাহিনী।

'আর আমি মাদইয়ানে পাঠালাম তাদের ভাই শোয়ায়বকে। ....' (আয়াত ৮৫-৯৩)

এ সূরার অন্যান্য কাহিনীর তুলনায় এই কাহিনীটায় আমরা কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পাই। এখানে আকীদা ও আদর্শ ছাড়াও কিছু আচার আচরণ ও লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ও আলোচিত হওয়ার কারণেই কাহিনীর এই বিস্তৃতি ঘটেছে।

'মাদয়ানবাসীর কাছে তাদের ভাই শোয়ায়বকে পাঠালাম। সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহ তায়ালার এবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই।'

এ হচ্ছে দাওয়াতের মূলকথা। এতে কোনো রদবদল ও পরিবর্তন কখনো হয় না।

'তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে।'

এখানে কি ধরনের নিদর্শন এসেছিলো তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি, যেমনটি হযরত সালেহ (আ.)-এর কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। (হযরত সালেহের নিদর্শন ছিলো উষ্ট্রী) কোরআনের অন্যান্য সূরা থেকেও আমরা এর পরিচয় পাই না। তবে আয়াতের বক্তব্য ইংগিত করছে যে, তিনি তার নবুওতের প্রমাণ স্বরূপ একটা নিদর্শন এনেছিলেন। সেই নিদর্শনের ওপর ভিত্তি করেই তিনি তাদেরকে সঠিকভাবে মাপ ও ওযন করার আদেশ দিয়েছিলেন। আর দেশে গোলযোগ সৃষ্টি করতে, ডাকাতি রাহাজানি করতে এবং মানুষের ইচ্ছামত ধর্ম গ্রহণে বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

'অতএব তোমরা ওযন ও মাপ ঠিকমত করো, মানুষকে তাদের পণ্যে ঠকিও না, দেশে শৃংখলা আণয়নের পর তাতে বিশৃংখলা ও গোলযোগ সৃষ্টি করো না। তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তবে এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম। তোমরা পথে পথে বসে থেকে সন্ত্রাস করো না। যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিও না এবং তাতে বক্রতা সন্ধান করো না। আর সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, অতপর আল্লাহ তোমাদেরকে সংখ্যায় বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের কী পরিণতি হয়েছিলো দেখে নাও।'

এই নিষেধাজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, হযরত শোয়ায়বের জাতি এক আল্লাহর এবাদাত করতো না। তারা আল্লাহর সাথে তাঁর ক্ষমতা ও অধিকারে তাঁর বান্দাদেরকে শরীক করতো, তাদের আচার আচরণ ও লেনদেনে তারা আল্লাহর ন্যায় বিচার ভিত্তিক শরীয়তের আনুগত্য করতো না। বরঞ্চ লেন দেনের জন্যে তারা এক ধরনের মনগড়া নিয়ম বিধি তৈরী করে নিয়েছিলো। সম্ভবত এটাই ছিলো তাদের শেরক। আর এ কারণে তারা বেচাকেনার ক্ষেত্রে খুবই অসৎ ছিলো, দেশে গোলযোগ সৃষ্টি করতো, ডাকাতি রাহাজানি করে বেড়াতো এবং তাদের ধর্ম ত্যাগ করে যারা আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করতো, তাদের সেই সোজা ও সরল পথ থেকে জোরপূর্বক ফিরিয়ে রাখতো। তা ছাড়া তারা আল্লাহর পথে অবিচল থাকাকে পছন্দ করতো না, বরং তা থেকে বিচ্যুত হওয়া ও বাঁকাভাবে চলা পছন্দ করতো।

শোয়ায়ব (আ.) তাদেরকে সর্ব প্রথম এক আল্লাহর এবাদাত ও আনুগত্য করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং সকল কাজে শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলার দাওয়াত দিয়েছেন। এই মূলনীতির আহ্বান জানানোর কারণ এই যে, তিনি জানতেন এই মূলনীতি থেকে জীবন যাপনের সকল বিধি ব্যবস্থা নির্গত হয় এবং এটা যাবতীয় লেন দেনে, আচার আচরণের ও নৈতিক বিধির উৎস। এ মূলনীতি যতোক্ষণ সঠিকভাবে পালিত না হবে, ততোক্ষণ আর কোনো বিধি বিধানই সঠিক হতে পারে না।

এসব দাওয়াতের পাশাপাশি তাদেরকে তিনি কতিপয় চেতনা সঞ্চারক কথাও বলেন। প্রথমে তাদেরকে আল্লাহর একটি নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দেন।

'স্মরণ করো যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে। অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সংখ্যায় বাড়িয়ে দিয়েছেন।'

অতপর ফাসাদ বা গোলযোগ ও অরাজকতা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন।

'যারা বিশৃংখলা ছড়ায় তাদের পরিণতি কেমন হয়েছিলো দেখো।'

হযরত শোয়ায়ব তাদেরকে কিছুটা ন্যায় নীতি ও উদারতা অবলম্বনেরও উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তারা ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে নিপীড়ন ও নির্যাতন না করে। পথে ঘাটে তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড না চালায় এবং কেউ ইসলাম গ্রহণ করুক এটা তাদের মনোপূত না হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন ধৈর্যধারণ করে এবং উভয় গোষ্ঠীর সহাবস্থান মেনে নেয়। তিনি বলেন,

'আর যদি তোমাদের মধ্য হতে একটা দল আমার আনীত বিধানের প্রতি ঈমান এনে থাকে এবং আর একটি দল না এনে থাকে, তাহলে তোমরা ততোক্ষণ ধৈর্যধারণ করো, যতোক্ষণ আল্লাহ আমাদের মধ্যে একটা নিষ্পত্তি না করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ নিষ্পত্তিকারী।'

হযরত শোয়ারব সবচেয়ে ন্যায় সংগত পন্থা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং এমন একটা অবস্থান গ্রহণ করেছেন, যার চেয়ে পেছনে যাওয়ার আর অবকাশ নেই। সে অবস্থানটা হলো কেউ কাউকে কষ্ট না দিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা এবং ধর্মমত নির্বিশেষে সবাইকে শান্তিতে থাকতে দেয়া, যতোক্ষণ না সর্বোত্তম নিস্পত্তিকারী আল্লাহ তায়ালা উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো নিষ্পত্তি করে দেন।

কিন্তু আল্লাহদ্রোহী তাগুতী শক্তি এতোই আগ্রাসী হয়ে থাকে যে, পৃথিবীতে এমন কোনো একটি গোষ্ঠীর আদৌ অস্তিত্ব থাকাকে তারা বরদাশত করে না যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তাগুতী শক্তির আনুগত্য করে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো হুকুম মানে না, আর কারো শক্তির পরোয়া করে না, আর কারো আইন মানে না এবং আর কারো জীবন বিধান মানে না, এমন একটা দল পৃথিবীতে থাকলে তা তাগুতী শক্তির অস্তিত্বের জন্যে হুমকি স্বরূপ। এমনকি এই দল যদি নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রীয় হয়েও বসে থাকে এবং তাগূতী শক্তিকে আল্লাহর ফয়সালার হাতে সমর্পণ করে চুপ চাপও থাকে, তাহলেও তাগূতী শক্তি তাদের রেহাই দেয় না। তারা যদি তাদের সাথে যুদ্ধ এড়িয়েও থাকতে চায়, তবু তাগুতী শক্তি তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। সত্যের অস্তিত্বই বাতিলকে অস্থির, বিব্রত ও অস্থিতিশীল করে। তাই তার শক্তি-সামর্থ বা প্রস্তুতি কিছু থাক বা না থাকো, তার অস্তিত্বের ওপরই বাতিল যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। সত্য ও বাতিলের সংঘাত আল্লাহর শাশ্বত নীতি অনুযায়ী অনিবার্য ও অবধারিত।

'শোয়ায়বের জাতির মধ্য থেকে যারা দম্ভে মেতেছিলো, তারা বললো, হে শোয়ায়ব, তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে না এলে তোমাকে ও তোমার অনুসারী মোমেনদেরকে শহর থেকে বের করেই ছাড়বো।'

এ ছিলো তাদের পক্ষ থেকে সব রকমের আপোষ মীমাংসা ও সহাবস্থানকে অস্বীকার ও সংঘাতে যাওয়ার পক্ষে চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ হঠকারী ঘোষণা।

কিন্তু ঈমানী শক্তির স্বভাবই এই যে, তা কোনো হুমকি ও ভয়ভীতির সামনে মাথা নোয়ায় না। হযরত শোয়ায়ব (আ.) শান্তি ও সহাবস্থানের পক্ষে যে আপোস ফর্মুলায় অবস্থান নিয়েছিলেন, সেটা ছিলো তার সর্বশেষ অবস্থান। এর চেয়ে পেছনে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তার বক্তব্য ছিলো এই যে, আল্লাহ তায়ালা যতোক্ষণ উভয় পক্ষের কোনো একটির পক্ষে কোনো ফয়সালা না দেন, ততোক্ষণ কেউ কারো ওপর জবরদস্তি করবে না, সমাজের প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হবে যে কোনো আকীদা ও আদর্শকে মেনে নেয়ার এবং যে কোনো

শক্তির—ইসলামী শক্তি অথবা কুফরী শক্তির আনুগত্য করার। এ অবস্থান থেকে এক চুলও পিছু হটা কোনো দাওয়াতদাতার পক্ষে সম্ভব হয় না, তা সে যতো বড় চাপ বা হুমকি আল্লাহদ্রোহীদের পক্ষ থেকে আসুক না কেন। যিনি আল্লাহর দ্বীনের প্রতিনিধি, তার পক্ষে সেই দ্বীনকে একেবারেই অস্বীকার করে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রশ্নই ওঠে না। হঠকারীরা যখন তাকে তাদের শহর থেকে বহিষ্কার অথবা তাদের ধর্মে ফিরে আসার জন্যে চরমপত্র দিল, তখন শোয়ায়ব (আ.) নিজ আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে সত্যের প্রতি আনুগত্যের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিলেন। যে বাতিল ধর্ম থেকে আল্লাহ তায়ালা তাকে ও তার সাথীদেরকে রক্ষা করেছেন, তাতে ফিরে যাওয়ার প্রতি চূড়ান্ত অনীহা প্রকাশ করে আল্লাহ তায়ালার কাছে তা থেকে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

'শোয়ায়ব বললো, এমনকি আমরা যদি তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তনকে অপছন্দ করি তবুও? আমরা যদি তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি ..... (আয়াত ৮৮-৮৯)

এই সংক্ষিপ্ত ক'টি কথায় ঈমানের স্বভাব, মোমেনদের অভিরুচি এবং জাহেলিয়াতের স্বভাব ও তার নিকৃষ্ট রুচি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনুরূপভাবে আমরা দেখতে পাই আল্লাহর রসূলের অন্তরে সত্যের অপূর্ব আলোকছটা কিভাবে উদ্ভাসিত হয়।

'সে বললো, আমরা যদি তা অপছন্দ করি তবুও?'

তাদের সেই ঘৃণ্য বক্তব্যটির প্রতিবাদ করে বললেন যে, তোমাদের যে ধর্ম থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন, তোমরা বহিষ্কারের হুমকি দিয়ে আমাদেরকে কি সেই ধর্মে প্রত্যাবর্তনের জন্যেই জবরদস্তি করছো?

'তোমাদের ধর্ম থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রক্ষা করার পরও যদি তাতে প্রত্যাবর্তন করি, তবে তা হবে আল্লাহর ওপর অপবাদ আরোপের শামিল।'

তাগুত ও জাহেলিয়াতের ধর্মে আল্লাহর একক আনুগত্য করা হয় না, বরং মানুষ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অনেককে প্রভু হিসাবে মেনে নেয় এবং তাদের ক্ষমতা ও অধিকারকে স্বীকার করে নেয়। সেই ধর্ম থেকে আল্লাহ তায়ালা যাকে রক্ষা করেন এবং আল্লাহর সত্য দ্বীনে দীক্ষিত করেন, তার জন্যে তিনি প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করেন এবং তাকে বান্দার গোলামী থেকে রক্ষা করেন। এরপরও যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের ধর্মে ফিরে যায়, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর দ্বীনের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। সে সাক্ষ্য দেয় যে, সে আল্লাহ তায়ালার ধর্মে কোনো কল্যাণ লাভ করেনি, তাই তা পরিত্যাগ করে তাগূতের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছে। কিংবা এই সাক্ষ্য দেয় যে, এই যমীনে তাগুতী আল্লাহ শক্তির টিকে থাকা ও আল্লাহর সৃষ্টি-জগতের ওপর কর্তৃত্ব করার ন্যায় সংগত অধিকার রয়েছে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকার সাথে তার কোনো বিরোধ ও অসংগতি নেই। তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পরও সে তাগূতের ধর্মে ফিরে এসেছে। এই সাক্ষ্য সেই ব্যক্তির সাক্ষ্যের চেয়েও মারাত্মক, যে আদৌ ইসলামকে চেনেনি এবং গ্রহণ করেনি। এ সাক্ষ্য আসলে আল্লাহদ্রোহী শক্তির প্রতি স্বীকৃতির শামিল। বস্তুত জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার চেয়ে বড় আল্লাহদ্রোহিতা আর কিছু হতে পারে না।

এরপর আল্লাহদ্রোহীরা হযরত শোয়ায়বকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে যে হুমকি দিয়েছিলো, তিনি সরাসরি তা অস্বীকার করছেন।

'ওই ধর্মে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়'...........

অর্থাৎ ওটা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয় এবং শোভনও নয়। যে হুমকির মুখে তিনি এ কথা বলেছিলেন, সে হুমকি শুধু শোয়ায়বের জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরাই দেয়নি, বরং সব

দেশেই তাগুতী শক্তি সত্যিকার ঈমানী কাফেলাকে দিয়ে থাকে, যারা তাগুতের তাবেদারী করতে চায় না, বরং শুধু আল্লাহর আনুগত্য করতে চায়।

তাগূতের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসা এবং একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করা যতো কঠিন ও কষ্টকরই হোক না কেন, তা প্রকৃতপক্ষে তাগুতের আনুগত্য ও দাসত্বের তুলনায় অনেক সহজ ও অপেক্ষাকৃত কম ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদাপদের ঝুঁকি বহন করে। তাগুতী শক্তির দাসত্ব ও আনুগত্য আপাত দৃষ্টিতে জীবন, জীবিকা ও মান-সম্ভ্রমের পক্ষে যতো বেশী নিরাপদ ও ঝুঁকিহীন মনে হোক না কেন, তা ধীরগতিসম্পন্ন ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষয়ক্ষতি ও সর্বনাশ ডেকে আনে। এটা খোদ মানবতা ও মনুষ্যত্বের জন্যেই সর্বনাশী। কারণ মানুষ যখন মানুষের দাস হয়, তখন মানবতা ও মনুষ্যত্বের অস্তিত্বই তো থাকে না। একজন মানুষ আরেক জন মানুষের মনগড়া আইনের অধীনতা মেনে নেবে এর চেয়ে জঘন্য দাসত্ব আর কী হতে পারে? একজন মানুষের মন আরেক জন মানুষের ইচ্ছা, রাগ বা অনুরাগের বশীভূত হবে, এর চেয়ে নিকৃষ্ট মানের গোলামী আর কী হতে পারে? একজন মানুষের ইচ্ছা, মরযী, খেয়ালখুশী ও কামনা বাসনার ওপর আর একজন মানুষের ভাগ্য নির্ভর করবে, এর চেয়ে হীনতর দাসত্ব আর কী হতে পারে? একজন মানুষ আরেকজন মানুষের নাকে দড়ি দিয়ে যেমন খুশী ঘুরাতে থাকবে, এর চেয়ে লজ্জাকর ও অবমাননাকর গোলামী আর কী হতে পারে?

শুধু এখানেই শেষ নয়, তাগূতের শাসন মানুষের কাছ থেকে তার সহায় সম্পদ পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয়। কোনো আইন বা নিরাপত্তা প্রাচীর তার রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা দেয় না। তার সন্তানদেরকেও তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। অর্থাৎ তাগুতী শক্তি তাদেরকে যেভাবে চায়, সেভাবেই গড়ে তোলে। তাদের ধ্যান ধারণা, চিন্তাধারা, চরিত্র ও আদত অভ্যাস তাগূতী শক্তি নিজের পছন্দ মাফিকই গঠন করে। এ ছাড়া তাদের জীবনের ওপরও সে যথেচ্ছা কর্তৃত্ব চালায়। কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ সংহার করে এবং তাদের মাথার খুলির ওপর ও তাদের হাড়গোড়ার ওপর নিজে আধিপত্যের পতাকা উড়ায়। এমনকি তাগূতী শক্তি মানুষকে ন্যূনতম মান সম্ভ্রম নিয়েও বাঁচতে দেয় না। সে সমাজে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে, পিতা তার কন্যার সম্ভ্রম পর্যন্ত রক্ষা করতে সক্ষম হয় না। চাই সেটা সরাসরি ক্ষমতাসীন খোদাদ্রোহী গোষ্ঠীর ধর্ষণ নির্যাতনের কারণে হোক, যা ইতিহাসের সকল যুগেই সংঘটিত হয়ে এসেছে, অথবা তাদেরকে এমন মতবাদ ও মতাদর্শে দীক্ষিত করার মাধ্যমেই হোক, যে মতবাদ ও মতাদর্শ নারীকে লম্পট পুরুষদের কামনার সহজ শিকারে পরিণত করে, চাই তা যে নামেই হোক না কেন। যে ব্যক্তি মনে করে যে, খোদাদ্রোহী শক্তির শাসনে তার সহায় সম্পদ, সম্ভ্রম এবং তার ও তার সন্তানদের প্রাণ সম্পূর্ণ নিরাপদ, সে হয় কল্পনার জগতে বাস করে, নচেত সে বাস্তব অবস্থা অনুভব করার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছে।

বস্তুত, তাগূতী শক্তির দাসত্ব মানুষের জান, মাল ও সভ্রমের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদের ঝুঁকি বহন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য আপাতদৃষ্টিতে যতোই কষ্টকর মনে হোক না কেন, তা শুধু আল্লাহর মাপকাঠিতেই নয় বরং 'ইহকালীন জীবনের মাপকাঠিতেও অপেক্ষাকৃত লাভজনক ও দীর্ঘস্থায়ী। ওস্তাদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী স্বীয় পুস্তক ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি'তে বলেন,

'মানব জীবনে জটিল সমস্যাবলী সম্পর্কে সামান্য মাত্র জ্ঞানও যার আছে, সে এই নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে ভালো করেই অবহিত আছে যে, মানব সমাজের যাবতীয় ব্যাপারের কর্তৃত্ব ও চাবিকাঠি

কার হাতে নিবদ্ধ, এ প্রশ্নের ওপরই মানব জীবনের শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা এবং ভাংগন বিপর্যয় ও অধোপতন একান্তভাবে নির্ভর করে। গাড়ী যেমন সব সময় সেই দিকেই ছুটে চলে, যেদিকে তার চালক তাকে চালিয়ে নেয়। তার আরোহীর ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সেই দিকেই যেতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে, মানব সমাজের গাড়ীও ঠিক সেই দিকেই অগ্রসর হয়ে থাকে, যেদিকে তার নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃত্বশীল লোকেরা নিয়ে যায়। পৃথিবীর সমগ্র উপায় উপকরণ যাদের করায়ত্ত হয়ে থাকবে, শক্তি-ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সব চাবিকাঠি যাদের মুঠোর মধ্যে থাকবে, সাধারণ জনগণের জীবন যাদের হাতে নিবদ্ধ থাকবে, চিন্তাধারা, মতবাদ, আদর্শের রূপায়ণ ও বাস্তবায়নের জন্যে অপরিহার্য উপায়-উপাদান যাদের হস্তগত হবে, ব্যক্তিগত স্বভাব চরিত্র পুনর্গঠন, সমষ্টিগত নীতি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং নৈতিক মূল্যবোধ নির্ধারণের ক্ষমতা যাদের রয়েছে, তাদের অধীন জীবন যাপনকারী লোকরা সমষ্টিগতভাবে তার বিপরীত দিকে কিছুতেই চলতে পারে না। এই নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃত্বশীল লোকেরা যদি আল্লাহর অনুগত, সৎ ও সত্যাশ্রয়ী হয়, তবে সেই সমাজের লোকদের জীবনের সমগ্র গ্রন্থী ও ব্যবস্থাই আল্লাহভীতি, সঠিক কল্যাণ ও ব্যাপক সত্যের ওপর গড়ে উঠবে। অসৎ ও পাজী লোকও সেখানে সৎ ও পুণ্যবান হতে বাধ্য হবে। কল্যাণ ও সৎ ব্যবস্থা এবং মংগলকর রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান উৎকর্ষ ও বিকাশ লাভ করবে। অন্যায় ও পাপ নিশেষে বিলুপ্ত হয়ে না গেলেও অন্তত তা প্রসার ও বিকাশ লাভ হতে পারবে না। কিন্তু নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং সামাজিক ও রাষ্ট্র ক্ষমতা যদি আল্লাহদ্রোহী, ফাসেক, পাপী ও পাপলিপসু লোকদের করায়ত্ত হয়, তবে গোটা জীবন ব্যবস্থাই স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহদ্রোহীতা, যুলুম, অন্যায়, অনাচার ও অসচ্চরিত্রতার পথে চলতে শুরু করবে। চিন্তাধারা, আদর্শ ও মতবাদ, জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প ও রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিক চরিত্র ও পারস্পরিক কাজকর্ম, বিচার ও আইন সমষ্টিগতভাবে এই সব কিছুই বিপর্যস্ত হবে। অন্যায় ও পাপ ফুলে ফলে সুশোভিত হবে। পৃথিবীর কোথাও একবিন্দু কল্যাণ, ন্যায় ও সত্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবী ন্যায় ও সত্যকে স্থান দিতে, বায়ু ও পানি তার লালন পালন করতে অস্বীকার করবে। এ পৃথিবী অত্যাচার, যুলুম শোষণ ও নিপীড়নের সয়লাবে কানায় কানায় ভরে যাবে। এরূপ পরিবেশে অন্যায়ের পথে চলা সকলের পক্ষেই সহজ হবে, ন্যায় ও সত্যের পথে চলাচল তো দূরের কথা, দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন হবে।'

'আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের সর্বপ্রথম নির্দেশ হলো, দুনিয়ার সকল মানুষ একমাত্র আল্লাহর দাস হয়ে জীবন যাপন করবে এবং তাদের কণ্ঠে আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া আর কারো দাসত্বের শৃংখল থাকবে না। সেই সাথে তার আর একটা দাবী এই যে, আল্লাহর দেয়া আইনকেই মানুষের জীবনের একমাত্র আইন হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার তৃতীয় দাবী এই যে, পৃথিবীর বুক থেকে সকল অশান্তি ও বিপর্যয় নির্মূল করতে হবে, পাপ ও অন্যায়ের মূলোৎপাটন করতে হবে। কেননা এগুলোই দুনিয়ার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার একমাত্র কারণ। কিন্তু যতোদিন মানব জাতির নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং যাবতীয় সামাজিক কার্যাবলীর মূল চাবিকাঠি কাফের ও ভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দের মুঠোর মধ্যে থাকবে, আর একমাত্র সত্য ব্যবস্থা ইসলামের অনুসারীরা যতোদিন তাদের অধীন, তাদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাভোগে লিপ্ত হয়ে ঘরের কোণে বসে আল্লাহর যেকের করতে থাকবে, ততোদিন উপরোল্লেখিত মহৎ উদ্দেশ্য কখনো সফল হতে পারে না। এই লক্ষ্য স্বতই নেতৃত্বের আমূল পরিবর্তন দাবী করে এবং সকল ন্যায়নিষ্ঠ, ন্যায়পন্থী, আল্লাহর সন্তোষকামী লোকদেরকে পরস্পর মিলিত হয়ে সামগ্রিক শক্তি অর্জন করতে এবং সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে আল্লাহ তায়ালা

প্রদত্ত একমাত্র সত্য বিধান ইসলামকে কায়েম করতে নির্দেশ দেয়। এই সত্য বিধান কায়েম করতে হলে নেতৃত্বের পদ ও কর্তৃত্বের সকল চাবিকাঠি সমাজের সর্বাপেক্ষা অধিক ঈমানদার, সৎ ও আদর্শবাদী লোকের হাতে অর্পণ করতে হবে। রাষ্ট্র বিপ্লব সাধন ব্যতীত দ্বীন ইসলামের মূল লক্ষ্য এবং দাবী কখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ জন্যেই সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বীন ইসলামের সত্য বিধান বাস্তবায়নে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। এমনকি এই বিরাট কর্তব্য বিস্মৃত হওয়ার পর এমন কোনো কাজই থাকতে পারে না, যা করে আল্লাহর কিছু মাত্র সন্তোষ লাভ করা যেতে পারে। কোরআনে জামায়াতবদ্ধ হওয়া ও নেতার আদেশ শ্রবণ ও পালনের ওপর এতো বেশী গুরুত্ব কেন আরোপ করা হয়েছে, তা বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য। উপরন্তু কোরআনের বিধান মতো জামায়াত থেকে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে যাওয়া ব্যক্তি হত্যার যোগ্য চাই সে যতোই দাবী করুক যে, সে মুসলমান এবং যতোই সে নামায রোযা করুক। এর কারণ কী? এর একমাত্র কারণ কি এটাই নয় যে, সৎ নেতৃত্ব ও সত্যের পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি সাধন দ্বীন ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য? আর এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে সমষ্টিগত ও সংঘবদ্ধ শক্তি অর্জন করা একান্ত অপরিহার্য। কাজেই যে ব্যক্তিই সামগ্রিক শক্তি ও সামাজিক শৃংখলার ক্ষতি সাধন করবে, তার অপরাধ এতো বড় ও মারাত্মক যে, হাজার তাওহীদ স্বীকার ও হাজার নামায রোযা দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ কিছুতেই হতে পারে না।

এরপর ইসলামের জেহাদের ওপর এতো গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কেন, তাও ভেবে দেখুন। জেহাদ থেকে বিরত থাকলে কোরআন তাকে মোনাফেক বলে অভিহিত করে কেন? কারণ এই যে, এই জেহাদ ইসলামের সত্য বিধান প্রতিষ্ঠারই নামান্তর মাত্র। কোরআনে মুসলমানদের ঈমান পরীক্ষার জন্যে এই জেহাদকেই চূড়ান্ত মাপকাঠি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য কথায়, কোরআনের বিধান অনুযায়ী ঈমানদার ব্যক্তি বাতিল ও কাফেরী শাসন ব্যবস্থার প্রাধান্যে কখনই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আর দ্বীন ইসলামের সত্য ও আদর্শ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা সাধনা না করা এবং জানমালের কোরবানী না দেয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আর এই কাজে এ ব্যাপারে কারো কুণ্ঠা ও ইতস্তত ভাব প্রকাশিত হলে তার ঈমান সংশয়ের মধ্যে পড়ে যায়। ফলে অন্য হাজারো সওয়াবের কাজও তার কোনো উপকার সাধন করবে না।' ....

'ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর যমীনে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা একটি কেন্দ্রীয় ও মৌলিক উদ্দেশ্য এবং সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কাজেই এই ইসলামের প্রতি যার ঈমান আছে, একমাত্র নিজের ব্যক্তিগত জীবনকেই যথাসম্ভব ইসলামী আদর্শের অনুসারী করলে তার সকল কর্তব্য সম্পন্ন হয় না। বরং মানব সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকার কাফের ও ফাসেকদের কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে সর্বাপেক্ষা সৎ, সত্যাশ্রয়ী ও আদর্শবাদী লোকদের হাতে তা তুলে দেযার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করাও তার মূল ঈমানের ঐকান্তিক দাবী। কারণ আল্লাহর মরযী অনুযায়ী পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও সমাজ পরিচালনা এইরূপ একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।'....

ইসলাম যখন মানুষকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে অবৈধ দখলদার লোকদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তা পুরো পুরিভাবে আল্লাহর হাতে সোর্পদ করার আহ্বান জানায়, তখন কেবল তাদের মানুষত্বের মুক্তি এবং বান্দাদের গোলামী থেকে তাদের অব্যাহতি লাভ করার আহ্বানই জানায়। ইসলামের এ আহ্বান মানবজাতিকে তার জান ও মাল তাগুতী শক্তির লোভ ও খায়েশের খপ্পর থেকে মুক্ত করারও আহ্বানের শামিল। ইসলাম তার ওপর আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সকল

ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে লড়াই করার দায়িত্ব অর্পণ করে সত্য। কিন্তু এর মাধ্যমে সে তাকে আরো দীর্ঘস্থায়ী, আরো বড়, আরো অবমাননাকর ও আরো হীনতর ত্যাগ তিতিক্ষা থেকে মুক্তি দেয়। আসলে সে তাকে তার নিরাপত্তা ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্যেই লড়াই করার আহ্বান জানায়।

এ কারণেই শোয়ায়ব (আ.) এরূপ চূড়ান্ত ঘোষণা করেছিলেন,

'আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে অব্যাহতি দানের পর পুনরায় আমরা যদি তা গ্রহণ করি, তবে সেটা হবে আল্লাহর ওপর আমাদের অপবাদ আরোপের শামিল। আমাদের পক্ষে ওই ধর্মে ফিরে যাওযা আর সম্ভব নয়।'......

কিন্তু শোয়ায়ব (আ.) তাঁর জাতির দর্পিত আল্লাহদ্রোহী নেতাদের সামনে যতোই উঁচু কণ্ঠে ও উঁচুশিরে কথা বলুন না কেন, আল্লাহর সামনে মাথা নত করে বিনয়ের সাথে কথা বলেন এবং নিজের নতি স্বীকারের কথা ব্যক্ত করেন।

'তবে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যদি চান সেটা ভিন্ন কথা। আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান এত প্রশস্ত যে, তিনি সব কিছুই জানেন।'

অর্থাৎ তিনি নিজের ও নিজের সহযোগী মোমেনদের ভবিষ্যত আল্লাহর হাতেই সমর্পণ করেছেন। আল্লাহদ্রোহী শক্তি তাদের ধর্মে ফিরে না এলে যে হুমকি দিয়েছে, তাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করে ফিরে না আসার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন এবং এই চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করার কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তার ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা কী, তা তাদের জানা নেই বলে সে ব্যাপারে জোরের সাথে কিছু বলেননি। যেহেতু তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর ইচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল, তাই তিনিও তাঁর ইচ্ছার ওপরই সব কিছু সমর্পণ করেছেন। আল্লাহর জ্ঞান সুপ্রশস্ত ও সীমাহীন। তাই তাঁর জ্ঞানের কাছেই সব কিছু সোপর্দ করেছেন।

এ হচ্ছে আল্লাহর সাথে তাঁর বন্ধুর আদব ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ। এ আদবের দাবী অনুসারে তাঁর নির্দেশ অবশ্যই মানতে হয়, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ব্যাপারে বেপরোয়াভাবে কিছু বলা যায় না এবং তাঁর ইচ্ছা বা পরিকল্পনাধীন কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা যায় না।

এ পর্যায়ে শোয়ায়ব (আ.) তার জাতির হঠকারী নেতাদের হুমকি ও আস্ফালনের বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা ও আস্থা প্রকাশ করে তাঁর কাছে এই সংকটের নিষ্পত্তি প্রার্থনা করেছেন।

'আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ন্যায় সংগতভাবে মীমাংসা করে দাও। তুমিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।'

এখানে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর বন্ধু ও নবীর হৃদয়কে আল্লাহর প্রভুত্বের তত্ত্বটি কি ধরনের আলোয় উদ্ভাসিত করে। তিনি জানেন প্রকৃত শক্তির উৎস ও প্রকৃত আশ্রয়স্থল কোথায়। তিনি জানেন যে, একমাত্র তাঁর প্রতিপালকই ঈমান ও কুফরীর দ্বন্দ্বের ন্যায়সংগত মীমাংসা করতে পারেন। তার ও তার সঙ্গী-সাথীদের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া লড়াইতে তিনি একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করেছেন। কেননা আল্লাহর সাহায্য ও মীমাংসা ছাড়া এই লড়াই থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনোই উপায় নেই।

এ পর্যায়ে হঠকারী কাফের নেতারা শোয়ায়ব (আ.)-এর সহচরবৃন্দকে ইসলাম থেকে ফেরানোর জন্যে হুমকি দিলো।

'শোয়ায়বের জাতির কাফের নেতৃবর্গ বললো, তোমরা যদি শোয়ায়বের অনুসরণ করো, তা হলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

হক ও বাতিলের লড়াইয়ের এটা একটা চিরন্তন বৈশিষ্ট। বাতিল শক্তি প্রথমে ইসলামী আন্দোলনের প্রধান দাওয়াতদাতার পেছনে লাগে, যাতে তাকে দাওয়াতের কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু সে যখন নিজের ঈমানের দৃঢ়তা ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের বদৌলতে এই অপচেষ্টা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়, আল্লাহদ্রোহীদের সকল হুমকি ও ধমকিকে উপেক্ষা করে দাওয়াত ও প্রচারের কাজে আপোষহীনভাবে নিয়োজিত হয়, তখন তার অনুসারীদের প্রতি মনোনিবেশ করে এবং সর্ব প্রকারের হুমকি, ধমক এবং নির্যাতন নিপীড়নের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম থেকে ফেরাবার চেষ্টা করে। তাদের বাতিল আদর্শের পক্ষে তারা কোনো যুক্তিই দাঁড় করাতে পারে না। এজন্যেই তারা নির্যাতন ও সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। তারা তাদের জাহেলিয়াতের বলে মোমেনদের মনমগজকে দখল করতে পারে না, তবে খালেস ঈমানের বদৌলতে আল্লাহর একনিষ্ঠ অনুগত হবার কারণে যারা একমাত্র আল্লাহর আইনকে মেনে চলতে বদ্ধপরিকর, সেই মোমেনদের ওপর তারা কঠোর নির্যাতন চালায়। কিন্তু আল্লাহর শাশ্বত রীতি হলে হক ও বাতিল যখন আপোসহীনভাবে সংঘাতে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহর নীতিই জয়ী হয়। এখানেও তাই হয়েছে।

'তাদেরকে একটা ভূমিকম্প পাকড়াও করলো। ফলে তারা তাদের বাড়ীঘরে নিথর ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলো।' ভূমিকম্প ও নিশ্চল করে দেয়ার শাস্তিটা ছিলো হুমকি, আস্ফালন ও নির্যাতন নিপীড়নের। 'তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' এ কথাটার অব্যবহিত পরই ভূমিকম্প ও নিশ্চল করে দেয়ার শাস্তি সম্বলিত আয়াতটা এসেছে। তাদের দেয়া এ হুমকির পরে এ কথাটা বলে বুঝানো হয়েছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত হলো অমান্যকারীরা, শোয়ায়েবের অনুসারীরা নয়।

'যারা শোয়ায়বকে অস্বীকার করেছিলো, তাদের পরিণাম এমন হলো যেন তারা কোনো দিন সেখানে বাস করেনি। যারা শোয়ায়েবেকে অস্বীকার করেছিলো, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।'

আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারাই তাদের বাড়ীতে নির্জীব ও নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলো। যেন তারা কোনো দিন সেখানে বসবাস করেনি এবং তাদের কোনো চিহ্নও যেন নেই।

অতপর তাদের অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা হচ্ছে এই বিষাদময় বিবরণের মাধ্যমে যে, যে রসূল তাদের ভাই ছিলো, সে অবশেষে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলো, তাদের পথ ও তার পথ আলাদা হয়ে গেলো এবং সে তাদের জন্যে কোনো আক্ষেপও করলো না।

'অতপর শোয়ায়ব তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলো। সে বললো, হে আমার জাতি, আমি আমার প্রভুর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। যে জাতি আল্লাহর প্রত্যাখ্যান করলো, তার ওপর আমি কিভাবে আক্ষেপ করি?'

বস্তুত, শোয়ায়ব এক আদর্শের ও এক জাতির লোক, আর মাদইয়ানবাসী আরেক আদর্শ ও আরেক জাতির লোক। উভয়ের মধ্যে যে রক্তের ও জাতীয়তার সম্পর্ক ছিলো, ইসলামে তার কোনো স্বীকৃতি নেই এবং আল্লাহর মানদন্ডে তার কোনো মুল্যও নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনই টিকে থাকে। মানুষের মধ্যে সম্পর্কের একমাত্র সূত্র হলো আল্লাহর বন্ধন সূত্র, যা অটুট ও স্থায়ী।

সূরা আ'রাফের নবম পারাভূক্ত অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য নবম পারাটি দুই অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথমাংশ মক্কী সূরা আল আ'রাফের অবশিষ্টাংশ। সূরা আরাফের এ অংশটি রয়েছে এ পারার তিন চতুর্থাংশ জুড়ে দ্বিতীয়াংশে রয়েছে মাদানী সূরা আনফালের প্রথম অর্ধেক। এ অর্ধেক রয়েছে এ পারার শেষ চতুর্থাংশে।

এখানে প্রথমাংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করবো। আর দ্বিতীয় অংশের পরিচয় যথাস্থানে সূরা আনফালের পরিচিতির সাথে তুলে ধরা হবে। কোরআনের সূরাসমূহের পরিচিতি তুলে ধরার যে পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করে এসেছি, সেই অনুসারেই এখানেও পরিচিতি তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ।

সূরা আল আরাফের যে অংশটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ৮ম পারায় করে এসেছি, তাতে হযরত আদম (আ.)-এর পরবর্তী রসূলরা, তাদের রেসালাত ও জাতিসমূহের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে আমরা হযরত নূহ, হুদ, সালেহ, লূত ও শোয়ায়ব আলাইহেস সালামের ঘটনাবলী এবং তাদেরকে প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংস ও তাদের প্রতি বিশ্বাস আনয়নকারীদের নিষ্কৃতি লাভের কাহিনী আলোচনা করেছি। এ পারাটি হযরত শোয়ায়ব (আ.)-এর কাহিনীর শেষাংশ দিয়ে শুরু হয়েছে। এটিকে আমরা আট পারার শেষভাগে যুক্ত করা সমীচীন মনে করেছি, যাতে কাহিনীটা এখানেই শেষ হয়ে যায়।

এরপর সূরায় ওই কাহিনীগুলো নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে। এটাই সূরার আলোচনার রীতি। এই মন্তব্যে আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর গৃহীত পর্যায়ক্রমিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। দেখানো হয়েছে কিভাবে তিনি তাদেরকে বিপদ-মুসিবতে নিক্ষেপ করেন, যাতে তারা সচেতন ও সতর্ক হয়, যাতে তাদের মধ্যে বিনয়ভাব জাগ্রত হয় এবং যাতে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে ও তাঁর অনুগত হয়। এতেও যখন তাদের মন জাগ্রত হয় না এবং বিপদ মুসিবত দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি দান করেন। এটা পরীক্ষা হিসাবে আরো কঠিন। এতে যখন আল্লাহর ক্ষমতা ও পরাক্রম সম্পর্কে তাদের উদাসীনতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং দুনিয়ার জীবনকে নিছক খেলাধুলা সর্বস্ব জীবন ভাবতে আরম্ভ করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করেন ও ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি কোনো অঞ্চলে যখনই কোনো নবী পাঠিয়েছি, তার অধিবাসীদেরকে বিপদ আপদ ও দুঃখ কষ্টে নিক্ষেপ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর অনুগত হয়। এরপর আমি দুঃখ কষ্টের পরিবর্তে সুখ শান্তি দিয়েছি। এতে করে তারা আবার সীমা অতিক্রম করেছে এবং বলেছে, এ রকম বিপদ আপদ ও সুখ শান্তি আমাদের বাপ দাদাদের ওপরও এসেছিলো। তাই আমি তাদেরকে এমন আকস্মিকভাবে পাকড়াও করি যে, তারা টেরও পায়নি।' (আয়াত ৯৪-৯৫)

ঈমানী মূল্যবোধ ও মানুষকে শাস্তি দানের ব্যাপারে আল্লাহর নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক কী, সে বিষয়টাও এই অংশে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কর্মফলমূলক পদক্ষেপ ও উক্ত মূল্যবোধসমূহের মধ্যে কোনো ছেদ নেই। এই সম্পর্কটা অসতর্ক লোকদের কাছে অজানা। কেননা এর আলামতগুলো তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান নয়, তবে এই পদক্ষেপ বিলম্বে হলেও একদিন নেয়া হবেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'নগরসমূহের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো ও সংযমের পথ অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের জন্যে কল্যাণের দুয়ার খুলে দিতাম আকাশ ও পৃথিবী থেকে। কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করলো। ফলে আমি তাদের কৃতকর্মের দায়ে তাদেরকে পাকড়াও করলাম।' (আয়াত ৯৬)

সূরার এ অংশে কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ, তার নিয়ম এবং মানব জীবনে ঈমানী মূল্যবোধের সাথে তার সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে। এতে হৃদয় প্রকম্পিতকারী হুমকি ও কাফেরদের ধ্বংসের বিবরণ সম্বলিত হুশিয়ারীও স্থান পেয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'নগরসমূহের অধিবাসীরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, রাতের বেলা ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের ওপর আমার আযাব আসতে পারে? অথবা নগরবাসীরা দিন-দুপুরে খেলাধুলায় মশগুল থাকা অবস্থায় তাদের ওপর আমার আযাব নেমে আসতে পারে এ ব্যাপারে তারা কি নিশ্চিন্ত? তারা কি আল্লাহর (ঈমান না আনার কারণে আল্লাহর শাস্তির) পরিকল্পনা থেকে নিশ্চিন্ত?..........' (আয়াত ৯৭-১০০)

এই মন্তব্যের উপসংহার টানা হয়েছে এই ঘটনাবলীর দিকে রসূল (স.)-কে একটি ইংগিত প্রদান, অতীতের কাফের জাতিগুলোর পরিণতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান, তাদের প্রকৃত অবস্থা ও আল্লাহর একত্ব-সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়ার ওয়াদা ভংগের বর্ণনা দান এবং তাদের কাছে তাদের রসূলদের মাধ্যমে আগত আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও অলৌকিক ঘটনাবলী তাদের স্বভাব প্রকৃতির জড়তা ও মনমগজের নিষ্ক্রিয়তার কারণে নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার বর্ণনা দানের মধ্য দিয়ে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ওই সব নগরবাসীর ঘটনাবলী আমি তোমার কাছে বর্ণনা করি। তাদের কাছে তাদের রসূলরা অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলো। .... তাদের অধিকাংশকেই আমি অবাধ্য পেয়েছি।' (আয়াত ১০১-১০২)

হযরত নূহ, হূদ, সালেহ, লূত ও শোয়ায়ব (আ.)-এর জাতিগুলোর ধ্বংসের ব্যাপারে মন্তব্য করার পর আসছে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা। প্রথমে ফেরাউন ও তার দল-বলের সাথে এবং পরে বনী ইসরাঈলের সাথে মূসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এই সূরায় মূসার ঘটনা যতো বড় ও ব্যাপক আকারে আলোচিত হয়েছে, সমগ্র কোরআনের আর কোথাও একই সূরায় এতো ব্যাপকভাবে এ ঘটনা আলোচিত হয়নি। এ ছাড়া সূরার আরো অনেক জায়গায় বনী ইসরাঈলের কিছু কিছু ঘটনা আলোচিত হয়েছে। কোরআনের অন্যান্য স্থানে এ সম্পর্কে যে সব সংক্ষিপ্ত ইশারা-ইংগিত দেয়া হয়েছে, এটা তার অতিরিক্ত। হযরত মূসা ও বনী ইসরাঈলের ঘটনা কোরআনের সবচেয়ে বেশী আলোচিত ঘটনা। এই জাতির ঘটনাবলী এতো বেশী আলোচিত হওয়ার নিগূঢ় রহস্য কী, সে সম্পর্কে আমি যিলালুল কোরআনের ৬ষ্ঠ পারায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। নিম্নে এর অংশ বিশেষ তুলে ধরছি :

বনী ইসরাঈল ছিলো মদীনায় ও সমগ্র আরব উপদ্বীপে শত্রুতা, ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব সম্পন্ন ইসলামী দাওয়াতের মোকাবেলাকারী প্রথম জনগোষ্ঠী। প্রথম দিন থেকেই তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মদীনায় তারাই মোনাফেক গোষ্ঠীকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয় এবং ইসলামী মতাদর্শ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুগপৎ ষড়যন্ত্র পাকাতে সব রকমের সাহায্য ও সহযোগিতা করে। মোশরেকদেরকেও মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করতো তারাই। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, হানাহানি, গুজব রটনা ও ষড়যন্ত্রের যুদ্ধ তারাই বাধাতো। ইসলামী আকীদা আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রতি সন্দেহ সংশয় ও বিভ্রান্তি ছড়াতেও তারাই সচেষ্ট থাকতো। এসবই তারা করতো প্রকাশ্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পূর্বে। তাই মুসলমানদের কাছে তাদের মুখোশ উন্মোচন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো, যাতে তারা বুঝতে পারে, তাদের প্রকৃত দুশমন কারা, কী তাদের স্বভাব, কেমন তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, কী কী উপায়ে তারা ষড়যন্ত্র করে এবং তাদের সাথে মুসলমানদের লড়াই-এর স্বরূপটা কী।

আল্লাহ জানতেন যে, মুসলমানদের গোটা ইতিহাস জুড়ে ঐ বনী ইসরাঈল গোষ্ঠী ও তাদের উত্তরসূরীরাই থাকবে তাদের কট্টর দুশমন, যেমন তারা অতীতেও আল্লাহর হেদায়াতের কট্টর দুশমন ছিলো। এ জন্যেই তিনি মুসলমানদের সামনে তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন এবং তাদের সকল ষড়যন্ত্রের জারিজুরি ফাঁস করে দিয়েছেন।

বনী ইসরাঈল হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীনের আগের দ্বীনের অনুসারী। ইসলামের পূর্বে তাদের ইতিহাস সুদীর্ঘকাল জুড়ে বিস্তৃত। তাদের আকীদায় বিকৃতি এসেছিলো, তারা বারবার আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার ভংগ করেছিলো এবং তাদের জীবনে, চরিত্রে ও ঐতিহ্যে এই অংগীকার ভংগ ও বিকৃতির বিরূপ প্রভাব পড়েছিলো। মুসলিম জাতি যেহেতু সকল নবী ও রসূলের প্রচারিত বাণীর উত্তরাধিকারী এবং সমগ্র ইসলামী আকীদার লালন পালনকারী, তাই এই জাতির ইতিহাস, তাদের উত্থান পতন ও ভাংগা গড়ার বৃত্তান্ত এবং তাদের চরিত্র ও জীবনে যে বিভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির যে বিষময় পরিণতি দেখা দিয়েছিলো, তা জানা মুসলিম জাতির পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলো। আদর্শ ও জীবনের টানা পড়েনের এই অভিজ্ঞতা তাদের ভান্ডারে সঞ্চিত থাকা ও তা দ্বারা অনাগত যুগ যুগ কাল ধরে শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছিলো, যাতে করে মুসলিম জাতি ওইসব বিভ্রান্তি ও শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে অভিজ্ঞতার আলোকে রক্ষা পেতে পারে।

বনী ইসরাঈল সুদীর্ঘকাল ধরে আল্লাহর পক্ষ থেকে বহু গ্রন্থপ্রাপ্ত জাতি। আল্লাহ তায়ালা জানতেন, কোনো জাতি যখন দীর্ঘ অবকাশ পায়, তখন তাদের মন কঠিন হয়ে যায়। তাদের কোনো কোনো বংশধর বিপথগামী হয়ে যায় এবং কেয়ামত পর্যন্ত আয়ুষ্কালধারী মুসলিম জাতিকে মাঝে মাঝে বনী ইসরাঈলের মতো পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। তাই তিনি মুসলমানদের বিভিন্ন প্রজন্মের নেতৃবৃন্দ ও সংস্কারকবৃন্দের সামনে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর পরিণতির কিছু কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, যাতে তারা রোগের প্রকৃতি বুঝে তার চিকিৎসার উপায় জেনে নিতে পারেন। কারণ এটা একটা অকাট্য সত্য যে, যারা জেনে শুনে বিপথগামী ও বিকারগ্রস্ত হয়, তারাই সবচেয়ে বেশী অবাধ্য ও অসৎ হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষেরাই ইসলামের দাওয়াত গ্রহণে অধিকতর পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কেননা দাওয়াতের আকস্মিকতা ও নতুনত্ব তাদের মনকে শিহরিত করে ও এর নতুন আঘাত তার মরিচাকে দূর করে দেয়। যারা আগেই দাওয়াত পেয়েছে, তাদের কাছে দ্বিতীয় দাওয়াতের সেই নতুনত্ব থাকে না, সেই শিহরণ থাকে না এবং তার বড়ত্ব ও গুরুত্ব তার কাছে অনুভূত হয় না। তাই তাদেরকে পথে আনতে দ্বিগুণ পরশ্রম ও দীর্ঘ ধৈর্যের প্রযোজন হয়।

অত্র তাফসীরে ইতিপূর্বে মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী একাধিকবার আলোচিত হয়েছে। সে আলোচনা হয়েছে কোরআনের সূরাসমূহের ধারাবাহিকতা অনুসারে, নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা অনুসারে নয়। এ আলোচনা এসেছে সূরা বাকারায়, আলে ইমরানে, নেসায়, মায়েদায় ও আনয়ামে। অথচ নাযিলের ধারাবাহিকতার দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝা যাবে যে, এই সূরায় এই কেসসার যে অংশগুলো আলোচিত হয়েছে, তা মাদানী সূরাগুলোর আগে নাযিল হয়েছে। মক্কী ও মাদানী সূরার বর্ণনাভংগির পার্থক্য থেকেও এটা সুস্পষ্ট। এখানে মক্কী সূরায় এটা আলোচিত হয়েছে কেসসা কাহিনী বর্ণনার পদ্ধতিতে। আর মাদানী সূরায় বর্ণিত হয়েছে এ দ্বারা বনী ইসরাঈলের মোকাবেলা করার উপায় হিসাবে এবং সেই ঘটনাবলীতে তাদের অবস্থান ও ভূমিকার মধ্য দিয়ে তাদের মুখোশ খুলে দেয়ার ভংগিতে। এ ঘটনা মক্কী ও মাদানী উভয় রকমের সূরায় ত্রিশটিরও বেশী জায়গায় আলোচিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে ১০টি সূরায় অপেক্ষাকৃত বেশী বিস্তারিতভাবে এসেছে। তন্মধ্যে ছয়টি জায়গায় সর্বাধিক বিস্তারিত। সূরা আরাফেই সর্ব প্রথম ও

সর্বাধিক বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। তবে সূরা তোয়াহার তুলনায় এখানে বনী ইসরাঈলের জীবনের অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক ঘটনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।(১)

এ সূরায় বনী ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা শুরু হয়েছে হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক ফেরাউন ও তার দল-বলের সাথে প্রত্যক্ষ আলোচনার ঘটনার মধ্য দিয়ে। পক্ষান্তরে সূরা তোয়াহায় শুরু হয়েছে তূর পর্বতের দিক থেকে মূসা (আ.)-কে আহ্বানের ঘটনা দিয়ে। আর সূরা কাসাসে শুরু হয়েছে বনী ইসরাঈলের ওপর ফেরাউনী নির্যাতনের সময়ে মূসার জন্মের বৃত্তান্ত দিয়ে। অতপর সমগ্র সূরা কাসাস জুড়ে(২) সূরার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপটের সাথে সংগতি রেখে ও কোরআনের সার্বিক বর্ণনাভংগির অনুকরণে ফেরাউন ও তার দল-বলের উক্ত দাওয়াত প্রত্যাখ্যানের পরিণতিসহ পুরো কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান সূরায় এ কাহিনীর সূচনা হয়েছে এভাবে,

'অতপর তাদের পরে আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন ও তার দল-বলের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা ওই নিদর্শনাবলীর ওপর অত্যাচার করলো। অতপর অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের কী পরিণতি হয়েছিলো, দেখো।' (আয়াত ১০৩)

অতপর এই কাহিনীর অন্যান্য অংশ ও দৃশ্যের বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রথমে এসেছে ফেরাউন ও তার স্বগোত্রীয়দের মোকাবেলা অতপর বনী ইসরাঈল ও তাদের বিকৃতি বিভ্রান্তির মোকাবেলার বিবরণ।

যেহেতু আমরা পরবর্তীতে এই কাহিনীর বিস্তারিত আলোচনায় আসছি, সেহেতু এখানে আমরা শুধু এই কাহিনীর প্রধান প্রধান দিক ও তার সার্বিক শিক্ষা তুলে ধরছি।

মূসা (আ.) ফেরাউন ও তার দল বলের কাছে উপস্থিত হয়ে এই সত্যটি তুলে ধরেন যে, তিনি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত দূত বা রসূল।

'মূসা বললো, হে ফেরাউন, আমি বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে আমি সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলা সংগত মনে করি না সুতরাং আমার সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও।' (আয়াত ১০৪-১০৫)

অনুরূপভাবে ওই একই সত্য তখনো প্রকটিত হয়, যখন মূসার সাথে ফেরাউনের জাদুকরদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং তারা পরাজিত হয়ে ঈমান আনে। কেননা তারা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতিই ঈমান এনেছিলো। 'জাদুকররা সেজদায় পড়ে গেলো। তারা বললো, আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম, যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।' এই সত্যটিকে আবারো উর্ধে তুলে ধরা হয় তখন, যখন ফেরাউন জাদুকরদেরকে কঠিন শাস্তির হুমকি দেয়। তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করে এবং ঘোষণা করে যে, তারা জীবনে, মরণে, আখেরাতের পুনরুজ্জীবনে এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তিত। 'তারা বললো, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যাবো। তোমাদের দৃষ্টিতে আমাদের দোষ তো কেবল এটাই যে, আমাদের কাছে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী পৌঁছে যাওয়ার পর আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে ধৈর্য দাও এবং মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

মূসা (আ.) যেহেতু তার জাতির স্বভাব জানতেন, তাই তাদেরকে তাদের প্রকৃত প্রভুর পরিচয় দিতে থাকেন। যখন ফেরাউন হুমকি দিল যে, সে বনী ইসরাঈলের পুরুষদেরকে হত্যা করা ও মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে পুনরায় শাস্তি দেবে, তখন 'মূসা তার জাতিকে বললো,

(১) 'আত্-তাসবীরুল ফান্নী কোরআন' দ্রষ্টব্য।
(২) একই পুস্তক দ্রষ্টব্য।

তোমরা আল্লাহর সাহায্য চাও ও ধৈর্যধারণ করো। যমিন আল্লাহর, তিনি নিজের যে বান্দাকে চান তার মালিক বানান আর চূড়ান্ত পরিণতি একমাত্র খোদা ভীরুদের জন্যে।' .... 'তারা বললো, তুমি আসার আগেও আমরা নির্যাতনে ভুগেছি আর তুমি আসার পরেও ভুগছি। মূসা বললো, সেদিন বেশী দূরে নয়, যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদের তারা স্থলাভিষিক্ত করে দেখবেন তোমরা কেমন কাজ করো।'

যখন মূসা বনী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্র পার হলেন, তখন একটি জাতিকে মূর্তি পূজা করতে দেখে তারা ও পূজা করার জন্যে মূসার কাছে ওই জাতির মূর্তির মতো মূর্তি চাইলো। 'মূসা বললো, তোমরা এমন একটা জাতি, যারা অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছ। এই জাতির জীবন পদ্ধতি বাতিল এবং তারা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সে বললো, তোমাদের জন্যে আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য খুঁজতে যাবো নাকি? অথচ তিনি তোমাদেরকে সারা দুনিয়ার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।'

এই ঘটনার অন্তর্ভুক্ত কোরআনের এই উক্তিগুলো থেকে মূসা (আ.)-এর আনীত দ্বীনের ও তার আকীদা বিশ্বাসের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝা যায়। আসলে এটাই ইসলামের প্রকৃতি ও বিশুদ্ধ আকীদা বিশ্বাস। সকল নবী রসূলই এই আকীদা বিশ্বাস নিয়ে এসেছেন। এ দ্বারা পাশ্চাত্যের ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গবেষকদের প্রচারিত মতবাদসমূহের অসত্যতাও প্রমাণিত হয়।

অনুরূপভাবে এই উক্তিগুলো বনী ইসরাঈলের বিকৃত মানসিকতাপ্রসূত বিভ্রান্তিগুলোও স্পষ্ট করে দেয়। তাদের বিকৃতি ও বিভ্রান্তি মূসা (আ.)-এর রেসালাত লাভের পরও অব্যাহত থাকে। যেমন তারা বলেছিলো, 'হে মূসা এদের মতো আমাদের জন্যেও মূর্তি যোগাড় করে দাও।' এর আর একটি উদাহরণ এই যে, মূসা (আ.) যখন আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্যে পর্বতে গেলেন, তখন তারা একটা বাছুরকে পূজা করতে শুরু করে দিল। অনুরূপভাবে তাদের এই হুমকিও এর একটি উদাহরণ যে, আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শনের ব্যবস্থা না করলে তারা ঈমান আনবে না। এই সব বিকৃতি ও বিভ্রান্তির লেশ মাত্রও উপস্থিত ছিলো না হযরত মূসার আনীত দ্বীনে। এগুলো আসল আকীদার সুস্পষ্ট বিকৃতি। বিকৃতিকে কখনো আসল ধর্মের অংশ বিবেচনা করা যায় না। আর তা কখনো মূল ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে এটাও সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে ফেরাউন ও তার দল বলের সাথে মূসার যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়েছে, তা থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর দ্বীনের সাথে জাহেলিয়াতের সংঘাত একটা অনিবার্য ও চিরন্তন ব্যাপার। এ থেকে বুঝা যায়, তাগুত তথা বাতিল শক্তি ইসলামের প্রতি কী দৃষ্টিতে তাকায় এবং কিভাবে সে ইসলামকে নিজের অস্তিত্বের জন্যে হুমকি মনে করে। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যারা খাঁটি মোমেন, তারা বাতিল শক্তির সাথে তাদের সংঘাত সংঘর্ষকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে করে এবং নির্ভীক চিত্তে তার মোকাবেলা করে।

মূসা (আ.) যখনই ফেরাউনকে বলেছেন যে, 'হে ফেরাউন, আমি বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত রসূল, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সত্য ছাড়া আর কিছু বলা আমার জন্যে সংগত নয়, আমি তোমার কাছে অকাট্য প্রমাণ সহকারে এসেছি, কাজেই বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও,' তখনই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, 'বিশ্ব প্রতিপালক'-এর দিকে যে দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তার তাৎপর্য কী। এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহর কাছে সমস্ত ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করতে হবে এবং তা করতে হবে সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্ববাসীকে অন্য কারো নয়- একমাত্র আল্লাহর দাস বলে স্বীকার করার মাধ্যমে। এই তাৎপর্যের ভিত্তিতেই হযরত মূসা বনী ইসরাঈলের মুক্তি দাবী করেন। কেননা আল্লাহ তায়ালাই যখন সারা বিশ্বের প্রতিপালক, তখন তাঁর কোনো বান্দার– হোক না সে স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী ফেরাউন–এ অধিকার থাকতে পারে না যে, মানুষকে নিজের গোলামে

পরিণত করবে। তারা তো আসলেই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো গোলাম নয়। আল্লাহকে সারা বিশ্বের প্রতিপালক বলে স্বীকার করার অর্থ দাঁড়ায় তার সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া। কেননা সার্বভৌমত্ব হচ্ছে মানুষের প্রতিপালক হওয়ার আলামত। মানুষ বিশ্বের একটি অংশ। মানুষ যখন একমাত্র আল্লাহর অনুগত হয়, তখন বিশ্বে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রকাশিত হয়। অন্য কথায়, মানুষ ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহকে নিজের প্রভু, মনিব ও প্রতিপালক হিসাবে স্বীকার করতে পারে না যতোক্ষণ একমাত্র তাঁর অনুগত তথা একমাত্র তাঁর গোলাম ও তাঁর সার্বভৌমত্বের অধীন না হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অনুসারে শাসন করে না। তার সার্বভৌমত্ব তথা শাসন ক্ষমতা মেনে নিলে ও তার আনুগত্য স্বীকার করে নিলে তা হয় আল্লাহর প্রভুত্বকে প্রত্যাখ্যান করার শামিল।

'বিশ্ব প্রতিপালক'-এর দিকে আহবানের বিপদ কী, তা ফেরাউন ও তার দল বল বুঝতে পেরেছিলো। তারা অনুভব করেছিলো যে, আল্লাহকে একমাত্র প্রভু স্বীকার করার অর্থ হলো ফেরাউনের ক্ষমতা হারানো এবং ফেরাউনের কাছ থেকে যারা যারা ক্ষমতা লাভ করে তাদেরও ক্ষমতার বিলুপ্তি। এই বিপদটাকে ফেরাউন এভাবে ব্যক্ত করেছিলো যে, মূসা ফেরাউন ও তার দল বলকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে; 'ফেরাউনের দলভুক্ত একটি গোষ্ঠী বললো, মূসা একজন ধড়িবাজ/জাদুকর, সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চাইছে। এখন তোমাদের মত কী?' .... ফেরাউনের দলভূক্ত একটি গোষ্ঠী বললো, দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে বেড়ানো এবং তোমাকে ও তোমার প্রভুদেরকে বর্জন করার পরও মূসাকে কি তুমি ছেড়ে দিচ্ছ?'

এ সব কথার অর্থ তারা শুধু এটাই বুঝেছিলো যে, বিশ্ব প্রতিপালকের দিকে এই আহবান আল্লাহর অবাধ্য বান্দাদের হাত থেকে সার্বভৌম ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে তার প্রকৃত মালিক আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেয়ার শামিল। আর এই কাজটাকে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির নামান্তর মনে করতো। আজকালও কেউ এ ধরনের আহ্বান জানালে প্রচলিত অনৈসলামী আইনে তাকে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। যে সব আল্লাহদ্রোহী স্বৈরাচারী শাসক মুখে স্বীকার না করলেও কার্যত আল্লাহর ক্ষমতাকে অর্থাৎ আল্লাহর প্রভুত্ব ও প্রভুসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলোকে জবর দখল করে, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কাজটা সরকার উৎখাতের চেষ্টাই বটে। কেননা অনৈসলামী রাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহর দাস বা গোলামদের মধ্য থেকে একজনের বাদ বাকী গোলামের মনিব হয়ে যাওয়ার ওপর। অথচ বিশ্ব-প্রভুর এবাদাতের আহবান জানানোর অর্থ হলো, দাসদের ওপর তাদের স্রষ্টার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা। ফেরাউনের জাদুকররা যখন সত্যের আসল চেহারা দেখে অভিভূত হয়ে বিশ্ব প্রভুর ওপর ঈমান আনলো এবং ফেরাউনের গোলামীর জিঞ্জির খুলে ফেলে দিলো, তখন ফেরাউন ঐ জাদুকরদের সম্পর্কে বলেছিলো যে, ওরা মিসরবাসীকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। সে তাদের কঠোরতম শাস্তি ও লাঞ্ছনার হুমকি দিয়েছিলো,

'ফেরাউন বললো, আমি অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা মূসার ওপর ঈমান এনে ফেললে? এটা এই শহরে তোমাদের পাকানো একটা ষড়যন্ত্র। শহরবাসীকে শহর ছাড়া করাই তোমাদের এ ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য। ঠিক আছে, শীঘ্রই জানতে পারবে। আমি তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াবো'। (আয়াত ১২৩-১২৪)

পক্ষান্তরে বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়নকারী, একমাত্র তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী এবং অবৈধভাবে প্রভুত্বের ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ জবরদখলকারী খোদাদ্রোহী শক্তির ভুয়া দাসত্বকে প্রত্যাখ্যানকারী জাদুকররা তাদের আল্লাহদ্রোহী শাসক শক্তির মধ্যকার লড়াইয়ের অর্থ কী, তা জানতো। তারা জানতো যে, এ লড়াই আদর্শের লড়াই। যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে এ লড়াই, সে আদর্শ সকল আল্লাহদ্রোহী তাগূতী শক্তির ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেও তাকে খতম করার

হুমকি দেয়। এ আদর্শের অনুসারীরা যখন বলে যে, তারা শুধু বিশ্ব প্রতিপালকের দাস, আর কারো নয়, এখনি তারা এ হুমকি দেয়। এমনকি শুধুমাত্র 'আল্লাহ সারা বিশ্বের প্রতিপালক' এতোটুকু কথা বলাই ওই হুমকি দেয়ার শামিল। এ জন্যেই জাদুকরদের বিরুদ্ধে ফেরাউন যখন অভিযোগ করলো যে, তোমরা জনগনকে দেশ ছাড়া করার জন্যে ষড়যন্ত্র এঁটেছো, তখন তার জবাবে তারা বললো, 'আমাদেরকে তুমি শুধু এ জন্যেই দোষারোপ করছ যে, আমরা আমাদের কাছে আগত আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।' অতপর যে প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনে তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের গোলামীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই প্রতিপালকের কাছে সাহায্য চেয়েছে এভাবে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করার ক্ষমতা দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দাও।' (আয়াত-১২৫)

বলা বাহুল্য, জাদুকরদেরকে ফেরাউন যে দোষারোপ করেছিলো, আধুনিক জাহেলিয়াতের ধ্বজাবাহীরাও আল্লাহকে বিশ্ব প্রতিপালক বলে ঘোষণাকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুরূপ দোষারোপ করে বলে থাকে যে, তারা সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ফেরাউনের বক্তব্যের জবাবে জাদুকরদের এই উক্তি ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের অন্তরে স্থাপিত এক অকাট্য দলীল, যা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধির সাক্ষ্য বহন করে। ফেরাউন ও তার দল বলের কাছে হযরত মূসা (আ.) যে নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ, ফসলহানি ও অন্য যে সব বিপদাপদ অবতীর্ণ করেছিলেন, আর এ সব সত্তেও তারা যে হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমি দেখিয়ে নিজেদের দুষ্কৃতি ও অনাচার অব্যাহত রাখার পরিণামে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এ পারায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফসলহানিতে আক্রান্ত করেছিলোাম, যেন তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। যখন তাদের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি আসতো, তখন বলতো, এটা আমাদের জন্যেই। আর দুর্যোগ দুর্বিপাক এলে তার জন্যে মূসা ও তার অনুসারীদের দুর্ভাগ্যকে দায়ী করতো। জেনে রেখো, তাদের দুর্ভাগ্য তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। তারা বলতো, তুমি আমাদের ওপর জাদু করার জন্যে যতো নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না। অতপর আমি তাদের ওপর সুস্পষ্ট নির্দশন হিসাবে বন্যা, পংগপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত পাঠালাম। তবু তারা দাম্ভিকসুলভ আচরণ করতে থাকলো এবং তারা অপরাধী জাতি ছিলো। অতপর যখনই তাদের ওপর দুর্যোগ নামতো, বলতো! হে মূসা, তোমার প্রতিপালক তোমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তার সুবাদে দোয়া করো। তুমি আমাদের ওপর থেকে দুর্যোগটা সরিয়ে দিলে আমরা অবশ্যই তোমার প্রতি ঈমান আনবো এবং তোমার সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দেবো। অতপর আমি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তাদের ওপর থেকে দুর্যোগ হটিয়ে দিলে তারা প্রতিশ্রুতি ভংগ করতো। অবশেষে আমি তাদের প্রতি প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ তারা আমার আয়াত অস্বীকার করেছিলো এবং তার প্রতি উদাসীন ছিলো।' (আয়াত ১৩০-১৩৬)

এই বিবরণ দেয়ার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায় আল্লাহদ্রোহী শক্তি সত্য প্রকাশিত হয়ে গেলেও বাতিলের প্রতি কতো একগুয়েমি দেখায় এবং 'বিশ্ব-প্রভুর' প্রতি দাওয়াতকে কত হঠকারিতা ও কত গোয়ার্তুমির সাথে প্রতিরোধ করে। কারণ তারা জানে যে, বিশ্ব প্রভুর আনুগত্যের দাওয়াতটাই তাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার শামিল। কেননা এ দাওয়াত বাতিলের অস্তিত্বই অবৈধ ঘোষণা করে। 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই' অথবা 'আল্লাহ তায়ালাই সারা বিশ্বের প্রতিপালক' এই ঘোষণা দিতে বাতিল ও খোদাদ্রোহী শক্তি কেবল তখনই অনুমতি দেবে, যখন ওই ঘোষণা

তার প্রকৃত তাৎপর্য হারিয়ে ফেলবে এবং কেবল অর্থহীন কথা হিসাবে উচ্চারিত হতে থাকবে। এরূপ অবস্থায় এই ঘোষণা বাতিলের কোনো ক্ষতিও করে না এবং তাকে কোনো কষ্টও দেয় না। কেন না বাতিলের সাথে এর কোনো সম্পর্কই থাকে না। কিন্তু যখন কোনো মানব গোষ্ঠী যথেষ্ঠ গুরুত্ব সহকারে এ উক্তিটা তার আসল অর্থেই উচ্চারণ করে, তখন যে বাতিল শক্তি আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে সার্বভৌম ক্ষমতা তথা নিরংকুশ কতৃত্ব প্রয়োগ করার মাধ্যমে এবং মানুষকে এই সার্বভৌমত্বের বলে নিজের গোলামে পরিণত করার মাধ্যমে সর্বময় ক্ষমতাধারী প্রভু হয়ে জেকে বসে, সেই আল্লাহদ্রোহী শক্তি ওই মানব গোষ্ঠীকে কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না, যেমন ফেরাউন বরদাশত করেনি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মূসার দাওয়াতকে এবং ঈমান আনয়নকারী জাদুকরদের এই ঘোষণা যে, তারা বিশ্ব প্রতিপালকের (রব্বুল আলামীন) প্রতি ঈমান এনেছে ফেরাউন একথা বরদাশত করেনি। ফেরাউন শুধু যে বরদাশত করেনি তা নয় বরং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই দাওয়াতকে প্রতিরোধ করে গেছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত নিদর্শনাবলী ও দুর্যোগ দুর্বিপাক, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি আসতে থাকা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ অব্যাহত রেখেছে। এ সব দুর্যোগ ও বিপদ-মুসিবত তাদের কাছে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে অনেক সহজ ও সহনীয় ছিলো। কেননা ওই দাওয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ ছিলো তাদের অবৈধভাবে অর্জিত ক্ষমতা থেকে পাততাড়ি গুটানো অনিবার্য হয়ে যাওয়া। আর এই অবৈধভাবে অর্জিত ক্ষমতার বলেই তারা মানুষকে বিশ্ব-প্রভু আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্যদের গোলাম বানিয়ে থাকে।

এই বিবরণের মধ্যে দিয়ে আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কী ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন, তাও জানা যায়। তাদেরকে প্রথমে বিপদ-মুসিবতে আক্রান্ত করেন, তারপর দেন সুখ সমৃদ্ধি। এতেও তাদের সম্বিত ফিরে না এলে সর্বশেষে তাদেরকে দোর্দন্ড প্রতাপের সাথে পাকড়াও করেন এবং ধ্বংস করে দেন। অতপর তাদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেন সেই মোমেনদেরকে যাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অতপর আমি আমার বরকত ও কল্যাণে সমৃদ্ধ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উত্তরাধিকারী করলাম সেই জাতিকে, যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হতো। ধৈর্যধারণের প্রতিদান স্বরূপ তোমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি বনী ইসরাঈলের জীবনে পূর্ণ হয়েছিলো। আর আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম ফেরাউন ও তার অনুসারীদের উৎপাদিত ও নির্মিত সমস্ত জিনিস।' (আয়াত-১৩৭)

কিন্তু বনী ইসরাঈলের নোংরা ও বক্র স্বভাব তাদের ওপর প্রবল হয়ে ওঠে এবং তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, যেমন কোরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায়। তারা তাদের ত্রাণকর্তা নেতা ও নবী মূসার (আ.) সাথে অত্যন্ত কষ্টদায়ক আচরণ করে, তার নাফরমানী করে। আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে এবং সরল ও সঠিক আচরণ থেকে বিরত থাকে। আর এ আচরণ আল্লাহ তায়ালা বারবার ক্ষমা করার পরও তারা বারবার করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহর চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি তাদের ওপর কার্যকর হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন যে, তাদের ওপর কেয়ামত পর্যন্ত এমন লোকদেরকে শাসক করে পাঠাতে থাকবেন, যারা তাদের ওপর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন চালাবে। ....' (আয়াত-১৬৭)

বস্তুত, আল্লাহর এ হুমকি অতীতে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বাস্তবায়িত না হয়ে পারে না। এটা ইতিহাসে তাদের পালাক্রমিক উত্থান পতন স্বরূপ। যখনই তারা সীমা অতিক্রম করেছে, অরাজকতা ছড়িয়েছে, স্বেচ্ছাচার ও আগ্রসন চালিয়েছে এবং তাদের নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর নিষ্ঠুরতম নির্যাতনকারী পাঠিয়েছেন। এই ধারা কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

শেষত, এটি মক্কী সূরা। এতে বনী ইসরাইলের স্বভাবের বক্রতা, অবাধ্যতা ও অসততার বিস্তর বিবরণ দেয়া হয়েছে। অথচ এ যুগের খৃস্টান ও ইহুদী প্রাচ্যবিদরা দাবী করে থাকেন যে, মোহাম্মদ (স.) যখন দেখলেন, মদীনায় ইহুদীদের ইসলাম গ্রহণের আর আশা নেই, তখনই কোরআনের মাধ্যমে তাদের ওপর আক্রমণ শুরু করলেন। মক্কায় থাকাকালে ও মদীনার প্রাথমিক যুগে তিনি ইহুদীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন এবং তাদের ধারণা অনুসারে, তখন কোরআনে ইহুদীদের ব্যাপারে কোনো আক্রমণাতত্মক বক্তব্য থাকতো না। বরঞ্চ তারা যাতে ইসলাম গ্রহণ করে, এই আশায় তাদের বলতেন যে, তাদের মাধ্যমে আরবরা তাদের দাদা ইবরাহীমের বংশধরদের সাথে মিলিত হতে পারবে। কিন্তু যখন তার এ আশা পূরণ হলো না, তখন এভাবে আক্রমণ করলেন। প্রাচ্যবাদীদের এ দাবী যে মিথ্যা এই সূরা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা এটা মক্কী সূরা। এখানে ইহুদীদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করা হয়েছে। এই অপরিবর্তনীয় সত্যের ব্যাপারে এই সূরার বিবরণ ও সূরা বাকারার বিবরণে কোনো পার্থক্য নেই। যখন আমরা এ সূরার ১৬৩ থেকে ১৬৭ নং আয়াত অধ্যয়ন করি, যা মাদানী আয়াত রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং যার একটিতে ইহুদীদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠুরতম অত্যাচারী শাসক চাপিয়ে দেয়ার ঘোষণা রয়েছে, তখন দেখতে পাই যে, এ কয়টি আয়াতের আগের ও পরের মক্কী আয়াতগুলোতেও বনী ইসরাঈলের স্বভাব চরিত্রের নির্ভুল বিবরণ রয়েছে। ওই সব আয়াতে তাদের বাছুর পূজা, এক আল্লাহর নামে মিসর থেকে বেরিয়ে আসার পর মূসার কাছে পূজার জন্যে মূর্তি চাওয়া, আল্লাহকে স্বচক্ষে না দেখলে ঈমান আনবে না বলায় ভূমিকম্প হওয়া এবং ফিলিস্তিনে প্রবেশের সময় আল্লাহর শেখানো কথা বিকৃত করা ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে। এ সব থেকে ওই সব প্রাচ্যবাদীর দাবীর অসারতা প্রমাণিত হয়ে যায়, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের পর এখন ইতিহাসকেও বিকৃত করতে সচেষ্ট। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ইসলাম সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তকের লেখকরা এই সব প্রাচ্যবাদীকেই শিক্ষা গুরু হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন।

বনী ইসরাঈলের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত-সার এখানেই শেষ করে এবার এর আয়াতসমূহের বিশদ আলোচনায় মনোনিবেশ করছি।

বনী ইসরাঈলের পুরো কাহিনীটা এই সূরায় রসূল (স.)-এর সহচর মোমেনদের উপলক্ষেই আলোচিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য একদিকে যেমন ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা কিরূপ হয়ে থাকে, তা তুলে ধরা এবং মানব জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও আল্লাহর বিশ্ব পরিচালনানীতির পারস্পরিক সম্পর্ক কী, তা স্পষ্ট করে দেয়া, তেমনি ঈমানের স্বভাব প্রকৃতি ও কুফরের স্বভাব-প্রকৃতি কেমন হয়ে থাকে তা বর্ণনা করাও এর উদ্দেশ্য। ঈমান ও কুফরের এই পরস্পর বিরোধী স্বভাব এই কাহিনীর বিভিন্ন অংশে ও বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর এই কাহিনীর সমাপ্তি টানা হয়েছে আল্লাহর কঠোর শাস্তির পরিপূর্ণ পরিদর্শনের পাশাপাশি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অংগীকার গ্রহণের দৃশ্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যখন আমি পাহাড়টাকে তাদের মাথার ওপর মেঘের মতো তুলে ধরলাম এবং তারা মনে করলো যেন ওটা তাদের ওপর পতিত হবে। আমি তখন বললাম, তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো এবং এতে যা আছে, তা স্মরণ কর। আশা করা যায় যে, তোমরা নাফরমানী থেকে রক্ষা পাবে।' (আয়াত ১৭১)

এ জন্যে এ দৃশ্যের পরেই চিত্রিত করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্মগত স্বভাবের দৃশ্য। বলা হয়েছে,

'যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করে আনলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা জবাব দিলো যে, হাঁ, ...' (আয়াত ১৭২ ও ১৭৩)

আবার এই দৃশ্যের পরেই তুলে ধরা হয়েছে আল্লাহর এই অংগীকার ভংগকারী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত তাঁর বিধানের জ্ঞান থেকে বিপথগামী হওয়ার দৃশ্য। এ দৃশ্য বড়ই উদ্দীপনাদায়ক। এতে একদিকে যেমন রয়েছে অংগীকার ভংগ ও আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান লাভ করার পরও তার বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত হওয়ার জোরদার প্রেরণা, তেমনি রয়েছে এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তাদেরকে সেই ব্যক্তির ঘটনা শুনিয়ে দাও, যাকে আমি আমার বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান দিয়েছিলাম, কিন্তু তা থেকে সে বিচ্যুত হলো। ফলে শয়তান তার পিছু নিলো এবং সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। আমি যদি চাইতাম, তবে তাকে ওই জ্ঞান দ্বারা উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করতে পারতাম। কিন্তু সে মাটির দিকে আকৃষ্ট হলো এবং নিজের প্রকৃতির অনুসরণ করলো। ফলে তার অবস্থা হয়ে গেলো কুকুরের মতো ....' (আয়াত ১৭৫, ১৭৬ ও ১৭৭)

অতপর ঈমান ও কুফরের স্বভাব প্রকৃতির যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কুফর হচ্ছে মানুষের জন্মগত স্বভাবের এমন এক অচলাবস্থা, যা আল্লাহর হেদায়াত লাভের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং পরিণামে তার সর্বনাশ ঘটায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করেন, সেই সঠিক পথ লাভ করে। আর যাকে গোমরাহ করেন, সে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। আমি জিন ও মানুষের মধ্য থেকে অনেককে জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে শোনে না। তারা পশুর মতো বরং তার চেয়েও অধম। তারা উদাসীন।' (আয়াত ১৭৮, ১৭৯)

এরপর একটি ইংগিত করা হয়েছে সেই মোশরেকদের প্রতি, যারা মক্কায় ইসলামের দাওয়াতকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করতো এবং আল্লাহর নামগুলোকে বিকৃত করে তা থেকে তাদের মনগড়া দেব-দেবীর নাম তৈরী করে নিতো। সেই সাথে ওই মোশরেকদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করা হবে বলে হুমকিও দেয়া হয়েছে। আর তাদেরকে আবেগমুক্ত হয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করার আহবান জানানো হয়েছে যে, তাদের সহচর মোহাম্মদ (স.) তাদেরকে যে হেদায়াতের পথে ডাকেন, তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত হচ্ছে কিনা এবং সেটা তার ঘাড়ে জ্বিন সওয়ার থাকার কারণে হচ্ছে বলা সংগত হচ্ছে কিনা। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যেন তারা আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্যে ও বিশ্ব প্রকৃতির সর্বত্র হেদায়াত লাভের সহায়ক যে জিনিসগুলো রয়েছে, তার দিকে দৃষ্টি দেয়। সেই সাথে আল্লাহ তায়ালা তাদের মৃত্যু সম্পর্কেও হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন, যার সম্পর্কে তারা উদাসীন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, সুন্দরতম নামগুলো আল্লাহর। ওগুলো দ্বারা তোমরা তাঁকে ডাকো। আর যারা তাঁর নামকে বিকৃত করে, তাদের সঙ্গ ত্যাগ করো। তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের যথোচিত প্রতিফল দেয়া হবে। আমার সৃষ্টির মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে, যারা সত্যের পথ প্রদর্শন করে এবং সত্যের সাহায্যেই ইনসাফ করে। আর যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে, তাদেরকে আমি ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করবো এমনভাবে যে, তারা টেরও পাবে না। আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি। আমার চক্রান্ত অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তারা কি ভেবে দেখেনি যে, তাদের সহচরের ওপর জ্বিনের সভাব নেই? সে তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।.....' (আয়াত ১৮০-১৮৬)

এরপরের আয়াতগুলোতে কেয়ামতকে প্রত্যাক্ষাণকারী মোশরেকদের মোকাবেলা করা হয়েছে যারা কেয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করে, আবার তার সময় কখন তাও জিজ্ঞাসা করে। এখানে তাদের এই অবজ্ঞা করা কেয়ামত যে কি ভয়াবহ, তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর রসূল ও রেসালাতের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহর সর্বময় প্রভুত্ব, একত্ব ও তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ, যার মধ্যে অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী হওয়া ও যথা সময়ে কেয়ামত সংঘটিত করা অন্যতম। এ কথাগুলো বলা হয়েছে ১৮৭ ও ১৮৮ নং আয়াতে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

'তারা তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে; ওটা কবে হবে। বলো, তার জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকের রয়েছে। যথা সময়েই তা তিনি সংঘটিত করবেন। আকাশ ও পৃথিবীতে তা অত্যন্ত ভারী। ওটা আকস্মিকভাবেই তোমাদের কাছে আসবে। তারা তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে এই ভেবে যেন তুমি তা জানো ....'

মোশরেকদের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শেরকের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন, মানুষের জন্মগত ও স্বভাব সুলভ ধর্ম একত্ববাদ থেকে সে বিচ্যুত হলো এবং কিভাবে এই বিচ্যুতি মানুষের অন্তরে কিভাবে সংঘটিত হয় তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই বর্ণনাটি এমন নিপুনভাবে দেয়া হয়েছে যে, মনে হয় যেন তাতে মোশরেকদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের বিচ্যুতির ছবি এঁকে দেয়া হয়েছে। অথচ এদের পূর্বসূরীরা ছিলো হযরত ইবরাহীমের আনীত একত্ববাদী ধর্মের অনুসারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যেন সে তার কাছে গিয়ে শান্তি পেতে পারে। অতপর যখন পুরুষটি (দৈহিক প্রয়োজনে) নারী সাথীটিকে ঢেকে দিলো তখন সে হালকা গর্ভ ধারণ করলো এবং তা নিয়ে চলাফেরা করতে লাগলো। অতপর যখন সে ভারী হয়ে পড়লো, তখন উভয়েই আল্লাহর কাছে দোয়া করলো যে, তুমি যদি আমাদেরকে একটি সৎ সন্তান দাও, তবে আমরা কৃতজ্ঞ হব। অতপর তিনি তাদেরকে একটি সৎ সন্তান দিলেন। অমনি তারা উভয়ে আল্লাহর কতগুলো অংশীদার বানিয়ে নিলো আল্লাহর প্রদত্ত জিনিসের ব্যাপারে। তাদের অংশীদার বানানো থেকে আল্লাহ তায়ালা অনেক উর্ধে। যারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং সৃজিত হয় এবং যারা অন্য কাউকে তো দূরের কথা নিজকেও সাহায্য করতে পারে না, তাদেরকেই কি তারা আল্লাহর অংশীদার বানায় ?' (আয়াত ১৮৯-১৯২)

এভাবে একই ব্যক্তির মধ্যে ক্রমাগত ভাবান্তর সৃষ্টির আকারে ধারাবাহিক বংশধরদের অবস্থার পরিবর্তনের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ ধরনের রূপক বর্ণনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, বাস্তবসম্মত এবং চমকপ্রদ।

যেহেতু এই সব বর্ণনার আসল উদ্দেশ্য কোরআন অবতরণকালীন মোশরেকদের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা, তাই এই সূরার আয়াতগুলোতে উদাহরণ পেশ করার পর সরাসরি তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তিনি তাদেরকে ও তাদের উপাস্যদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন।

'আর যদি তোমরা তাদেরকে হেদায়াতের দিকে ডাকো, তবে তারা তোমাদের অনুসরণ করে না। চাই তোমরা তাদেরকে ডাক, অথবা চুপ করে থাকো সবই সমান। আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা ডাকো, তারা তোমাদেরই মতোই বান্দা মাত্র। সুতরাং তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে এদেরকে ডাকো তো দেখি, ওরা তোমাদের, ডাকে সাড়া দিকতো দেখি। ওদের কি চলার মতো পা আছে? অথবা ওদের কি শোনার মতো কান আছে ? অথবা ওদের কি ধরার হাত আছে? অথবা ওদের কি দেখার মতো চোখ আছে ? বলো, তোমাদের অংশীদারদেরকে ডেকে আনো, অতপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো এবং আমাকে একটুও সময় দিয়ো না। ......' (আয়াত ১৯৩ - ১৯৮)

সূরার শেষে রসূল (স.) ও মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করে মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার সময় সহজ ও উদার পন্থা অবলম্বন, মানুষের নানা রকমের আপত্তি উত্থাপন ও অনীহা প্রদর্শনের কারণে ক্রোধের উদ্রেক করলে ক্রোধ সংবরণ এবং ক্রোধ ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী শয়তান থেকে আল্লাহর পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন,

'তুমি ক্ষমার পথ অবলম্বন করো, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অজ্ঞ লোকদেরকে এড়িয়ে চলো। আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুপ্ররোচনা তোমার কাছে এসেই পড়ে, তবে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। .... মোমেনদের জন্যে হেদায়াত ও করুণা।' (আয়াত ১৯৯-২০৩)

উপরোক্ত নির্দেশ সূরার শুরুতে উল্লেখিত এই আয়াতটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'এ হচ্ছে তোমার কাছে নাযিল-করা একটি কেতাব। সুতরাং এ কেতাব সম্পর্কে তোমার বক্ষে কোনো সংকীর্ণতা থাকা চাই না। এ কেতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি যেন এ দ্বারা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারো এবং মোমেনদের জন্যে এটি হচ্ছে স্মরণিকা।' এ আয়াতটিতে আগে ভাগেই আভাস দেয়া হয়েছে যে, মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া খুবই কঠিন কাজ, এ কাজ করতে গিয়ে তাদের মনে বহু দিনের জমে থাকা মরিচা, বাধা বিপত্তি, স্বার্থ ও কামনা বাসনা, উদাসীনতা ও অনীহার সম্মুখীন হতে হবে এবং ধৈর্য, উদারতা এবং সব কিছুকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার হিম্মত ও সাহস থাকার প্রয়োজন হবে।

উপরন্তু এ পথের বাধা বিপত্তি অতিক্রমের জন্যে যে পাথেয় প্রয়োজন তারও সন্ধান দেয়া হয়েছে। সেই পাথেয় হচ্ছে কোরআন যখন পাঠ করা হয়, তখন তা নীরবে ও মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা, সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করা, উদাসীনতা থেকে সতর্ক থাকা এবং আল্লাহর স্মরণ ও এবাদাতে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদের অনুকরণ করা। শেষ আয়াত তিনটি লক্ষ্য করুন,

'যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনো, হয়তো তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করা হবে। আর তোমার প্রতিপালককে মনে মনে, আগ্রহ ও ভীতি সহকারে এবং নিশব্দে স্মরণ করো সকালে ও সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা তোমার প্রতিপালকের কাছে আছে, তারা তাঁর এবাদাতে অহংকার করে না। বরং তাঁর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করে এবং তাঁরই জন্যে সেজদা করে।' (আয়াত ২০৪-২০৬)

বস্তুত, এই সার্বক্ষণিক যেকর, তাসবীহ, সেজদাহ ও এবাদাতই হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতদাতাদের পাথেয়, তাদের আনুগত্যের রীতি এবং আল্লাহর প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ বান্দাদের চিরস্থায়ী কর্মপদ্ধতি।

নবম পারার আয়াতসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাওয়ার আগে এটুকু সংক্ষিপ্ত-সার তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করছি।(১)

(১) নবম পারার প্রথম ৬টি আয়াত (৮৮-৯৩) হযরত শোয়াইবের কাহিনীর অংশ বিধায় ৮ম পারার সাথে যুক্ত হয়েছে এবং তার তাফসীর ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে, যাতে ঐ কাহিনী এক জায়গায় সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ
لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ۝٩٤ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا
قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩٥
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٩٦ اَفَاَمِنَ اَهْلُ
الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝٩٧ اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى
اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝٩٨ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ج فَلَا يَاْمَنُ
مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٩٩

রুকু ১২

৯৪. আমি কোনো জনপদে কোনো নবী পাঠিয়েছি– অথচ সেই জনপদে মানুষদের অভাব ও কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করিনি, এমনটি কখনো হয়নি, আশা (করা গিয়েছিলো), এর ফলে তারা আল্লাহ তায়ালার কাছে বিনয়াবনত হবে। ৯৫. অতপর আমি তাদের দুঃখ-কষ্টের জায়গাকে সচ্ছল অবস্থার দ্বারা বদলে দিয়েছি, এমনকি যখন তারা (আমার নেয়ামত দ্বারা) প্রাচুর্য লাভ করলো, তখন তারা (আমাকেই ভুলে বসলো এবং) বললো, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপরও এসেছে, অতপর আমি তাদের এমন আকস্মিকভাবে পাকড়াও করলাম যে, তারা টেরও পেলো না। ৯৬. অথচ যদি সেই জনপদের মানুষগুলো (আল্লাহ তায়ালার ওপর) ঈমান আনতো এবং (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করতো, তাহলে আমি তাদের ওপর আসমান–যমীনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম, কিন্তু (তা না করে) তারা (আমার নবীকেই) মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, সুতরাং তাদের কর্মকান্ডের জন্যে আমি তাদের (ভীষণভাবে) পাকড়াও করলাম। ৯৭. (এ) লোকালয়ের মানুষগুলো কি এতোই নির্ভয় হয়ে গেছে (তারা মনে করে নিয়েছে), আমার আযাব (নিঝুম) রাতে তাদের কাছে আসবে না, যখন তারা (গভীর) ঘুমে (বিভোর হয়ে) থাকবে! ৯৮. অথবা জনপদের মানুষগুলো কি নির্ভয় হয়ে ধরে নিয়েছে যে, আমার আযাব তাদের ওপর মধ্য দিনে এসে পড়বে না– যখন তারা খেল-তামাশায় মত্ত থাকবে। ৯৯. কিংবা তারা কি আল্লাহ তায়ালার কলা-কৌশল থেকেও নির্ভয় হয়ে গেছে, অথচ আল্লাহ তায়ালার কলা-কৌশল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ছাড়া অন্য কেউই নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

রুকু ১৩

১০০. (আগের) লোকদের চলে যাওয়ার পর (তাদের জায়গায়) যারা পরে দুনিয়ার উত্তরাধিকারী হয়েছে, তাদের কি এ বিষয়টি কখনো হেদায়াতের পথ দেখায় না যে, আমি ইচ্ছা করলে (যে কোনো সময়ই) তাদের অপরাধের জন্যে তাদের পাকড়াও করতে পারি এবং (এমনভাবে) তাদের দিলের ওপর মোহর মেরে দিতে পারি যে, তারা (সত্যের ডাক) শুনতেই পাবে না। ১০১. এই যে জনপদসমূহ– যাদের কিছু কিছু কাহিনী আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে রসূলরা এসেছিলো, কিন্তু তারা যে বিষয়টি এর আগে অস্বীকার করেছিলো, তার ওপর ঈমান আনলো না; আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসী কাফেরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। ১০২. আমি এদের বেশী সংখ্যক মানুষকেই (আমার সাথে সম্পাদিত) প্রতিশ্রুতির পালনকারী হিসেবে পাইনি, বরং এদের অধিকাংশকেই আমি (বড়ো বড়ো অপরাধে) অপরাধী পেয়েছি।

তাফসীর

আয়াত ৯৪-১০২

সূরার ধারাবাহিক আলোচনার মাঝে এটি একটি বিরতি বিশেষ। ইতিপূর্বে হযরত নূহ, হুদ সালেহ, লূত ও শোয়ায়ব (আ.)-এর যে ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে, তার ওপর মন্তব্য বা পর্যালোচনা করার জন্যেই এখানে এই বিরতি দেয়া হয়েছে। (এরপর ১০৩ নং আয়াত থেকে আবার হযরত মূসা ও ফেরাউনের কাহিনী শুরু হয়েছে।) এই পর্যালোচনায় বিশ্ব জগতের সৃষ্টি, পরিচালনা ও ধ্বংস এবং আল্লাহর রসূলদের দেয়া সত্যের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের ভাগ্য ও পরিণতি নির্ধারণে তাঁর অনুসৃত নীতি আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ছোট বড় সকল জনপদে রসূল বা নবী পাঠাতেন এবং যে সব জনপদের অধিবাসী তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতো তাদেরকে পর্যায়ক্রমে শাস্তি দিতেন। আল্লাহর এই নীতি চিরন্তন ও শাশ্বত। সকল জাতি ও জনপদের সাথে তিনি একই আচরণ করেছেন। এই নীতি মানবেতিহাসের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। নীতিটা হলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে প্রথমে নানা রকমের দুঃখকষ্ট, দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে শাস্তি দেন, যাতে তাদের মন নরম হয়, শিক্ষা গ্রহণ করে, আল্লাহর দিকে ঝোঁকে এবং তাঁর মহা পরাক্রান্ত প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের সামনে মানুষের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব যে কত নগণ্য তা উপলব্ধি করে। এতেও যখন তাদের সম্বিত ফেরে না এবং তারা সুপথে আসে না, তখন তাদেরকে

প্রচুর সুখ সমৃদ্ধি দান করেন। এ সবই দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু এই সুখ সমৃদ্ধি যখন তাদেরকে ধৃষ্টতা ও উদাসীনতার চরম সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়, যখন তারা একেবারেই বেপরোয়া আচরণ করতে থাকে এবং ভাবতে থাকে যে, জীবন এমন গতানুগতিকভাবেই চলবে, এর কোনো নিয়ন্তা নেই, কোনো লক্ষ্য নেই, দুঃখের পরে সুখ এমনিই আসে, এর পেছনে কারো কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নেই, কোনো পরীক্ষা নেই। তাদের পূর্ব পুরুষরাও এমনি দুঃখের পরে সুখ ভোগ করতো, কেননা দুনিয়াটা এভাবেই কোনো পরিকল্পনা ও পরিচালক ছাড়াই চলে, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আর কোনো হুশিয়ারী সংকেত ও অবকাশ না দিয়ে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করেন। যখন তারা উদাসীনতা ও শৈথিল্যে ডুবে থাকে, সুখ ও দুঃখে আল্লাহর কোনো পরীক্ষা আছে কিনা, তা অনুধাবন করে না, বান্দাদের নানা রকমের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটানোর পেছনে তার কী গভীর ও মহৎ উদ্দেশ্য ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা উপলব্ধি করে না এবং অলস ও অবাধ্য লোকদের ওপর আল্লাহর যে কোপ ও ক্রোধ অবশ্যম্ভাবী, তা থেকে সতর্কও হয় না এবং পশু বা তার চেয়েও জঘন্য পন্থায় জীবন যাপন করতে থাকে তখনই আল্লাহর গযব এসে তাদেরকে পাকড়াও করে নেয়। এই অবস্থাতেই আল্লাহর পার্থিব আযাব নেমে আসে। যদি সময় থাকতে তারা ঈমান আনে ও তাকওয়া বা সতর্কতা অবলম্বন করে, তা হলে পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে, বরকত ও কল্যাণ নাযিল হতে পারে, আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবী থেকে অবারিত ধারায় জীবিকা দিতে পারেন এবং জীবনকে শান্তি-নিরাপত্তা-কল্যাণ দিয়ে ভরে দিতে পারেন। আর কোনো দুঃখ-কষ্ট বা শাস্তি নাযিল হবার আশংকা না থাকতে পারে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের উত্তরাধিকারীদেরকে সতর্ক করেন যে, তারা যেন পার্থিব জীবনের সুখ ঐশ্বর্যের লোভে বেহুশ ও অচেতন হয়ে না যায়। তাদেরকে সতর্কতা ও সংযম অবলম্বন এবং তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত পূর্বসূরীদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানান। কেননা তাদের জন্যেও আল্লাহর সেই অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী নীতি অপেক্ষা করছে, যা শত শত হাজার হাজার বছর ধরে মানবেতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করছে। নবীদের ইতিবৃত্ত আলোচনার মধ্যবর্তী এই পর্যালোচনামূলক বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'ওই সমস্ত জনপদের কাহিনী আমি তোমাকে শুনাচ্ছি এই কাহিনীগুলো শুনানোর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর যে মহাজাগতিক বিধানের বলে ওই জনপদগুলো শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিলো, সেই বিধান রসূল (স.)-কে অবহিত করা এবং ওই জনপদগুলো ও তার অধিবাসীরা কী প্রকৃতি ও কী চরিত্রের অধিকারী ছিলো, তা তাঁকে জানানো। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি ওই অধিবাসীদের অধিকাংশকেই অংগীকার রক্ষাকারী হিসাবে পাইনি, বরং তাদের অধিকাংশকে অবাধ্য ও পাপিষ্ঠ পেয়েছি।' (আয়াত ১০২) বস্তুত শেষ নবী ও তাঁর উম্মতই সকল নবী ও রসূলের পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস ও তার শিক্ষা দ্বারা উপকৃত একমাত্র জাতি।

এবারে আসুন এই আয়াতগুলোর তাফসীরে মনোনিবেশ করি, যা মধ্যবর্তী পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (আয়াত ৯৪ থেকে আয়াত ১০২ পর্যন্ত)

প্রাচুর্য ও অভাব অনটনের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি যখনই কোনো জনপদে কোনো নবীকে পাঠিয়েছি। আমি সেই জনপদবাসীকে বিপদ মুসিবত দ্বারা আক্রান্ত করেছি। অতপর বিপদ মুসিবত দুর করে তাদেরকে সুখ দিয়েছি, অবশেষে তাদের ঔদ্ধত্য বেড়েছে.......' (৯৪-৯৫)

এই আয়াত কটিতে কোনো ঘটনা নয় বরং একটা নিয়ম ও নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কোনো জাতির জীবনেতিহাস বর্ণনা করা হয়নি বরং তাদের পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, একটা মহাজাগতিক নিয়ম রয়েছে যার আওতায় ও যা অনুসারে বিভিন্ন ঘটনা ঘটে থাকে এবং সেই অনুযায়ীই পৃথিবীতে মানবেতিহাসের বিবর্তন সাধিত হয়। আল্লাহর বাণী নিয়ে পৃথিবীতে নবী ও রসূলদের আগমন যদিও অত্যন্ত মহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যাপার, কিন্তু তা আল্লাহর ওই মহাজাগতিক নিয়ম বাস্তবায়নের অন্যতম উপলক্ষ ও মাধ্যম বিশেষ। আল্লাহর এই নিয়ম আল্লাহর বাণীর চেয়ে অনেক বড় ও সুদূরপ্রসারী। এ আয়াতগুলো থেকে আরো জানা যায় যে, পৃথিবীতে যে ঘটনাই ঘটে, তা নিছক এমনি এমনি বা অপরিকল্পিতভাবে ঘটে না। পৃথিবীতে মানুষ এককভাবে ও স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে বাস করে না যদিও এ যুগের নাস্তিকেরা সে রকমই ধারণা করে। মহাবিশ্বের যেখানে যা-ই ঘটে, তা সুপরিকল্পিতভাবে অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্যেই ঘটে এবং তার একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। আল্লাহর স্বাধীন ইচ্ছা ও পরাক্রান্ত ক্ষমতা বলেই যাবতীয় ঘটনা সংঘটিত হয় এবং এই ঘটনা নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ম বিধি তৈরী হয়। আর আল্লাহর অবাধ্য ও নবী-রসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী জাতিসমূহের যে শোচনীয় পরিণতি হয়েছিলো, তাও আল্লাহর স্বাধীন ইচ্ছা ও অজেয় ক্ষমতার অধীন এবং তাঁর তৈরী নিয়মবিধি অনুযায়ীই সংঘটিত হয়েছিলো। ঐ ঘটনাবলীই এখানে বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামী মতাদর্শ অনুসারে মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম যে মানবেতিহাসের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে ও ইতিহাসের বিশ্লেষণে অন্যতম চালিকাশক্তি, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা ও কর্মও আল্লাহর অবাধ ইচ্ছা ও পরিকল্পনার আওতাধীনই সংঘটিত হয়ে থাকে। মহাবিশ্বের সব কিছুই আল্লাহর প্রত্যক্ষ ও সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের আওতাধীন। আল্লাহর এই নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীন ইচ্ছা ও পরিকল্পনার আওতায় মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম গোটা বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সংযোগ রক্ষা করে থাকে, একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং একে অপর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। মানবেতিহাসের গতি সঞ্চারকারী অসংখ্য কার্যকারণ ও জগত রয়েছে এবং এই গতির পরিমন্ডল অত্যন্ত গভীর ও প্রশস্ত। সেই বিশাল পরিমন্ডলে তথাকথিত 'ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা', 'ইতিহাসের জীবতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা' এবং 'ইতিহাসের ভৌগোলিক ব্যাখ্যা' অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিষয় এবং ক্ষুদ্র মানুষের তুচ্ছ অর্থহীন কিছু তৎপরতা বলে মনে হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি যখনই কোনো জনপদে কোনো জনপদে কোনো নবী পাঠিয়েছি, তার অধিবাসীদেরকে' ....(আয়াত ৯৪ দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ তায়ালা কোনো বেহুদা ও নিরর্থক কাজ করার মত হীনতা ও নীচতা থেকে অনেক উর্ধে। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে যদি কখনো বিপদ-আপদে বা দুঃখ কষ্টে নিক্ষেপ করেন, তবে তা নেহাৎ পরিহাসচ্ছলে বা মনের কোনো আক্রোশ বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে করেন না। পৌত্তলিকদের প্রাচীন উপাখ্যানে তাদের হিংসুটে ও পরিহাসকারী দেব-দেবী সম্পর্কে এ ধরনের বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদেরকে অস্বীকারকারী জাতিগুলোকে বিপদ মুসিবতে আক্রান্ত করেন অন্য একটা মহৎ উদ্দেশ্যে। বিপদ মুসিবতের একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এই যে, তা আক্রান্ত ব্যক্তির স্বভাব প্রকৃতিতে প্রত্যাশিত কোনো সৎ প্রবণতা প্রচ্ছন্ন থাকলে তাকে জাগিয়ে তোলে, দীর্ঘ দিনের অযত্ন ও অবহেলায় পাষাণ হয়ে যাওয়া হৃদয়ে সামান্য কোমলতা লুকিয়ে থাকলেও তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে কোমল করে দেয়, দুর্বল মানুষকে

তার মহা পরাক্রমশালী স্রষ্টার দিকে মনোনিবিষ্ট ও বিনয়াবনত করে, তাঁর দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাঁর কাছে নিজের দীনতা, হীনতা প্রকাশ করে তাঁর দাসত্ব গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। বস্তুত আল্লাহর দাসত্বের উপলব্ধিতেই মানব জন্মের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত রয়েছে, যদিও বান্দার পক্ষ থেকে দাসত্বের উপলব্ধি ও প্রকাশ ঘটুক বা না ঘটুক তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা তূরে বলেছেন,

'আমি শুধু আমার দাসত্ব করার জন্যেই জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি। তাদের কাছে আমি কোনো জীবিকা চাই না এবং তারা আমাকে আহার করাক তাও চাই না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র জীবিকাদাতা এবং অটুট শক্তির অধিকারী।'

অনুরূপভাবে একটি হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র জ্বিন জাতি ও মানব জাতি যদি তাদের মধ্যকার সবচেয়ে সৎ লোকটির মতো সৎ হয়ে যায়, তবে তাতে আল্লাহর রাজ্যের কিছুমাত্র বৃদ্ধি ঘটে না। আর সমগ্র জ্বিন জাতি ও মানব জাতি যদি তাদের সবচেয়ে পাপিষ্ঠ ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, তাহলেও তাতে তাঁর রাজ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি সাধিত হয় না। তবে বান্দা যদি নিজের দাসত্ব স্বীকার ও দাসোচিত কর্তব্য পালন করে, তবে সেটা তার নিজেরই কল্যাণ ও উপকার সাধন করে এবং তার জীবন ও জীবিকার উন্নতি নিশ্চিত করে। মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহর বান্দা বা দাস বলে স্বীকার করে, তখন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর সবার গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে যায়। সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, শয়তান তাকে বিপথগামী করার জন্যে সর্বদা সচেষ্ট। আল্লাহর বান্দা হয়ে যেতে পারলে মানুষ সেই শয়তানের গোলামী থেকেও মুক্ত হয়ে যায় এবং নিজের কু-প্রকৃতির গোলামী থেকেও মুক্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, তার সমপর্যায়ের যে সকল বান্দা তাকে নিজের গোলাম বানাতে চায় তাদের কবল থেকেও রক্ষা পায়। এ দ্বারা মানুষ বিপদে পড়লে যে আল্লাহর শরণাপন্ন হয়, তাকে ভুলে গিয়ে তার ক্রোধভাজন হবার মতো কাজ থেকে রক্ষা পায়, যে জীবন পদ্ধতি তাদেরকে মুক্ত করে ও পবিত্র করে তার ওপর অবিচল থাকতে সক্ষম হয় এবং নিজের কু-প্রবৃত্তির দাসত্ব ও আল্লাহর বান্দাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে।

এজন্যেই আল্লাহর চিরস্থায়ী ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত ও নীতি এই যে, তিনি যে জাতির কাছে তাঁর নবী পাঠাবেন, সে জাতি তাকে প্রত্যাখ্যান করলে তাদেরকে বা'ছা' (অর্থাৎ মানসিক কষ্ট) এবং 'যাররা' অর্থাৎ দৈহিক-আর্থিক ক্ষয় ক্ষতি দিয়ে আক্রান্ত করবেন। তিনি এভাবে কষ্ট দিয়ে তাদের অন্তরকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান। বস্তুত, দুখ-কষ্ট মানুষকে সংশোধন করে, তার স্বভাবে সুপ্ত যে প্রচ্ছন্ন সৎ প্রবণতা রয়েছে তাকে জাগিয়ে তোলে, এখনো মরে যায়নি এমন বিবেককে সংবেদনশীল করে এবং বিপন্ন দুর্বল মানুষকে বিপদের কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর রহমতের দিকে চালিত করে। 'যাতে তারা বিনয়াবনত হয়।'

'অতপর আমি দুঃখের পরিবর্তে সুখ দেই।'

অর্থাৎ সহসাই দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটে, তার পরিবর্তে সুখ-শান্তি নেমে আসে, দারিদ্রের পরিবর্তে সমৃদ্ধি আসে, কষ্টের পর স্বস্তি আসে, বন্ধ্যাত্বের পরিবর্তে সন্তান প্রাপ্তি ঘটে, অভাবের পর প্রাচূর্য আসে এবং ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা আসে। আসলে এভাবেও মানুষকে পরীক্ষা করা হয়।

বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে যে পরীক্ষা করা হয়, অনেকেই তাতে ধৈর্যধারণ করতে পারে। কেননা কঠিন মুসিবত মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতা উজ্জীবিত করে। আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে কিছুটা সৎ প্রবণতা অবশিষ্ট থেকে থাকলে তা তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে সে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে ও বিনয়াবনত হয়। তার কাছে আশ্রয় চেয়ে সে প্রশান্তি, তৃপ্তি ও

নিরাপত্তা বোধ করে ও আশান্বিত হয়। পক্ষান্তরে সুখ ও সমৃদ্ধি দ্বারা যে পরীক্ষা করা হয়, তাতে ধৈর্য ধারণকারীর সংখ্যা খুবই কম। কেননা সুখ মানুষকে আত্মভোলা ও উদাসীন বানিয়ে দেয়। বিত্তবৈভব ও প্রাচুর্য তাকে দাম্ভিক ও অহংকারী বানায়। তাই এ পরীক্ষায় আল্লাহর খুব কম বান্দাই পাস করে।

'অতপর দুঃখ কষ্টের জায়গাকে সুখ সমৃদ্ধি দ্বারা বদলে দিয়েছি, ফলে তাদের ঔদ্ধত্য বেড়েছে এবং তারা বলেছে যে, আমাদের বাপ দাদাদের জীবনেও এরূপ সুখ-দুঃখ আসতো।'

আয়াতে 'হাত্তা আফাও' কথাটার অর্থ হলো 'ফলে তাদের ঔদ্ধত্য বেড়েছে।' অর্থাৎ দুঃখের পরে সুখ আসার কারণে তাদের জীবনে প্রাচুর্য এসেছে, তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের জীবন আরাম আয়েশ ও বিলাসিতায় পূর্ণ হয়ে গেছে, কোনো কাজে তারা ভয় বা সংকোচ বোধ করতো না। 'আফাও' শব্দটা প্রাচুর্যের পাশাপাশি এমন একটা মানসিক অবস্থাকে বুঝায়, যা বেপরোয়াভাব, ধৃষ্টতা, সব কিছুকে হালকাভাবে গ্রহণ করা, অনুভূতি ও আচরণে দ্বিধাহীনতা ও ভাবলেশহীনতা। দীর্ঘ কালব্যাপী প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি উপভোগকারী লোকদের জীবনে এ সব উপসর্গ দেখা যায়। তারা অকাতরে অঢেল অর্থ ব্যয় করে, ভোগবিলাসে মত্ত থাকে, আমোদ প্রমোদে গা ভাসিয়ে দেয়, আবার দুর্ধর্ষতা ও হিংস্রতাও দেখায়। সাধারণ মানুষ ভাবতেও আঁতকে ওঠে এমন বড় বড় পাপের কাজ তারা অতি সহজে ও নির্দ্বিধায় করে। আল্লাহর ক্রোধ বা মানুষের নিন্দা কিছুই তারা তোয়াক্কা করে না। সব কিছুই তারা বেপরোয়ায়ভাবে ও নির্দ্বিধায় করে ফেলে। এমনকি বিশ্ব প্রকৃতিতে আল্লাহ তায়ালা যে নিয়মে মানুষকে নানা রকমের দুঃখ কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন, তাও তারা বিবেচনায় আনে না। তাই তারা ভাবে, বিশ্ব জগত আপনা থেকেই চলে, এর কোনো নিয়ন্ত্রণ পরিচালক নেই, এর পেছনে কারো ইচ্ছার কোনো হাত নেই।

'তারা বলে, আমাদের বাপ দাদারাও সুখ-দুঃখ ভোগ করতো।'

অর্থাৎ আমরা যেমন দুর্দিনের পর সুদিন পেয়েছি। একটা অতীত, একটা বর্তমান। কোনোটা কোনোটার পরিণাম নয়। জগতটা এই নিয়মেই চলে।

তাদের অবস্থা যখন এই পর্যায়ে পৌঁছে যায়, সব কিছুকে ভুলে যায়, ধরাকে সরা জ্ঞান করে, কোনো কিছুর পরোয়া করে না। কোনো সীমা ও মাত্রা জ্ঞান তাদের থাকে না, তখনই আল্লাহর চিরাচরিত নিয়মে শাস্তি নেমে আসে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অমনি আমি তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করি, অথচ তারা টেরও পায় না।'

এটা তাদের বিস্মৃতি, দাম্ভিকতা, আল্লাহ তায়ালা থেকে দূরে সরে যাওয়া, স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাওয়া এবং নির্ভয়ে ও নিসংকোচে অপকর্ম করার ফল। এভাবেই আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম চলে আবহমান কাল ধরে। আল্লাহর বান্দাদের ওপর আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকরী হয়। এভাবেই আল্লাহর ইচ্ছা ও আল্লাহর নিয়মের অধীন মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের ভিত্তিতে আবর্তিত হতে থাকে মানুষের ইতিহাস। কোরআন আল্লাহর এই নিয়মের কথাই মানুষকে জানায় এবং আল্লাহর পরীক্ষা সম্পর্কে সাবধান করে। সে পরীক্ষা দুঃখ ও সুখ উভয় প্রকারেই হয়ে থাকে। কোরআন মানুষকে সজাগ ও সতর্ক করে থাকে। তার অনিবার্য ও অবধারিত পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে। সে পরিণাম নির্ণীত হয় তার ইচ্ছা ও কর্মের নিরিখে। কোরআনের এই হুশিয়ারী ও সতর্কবাণী সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সতর্ক হয় না, অন্যায় কাজে সংকোচ ও দ্বিধা বোধ করে না, আল্লাহর ভয়ে ভীত ও সংযত হয় না, সে-ই নিজের ব্যক্তি সত্ত্বার ওপর যুলুম করে নিজেকে আল্লাহর অবধারিত আযাবের উপযুক্ত বানায়। আল্লাহ তায়ালা কখনো কারো ওপর যুলুম করেন না।

মুসলমানদের সাথে প্রাচুর্যের ওয়াদা

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যদি ওই জনপদবাসী ঈমান আনতো ও সংযত হতো, তাহলে আমি তাদের ওপর আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করতাম। কিন্তু তারা রসূলদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করলো। ফলে আমি তাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে পাকড়াও করলাম।' (আয়াত ৯৬)

এ হচ্ছে আল্লাহর চলমান প্রাকৃতিক নিয়মের আর একটি দিক। কোনো জনপদের অধিবাসীরা যদি নবীদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান না করে তাদের ওপর ঈমান আনতো এবং দাম্ভিকতা ও ধৃষ্টতা প্রদর্শনের পরিবর্তে খোদাভীতি ও সংযমের পথ অবলম্বন করতো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর আকাশ ও পৃথিবী থেকে বরকত ও কল্যাণের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিতেন, অর্থাৎ ওপর থেকে ও নীচ থেকে অবারিত ধারায় ও বিনা হিসাবে বরকত বা কল্যাণ লাভ করতো। এখানে কোরআনে 'বরকত' শব্দটি শুধু প্রচলিত অর্থে জীবিকা তথা বস্তুগত সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এ দ্বারা ব্যাপকতর অর্থে আল্লাহর করুণার ধারা বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত থেকে আমরা বিশ্ব প্রকৃতি, মানব জীবন ও ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত একটি তত্ত্ব যেমন জানতে পারি, তেমনি চিনতে পারি মানবেতিহাসের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণকে, যার সম্পর্কে সকল মানব রচিত মতবাদগুলো শুধু অজ্ঞই নয়, বরং অস্বীকারও করে।

সেই তত্ত্বটি এই যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর ভয়ে তাঁর নিষিদ্ধ জিনিস থেকে দূরে থাকা (তাকওয়া) মানুষের পার্থিব জীবনের সাথে ও ইতিহাসের সাথে সম্পর্কহীন কোনো বিষয় নয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর ভয়ে সংযম অবলম্বন এই দুটো মহৎ গুণ মানুষকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে নির্গত বরকত বা কল্যাণের যোগ্য বানায়। এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহর চেয়ে উত্তম প্রতিশ্রুতি পালনকারী আর কেউ নেই। আমরা যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী, তারা মোমেনের মন নিয়েই এই প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত জানাই। প্রথমত, এ প্রতিশ্রুতিকে শর্তহীনভাবে বিশ্বাস করি। এর কারণ কী, তা যেমন জানতে চাই না, তেমনি এ ওয়াদা যে পালন করা হবে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সংশয়ও পোষণ করি না। আমরা যেমন না দেখেই আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, তেমনি সেই ঈমানের দাবী মোতাবেকই আল্লাহর ওয়াদায় বিশ্বাস করি। এরপর আল্লাহর এই ওয়াদার প্রতি যুক্তির দৃষ্টিতে তাকালে এর কারণও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। বলা বাহুল্য যে, এই যুক্তির দৃষ্টিতে তাকানোটাও ঈমানের পরিপন্থী নয়, বরং এর জন্যে ঈমানের নির্দেশও রয়েছে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান আনয়নকারীর স্বভাব প্রকৃতি অবিকৃত, নিখুঁত ও সজীব রয়েছে, তার সহজাত সত্যগ্রাহী ক্ষমতা বহাল রয়েছে, তার বুদ্ধি ও বিবেক সত্য উপলব্ধি করতে এখনো সক্ষম, তার মানবীয় সত্ত্বা এখনো জীবন্ত এবং বিশ্ব প্রকৃতির তত্ত্ব ও তথ্য অনুধাবনে তার মেধা অত্যন্ত প্রখর ও উদার। এ সবই পার্থিব জীবনে সাফল্যের উপকরণ।

আল্লাহর প্রতি ঈমান একটি তীব্র প্রতিরোধক ও উদ্দীপক শক্তি। মানবীয় শক্তি সামর্থের সকল দিক এর আওতায় এসে যায়। এই সমস্ত দিক নিয়েই সে তাকে আল্লাহর অনুগত বানায়, তাকে আল্লাহর কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয়ের যোগ্য করে, তাকে পৃথিবীতে আল্লাহর খোলাফত প্রতিষ্ঠা এবং পৃথিবীর গঠন ও উন্নয়নে আল্লাহর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে প্রস্তুত করে, পৃথিবী থেকে সকল ফেতনা ফাসাদ তথা অরাজকতা ও অনাচার দূর করতে অনুপ্রাণিত করে এবং জীবনকে উন্নত ও বিকশিত করার প্রেরণা যোগায়। এগুলোও পার্থিব জীবনের সাফল্যের অপরিহার্য শর্ত।

আল্লাহর প্রতি ঈমান মানুষকে তার প্রবৃত্তির দাসত্ব ও আল্লাহর বান্দাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে। আর যারা আল্লাহর বান্দাদের বা নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, তাদের চেয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যকারীরাই যে পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠায় অধিকতর দক্ষ ও সমর্থ, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

আর আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া হলো এক ধরনের সার্বক্ষণিক সতর্কতা ও সংযম, যা মানুষকে দাম্ভিকতা, ধৃষ্টতা, অহংকার ও ঔদ্ধত্য থেকে রক্ষা করে, যা মানুষের জীবন ও কর্মকে সংযত ও পরিশীলিত করে, যা মানুষের সকল কর্মকাণ্ডকে অসাবধানতা ও সীমা অতিক্রম করা থেকে রক্ষা করে। ফলে তাকওয়ার গুণ সম্পন্ন মানুষ অসতর্ক ও উদ্ধত হয় না। দাম্ভিক হয় না, বেপরোয়া হয় না এবং সততার সীমা ছাড়িয়ে যায় না।

জীবন যখন বিধি নিষেধ ও উৎসাহ উদ্দীপনাদায়ক জিনিসগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন পূর্বক এগিয়ে যেতে থাকে, আল্লাহকে হাযির নাযির জেনে পার্থিব কাজ সমাধা করতে থাকে, মানুষের ও প্রবৃত্তির গোলামী থেকে মুক্ত ও আল্লাহর অনুগত হয়ে কাজ করতে থাকে, তখন সে নির্ভুলভাবে এগিয়ে চলে, প্রতি পদে সে আল্লাহর সাহায্য ও সন্তুষ্টি লাভ করতে থাকে। ফলে সর্ববিধ বরকত ও কল্যাণ লাভ তার জন্যে অপরিহার্য হয়ে যায়, সব কিছুতেই সে কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করে। এই সাহায্য ও কল্যাণের বিষয়টি প্রকাশ্য, বাস্তব ও দৃশ্যমান। এ ছাড়া আল্লাহর যে অদৃশ্য করুণা ও গায়েবী সাহায্যপ্রাপ্তি ঘটে, সেটা এর অতিরিক্ত।

আল্লাহ তাঁর সতর্ক, সাবধানী ও সংযত মোত্তাকী পরহেযগার মোমেন বান্দাদের জন্যে যে কল্যাণের নিশ্চিত ওয়াদা করেছেন, তা সীমা সংখ্যাহীন এবং বহু প্রকারের। কোরআনের শাব্দিক অভিব্যক্তি তার সীমাহীনতাকেই স্পষ্ট করে দেয়। আকাশ ও পৃথিবী থেকে এমন অফুরন্ত পরিমাণে ও অগণিত প্রকারে ও আকৃতিতে তা নেমে আসে যে, মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না।

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাকওয়াকে নিরেট ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জিনিস মনে করে এবং পৃথিবী ও মানব জীবনের সাথে সংস্রবহীন বিষয় মনে করে, তারা ঈমান ও পার্থিব জীবন এ দুটোর কোনোটাকেই জানে না ও বোঝে না। আল্লাহ তায়ালা নিজেই যখন সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, পার্থিব জীবন ও তার সুখ সমৃদ্ধির সাথে ঈমান ও তাকওয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তখন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যে কোনো বিষয়ে আল্লাহর সাক্ষ্যই তো যথেষ্ট। মানুষের সুপরিচিত উপকরণাদির প্রতি দৃষ্টি দিলেই এই সাক্ষ্য কতো বাস্তব ও অকাট্য বুঝা যাবে। যেমন ৯৬ নং আয়াতটিতে বলা হয়েছে,

'জনপদবাসীরা যদি ঈমান আনতো ....'

কিছু লোক প্রশ্ন করে থাকে যে, আমরা তো কত মুসলিম জাতিকে দেখি নিদারুণ অভাব ও দারিদ্রের শিকার, অভাব অনটন হাহাকার দুর্ভিক্ষ তাদের নিত্য সহচর। আবার কত অমুসলিম ও অ-মোত্তাকী লোকদেরকেও দেখি সম্পদ, শক্তি ও ক্ষমতায় তারা আকাশছোঁয়া সাফল্যের অধিকারী। তাহলে আল্লাহর সেই অমোঘ নিয়ম কোথায় গেলো? কিন্তু আসলে এটা তাদের দৃষ্টিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

যাদেরকে তারা মুসলমান বলে চিহ্নিত করছে, তারা আসলে মোমেনও নয়, মোত্তাকীও নয়। তারা আল্লাহর একনিষ্ঠ দাসও নয় এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, এই সাক্ষ্য প্রদানে তারা সত্যবাদী নয়। তারা তাদেরই মতো একশ্রেণীর মানুষের কাছে আত্ম সমর্পণ করে দাসানুদাস হয়ে রয়েছে, তাদের আইন কানুন, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলেছে। কাজেই তারা সঠিক অর্থে কিছুতেই মোমেন নয়। একজন মোমেন কখনো আল্লাহর আর এক বান্দার

আইন কানুনের আনুগত্য করতে পারে না। সে কখনো তারই মতো আর একজন বান্দাকে তার জীবনের ওপর কর্তৃত্বকারী প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে জীবনের কোনো ক্ষেত্রে তার নির্দেশ ও বিধান মেনে চলতে পারে না। যারা আজ নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে, তাদের পূর্ব-পুরুষেরা যেদিন সত্যিকার মুসলমান হিসাবে পৃথিবীতে জীবন যাপন করতো, সেদিন সারা পৃথিবী তাদের অনুগত ছিলো, আকাশ ও পৃথিবী থেকে তাদের প্রতি কল্যাণ ও বরকত বর্ষিত হতো এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হতো।(১)

পক্ষান্তরে অমুসলিমদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সুখ সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের বন্যা বয়ে যাওয়াটা আল্লাহরই ঘোষিত রীতি। যেমন ৯৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অতপর দুঃখ সরিয়ে নিয়ে সুখ দিয়েছি। ফলে তাদের ঔদ্ধত্য বেড়ে গেছে এবং তারা বলেছে যে, আমাদের বাপ-দাদার ওপরও সুখ ও দুঃখ আসতো।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাঁর অবাধ্য ও নাফরমান লোকদেরকে এভাবে সুখ সমৃদ্ধি দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। এ পরীক্ষা বিপদ মুসিবত ও দুঃখ দারিদ্রের পরীক্ষার চেয়েও কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ। এই পরীক্ষামূলক সুখ সমৃদ্ধি এবং মোমেন ও খোদাভীরু বান্দাদের জন্যে আল্লাহর প্রতিশ্রুত বরকত ও কল্যাণ এক জিনিস নয়। উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। বরকত তথা প্রবৃদ্ধি ও প্রাচুর্য সামান্য জিনিসেও হতে পারে, যদি তাকে কেউ ভালোভাবে কাজে লাগায় এবং শান্তি, সন্তোষ ও সততার সাথে তা ব্যবহার করা হয়। এমন বহু শক্তিশালী ও বিত্তশালী জাতি রয়েছে, যাদের জীবনে শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই, আভ্যন্তরীণ বিভেদ ও অনৈক্যে যারা জর্জরিত, যেখানে মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত কাটে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় এবং অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার আশংকায়। এ ধরনের জাতি শক্তিমান হলেও নিরাপত্তাহীন, বিত্তশালী হলেও অসুখী, প্রাচুর্যময় হলেও অতৃপ্ত এবং ও জাঁকজমকপূর্ণ হলেও তাদের সামনে রয়েছে শোচনীয় ও ধ্বংসাত্মক ভবিষ্যত। এ ধরনের সুখ ও সমৃদ্ধি আসলে এমন এক পরীক্ষা, যার শেষ ফল লাঞ্ছনা গ না ছাড়া আর কিছু নয়।

পক্ষান্তরে ঈমান ও খোদাভীরুতার সাথে যে বরকত বা সমৃদ্ধি পাওয়া যায়, তা সহায় সম্পদের প্রবৃদ্ধি, মানসিক শান্তি ও পরিতৃপ্তি, আবেগ ও অনুভূতির নির্মলতা এবং জীবনের নিরুদ্বেগত্ব ও নিরাপত্তার সমন্বয়ে একীভূত বহুমুখী ও সর্বাত্মক সুখ, শান্তি ও কল্যাণের নাম। এই বরকত জীবনকে প্রতি মুহূর্তে সমৃদ্ধিশালী ও মর্যাদাশালী করে। দুর্ভোগ, ধ্বংস ও বিনাশের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে নিছক সাময়িক ভোগবিলাসের নাম বরকত নয়।(২)

আল্লাহর অবাধ্যতা হচ্ছে আযাবের পূর্ব লক্ষণ

অতীতের বিলুপ্ত ও বিধ্বস্ত জনপদগুলো আল্লাহর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যে শিক্ষা পেয়েছে এবং নবীদেরকে প্রত্যাখ্যানকারী কাফের ও অসৎ লোকদের ওপর যে শোচনীয় পরিণতি নেমে এসেছে, তার বর্ণনা দেয়ার পর এবং সম্পদের প্রাচুর্যের আনন্দে আত্মহারা হয়ে আল্লাহর পরীক্ষার মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাদের দুঃখজনক উদাসীনতার শাস্তির বিবরণ দেয়ার পর পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে উদাসীন লোকদের চেতনা সঞ্চারে মনোযোগ দেয়া হয়েছে এবং তাদের অজান্তে দিন রাতের যে কোনো সময়ে আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হবার সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

(১) এ পর্যায়ে পাঠকদের আমরা বিশেষ করে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও কবি আল্লামা ইকবালের বিখ্যাত কাব্য শেকওয়াহ ও জওয়াবে শেকওয়াহ পড়ে দেখার আহ্বান জানাবো।–সম্পাদক

(২) আমার লেখা পুস্তক 'আল ইসলামু ওয়া মুশকিলাতুল হাযারাহ' (ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার সংকট) এবং মোহাম্মদ কুতুবের লেখা 'আত্তাতাউরু ওয়াছ ছুবাত' (প্রগতি ও স্থিতিশীলতা) দ্রষ্টব্য।

'জনপদবাসী কি ভয় পায় না যে, তাদের ওপর আমার শাস্তি রাতের বেলায় ঘুমের ঘোরে নাযিল হয়ে যেতে পারে? অথবা জনপদবাসী কি ভয় পায় না যে, আমার শাস্তি তাদের ওপর দিন দুপুরে তাদের খেলাধুলার সময়েও অবতীর্ণ হয়ে যেতে পারে? তারা কি আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত? আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে কেবল তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে যাদের ধ্বংস অবধারিত।.......... (আয়াত ৯৬-৯৯)

অর্থাৎ বিপদাপদ ও সুখ সমৃদ্ধি দিয়ে পরীক্ষা করা আল্লাহর আবহমানকালের রীতি, একথা জানা সত্তেও এবং আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যানকারী জনপদবাসীর ধ্বংসের পর তাদের উত্তরসূরী হিসাবে একই বিধ্বস্ত জনপদের অধিবাসী হওয়া সত্তেও তারা কি নিশ্চিন্ত যে, তাদের যে- কোনো অসতর্ক মুহূর্তে বিশেষত, রাতের বেলায় ঘুমের ঘোরে আল্লাহর শাস্তি তথা ধ্বংস ও বিনাশ তাদের ওপর নেমে আসতে পারে। নিদ্রিতাবস্থায় মানুষের ইচ্ছা ও শক্তি বলতে কিছুই থাকে না। তখন সে কোনো রকম সতর্কতা অবলম্বন করতে, এমনকি একটি ক্ষুদ্র পোকামাড়ক থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। আর তা যখন পারে না, তখন অসীম শক্তিধর আল্লাহর শাস্তি থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা করবে? তার শাস্তি তো মানুষ জেগে থাকা অবস্থায় সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করেও রোধ করতে পারে না।

দিন দুপুরে তারা যখন খেষ তামাশায় মত্ত তখনো তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসতে পারে। খেলাধুলায় মত্ত থাকা কালেও মানুষ সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যায় এবং সতর্ক প্রস্তুতি নেয়ার সময় ও সুযোগ পায় না। তখন তার ওপর কেউ আক্রমণ চালালে তা সে ঠেকাতে পারে না। আর আল্লাহর আক্রমণের তো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েও তা প্রতিহত করতে পারে না।

মানুষ জেগেই থাকুক বা ঘুমিয়েই থাকুক, খেলায় মত্ত থাকুক বা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকুক, আল্লাহর আযাব এতো ভয়ংকর যে, কোনো অবস্থাতেই তা প্রতিরোধ করার কোনো ক্ষমতা কারো নেই। তবু কোরআন মানুষের দুর্বল সময়কার অবস্থাটাই তুলে ধরেছে, যাতে তার চেতনার ওপর জোরদার প্রভাব বিস্তার করা যায় এবং তাকে অসতর্ক ও দুর্বল মুহূর্তে আকস্মিকভাবে নেমে আসা আল্লাহর আযাব থেকে আগে ভাগেই সাবধান করা যায়। এ ধরনের আযাব সচেতন বা অচেতন যে অবস্থাতেই আসুক না কেন, সবই সমান। এ থেকে তার নিস্তার পাওয়া অসম্ভব।

'তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? আল্লাহর কৌশল থেকে কেবল তারাই নিশ্চিন্ত হয়, যাদের ধ্বংস অনিবার্য।'

এখানে 'আল্লাহর কৌশল' দ্বারা আল্লাহর সেই সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন কৌশল ও শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষের কাছে অদৃশ্য। 'তারা কি ..... নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে?' এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা কি মনে করে তাদের আল্লাহর কৌশল অর্থাৎ আযাব থেকে সতর্ক হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই? আয়াতের শেষাংশের অর্থ হলো, আল্লাহর আযাব থেকে নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হয়ে যাওয়ার অবধারিত পরিণাম হলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া। যারা এই ধ্বংস ও ক্ষতির যোগ্য তারাই এ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকে। অর্থাৎ তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের পাপের পরিণামে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তারা জনপদসমূহের উত্তরাধিকারী হয়েছে। তবু কি তারা আল্লাহর অদৃশ্য আযাব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে আছে? তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া কি তাদের সুপথপ্রাপ্তির জন্যে যথেষ্ট নয়?

১০০ নং আয়াতটি লক্ষ্য করুন :

'যমীনের পূর্ববর্তী অধিবাসীদের পরে যারা উত্তরাধিকারী হয়েছে, তাদের সুপথপ্রাপ্তির জন্যে কি এটাই যথেষ্ট নয় যে, আমি ইচ্ছা করলেই তাদের পাপের দরুন শাস্তি দিতে পারি এবং তাদের অন্তরে সিল মেরে দিতে পারি, ফলে তারা আর শুনবে না?'

আল্লাহর নিয়ম অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় এবং তাঁর ইচ্ছা অপ্রতিরোধ্য। কাজেই পূর্ববর্তীদের মতো তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পাপের শাস্তি দেবেন না এ নিশ্চয়তা তাদেরকে কে দিয়েছে? আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে সিল করে দিয়ে তাদের হেদায়াতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা এমনকি হেদায়াতের কথা শোনার ক্ষমতাও বিলুপ্ত করে দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে গোমরাহীর শাস্তি তাদেরকে দিতে পারেন এ কথা তারা ভুলে গেলো কিভাবে? বস্তুত, তাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংসের ঘটনা, তাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে পরবর্তীদের আবির্ভাব এবং আল্লাহর আবহমানকাল ধরে চালু নিয়ম- এসব কিছুতে তাদের সতর্ক হওয়ার মতো যথেষ্ট উপকরণ ছিলো। কারো মিথ্যে আশ্বাসে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা ও উদাসীন হওয়া তাদের উচিত ছিলো না। তাদের পূর্ব-পুরুষদের শোচনীয় পরিণতি থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিলো, যাতে সেই পরিণতি তাদেরও না হয়। অবশ্য তারা যদি হেদায়াতের বাণী শ্রবণ করে, তবেই তাদের সেই পরিণতি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

কোরআনে এই সব হুশিয়ারী ও সতর্কবাণী উচ্চারণ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আতংক ও উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য করতে চান না। তিনি চান না। যে, মানুষ অস্থিরতা ও ত্রাসে সর্বক্ষণ কম্পমান থাকুক এবং দিনে বা রাতে যে কোনো মুহূর্তে সে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় সারাক্ষণ শংকিত থাকুক। কেননা সর্বক্ষণ অজানা আশংকা, ভবিষ্যতের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক দুর্ভাবনা এবং প্রতি মুহূর্তে ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা মানুষের কর্মশক্তিকে নিষ্ক্রিয় ও বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। এতে করে, কর্ম, উৎপাদন, উন্নয়ন ও দেশ গঠন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে এবং এসব কিছু থেকে মানুষ হতাশ ও নিরুৎসাহিত হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তায়ালা শুধু চান যে, মানুষের ভেতরে সতর্কতা, আত্মসংযম, আত্মনিরীক্ষণ, ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ, মানব জাতিসমূহ সকল সৃষ্টি জগতের চালিকাশক্তি কী তা জানুক, আল্লাহর সাথে সার্বক্ষণিক সংযোগ ও সম্পর্ক রাখুক এবং জীবনের সুখ-শান্তি ও আরাম আয়েশের কারণে অহংকারী না না হয়ে আরো বিনয়ী হওয়ার মানষিকতা অর্জিত হোক।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেই সব বান্দাকে দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্য, সন্তোষ, শান্তি ও নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা তাঁর সম্পর্কে সংবেদনশীল থাকে, তাঁর সম্পর্কে সতর্ক থাকে, জীবনকে কলুষিত করতে পারে এমন সব কিছু থেকে দূরে থাকে এবং তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য বজায় রাখে। তাদেরকে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থানের আহ্বান জানান- অহংকার ও গর্ব উৎপাদনকারী বস্তুগত সহায় সম্পদের আশ্রয় নয়। তাদেরকে তিনি তাঁর অটুট ক্ষমতার ওপর নির্ভর করার আহ্বান জানান- তাদের ক্ষয়িষ্ণু বস্তুগত শক্তির ওপর নয়। তাদেরকে তিনি তাঁর অমর ও অক্ষয় সম্পদের আশ্রয় নেয়ার আহ্বান জানান তাদের নিজেদের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সম্পদের আশ্রয় নয়। আল্লাহর প্রতি যথার্থ ঈমান আনয়নকারী ও যথার্থ খোদাভীরু একদল বান্দা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও উদাসীন থাকতো না এবং তাঁর ওপর ছাড়া আর কারো ওপর নির্ভর করতো না। এ দুটি গুণের কারণে তাদের অন্তর সব সময় ঈমানী বলে বলীয়ান থাকতো, আল্লাহর স্মরণে সর্বদা ব্যস্ত ও তৃপ্ত থাকতো, শয়তান ও তার কুপ্ররোচনার ওপর সব সময় বিজয়ী ও পরাক্রান্ত থাকতো, আল্লাহর

হেদায়াতের আলোকে পৃথিবীতে সব সময় সংস্কার ও সংশোধনের কাজে ব্যাপৃত থাকতো এবং তারা একমাত্র ভয় আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করতো না।

আল্লাহর সেই অপ্রতিরোধ্য শাস্তি ও অদৃশ্য কৌশল সম্পর্কে কেন আমাদেরকে সর্বক্ষণ ভীতি প্রদর্শন করা হয়, সে রহস্য আমাদের এখান থেকেই বুঝে নেয়া উচিত। আমাদের বুঝা উচিত যে, এর উদ্দেশ্য আমাদেরকে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত করে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া নয়, বরং সদা জাগ্রত ও সদা সতর্ক রাখা, আতংকে দিশেহারা করে দেয়া নয়, বরং সদা সচেতন ও সংবেদনশীল রাখা। জীবনকে নিশ্চল করে দেয়া নয়, বরং সীমালংঘন ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন থেকে রক্ষা করা।

কোরআনের বর্ণনাভংগি এমন যে, তা মানুষের রকমারি মনস্তত্ত্ব ও তার নিত্য পরিবর্তনশীল মনের সুচিকিৎসা করে। অনুরূপভাবে তা বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর রকমারি মানসিকতারও সুচিকিৎসা করে। প্রত্যেকের জন্যে সে উপযুক্ত ওষুধ নির্বাচন ও প্রয়োগ করে। দুনিয়ার বিভিন্ন শক্তি ও পার্থিব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার ভয়ে যখন সে দিশেহারা হয়ে পড়ে, তখন সে তাকে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা ও আল্লাহর নিরাপদ আশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি নামক ওষুধের দু'এক ফোঁটা খাইয়ে দেয়। আর যখন সে দুনিয়াবী শক্তির ওপর ও পার্থিব জীবনের হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্য সৃষ্টিকারী উপকরণগুলোর ওপর ভর করে ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করতে থাকে, তখন সে তাকে খাইয়ে দেয় দুনিয়ায় আল্লাহর আযাব নাযিল হওয়ার ভয় নামক ওষুধের কয়েক ফোঁটা। বস্তুত, আল্লাহর সৃষ্টির স্বভাব প্রকৃতি ও চাহিদা সম্পর্কে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন কেননা তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও অভিজ্ঞ।(১)

সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার পরিণতি

এ যাবত বিশ্ব-প্রকৃতিতে কার্যকর আল্লাহর নিয়ম ও বিধির বিবরণ দেয়া ও সে সম্পর্কে মানবীয় চেতনাকে সজাগ করার পর, এবার শুরু হয়েছে রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহর আযাবে বিধ্বস্ত জনপদবাসীর পরিণাম অবহিত করা, তার মাধ্যমে ঈমান ও কুফরের স্বভাব প্রকৃতি উন্মোচিত করা এবং মানুষের সাধারণ স্বভাব প্রকৃতি, যা এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর স্বভাব দেখে জানা যায়, তা উন্মোচন করার পালা। যেমন আল্লাহ ১০১ ও ১০২ আয়াতে বলেন,

'ওই জনপদগুলোর কাহিনী আমি তোমাকে শুনাচ্ছি। তাদের মধ্য থেকে আগত রসূলরা তাদের কাছে অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তারা যে বিষয়টিকে ইতিপূর্বে অস্বীকার করেছিলো তখনো তার ওপর ঈমান আনলোনা। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের হৃদয়ে সিল মেরে দেন। আমি তাদের অধিকাংশের মধ্যেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার গুণ দেখতে পাইনি। তাদের অধিকাংশকে আমি কেবল অবাধ্যই পেয়েছি।'

বস্তুত, এভাবে আল্লাহর ওহী ও নির্দেশনার মাধ্যমে রসূল (স.)-কে তার একেবারে অজানা ইতিহাস অবহিত করেন।

'তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকে আসা রসূলরা অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন ....' কিন্তু ওই অকাট্য প্রমাণাদি তাদের কোনো কাজে লাগেনি। এসব অকাট্য প্রমাণাদি আসার পরও তারা আগের মতোই অবিশ্বাস ও অস্বীকার অব্যাহত রেখেছে। প্রমাণাদি আসার আগে যে দাওয়াতকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে, প্রমাণ আসার পরও তার ওপর ঈমান আনেনি। যুক্তি প্রমাণ অবিশ্বাসীদেরকে ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করে না। কেননা শুধু এর অভাবেই তাদের ঈমান আনা

(১) মোহাম্মদ কুতুব রচিত দু'খানা পুস্তক 'মানহাজুত তারবয়াতিল ইসলামিয়া' (ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতি) এবং 'দারাসাতুন ফিন নাফসিল ইনসানিয়া' (মানবীয় মনস্তত্ত্ব)

আটকে থাকে না। যে কারণে তাদের ঈমান আনা আটকে থাকে, তা হলো তাদের উন্মুক্ত, উদার ও প্রশস্ত মনের অভাব, হেদায়াতের প্রতি আকর্ষণের অভাব এবং তার অনুভূতির অভাব। আসলে তাদের সহজাত স্বভাব প্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধি– যা কোনো কিছুকে গ্রহণ করে ও সাড়া দেয়– সজীব ছিলো না। হেদায়াতের বাণী ও ঈমানের যুক্তি-প্রমাণের প্রতি তারা যখন মনোযোগ দিলো না, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে সিল করে দিলেন এবং বন্ধ করে দিলেন। ফলে তা আর সত্যের ডাকে সাড়া দেয়া ও তা গ্রহণ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ তায়ালা তাই আয়াতের শেষে বলেন,

'এভাবেই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের অন্তর সিল করে দেন।'

আর সিল করা লোকদের সম্পর্কে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী আয়াতে (১০২ নং) বলেন,

'আমি তাদের অধিকাংশকেই প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী পাইনি .....।'

যে প্রতিশ্রুতির কথা এখানে বলা হয়েছে, তা মানব সৃষ্টির সময়ে আল্লাহর গৃহীত সেই অংগীকারও হতে পারে, যা সূরার শেষের দিকে আলোচিত হয়েছে, 'যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের পরবর্তী বংশধরদেরকে বের করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বললো, হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।' ....

আবার এর অর্থ সেই অংগীকারও হতে পারে, যা নবীদের প্রতি ঈমান আণয়নকারী তাদের পূর্ব পুরুষরা দিয়েছিলেন। পরে পরবর্তীরা তা থেকে বিচ্যুত হয়। এ ধরনের বিচ্যুতি সকল জাহেলী যুগেই ঘটে থাকে। এক একটি প্রজন্ম একটু একটু করে বিপথগামী হতে হতে এক সময় ঈমানের অংগীকার ভংগ করে ফেলে এবং জাহেলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

যে অংগীকারই বুঝানো হোক, একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বিধ্বস্ত জাতিসমূহের বেশীর ভাগ আল্লাহর সাথে কোনো ওয়াদা রক্ষা করেনি, হয় সরাসরি ওয়াদা ভংগ করেছে, নচেত ধৈর্যহারা হয়ে ওয়াদার দাবী পূরণ ও তার দায় দায়িত্ব পালন করে সরল ও সঠিক হেদায়াতের পথে বহাল থাকেনি। আল্লাহ তায়ালা এ কথাই আয়াতের শেষাংশে বলেছেন,

'তাদের অধিকাংশকে আমি কেবল অবাধ্যই পেয়েছি।'

অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন থেকে ও তাঁর প্রাচীন অংগীকার থেকে বিচ্যুত পেয়েছি। এ হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতা ও ওয়াদা খেলাফীর ফল। যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও অংগীকার রক্ষা করে না, হেদায়াতের সরল ও সঠিক পথে বহাল থাকে না, আল্লাহর নির্দেশা অনুযায়ী জীবন যাপন করে না, তাদের বিপথগামী হওয়া, দলে দলে বিভক্ত হওয়া ও আল্লাহর অবাধ্য হওয়া অনিবার্য ও অবধারিত। বিধ্বস্ত জনপদগুলোর অধিবাসীদের মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো এবং এগুলোই তাদের শোচনীয় পরিণতি ডেকে এনেছিলো।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِاٰيٰتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَقَالَ مُوسَى يٰفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَّا أَقُولَ عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٩﴾ يُّرِيْدُ أَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿١١١﴾

১০৩. এদের (ধ্বংসের) পর আমি মূসাকে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে পাঠিয়েছি, কিন্তু তারাও (আমার) নিদর্শনসমূহের সাথে বাড়াবাড়ি করেছে, (আজ) তুমি দেখে নাও, (আমার যমীনে) বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন ছিলো। ১০৪. মূসা বললো, হে ফেরাউন, আমি অবশ্যই সৃষ্টিকুলের মালিকের পক্ষ থেকে পাঠানো একজন রসূল। ১০৫. এটা নিশ্চিত, আমি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলবো না, আমি অবশ্যই তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছি, অতএব তুমি বনী ইসরাঈলদের (মুক্তি দিয়ে) আমার সাথে যেতে দাও! ১০৬. ফেরাউন বললো, তুমি যদি (সত্যিই তেমন) কোনো নিদর্শন এনে থাকো এবং তুমি যদি (তোমার দাবীতে) সত্যবাদী হও, তাহলে তা (সামনে) নিয়ে এসো! ১০৭. অতপর সে তার হাতের লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ করলো, সাথে সাথেই তা প্রকাশ্য একটি অজগরে পরিণত হয়ে গেলো। ১০৮. অতপর সে (বগল থেকে) তার হাত বের করলো, সাথে সাথে তা (উৎসাহী) দর্শকদের জন্যে চমকাতে লাগলো।

রুকু ১৪

১০৯. (অবস্থা দেখে) ফেরাউনের জাতির প্রধান ব্যক্তিরা বললো, এ তো (দেখছি আসলেই) একজন সুদক্ষ যাদুকর! ১১০. (আসলে) এ ব্যক্তি তোমাদের সবাইকে তোমাদের (নিজেদের) দেশ থেকেই বের করে দিতে চায়, (এ পরিস্থিতিতে) তোমরা (আমাকে) কি পরামর্শ দিচ্ছো? ১১১. (অতপর) তারা ফেরাউনকে বললো, আপাতত তাকে এবং তার ভাইকে কিছু দিনের জন্যে এমনিই থাকতে দাও এবং (এ সুযোগে) তোমরা শহরে-বন্দরে (সরকারী) সংগ্রাহক পাঠিয়ে দাও।

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا۟ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا

إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾ قَالُوا۟

يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُوا۟ ۖ فَلَمَّآ

أَلْقَوْا۟ سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾

فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟

صَٰغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢١﴾

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِۦ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ

১১২. যেন তারা দেশের সকল দক্ষ যাদুকরদের (অবিলম্বে) তোমার কাছে নিয়ে আসে। ১১৩. (সিদ্ধান্ত মোতাবেক) যাদুকররা যখন ফেরাউনের কাছে এলো, তখন তারা বললো, আমরা যদি (আজ মূসার মোকাবেলায়) বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্যে নিশ্চিত পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে তো! ১১৪. সে বললো, হাঁ (তা তো অবশ্যই) এবং তোমরাই হবে (দরবারের) ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিদের অন্যতম। ১১৫. (এবার) যাদুকররা বললো, হে মূসা, (যাদুর বাণ) তুমি আগে নিক্ষেপ করবে না আমরা আগে তা নিক্ষেপ করবো। ১১৬. সে বললো, তোমরাই (বরং) আগে নিক্ষেপ করো, অতপর তারা (তাদের বাণ) নিক্ষেপ করে মানুষদের দৃষ্টিশক্তির ওপর যাদু করে ফেললো, (এতে করে) তারা মানুষদের ভীত-আতংকিত করে তুললো, তারা (সেদিন সত্য সত্যই) বড়ো যাদুমন্ত্র নিয়ে হাযির হয়েছিলো। ১১৭. অতপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম এবং তাকে বললাম, এবার তুমি (যমীনে) তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ করো, (নিক্ষিপ্ত হবার সাথে সাথেই) তা যাদুকরদের অলীক বানোয়াটগুলোকে গ্রাস করে ফেললো। ১১৮. অতপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, আর তারা যা কিছু বানিয়ে এনেছিলো তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। ১১৯. সেখানে তারা সবাই পরাভূত হলো এবং তারা লাঞ্ছিত হয়ে (ফিরে) গেলো। ১২০. অতপর (সত্যের সামনে) যাদুকরদের অবনত করে দেয়া হলো। ১২১. তারা (সবাই সমস্বরে) বলে উঠলো, আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের ওপর ঈমান আনলাম, ১২২. (যিনি) মূসা ও হারূনের মালিক। ১২৩. (ঘটনার এই আকস্মিক মোড় পরিবর্তন দেখে) ফেরাউন বললো, (একি!) আমি তোমাদের কোনো রকম অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার ওপর ঈমান আনলে!

إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ

تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ

أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا

بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ۚ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا

فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ

الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

(আসলে আমি বুঝতে পারলাম,) এ ছিলো তোমাদের সবার নিশ্চিত একটা ষড়যন্ত্র! (এ) নগরে (বসেই) তোমরা তা পাকিয়েছো, যাতে করে তার অধিবাসীদের তোমরা সেখান থেকে বের করে দিতে পারো, অচিরেই তোমরা (এ বিদ্রোহের পরিণাম) জানতে পারবে। ১২৪. আমি অবশ্যই তোমাদের একদিকের হাত ও অন্যদিকের পাগুলো কেটে ফেলবো, এরপর আমি তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াবো। ১২৫. তারা বললো, আমরা তো (একদিন) আমাদের মালিকের কাছে ফিরে যাবোই (তাই আমরা তোমার শাস্তির পরোয়া করি না)। ১২৬. তুমি আমাদের কাছ থেকে এ কারণেই (এই) প্রতিশোধ নিচ্ছো যে, আমাদের মালিকের নিদর্শনসমূহ, যা তাঁর কাছ থেকে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি; (আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি,) হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দাও এবং (তোমার) অনুগত বান্দা হিসেবে তুমি আমাদের মৃত্যু দিয়ো।

রুকু ১৫

১২৭. ফেরাউনের জাতির সরদাররা তাকে বললো, তুমি কি মূসা ও তার দলবলকে এ যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্যে এমনিই ছেড়ে দিয়ে রাখবে এবং তারা তোমাকে ও তোমার দেবতাদের (এভাবে) বর্জন করেই চলবে? সে বললো (না, তা কখনো হবে না), আমি (অচিরেই) তাদের ছেলেদের হত্যা করে ফেলবো এবং তাদের মেয়েদের আমি জীবিত রাখবো, (নিসন্দেহে) আমি তাদের ওপর বিপুল ক্ষমতায় ক্ষমতাবান। ১২৮. মূসা এবার তার জাতিকে বললো, (তোমরা) আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধারণ করো (মনে রেখো), অবশ্যই এ যমীন (হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালার, তিনি নিজ বান্দাদের মাঝে যাকে চান তাকেই এ যমীনের ক্ষমতা দান করেন; চূড়ান্ত সাফল্য তাদের জন্যেই– যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে।

قَالُوٓا۟ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا۟ لَنَا هَٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا۟ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ ۗ أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوا۟ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِۦ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَٰتٍ مُّفَصَّلَٰتٍ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا۟ يَٰمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۖ لَئِن

১২৯. তারা (মূসাকে) বললো, তুমি আমাদের কাছে (নবী হয়ে) আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি, আর (এখন) তুমি আমাদের কাছে আসার পরও আমরা একইভাবে নির্যাতিত হচ্ছি; (এর কি কোনো শেষ হবে না?) মূসা বললো (হাঁ, হবে), খুব তাড়াতাড়িই সম্ভবত তোমাদের মালিক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং (এ) দুনিয়ায় তিনি তোমাদের তার স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতপর আল্লাহ তায়ালা দেখবেন তোমরা কিভাবে (তার) কাজ করো!

রুকু ১৬

১৩০. ক্রমাগত বেশ কয়েক বছর ধরে আমি ফেরাউনের লোকজনদের দুর্ভিক্ষ ও ফসলের স্বল্পতা দিয়ে আক্রান্ত করে রেখেছিলাম, (ভাবছিলাম) সম্ভবত তারা (কিছুটা হলেও) বুঝতে পারবে। ১৩১. যখন তাদের ওপর ভালো সময় আসতো তখন তারা বলতো, এ তো ছিলো আমাদের নিজেদেরই (পাওনা), আবার যখন দুঃসময় তাদের পেয়ে বসতো, তখন নিজেদের দুর্ভাগ্যের ভার তারা মূসা এবং তার সংগী-সাথীদের ওপরই আরোপ করতো; হাঁ, তাদের দুর্ভাগ্যের যাবতীয় বিষয় তো আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই (এ সম্পর্কে) অবহিত নয়। ১৩২. তারা (মূসাকে আরো) বললো, আমাদের ওপর যাদুর প্রভাব বিস্তার করার জন্যে তুমি যতো নিদর্শনই নিয়ে আসো না কেন, আমরা কখনো তোমার ওপর ঈমান আনবো না। ১৩৩. (এ ধৃষ্টতার জন্যে) অতপর আমি তাদের ওপর ঝড়-তুফান (দিলাম), পংগপাল (পাঠালাম), উকুন (ছড়ালাম), ব্যাঙ (ছেড়ে দিলাম) ও রক্ত (-পাতজনিত বিপর্যয়) নাযিল করলাম, এর সবকয়টিই (তাদের কাছে এসেছিলো আমার এক একটা) সুস্পষ্ট নিদর্শন (হিসেবে, কিন্তু এ সত্ত্বেও) তারা অহংকার বড়াই করতেই থাকলো, আসলেই তারা ছিলো একটি অপরাধী জাতি। ১৩৪. যখনি তাদের ওপর কোনো বিপর্যয় আসতো, তখন তারা বলতো হে মূসা! তোমার প্রতি

كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَآئِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿١٣٥﴾ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

প্রদত্ত তোমার মালিকের প্রতিশ্রুতিমতো তুমি আমাদের জন্যে তোমার মালিকের কাছে দোয়া করো, যদি (এবারের মতো) আমাদের ওপর থেকে এ বিপদ দূর করে দাও, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলদেরও তোমার সাথে যেতে দেবো। ১৩৫. অতপর যখনি তাদের ওপর থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে– যে সময়টুকু সে জন্যে নির্ধারিত ছিলো– সে বালা-মসিবত আমি অপসারণ করে নিতাম, তখন সাথে সাথেই তারা ওয়াদা ভংগ করে ফেলতো। ১৩৬. অতপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম, তাদের আমি সাগরে ডুবিয়ে দিলাম, কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো এবং (আমার) এ (শাস্তি) থেকে তারা উদাসীন হয়ে গিয়েছিলো। ১৩৭. এবার আমি (সত্যি সত্যিই) তাদের ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দিলাম, যাদের (এতোদিন) দুর্বল করে রাখা হয়েছিলো, (তাদের আমি) এ রাজ্যের পূর্ব-পশ্চিম (-সহ সব কয়টি) প্রান্তের অধিকারী বানিয়ে দিলাম, যাতে আমি আমার প্রভূত কল্যাণ ছড়িয়ে দিয়েছি, (এভাবেই) বনী ইসরাঈলের ওপর প্রদত্ত তোমার মালিকের (প্রতিশ্রুতির) সেই কল্যাণবাণী সত্যে পরিণত হলো, কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছিলো; ফেরাউন ও তার জাতির যাবতীয় শিল্পকর্ম ও উঁচু প্রাসাদ–যা তারা নির্মাণ করেছিলো, আমি সব কিছুই ধ্বংস করে দিলাম।

তাফসীর
আয়াত ১০৩-১৩৭

সূরার এ অংশটিতে ফেরাউন ও তার সহযোগীদের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সারা বিশ্বের প্রতিপালক ও মনিব– এই মর্মে হযরত মূসা কর্তৃক ফেরাউন ও তার দলবলের সামনে ভাষণ দান থেকে শুরু করে সদল বলে ফেরাউনের ডুবে মরা পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার বিবরণ এখানে রয়েছে। তন্মধ্যে হযরত মূসা ও ফেরাউনের মধ্যে জাদুর প্রতিযোগিতা, বাতিলের ওপর সত্যের বিজয় লাভ, জাদুকরদের আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন, ফেরাউন কর্তৃক জাদুকরদেরকে শাস্তি দেয়া, লাঞ্ছিত করা, হত্যার হুমকি সত্তেও সত্যের ওপর

জাদুকরদের অবিচল থাকা, তাদের জীবনের চেয়েও ঈমানকে ভালোবাসা, অতপর বনী ইসরাঈলের ওপর ফেরাউনের নির্যাতন, ফেরাউন ও তার সহযোগীদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষ, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি, বন্যা, পংগপাল, উকুন, ব্যাং ও রক্ত দিয়ে শাস্তি দান, প্রতিবার ফেরাউন কর্তৃক মূসাকে দোয়া করে আযাব বন্ধ করার জন্যে অনুরোধ, আযাব হটে যাওয়ার পর আবার তাদের আগের অপকর্মে ফিরে যাওয়া, অতপর তাদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া যে, যতো রকমের আযাবই আসুক, তারা ঈমান আনবে না। অবশেষে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অব্যাহতভাবে অস্বীকার করা ও তাঁর পরীক্ষার সদুদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীনতার ফলে আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা ও মূসা (আ.)-এর জনগোষ্ঠীকে যুলুম-নির্যাতনে ধৈর্য ধারণের প্রতিদান স্বরূপ ও তাদেরকে সুখ-শান্তি দিয়ে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর খেলাফত তথা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতকরন– এই সমস্ত ঘটনার বিবরণ রয়েছে। ফেরাউনের শোচনীয় পরিণতির মধ্য দিয়ে আল্লাহর সেই শাশ্বত নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, যার মূলকথা হলো, নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার আগে প্রথমে দুঃখকষ্ট ও বিপদ আপদ এবং পরে সুখ ও সমৃদ্ধি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়।

তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে মূসা (আ.)—এর সংগ্রাম

আমি ফেরাউনের সাথে মূসার ও বনী ইসরাঈলের সাথে মূসার আচরণ ও কর্মকান্ডকে আলাদা আলাদা দুটো অংশে ভাগ করা সমীচীন মনে করেছি। কেন না উভয়ের প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের।

এখানে পুরো কাহিনীটা একটি আয়াতে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে মূল কাহিনীর সূচনা করা হয়েছে এবং সেই সাথে এই কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্যটাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘অতপর তাদের পরে আমি ফেরাউন ও তার জনগোষ্ঠীর কাছে মূসাকে আমার আয়াতসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা এই আয়াতগুলোর ওপর অবিচার করলো। নৈরাজ্যবাদীদের কী পরিণতি হলো দেখে নাও।’ (১০৩)

এখানে এই কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্যটা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্যটা হলো, উচ্ছৃংখল, নৈরাজ্যবাদী ও আল্লাহদ্রোহীদের কী পরিণাম হয়ে থাকে, সেটা প্রত্যক্ষ করা। উদ্দেশ্য উল্লেখ করে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার পর পর্যায়ক্রমে ঘটনার বিভিন্ন অংশ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

কাহিনীটাতে বেশ কিছু জীবন্ত দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে, এর মধ্যে বেশ কিছু সাড়া জাগানো সংলাপ ও কর্মকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্টসমূহও আলোচিত হয়েছে, শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে এবং বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহর দিকে আহবানকারী ও আল্লাহর বান্দাদের ওপর গায়ের জোরে জেঁকে বসে প্রভুত্বকারীদের মধ্যে যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব সংঘাত বিরাজমান, তার ধরন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সাথে ইসলামী আকীদা ও আদর্শের শক্তি ও পরাক্রম এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তা কোনো অবস্থাতেই ক্ষমতার মদমত্ত স্বৈরাচারী শাসকদের চোখ রাংগানি ও হুমকি ধমকিকে ভয় পায় না। ১০৩নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘অতপর আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন ও তার দলবলের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা আমার নিদর্শনাবলীর ওপরবাড়াবাড়ি করলো।.........’

অর্থাৎ ওই সব জনপদ (নূহ, হূদ, সালেহ, লূত, শোয়ায়ব প্রমুখ নবীরা যে সব জনপদে প্রেরিত হয়েছিলেন) ও আল্লাহর নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী ওই সব জনপদের অধিবাসীদের

ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর মূসাকে পাঠানো হয়েছিলো। এ আয়াতটিতে ফেরাউন ও তার দলবল কর্তৃক হযরত মূসার রেসালাতের মুখোমুখি হওয়ার বিবরণ অতি সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে। অতপর তারা কিভাবে মূসার দাওয়াতকে অভ্যর্থনা করেছে, তার সংক্ষিপ্তসার দ্রুত গতিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। একই দ্রুততার সাথে ও সংক্ষেপে তাদের পরিণতি কী হয়েছিলো সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অত্যাচার করেছে, অর্থাৎ কুফরীও প্রত্যাখ্যান করেছে। কোরআনে প্রায়ই কুফর বা শিরক শব্দের স্থলে 'যুল্‌ম' (অত্যাচার) ও ফেস্‌ক (অবাধ্যতা ও পাপাচার) শব্দ প্রয়োগ করে থাকে। এ স্থানটাও সেই স্থানগুলোর অন্যতম, যেখানে কোরআন এই শব্দ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে থাকে। উল্লেখিত প্রয়োগের কারণ এই যে, শেরক ও কুফর হচ্ছে নিকৃষ্টতম যুলুম বা অত্যাচার এবং জঘন্যতম পাপাচার ও অবাধ্যতা। যারা কুফরী বা শেরেকে লিপ্ত হয়, তারা জগতের সবচেয়ে বড় সত্যটি অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব জগতের একমাত্র প্রভু, মনিব ও মাবুদ– এই মহাসত্যটির ওপর অত্যাচার ও যুলুম করে। তারা নিজেদের ওপরও অত্যাচার করে। কেননা এ দ্বারা তারা নিজেদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে। তারা জনসাধারণের ওপরও যুলুম করে। কেননা তাদেরকে এক আল্লাহর এবাদাত থেকে বিরত করে বহু সংখ্যক উপাস্যের পূজা করতে বাধ্য বা উদ্বুদ্ধ করে। এর চেয়ে বড় যুলুম ও অন্যায় কাজ আর হতে পারে না। এ জন্যেই কুফরীকে যুলুম বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বস্তুত কাফেররাই যালেম।' অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কুফরী বা শেরেকে লিপ্ত হয়, সে ফাসেকও হয়ে যায়। কেননা সে আল্লাহর সহজ সরল ও সোজা পথ থেকে বিচুত হয় এবং এমন পথে চলে যায় যা তাকে আল্লাহর দিকে নয় বরং জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

কাজেই আল্লাহর আয়াতগুলোর প্রতি ফেরাউন ও তার দলবলের যুলুম করার অর্থ দাঁড়ালো সেগুলোকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা।

'অতএব লক্ষ্য করো, ওই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কী পরিণতি হলো।'

এই পরিণতির বিবরণ অনতিবিলম্বেই আসছে। এখানে 'মুফসেদ' শব্দটার মর্ম কী তা প্রথমে জেনে নেয়া দরকার। এ শব্দটি এখানে কাফের ও যালেমের সমার্থক। তারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি যুলুম করেছে অর্থাৎ কুফরী তথা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং এই সব 'মুফসেদ' তথা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কী পরিণাম হয়েছিলো দেখো।

তারা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এজন্যেই যে, তারা যালেম অর্থাৎ অস্বীকারকারী ও প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের)। কেননা কুফরীর মতো বিপর্যয় আর নেই। এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা ছাড়া জীবন সুষ্ঠু ও সুশৃংখল হতেই পারে না। অনুরূপভাবে আল্লাহর যমীন ফেৎনা ফাসাদ অত্যাচার, অরাজকতা ও বিপর্যয়ে ভরে দাওয়ার একমাত্র কারণই হলো মানুষের জীবন একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও গোলামী থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া। একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার অর্থ হলো, মানুষের মাত্র একজন প্রভু ও মনিব থাকবে, তারা কেবল তারই এবাদাত ও আনুগত্য করবে এবং একমাত্র আল্লাহর আইন মেনে চলবে। এতে করে তাদের জীবন মানুষের পরিবর্তনশীল খেয়ালখুশীর আনুগত্য করা থেকে রেহাই পাবে। অরাজকতা ও অনাচার মানুষের সামষ্টিক জীবনের মতো তাদের ধ্যান ধারণাকেও প্রভাবিত করে থাকে। এটা তখনই হয়, যখন এক আল্লাহর পরিবর্তে বহু সংখ্যক মনিব মানুষের ওপর প্রভুত্ব করে। আকীদা বিশ্বাস, এবাদাত উপাসনা ও আইন কানুন সব কিছুতেই যখন মানুষ এক আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করে, কেবল তখনি পৃথিবীতে সুখ শান্তি ও শৃংখলা বিরাজ করে এবং মানুষের জীবন সুষ্ঠুভাবে

পরিচালিত হয়। মানুষ যখন একমাত্র আল্লাহর গোলামী করে, কেবল তখনই সে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করে। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা ফেরাউন ও তার দলবল সম্বন্ধে বলেন,

'দেখো বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের কেমন পরিণতি হয়েছে।'

এমন প্রত্যেক স্বৈরাচারী তাগূতী শক্তিই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও নৈরাজ্যবাদী, যে বান্দাদেরকে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজের মনগড়া আইন মেনে চলতে বাধ্য করে। কেননা তারা পৃথিবীতে কেবল অরাজকতাই ছড়ায়। সংস্কার ও গঠনমূলক কিছু করে না।

উল্লেখিত পদ্ধতিতে কাহিনীর বর্ণনা শুরু করা কোরআনের একটা স্থায়ী রীতি। এখানে এই পদ্ধতিটাই সবচেয়ে মানান সই, বিশেষত, এর কেন্দ্রীয় বক্তব্য টিকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে। কেননা এতে তাৎক্ষণিতভাবে শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার পর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া শুরু হয়েছে। এরপর ঘটনাবলী কিভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, তা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই।

মূসা ও ফেরাউনের মধ্যে কী সংঘটিত হয়েছিলো ?

সেই প্রথম দৃশ্যটি নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে,

'মূসা বললো, হে ফেরাউন, আমি বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের প্রেরিত রসূল। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সত্য ছাড়া আর কিছু বলা আমার জন্যে শোভা পায় না। আমি অকাট্য নির্দশন নিয়ে হাযির হয়েছি। কাজেই আমার সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠাও। .... (আয়াত ১০৪-১১২)

এটা হক ও বাতিলের এবং ঈমান ও কুফরের প্রথম সংঘর্ষের দৃশ্য। এটা 'বিশ্ব জগতের প্রতিপালক' আল্লাহর দিকে আহ্বান এবং আল্লাহকে অগ্রাহ্য করে নিজের খোদায়ীর দাবীদার তাগূতী শক্তির মধ্যে প্রথম সংঘাতের দৃশ্য।

'মূসা বললো, হে ফেরাউন, আমি বিশ্ব প্রভুর প্রেরিত রসূল ....'

এখানে হযরত মূসা 'হে ফেরাউন' বলেছেন, 'হে আমার মনিব' বলেননি, যেমন প্রকৃত মনিবকে যারা চেনে না, তারা বলে থাকে। তবে তিনি ফেরাউনের নাম ধরেও ডাকেননি, বরং তার রাজকীয় উপাধি 'ফেরাউন' বলে শালীনতা বজায় রেখে সম্বোধন করেছেন। কেননা তিনি তার প্রকৃত অবস্থান প্রকাশ করতে চান, যেমন তার কাছে নিজের অবস্থানও প্রকাশ করেন। আর এটি বিশ্ব জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য। সেটি হলো, 'আমি বিশ্ব প্রভুর প্রেরিত রসূল।

এই মহা সত্য নিয়ে মূসা (আ.) একাই আসেননি, বরং তার পূর্বেও বহু রসূল এসেছেন। এ মহা সত্য হলো, আল্লাহ তায়ালা সারা বিশ্বের একক ও সর্বময় প্রভু প্রতিপালক। এই প্রভুত্বের অর্থ হচ্ছে সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব এবং সকল সৃষ্টির পক্ষ থেকে আল্লাহর যাবতীয় হুকুমের সর্বাত্মক আনুগত্য ও দাসত্ব। বিভিন্ন পথভ্রষ্ট 'ধর্ম তাত্ত্বিক' ও তাদের অনুসারীরা বলে থাকে যে, রসূলরা আল্লাহর কাছ থেকে যুগে যুগে যে আকীদা ও আদর্শ নিয়ে এসেছেন, তা আগাগোড়াই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে তা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছে। এ কথা আদৌ ঠিক নয়। নবী ও রসূলরা যে আকীদা বিশ্বাস নিয়ে এসেছেন, তা সর্বকালে এক ও অপরিবর্তনীয়। সে আকীদা বিশ্বাসে সমগ্র সৃষ্টি জগতের সার্বভৌম মনিব, প্রভু খোদা হিসাবে এক আল্লাহকেই ঘোষণা করা হয়েছে। আগে বহু খোদা ছিলো, তার পর দুজন হয়েছে এবং অবশেষে একজনই হবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মানুষের চিন্তাধারা যখন তাওহীদ বিশ্বাস থেকে পথভ্রষ্ট হয়, তখন তা জাহেলী ধ্যান ধারণায় পর্যবসিত হয় এবং তার বিকৃতি ও বিভ্রান্তির আর কোনো সীমা থাকে না। বিভিন্ন সময়ে তা বিভিন্ন কাল্পনিক ভৌতিক সত্ত্বাকে,

আত্মাকে বহু সংখ্যক কল্পিত দেব দেবীকে, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রকে, দুই খোদাকে ও পৌত্তলিকদের ভ্রষ্ট চিন্তার ফসলকে উপাস্য খোদা মেনে নেয় এবং এরূপ আরো বহু জাহেলী চিন্তাধারাকে প্রশ্রয় দেয়। তাই বলে আল্লাহর কাছ থেকে আগত নির্ভুল তাওহীদ বিশ্বাসকে আল্লাহর বিশুদ্ধ দ্বীন থেকে ভ্রষ্ট ওই সব জাহেলী আকীদা বিশ্বাসের সাথে মিশ্রিত করা যাবে না। কেননা তাওহীদ বিশ্বাসে সমগ্র মহাবিশ্বের জন্যে এক খোদা আর জাহেলী বিশ্বাসে বহু খোদা নির্ধারিত হয়েছে।

এক একক খোদার তত্ত্ব নিয়েই মূসা (আ.) ফেরাউন ও তার দল-বলের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তার আগে ও পরের সকল নবী এই একই তত্ত্ব নিয়েই বাতিল আকীদা বিশ্বাসের মুখোমুখি হয়েছেন। যে তাওহীদ তত্ত্ব নিয়ে মূসা ফেরাউনের কাছে গিয়েছিলেন, ফেরাউন জানতো যে, ওই তত্ত্ব ফেরাউন, তার সরকার, শাসন-ক্ষমতা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সমূলে উৎখাত করতে চায়। কেননা সারা বিশ্বের ওপর একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সর্ব প্রথম অর্থ হলো, আল্লাহর আইন ও বিধানের পরিবর্তে নিজস্ব মনগড়া আইন ও বিধান দ্বারা মানুষের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগকারী ও শাসন প্রতিষ্ঠাকারী সকল কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বকে অবৈধ ঘোষণা করা এবং আল্লাহর হুকুমের অনুগত নয় এমন প্রত্যেক তাগুতী শক্তির মানুষের আনুগত্য লাভ এবং তার আইন মানতে বাধ্য করার চেষ্টা প্রতিহত করা। নিজেকে রব্বুল আলামীন তথা সারা বিশ্বের প্রভুও মনিব আল্লাহর রসূল আখ্যায়িত করে, এই সুদূরপ্রসারী তাওহীদ তত্ত্ব প্রচার করতে মূসা ফেরাউনের কাছে গিয়েছিলেন আর নিজেকে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সত্য ভাষণের জন্যে আর্দিষ্ট ও দায়িত্বশীল বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

'আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সত্য ছাড়া আর কিছু আমি বলবোনা' .....

কেননা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য ও অকাট্য সত্য রসূলের চেয়ে বেশী কেউ জানে না। তাই তার পক্ষে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে আসল সত্য কথা ছাড়া কিছু বলা একেবারেই অশোভন ও অন্যায়।

'আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে অকাট্য প্রমাণ নিয়ে এসেছি।'

অর্থাৎ আমি যে আল্লাহর রসূল, সে সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ এনেছি। আর সেই অকাট্য প্রমাণ ও নির্ভুল তথ্য অর্থাৎ বিশ্ব জগতের একমাত্র মালিক ও মনিব আল্লাহ– এই সত্যের দোহাই দিয়েই মূসা ফেরাউনের কাছে দাবী জানান যে, বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিয়ে তার সাথে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক। কেননা বনী ইসরাঈল ফেরাউনের ক্রীতদাস নয়। ওরা একমাত্র আল্লাহর গোলাম। কাজেই ফেরাউন তাদের গোলাম বানিয়ে রাখার অধিকারী নয়। মানুষ দুই খোদার এবাদাত ও দুই মনিবের দাসত্ব করতে পারে না। যে ব্যাক্তি আল্লাহর গোলাম সে অন্য কারো গোলাম হতে পারে না। যেহেতু ফেরাউন নিজের প্রবৃত্তির খেয়ালখুশী অনুসারেই বনী ইসরাঈলকে গোলাম করে রাখতে চাইছিলো। তাই মূসা ফেরাউনকে জানিয়ে দিলো যে, সমগ্র বিশ্ব জগত ও তার অধিবাসীদের মনিব আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নয়। (আর এই অধিবাসীদের মধ্যে বনী ইসরাঈলও রয়েছে)। এই সত্য ঘোষণার স্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায়, বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের গোলাম বানিয়ে রাখার কোনো অধিকার ফেরাউনের নেই।

বস্তুত, সারা বিশ্বের একমাত্র প্রভু ও প্রতিপালক আল্লাহ– এই কথাটা ঘোষণা করা মানুষের স্বাধীনতা ঘোষণার শামিল। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য সবার দাসত্ব ও আনুগত্য থেকে স্বাধীনতা, মানুষের মনগড়া আইন, মানুষের প্রবৃত্তির খেয়ালখুশি, মানুষের ঐতিহ্য ও মানুষের শাসন থেকে স্বাধীনতা।

আল্লাহকে সারা বিশ্বের রব বা প্রতিপালকও ঘোষণা করা হবে, আবার আল্লাহ তায়ালা ছাড়া বিশ্বের অন্য কারো কাছে নতি স্বীকার ও আনুগত্যও করা হবে এটা অসম্ভব। আল্লাহকে বিশ্বের সার্বভৌমত্বের মালিক বলে ঘোষণা করা হবে, আবার মানুষের ওপর অন্য কেউ নিজের আইন দিয়ে শাসনও করবে এটা অকল্পনীয়। যারা মানুষের তৈরী আইনের আনুগত্য করে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে খোদা মেনে নিয়ে নিজেকে মুসলমান বলে মনে করে, তারা এক মুহূর্তের জন্যেও মুসলমান নয়। যারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে সার্বভৌম শাসক ও মনে করে এবং আল্লাহর আইন ছাড়া আর কারো আইন অনুসারে জীবন পরিচালনা করে, তারা এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী নয়। তারা তাদের ওই সার্বভৌম শাসকের গোলাম- আল্লাহর নয়। তারা শাসকের অনুগত- আল্লাহর নয়।

এই সত্যের ভিত্তিতেই মূসাকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তিনি যেন ফেরাউনের কাছ থেকে বনী ইসরাঈলের মুক্তি চান। তাঁর এ দুটি কথা -

'হে ফেরাউন, আমি বিশ্বজগতের প্রভুর পাঠানো রসূল' এবং 'কাজেই আমার সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দাও' পরস্পরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। এ কথা দুটোর একটা অন্যটার স্বাভাবিক ও অনিবার্য ফলশ্রুতি।

ফেরাউন ও তার দলবলের কাছে সারা বিশ্বের সর্বময় প্রভু একমাত্র আল্লাহ- এই ঘোষণার তাৎপর্য মোটেই অজানা নয়। তাদের অজানা নয় যে, এই ঘোষণার মধ্যে ফেরাউনের সাম্রাজ্য ধ্বংসের ব্যবস্থা রয়েছে। তার শাসন ব্যবস্থা উৎখাতের উপকরণ রয়েছে। তার শাসনের বৈধতা অস্বীকার করা হয়েছে এবং তার আগ্রাসী ও স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। কিন্তু ফেরাউন ও সভাসদদের হাতে তখনো এই সুযোগটুকু অবশিষ্ট ছিলো যে, হয়তো বা মূসাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা যেতে পারে এবং বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত রসূল বলে তার দাবীকে প্রমাণবিহীন বলে খন্ডন করা যেতে পারে। তাই,

'সে বললো, তুমি যদি কোনো নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো, তবে সেটা দেখাও তো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।' (আয়াত ১০৬)

কেননা সে ভেবেছিলো যে, বিশ্ব প্রতিপালকের প্রভুত্বের এই প্রচারক যখন তার দাবীতে মিথ্যুক প্রমাণিত হবে, তখন তার দাবী এমনিতেই নস্যাত হয়ে যাবে, তার প্রচারণা দুর্বল হয়ে যাবে এবং তা আর বিপজ্জনক থাকবে না। কেননা প্রচারক স্বয়ং প্রমাণবিহীন বক্তা সাব্যস্ত হওয়ায় তার আর কোনো গুরুত্ব থাকবে না। কিন্তু মূসা জবাব দিলেন।

' মূসা তৎক্ষণাত তার লাঠিটা ফেলে দিলেন। অমনি তা সাক্ষাত সাপ হয়ে গেলো। আর তিনি নিজের হাত পকেট থেকে বের করলেন। অমনি তা দর্শকদের চোখে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিলো।' (১০৭-১০৮)

এ এক বিস্ময়কর আকস্মিকতা! লাঠিটা এমনভাবে সাপ হয়ে গেলো যে, তার সাপ হওয়া সম্পর্কে কোনো সন্দেহ রইলো না। 'মুবীন' (অর্থাৎ প্রকাশ্য) শব্দটি দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। অন্য একটা সূরায় বলা হয়েছে, ' তৎক্ষণাত তা একটা চলন্ত সাপ হয়ে গেলো।'(১) এরপর তিনি তার শ্যাম বর্ণের হাতটা পকেট থেকে বের করতেই তা সাদা হয়ে গেলো। তবে রোগব্যাধি জনিত

(১) বর্তমান সূরার মূল শব্দটি 'ছু'বানুন' এবং অন্য সূরার উদ্ধৃত আয়াতে মূল শব্দ 'হাইয়াতুন' রয়েছে। উভয় শব্দের অর্থই সাপ। প্রাণী বিজ্ঞানীদের কাছে হাইয়াতুন ও ছু'বানুন এই দুই ধরণের সাপের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তবে উভয়ে একই জাতের প্রাণী।

সাদা নয়। আসলে এটা ছিলো একটা মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনা। হাতটা আবার পকেটে ঢুকালেই আগের মতো শ্যাম বর্ণ ধারণ করলো। উল্লেখ্য যে, হযরত মূসা শ্যাম বর্ণের মানুষ ছিলেন।

যা হোক, এটি ছিলো মূসার এই দাবীর সত্যতার প্রমাণ যে, 'আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত রসূল।' তবে এই ভয়ংকর দাবীর কাছে কি ফেরাউন ও তার দলবল আত্মসমর্পণ করতে পারে বিশ্ব প্রতিপালকের প্রভুত্ব কি তারা মেনে নিতে পারে? যদি মেনে নেয়, তাহলে ফেরাউনের সিংহাসন, রাজমুকুট, রাজ্য ও সরকার কিসের ওপর টিকে থাকবে? কিসের ওপর টিকে থাকবে ফেরাউনের অনুসারী, ফেরাউনের প্রশাসন?

বিশ্ব প্রতিপালক যদি আল্লাহই হয়ে থাকেন, তাহলে এ সব টিকবে কী করে? আল্লাহ তায়ালা যদি 'বিশ্ব প্রতিপালক' হন, তা হলে আল্লাহর আইন ছাড়া আর কোনো আইন অনুযায়ী শাসন চলবে না এবং আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া আর কারো নির্দেশের আনুগত্য করা যাবে না। তখন ফেরাউনের আইন ও শাসন কোথায় যাবে? সে তো আল্লাহর আইন মানে না এবং তার নির্দেশের তোয়াক্কা করে না। দেশবাসীর প্রভু ও মনিব যদি আল্লাহ তায়ালা হয়, তাহলে তাদের তো অন্য কোনো প্রভু ও মনিব থাকবে না, যার আইন, বিধান ও শাসনের আনুগত্য করা যাবে? দেশবাসী কেবল তখনই ফেরাউনের আইন ও শাসন মেনে চলবে, যখন ফেরাউন তাদের প্রভু ও মনিব হবে। যে ব্যক্তি নিজের আইন ও আদেশ দ্বারা মানুষকে শাসন করে, সেই মানুষের 'রব' তথা প্রতিপালক, প্রভু ও মনিব। তখন জনগণ তারই দ্বীনের অনুসারী বলে বিবেচিত হবে, চাই সে যে-ই হোক না কেন।

কোনো আল্লাহদ্রোহী স্বৈরাচারী তাগুত এভাবে, এতো দ্রুত ও এতো সহজে আত্মসমর্পণ করতে পারে না এবং নিজের শাসন ক্ষমতার বিলুপ্তি ও নিজের রাজত্বের অবসান মেনে নিতে পারে না।

মূসার ঘোষিত মহাসত্যের অর্থ বুঝতে ফেরাউন ও তার দলবল ভুল করেনি। বরং তা খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করেছে। তবে এর বিপজ্জনক সম্ভাব্য ফলাফলের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমেই তা ব্যক্ত করেছে। মূসাকে একজন দক্ষ জাদুকর বলে অভিযুক্ত করে জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানোর চেষ্টা করেছে ফেরাউন ও তার দলবল।

'ফেরাউনের সম্প্রদায়ের প্রধানরা বললো, এতো (মূসা) একজন দক্ষ জাদুকর। এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এখন তোমরা কী পরামর্শ দেবে?' (আয়াত ১০৯-১১০)

মূসার ঘোষিত মহাসত্যের অর্থাৎ তাওহীদ তত্ত্বের অনিবার্য ভয়াবহ ফলটা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলো। সে ফলটা হলো দেশ থেকে বহিস্কৃত হওয়া, ক্ষমতা ও গদি হাতছাড়া হয়ে যাওয়া, শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বা সরকার উৎখাত হয়ে যাওয়া। আধুনিক যুগের ভাষায় বিষয়টি এভাবেই ব্যক্ত করা হয়।

যমীন আল্লাহর। বান্দারাও আল্লাহর। কাজেই আল্লাহর যমীনে যখন সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন সেখান থেকে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে অন্য কোনো আইন দ্বারা শাসনকারীরা স্বৈরাচারীরা উৎখাত হবেই। যারা নিজেদের মনগড়া আইন ও বিধানের জোরে মানুষকে গোলাম বানিয়ে নেয় এবং তাদের ওপর প্রভুত্ব চালায়, তাদেরকে সেখান থেকে পাততাড়ি গুটাতে হবেই। যে সব তল্পিবাহক শাসকদের দয়ায় বড় বড় পদ ও চাকরি হস্তগত করে এবং তারা জনগণকে শাসকদের গোলামে পরিণত করার কাজে ব্যস্ত থাকে, তাদের ওই সব পদ ও চাকরি না ছেড়ে গত্যন্তর থাকবে না।

এভাবেই ফেরাউন ও তার তল্পিবাহকরা হযরত মূসার দাওয়াতের ফল কতো ভয়াবহ হতে পারে তা বুঝতে পেরেছিলো। প্রত্যেক যুগের স্বৈরশাসকরাই তা বুঝতে পারে। যখন রসূল (স.) আরবের জনসাধারণকে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং মোহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রসূল এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়ার আহবান জানালেন, তখন আহবানটা শুনে একজন আরব স্বতস্ফূর্তভাবেই বলে উঠলো, 'রাজ-রাজড়াদের কাছে এ আহবান অবাঞ্ছিত।' তার কথা শুনে আর একজন আরব একই রকম স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠলো,

'মোহাম্মাদের এ দাওয়াত বাস্তবায়িত হলে আরব ও অনারব গোটা দুনিয়াবাসী আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে ছুটে আসবে।' এই উভয় ব্যক্তি রসূলের (স.) দাওয়াতের মর্ম বুঝতে পেরেছিলো। তারা বুঝেছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই– এ কথা বলার মানেই হলো আল্লাহর আইন বাদে অন্য কোনো আইন ও বিধান বলে দেশ শাসনকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা– চাই এ শাসকরা আরবই হোক বা অনারবই। এই আরবদের অনুভূতিতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কথাটার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিলো। কেননা তারা তাদের ভাষার অর্থ ভালোভাবেই বুঝতো । লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই) কথাটা যে ব্যক্তি এবং যে জাতি বুঝে-শুনে বলবে, সেই ব্যক্তির মনমগযে ও সেই জাতির দেশে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো আইনের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস থাকতে পারে না। তা থাকলে আল্লাহর সাথে আরো অনেক মা'বুদ মানা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। একজন সাধারণ আরব এটাই বুঝতো। আজকের যুগে যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে, তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই– কথাটার অর্থ যেমন বুঝে আরবরা তেমন বুঝতো না। আজকের মুসলমানদের বুঝ খুবই অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।

মূসার প্রতি জাদুকরদের ঈমান আনা

এভাবেই ফেরাউনের সম্প্রদায়ের প্রধানরা ফেরাউনের সাথে পরামর্শ করার সময় বললো, 'এতো একজন দক্ষ জাদুকর।..........'

অতপর তারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো তা হলো,

'তারা বললো, তাকে ও তার ভাইকে একটু অবকাশ দাও। আর নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও। যেন তারা তোমার কাছে সকল সুদক্ষ জাদুকরকে নিয়ে আসে।' (আয়াত ১১১-১১২)

সেকালে মিসরের মন্দিরে মন্দিরে অসংখ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকতো। তারাই আবার পেশাদার জাদুকরও ছিলো। আসলে সকল যুগের পৌত্তলিক ধর্মেই জাদুর সাথে ধর্মের অংগাংগি সম্পর্ক ছিলো। ধর্মীয় পুরোহিত ঠাকুররা এবং মন্দিরগুলো ছিলো জাদুর রক্ষক। আর এই কারণেই তথাকথিত 'ধর্মতাত্ত্বিকেরা' জাদুকে ধর্মের ক্রমবিকাশের একটি পর্যায় বলে মনে করে। এই ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে যারা নাস্তিক, তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে বলে থারক যে, জাদুর মতো ধর্মও একদিন বাতিল হয়ে যাবে। বিজ্ঞান জাদুর ন্যায় একদিন ধর্মেরও বিলোপ সাধন করবে। এভাবে 'বিজ্ঞান'-এর দোহাই দিয়ে তারা আরো অনেক প্রলাপোক্তি করে থাকে।

ফেরাউনের সম্প্রদায়ের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, ফেরাউনের উচিত মূসাকে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেয়া এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোক পাঠিয়ে বড় বড় জাদুকরদেরকে সমবেত করা, যাতে মূসার জাদুকে অনুরূপ জাদু দিয়ে মোকাবেলা করা যায়।

ফেরাউনের স্বৈর শাসন সম্পর্কে যতো তথ্যই এ যাবত পাওয়া গেছে, তাতে বলা যায় যে, সে তার এই কাজটিতে বিংশ শতাব্দীর বহু স্বৈরশাসকের চেয়ে কম স্বৈরাচারীতার পরিচয় দিয়েছে। এ শতাব্দীতে যারা আল্লাহর আইনের শাসন প্রবর্তনের আহবান জানাচ্ছে এবং এই বিপজ্জনক

আহবান দ্বারা বাতিলের গদিকে হুমকির সম্মুখীন করেছে, তাদের মোকাবেলায় এ শতাব্দীর স্বৈর শাসকরা হঠকারিতা, হিংস্রতা ও যুলুম নির্যাতনে ফেরাউনকেও হার মানিয়েছে। ফেরাউন জাদুর মোকাবেলা জাদু দিয়ে করেছে। কিন্তু এ যুগের ফেরাউনরা শান্তিপূর্ণ আহবান ও প্রচারণার মোকাবেলা করে কামান ও মেশিনগান দিয়ে।

এরপর ফেরাউন জাদুকরদের সমবেত করার জন্যে কি কি ব্যবস্থা নিল, তা কোরআন আর উল্লেখ করে না এবং প্রথম দৃশ্যটা উহ্য রাখে, যা পরবর্তী দৃশ্য দ্বারা বুঝা যায়। কেসসা কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে এটা কোরআনের এক চমকপ্রদ বাচনভংগি। যেন এটা একটা চোখে দেখা ঘটনা, তাই শোনার প্রয়োজন নেই।(১)

'জাদুকররা ফেরাউনের কাছে হাযির হলো। তারা বললো, আমরা বিজয়ী হলে আমাদের জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে তো। ফেরাউন বললো, হাঁ, উপরন্তু তোমরা ঘনিষ্ঠ জনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (আয়াত ১১৩-১১৪)

বস্তুত তারা ছিলো ধর্মীয় পৌরহিত্য ও জাদু উভয়টাতেই পেশাদার। উভয়টাতেই তাদের লক্ষ্য হলো পুরস্কার। পেশাদার ধর্মাচারী তথা ধর্ম-ব্যবসায়ীদের কাজই হলো বিজয়ী তাগূতী শক্তি ও ক্ষমতাসীন বাতিল শক্তির সেবাদাসগিরি করা। যখনই পরিস্থিতি ও পরিবেশ একনিষ্ঠ আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য এবং আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিকূল হয়ে পড়ে এবং তাগূতী বাতিল শক্তির শাসন আল্লাহর আইনের শাসনের স্থলাভিষিক্ত হয়, তখন তাগুতী শক্তি এই সব ধর্ম-ব্যবসায়ীর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এই ব্যবসায়ের জন্যে ক্ষমতাসীন বাতিল শক্তির সাথে তাদের আপোস রফা হয়ে যায় এবং উভয়ে পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করে। ধর্ম-ব্যবসায়ীরা ধর্মের নামে আল্লাহদ্রোহী শাসকের ক্ষমতাকে জায়েয বলে স্বীকৃতি দেয়, আর শাসক তাদেরকে এর বিনিময়ে দেয় অর্থ ও ঘনিষ্ঠ জনের মর্যাদা।

ফেরাউন জাদুকরদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলো যে, তাদের জাদুর জন্যে তারা পুরস্কার ও সম্রাটের নৈকট্য দুটোই পাবে। এ দ্বারা তাদেরকে বাড়তি প্রলোভন দেয়া হয়েছে, যাতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে তারা বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে। কিন্তু ফেরাউন স্বয়ং এবং জাদুকররা আদৌ জানতো না যে, ব্যাপারটা পেশাদারী দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিলো না। ব্যাপারটা ছিলো মোজেযার, রেসালাতের এবং সর্বোচ্চ ও অজেয় শক্তির সাথে সংযোগের। এটা জাদুকররা ও স্বৈরশাসক ফেরাউন উভয়েরই আয়ত্তের বাইরে।

জাদুকররা পুরস্কারের ব্যাপারে নিশ্চিত এবং ফেরাউনের ঘনিষ্ঠ জন হওয়ার ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে মূসা (আ.)-কে চ্যালেঞ্জ দিলো। এরপর তারা তাদের জন্যে আল্লাহর বরাদ্দকৃত এক অকল্পনীয় সৌভাগ্য এবং অপ্রত্যাশিত পুরস্কার লাভ করলোঃ

'তারা বললো,. ওহে মূসা, হয় আপনি ফেলুন (জাদুর খেলা) নচেত আমরা ফেললাম। মূসা (আ.) বললেন, ঠিক আছে, তোমরাই ফেলো।........' (আয়াত ১১৫-১১৬)

জাদুকরদের মূসা (আ.)-কে প্রথমে জাদু দেখানোর সুযোগ দানের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জটা স্পষ্ট হয়েছে, অপরদিকে তেমনি তাদের জাদুর ওপরও বিজয় লাভের ক্ষমতার ওপর তাদের আত্মবিশ্বাস ফুটে ওঠে। পক্ষান্তরে মূসার 'তোমরাই ফেলো' এই বলে পাল্টা চ্যালেঞ্জ দেয়া দ্বারা তাঁর আত্মবিশ্বাস ও বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ভাব প্রকাশ পায়। এরূপ একটা শব্দ দ্বারা এতো ব্যাপক মনোভাব প্রকাশ করা একমাত্র কোরআনেরই বৈশিষ্ট্য।(২)

(১) আমার লেখা 'আত্ তাসওয়ীরুল ফান্নী ফিল কোরআন' দেখুন।
(২) 'আত্ তাসওয়ীরুল ফান্নী ফিল কোরআন' দ্রষ্টব্য।

তবে কোরআনের এ আয়াত আমাদের কাছে একটা বিষয় আকস্মিকভাবে উপস্থাপন করে হযরত মূসার মতো আমাদেরকেও হতবাক করে দেয়। আত্মবিশ্বাস ও বেপরোয়া ভাবটি যখন আমাদের দৃষ্টিগোচর, ঠিক সেই সময় আমাদের সামনে নিপুণ ও দক্ষ জাদুর ভীতিকর উপস্থাপনা আমাদেরকে হতবাকও করে দেয়, 'তারা যখন জাদু নিক্ষেপ করলো, তখন তারা মানুষের চোখের ওপর জাদু করলো, তাদেরকে আতংকিত করলো এবং এক ভয়ংকর জাদু দেখালো।'

কোরআন নিজেই যখন তাকে 'ভয়ংকর জাদু বলেছে, তখন এ থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি যে, জাদুটা কেমন ছিলো। আমরা এও জানতে পারছি যে, তারা 'মানুষের চোখের ওপর জাদু করেছিলো' এবং তাদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি করেছিলো, যাতে জাদুটা কেমন ছিলো, তা ধারণা করতে পারি। 'ইসতারহাবা' শব্দটা যেন পরিস্থিতির ছবি এঁকে দিয়েছে। অর্থাৎ জাদুকররা দর্শকের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করেছিলো। সূরা তোয়াহার অন্য একটি আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, হযরত মূসা মনে মনে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এ থেকেও আমরা কল্পনা করতে পারি যে, জিনিসটা কি ধরনের ছিলো।

কিন্তু এর পরপরই আর একটি অতর্কিত ঘটনা ফেরাউন, তার লোকজন, জাদুকর ও পুরোহিতরা এবং জাদু প্রদর্শনের বিশাল ময়দানের দর্শকদেরকে হতভম্ব করে দেয়।

'আর আমি মূসাকে ওহী যোগে বললাম যে, হে মূসা, তোমার লাঠিটা ফেলে দাও। লাঠিটা ফেলে দেয়া মাত্রই তা জাদুকরদের বানানো জিনিসগুলোকে গিলে খেয়ে নিক্ষেপ করো। সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো এবং জাদুকরদের জাদু বৃথা গেলো। জাদুকররা সেখানে পরাজিত হলো এবং তারা লাঞ্ছিত হলো।' (আয়াত ১১৭, ১১৮, ১১৯)

বস্তুত বাতিল এভাবেই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, চোখের ওপর জাদু করে এবং অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে। আর মানুষকে ধারণা দেয় যে, সে বিজয়ী হতে যাচ্ছে এবং সে বিজীয় হয়ে বিরোধীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। অথচ বাতিল শান্ত, ভাবগম্ভীর ও আত্মবিশ্বাসী সত্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে এমনভাবে ধ্বংস হয়, যেমন পানির সংস্পর্শে এসে আগুন নিভে যায়। এই সংঘর্ষে প্রমাণিত হয় যে, বাতিলের চেয়ে সত্যের ওযন বেশী, ভিত্তি মযবুত এবং শেকড় গভীর। এখানে কোরআনের ভাষা থেকে এই ধারণা পাওয়া যায়। এতে সত্যকে একটা ভারী বাস্তবতা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। 'সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো' অর্থাৎ সত্য স্থিতিশীল ও টেকসই হলো এবং সকল অসত্য অপসৃত ও অস্থিত্বহীন হয়ে গেলো। 'জাদুকরদের সকল জাদু বৃথা হয়ে গেলো' অর্থাৎ বাতিল পরাজিত, লাঞ্ছিত, ও স্তিমিত হয়ে গেলো। অথচ একটু আগে তা কতো প্রতাপই না দেখাচ্ছিলো এবং মানুষের চক্ষুকে কিভাবে ঝলসে দিচ্ছিলো,

'তারা সেখানে পরাজিত হলো ও লাঞ্ছিত হলো।'

কিন্তু আকস্মিকতায় হতচকিত হওয়ার পালা তখনো শেষ হয়নি। আরো একটা বিস্ময় বরং বৃহত্তম বিস্ময় তখনো বাকী ছিলো। সেটি হলো,

'জাদুকররা সেজদায় পড়ে গেলো। তারা বললো, বিশ্ব প্রতিপালক, মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের ওপর আমরা ঈমান আনলাম।'(আয়াত ১২০, ১২১, ১২২)

এ অবস্থাটাকে বলা যায় বিবেকের অভ্যন্তরে সত্যের বিপ্লব। স্নায়ুমন্ডলে আলোর ঝলকানি এবং সত্য, আলো ও বিশ্বাস লাভের জন্যে প্রস্তুত হৃদয়ের সত্যের পরশ লাভ। একথা বলাই বাহুল্য যে, জাদুকররা তাদের জাদুবিদ্যা সম্পর্কে সবচেয়ে ব্যাপক ও সূক্ষ্ম গুণের অধিকারী হওয়াই স্বাভাবিক। তারাই ভালো জানে যে, জাদুর ক্ষমতা কতখানি। মূসা (আ.) যে জিনিস দেখিয়েছেন,

তা জাদু কিনা এবং মানুষের ক্ষমতার আওতাভুক্ত না আওতার বাইরে। যে ব্যক্তি নিজের বিদ্যায় পারদর্শী ওই বিদ্যার আওতাধীন কোনো তত্ত্ব ও তথ্য যখনই তার সামনে উদ্ঘাটিত হবে, তখন তা মেনে নেয়ার যোগ্যতা তার মধ্যেই সর্বাধিক পরিমাণে থাকে। কেননা সেই তত্ত্ব ও তথ্য বুঝবার ক্ষমতা তার মধ্যেই অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। যারা ওই বিদ্যায় তেমন পারদর্শী নয় বরং অল্প স্বল্প জ্ঞান রাখে। তাদের মধ্যে এই যোগ্যতা তেমন একটা থাকার কথা নয়। এ কারণেই জাদুকররা যেখানে একটু আগেই হযরত মূসাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিলো, সেখানে সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করে বসলো। কেননা তারা সত্যের সুনিশ্চিত ও অকাট্য প্রমাণ নিজেদের বিবেকের কাছ থেকেই পেয়ে গিয়েছিলো।

পক্ষান্তরে স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী তাগুতী শক্তিগুলো বুঝতেই পারে না কখন কিভাবে সত্যের আলো মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। কিভাবে মানুষের মনে ঈমানের প্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং কিভাবে প্রত্যয়ের উত্তাপে হৃদয় গলে যায়। তারা দীর্ঘকাল মানুষকে দাসদাসীর মতো খাটাতে খাটাতে ভেবে বসে যে, মানুষের মনকে যেমন খুশী ঘুরানো ফেরানোর ক্ষমতা তাদের পুরোপুরি করায়ত্ত। অথচ হাদীসে আছে যে, মানুষের মন আল্লাহর দুটো আংগুলের মধ্যে থাকে, তা দিয়ে তিনি মনকে যেমন খুশী ঘোরান। এ জন্যেই ফেরাউন জাদুকরদের ঈমান আনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সে ঘুণাক্ষরেও এর কোনো আভাস ইংগিত পায়নি। ফেরাউনের কাছে আরো ভয়ংকর অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিলো জাদুকরদের সেজদা দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। কেননা তারা শুধু জাদুকর ছিলো না, মন্দিরগুলোর পুরোহিতও ছিলো। তাদেরকে সমবেত করাই হয়েছিলো মূসা ও হারূনের দাওয়াতকে নস্যাত করার জন্যে। সেই হারুন ও মূসার আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের আকস্মিকতায় ফেরাউনের মসনদ কেঁপে উঠেছিলো। মসনদ ও শাসন ক্ষমতা হলো স্বৈরশাসকদের জীবনের সব কিছু। এই দুটোকে রক্ষা করার জন্যে তারা যে কোনো অপরাধ অকাতরে করতে পারে।

‘ফেরাউন বললো, আমি অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা ঈমান এনে ফেললে! নিসন্দেহে এটা তোমাদের চক্রান্ত। শহরের অধিবাসীদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যেই তোমরা এ চক্রান্ত করেছো।....... তোমাদের সবাইকে আমি শূলে চড়াবো।’ (আয়াত ১২৩,১২৪)

এভাবেই .... ‘আমার অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা ঈমান এনে ফেললে।’ ভাবখানা এই যে, তাদের অন্তর কখন সত্যের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে যাবে, সে জন্যেও ফেরাউনের অনুমতি নেয়া জরুরী। অথচ এর ওপর ওই জাদুকরদের নিজেদেরও নিয়ন্ত্রণ নেই। ঈমানের আলোতে তাদের আত্মা উদ্ভাসিত হবে এবং তাদের হৃদয় প্রকম্পিত হবে। এর ওপর তাদের নিজেদেরই হাত নেই। অথচ এ ব্যাপারে নাকি ফেরাউনের অনুমিত নেয়া দরকার ছিলো। অন্তরের অন্তস্তল থেকে যে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছে, তাকে জোর পূর্বক দমন করা নাকি তাদের কর্তব্য ছিলো। আসলে ফেরাউন ছিলো এক নির্বোধ অথচ অতি মাত্রায় দাম্ভিক স্বৈরাচারী। তার প্রকম্পিত গদি ও হুমকির সম্মুখীন সিংহাসন নিয়ে সে বেসামাল হয়ে পড়েছিলো। তাই বলেছিলো:

এটা নিশ্চয় এক চক্রান্ত...........

অন্যত্র বলা হয়েছে,

‘নিশ্চয়ই এ তোমাদের প্রধান জাদু শিক্ষক’।

আসলে সমস্যাটা খুবই পরিস্কার। মূসা (আ.) যে বিশ্বপ্রভুর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছেন, তাতেই ফেরাউন ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েছিলো। কেননা কোনো দেশে আল্লাহর আইন ও

শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলতে থাকলে সে দেশে স্বৈরাচারী শাসকদের শাসন ও কর্তৃত্বের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হতে পারে না। আল্লাহর আইনকে উৎখাত করে মানুষের ওপর থেকে আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের বিলোপ সাধন করতে পারলেই স্বৈরশাসকদের রাজত্ব চালানো সম্ভব হয়। তখন তারা নিজেদেরকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে মানুষের জন্যে যেমন ইচ্ছা তেমন আইন রচনা করে এবং সেই আইন মেনে চলতে মানুষকে বাধ্য করে। আল্লাহর আইন ও মানুষের আইন সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দুটো ব্যবস্থা, যা এক সাথে চলতে পারে না। অনুরূপ আল্লাহর রচিত বিধান ও মানব রচিত বিধান সম্পূর্ণ পৃথক দুটো বিধান, যার একত্র হওয়া অসম্ভব। আইনদাতা হিসাবে মানুষ এবং আইনদাতা হিসাবে আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ, যাদের সহাবস্থান সম্ভব নয়। ফেরাউন ও তার দলবল এই সহজ সত্যটা জানতো। মূসা ও হারুনের পক্ষ থেকে বিশ্বপ্রভুর বিধানের প্রচার ও আহবানে তারা আগেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। আর এখন জাদুকররা সেজদায় পড়ে যাওয়া এবং বিশ্ব প্রতিপালক ও মূসা হারুনের রবের ওপর ঈমান আনলাম বলে ঘোষণা করায় আরো বেশী ভয় পাওয়া ও আতংকিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেননা এই জাদুকররা পৌত্তলিক ধর্মের পুরোহিত ঠাকুর ছিলো। ফেরাউনকে তারাই রবের আসনে বসিয়েছিলো এবং ধর্মের নামে জনগণের প্রভু বানিয়েছিলো। তাদের এই আসকারা পেয়েই ফেরাউন এই ভয়াবহ ও হিংস্র হুমকি দিতে পেরেছিলো যে,

'শীঘ্রই জানতে পারবে। .... আমি তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াবো।'

এহেন নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আল্লাহদ্রোহী স্বৈরশাসকদের চিরাচরিত স্বভাব। সত্যের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে লড়তে অক্ষম হয়ে তারা এসব পন্থা অবলম্বন করে থাকে। সত্যের বিরুদ্ধে বাতিলের এগুলোই একমাত্র সম্বল।

তবে মানুষের হৃদয় যখন ঈমানের বলে বলীয়ান হয়, তখন সে সকল পার্থিব শক্তির ওপর বিজয়ী হয়। আল্লাহদ্রোহী স্বৈরশাসকদের যুলুমকে সে অবজ্ঞা করে। জীবনের ওপর তার আদর্শ জয়ী হয় এবং চিরস্থায়ী জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে সে ক্ষণস্থায়ী জীবনের সকল দুঃখ-কষ্টকে উপেক্ষা করে। সে তখন এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামায় না যে, তার জন্যে কোনটা গ্রহণযোগ্য ও কোনটা পরিত্যাজ্য! কিসে ক্ষতি ও কিসে লাভ! পথে তার কী কী বাধা বিঘ্ন ও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে এবং কী কী ত্যাগ স্বীকার করতে হবে! কেননা গন্তব্য তার সামনে উজ্জ্বল হয়ে ভাসতে থাকে। তাই সে পথের কোনো জিনিসের দিকেই তাকায় না।

'জাদুকররা বললো, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যাবো। আমাদের কাছে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন যখন এসে গেছে, তখন তার ওপর ঈমান এনেছি, এটাই আমাদের ওপর তোমার ক্ষোভের একমাত্র কারণ। হে আমাদের প্রভু! আমাদের ওপর ধৈর্য ঢেলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দাও।' (১২৫-১২৬)

বস্তুত, এ হচ্ছে আসল অটল ও অনড় ঈমান। এ ঈমান কারো কাছে নতি স্বীকারও করে না। কারো সাথে আপোষও করে না। এ ঈমান শেষ পরিণতি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। মাঝপথের দুঃখ কষ্ট তাকে বিচলিত করে না। আপন প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাওয়ার বিশ্বাস তাকে তার নৈকট্য লাভে আকৃষ্ট ও আশ্বস্ত করে।

'তারা বললো, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবো।'

যে ব্যক্তি স্বৈরশক্তির সাথে মোমেনের লড়াইয়ের প্রকৃতি জানে, সে জানে যে, এটা আসলে আদর্শের লড়াই। তাই সে আপোষ করে না ও নতি স্বীকার করে না। যে শত্রু আদর্শ ত্যাগ করা

ছাড়া আর কিছুতে খুশী হয় না। সে শত্রুর কাছে সে ক্ষমা চায় না। কেননা সে তো একমাত্র এই আদর্শের কারণেই তার ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালায়।

'আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী যখন আমাদের কাছে এসে গেছে, তখন আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি, এটাই আমাদের ওপর তোমার ক্ষোভের কারণ।'

লড়াইয়ের আসল লক্ষ্য কী ও কে, তা যে জানে, সে তার শত্রুর কাছ থেকে নিরাপত্তার আশা করতে পারে না। সে শুধু বিপদে ও যুলুমে ধৈর্য ধারণ এবং মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুই কামনা করতে পারে।

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ওপর ধৈর্য ঢেলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

ঈমান, স্থিরতা ও অটল প্রত্যয়ের সামনে স্বৈরশাসক নিরুপায়। স্বৈরশাসকরা মনে করে, তারা মানুষের দেহের ওপর যেমন কর্তৃত্ব করে, তেমনি তাদের মনের ওপরও কর্তৃত্ব করতে পারবে এবং দেহের ন্যায় মনের ওপরও যেমন খুশী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। কিন্তু কার্যত তা পারে না। কেননা মানুষের মন শুধু আল্লাহর আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কর্তৃত্ব তার ওপর চলে না। মন যখন আল্লাহর কাছে যেতে উদগ্রীব হয়, তখন স্বৈরশাসকরা আর কী করবে? মন যখন আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকে এবং শাসকদের কোনো জিনিসের প্রতি তার লোভ হয় না, তখন শাসকদের আর করণীয় কিছুই থাকে না।

ফেরাউন ও তার দলবলের সাথে ঈমান আনয়নে অগ্রণী জাদুকরদের এই যে আপোষহীন বোঝাপড়াটা হলো, এটা মানবেতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটা এই দিক দিয়ে মানবেতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে, এখানে জীবনের ওপর আদর্শের, দুঃখ কষ্টের ওপর দৃঢ়তার এবং শয়তানের ওপর মানুষের বিজয় সূচিত হয়েছে।

এটা মানবেতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ জন্যে যে, এর মাধ্যমে সত্যিকার স্বাধীনতার জন্ম হয়েছে। স্বৈরশাসক ও বলদর্পীদের বলপ্রয়োগের ওপর যখন আদর্শের জয় হয়। দেহের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী বস্তুগত শক্তি যখন অন্তরাত্মার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হয় এবং বস্তুগত শক্তি যখন হৃদয়ের ওপর শক্তি প্রয়োগে ব্যর্থ হয়, তখনই হৃদয়ে সত্যিকার স্বাধীনতার জন্ম হয়।

এ ঘটনার মধ্য দিয়ে মানবেতিহাসে বস্তুগত শক্তিকে দেউলে ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা এই মুষ্টিমেয় ক'জন জাদুকর, যারা একটু আগে বিজয়ের প্রতিদান হিসাবে পারিতোষিক ও সরকারের নৈকট্যও প্রার্থনা করছিলো, তারাই এখন ফেরাউনের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করছে। তারাই এখন ফেরাউনের শাসানি ও চোখ রাঙানিকে বুড়ো আংগুল দেখাচ্ছে এবং ফেরাউনের শাস্তি ও শূলদন্ডকে ধৈর্যের সাথে হাসিমুখে গ্রহণ করছে। অথচ তাদের জীবনে বস্তুগত দিক দিয়ে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তাদের আশপাশের পরিবেশেও কোনো নতুনত্ব আসেনি। পরিবর্তন যেটুকু এসেছে তা এসেছে কেবল তাদের অন্তরে। একটি অদৃশ্য শক্তির হালকা পরশ পেয়ে তাদের অন্তরে এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। যে অদৃশ্য শক্তির পরশে একটি নক্ষত্র বিশাল সৌরমন্ডলের সাথে যুক্ত থাকে, একটি ঘূর্ণায়মান পরমাণু তার স্থির কেন্দ্রের সাথে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, মরণশীল ব্যক্তি চিরন্তন ও শাশ্বত শক্তির সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়, যে অদৃশ্য শক্তির পরশ একটি বোতাম টিপে দেয় ও তৎক্ষণাত অন্তরাত্মায় এক দুর্জয় শক্তির জোয়ার বয়ে যায়। বিবেক হেদায়াতের বাণী শুনতে পায়, দৃষ্টি আলোর প্রবাহ লাভ করে, যে শক্তির পরশ বস্তু জগতে

কোনো পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় থাকে না। বরং সে নিজেরই বস্তুগত জগতে পরিবর্তন আনে এবং বাস্তব জগতের মানুষকে তার কল্পনারও উর্ধের জগতে পৌঁছিয়ে দেয়। সেই অদৃশ্য শক্তির পরশই জাদুকরদের মধ্যে এমন আমূল পরিবর্তন এনেছিলো। ফলে সমস্ত হুমকি ধমকি, শাসানি ও চোখ-রাঙানি তাদেরকে দমনে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের ঈমান অটল অনড় ও অবিকৃত থেকেছে।

কোরআন এখানেই এ দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটিয়েছে। পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা আর দেয়নি। আসলে ঘটনার ভয়াবহতা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। এভাবেই ঘটনার মনস্তাত্বিক উদ্দেশ্য ও উপস্থাপনার শৈল্পিক সৌন্দর্য একত্রিত হয়। আর এটাই কোরআনের বিশেষ বাচনভঙ্গি, যা সে শৈল্পিক সৌন্দর্যের ভাষা দ্বারা ঈমানী চেতনাকে সম্বোধন করার কাজে প্রয়োগ করে। আর এ ক্ষেত্রে সে এমন সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করে, যা কোরআন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।(১)

তবে তাফসীরের এই পর্যায়ে এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী দৃশ্যের সামনে আমাদের ক্ষণেকের জন্যে হলেও থেমে চিন্তাভাবনা করা উচিত। চিন্তাভাবনা করলে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষাগুলো লাভ করতে পারি,

সর্বপ্রথম আমরা লক্ষ্য করি যে, রব্বুল আলামীন আল্লাহর প্রতি জাদুকরদের ঈমান আনাকে ফেরাউন নিজের সরকার ও রাজত্বের জন্যে হুমকি স্বরূপ মনে করেছে। কেননা এ ঈমানের ভিত্তি এবং তার সরকারের ভিত্তি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। আমি আগেও বলেছি এবং আবারো বলছি যে, সর্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে প্রতিপালক ও মনিব বলে মেনে নেয়া আর মানব জীবনের জন্যে আইনদাতা ও সর্বময় শাসনকর্তা হিসাবে আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে স্বীকার করে নেয়া- এ দুটো কাজের সমাবেশ ঘটানো কোনো একই ব্যক্তি, একই দেশ ও একই সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা প্রথমটা একটা স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়টাও একটা স্বতন্ত্র জীবন ব্যবস্থা।

এরপর আমরা লক্ষ্য করি যে, জাদুকরদের হৃদয় ঈমানের আলোতে উদভাসিত হওয়া এবং ঈমান আনাকে তারা নিজেদের জীবনের পরিপূর্ণ আদর্শিক রূপান্তর বলে মেনে নেয়ার পর তারা বুঝেছে যে, ফেরাউনের সাথে তাদের লড়াইটা হওয়ার একমাত্র কারণ এটাই যে, তারা বিশ্ব প্রতিপালকের ওপর ঈমান এনেছে।

কেননা তাদের এভাবে ঈমান আনা ফেরাউনের রাজত্ব, সিংহাসন ও সরকারকে এবং তার কাছ থেকে ক্ষমতার ভাগ লাভকারী তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদেরকে প্রচন্ড হুমকির সম্মুখীন করে। অন্য কথায় বলা যায়, ফেরাউনের খোদায়ী ও প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব এবং পৌত্তলিক সমাজের সকল মূল্যবোধ ও কৃষ্টিকে হুমকির সম্মুখীন করে। লড়াইয়ের এ চরিত্র ও প্রকৃতি এমন প্রতিটি ব্যক্তির জানা ও বুঝা দরকার, যে আল্লাহর একক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আহবান জানায়। কেননা একমাত্র এই উপলব্ধিই ঐ মোমেনদেরকে (জাদুকরদেরকে) সকল বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করার যোগ্য বানিয়েছিলো। তারা হাসিমুখে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন শুধু তাদের এই বিশ্বাসের জন্যেই যে, তারা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং তাদের শত্রু ফেরাউন তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মাবলম্বী। কেননা সে নিজের আইন বাস্তবায়নের জন্যে শক্তি প্রয়োগ ও জনগণকে জোরপূর্বক বশ্যতা স্বীকারকারী বানানোর মাধ্যমে বিশ্ব প্রতিপালকের প্রভুত্বকে অমান্য করেছে। কাজেই সে শত্রুরা কাফেরদের দলভুক্ত। বস্তুত মোমেনরা যতোক্ষণ এই দুটো কথা বিশ্বাস না

(১) 'আত্ তাসওয়ীরুল ফান্নী ফিল কোরআন' (কোরআনের শিক্ষাগত সৌন্দর্য) দ্রষ্টব্য

করবে যে, প্রথমত তারা মোমেন ও তারা কাফের এবং দ্বিতীয়ত তাদের শত্রুরা তাদের ওপর মারমুখো ও ক্ষিপ্ত শুধু এই জন্য যে, তারা ইসলামের অনুসারী, ততক্ষণ তারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াত অব্যাহত রাখতে পারবে না।

সর্বশেষে আমরা প্রত্যক্ষ করি জীবনের ওপর আদর্শের বিজয়, নির্যাতন ও দুঃখকষ্টের ওপর দৃঢ়তা ও আপোষহীনতার বিজয় এবং শয়তানের ওপর মানুষের বিজয়ের দৃশ্য। এটা সবচেয়ে ভয়ংকর দৃশ্য। সে দৃশ্যকে বর্ণনা করার ভাষা যে আমাদের নেই, তা স্বীকার করছি এবং এটাকে কোরআন যেভাবে চিত্রিত করেছে, সেভাবেই রেখে দিচ্ছি।

সার্বভৌম ক্ষমতার দাবীদার ফেরাউন

এবার আমরা পরবর্তী আয়াতসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

এখানে নতুন একটা দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এটা হচ্ছে গোপন ষড়যন্ত্র, অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত সলাপরামর্শ এবং উস্কানি দানের দৃশ্য। ঈমান ও স্বৈরতন্ত্রের লড়াইয়ে শোচনীয় ও কলংকজনক পরাজয়ের পর এই গোপন ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়া হয়। ফেরাউনের তল্পিবাহক গোষ্ঠীর এটা সহ্য হয়নি যে, মূসা ও তার মোমেন সহচরবৃন্দ নির্বিঘ্নে ছাড়া পেয়ে চলে যাবেন। এ সময় মোমেন সহচরদের সংখ্যা বেশী ছিলো না। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের অত্যাচারের ভয়ে মুষ্টিমেয় কিছু বনী ইসরাঈলী যুবক ছাড়া আর কেউ মূসার প্রতি ঈমান আনেনি। ফেরাউনের কুচক্রী সাংগো-পাংগরা দুষ্কর্ম ও পাপাচারের উদ্দেশ্যে গোপন সলাপরামর্শ শুরু করে দিলো এবং ফেরাউনকে মূসা ও তার সহচরদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো। তারা তাকে বুঝাতে লাগলো যে, ওরা সমগ্র বিশ্বের সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করার যে নতুন মতবাদ প্রচার করে চলেছে, সে ব্যাপারে ওদেরকে বাধা না দিলে এবং উদারতা দেখালে তার ফল মোটেই শুভ হবে না। ফেরাউনের কোনো মর্যাদা বা ভয় জনগণের মধ্যে থাকবে না। আর যায় কোথায়। সাংগ-পাংগদের এই উস্কানিতে ফেরাউন রেগে আগুন হয়ে গেলো এবং নিজের বিশাল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ওপর ভর করে হুমকি ধমকি দিতে শুরু করে দিলো।

'ফেরাউনের দলের প্রধানরা বললো, মূসা ও তার সম্প্রদায়কে কি আপনি পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়াতে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করতে অনুমতি দিয়ে দেবেন? ফেরাউন বললো অচিরেই আমি ওদের পুত্রদেরকে হত্যা করবো এবং ওদের স্ত্রীদেরকে বাঁচিয়ে রাখবো। আমি তো ওদের ওপর পরাক্রমশালী।' (আয়াত ১২৭)

উল্লেখ্য যে, ফেরাউন কখনো এই অর্থে খোদায়ী দাবী করেনি যে, সে মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক কিংবা প্রাকৃতিক জগতের উপায়-উপকরণের ওপর তার কোনো হাত আছে। সে শুধু তার দুর্বল জাতির ওপর এই অর্থে খোদায়ী দাবী করতো যে, সে তার নিজ আইন কানুন বলে তাদের সর্বময় শাসক এবং একমাত্র তার ইচ্ছা অনুসারেই দেশের সব কিছু চলে। সাধারণত এ রকম দাবী এমন সকল শাসকই করে থাকে, যারা নিজেদের আইন কানুন ও সংবিধান অনুসারে দেশ শাসন করে এবং যাদের ইচ্ছা অনুসারেই দেশের সব কিছু চলে। আর আরবী ভাষায় 'রুবুবিয়াত' শব্দটির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ এটাই। অনুরূপ, মিসরের জনগণ যে ফেরাউনের গোলামী করতো, সেটা এ অর্থে নয় যে, তারা তার সামনে আনুষ্ঠানিক উপাসনা ও পূজা করতো। কেননা জনগণের পূজা উপাসনা করার জন্যে আলাদা দেবতা এবং ফেরাউনের পূজা উপাসনার জন্যেও আলাদা দেবতা ছিলো। ফেরাউনকে তার ঘনিষ্ঠ লোকেরা যে বলেছিলো, 'আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে ত্যাগ করার জন্যে মূসাকে কি অবাধ সুযোগ দেবেন'— এ

কথা থেকেও সেটা বুঝা যায়। তাছাড়া ফেরাউন যুগের মিসরীয় ইতিহাসও এ কথাই বলে। আসলে তারা তার গোলামী করতো শুধু এই অর্থে যে, তারা তার ইচ্ছা ও আদেশের শর্তহীন আনুগত্য করতো, তার কোনো আইন বা আদেশ লংঘন করতো না। আর এটাই 'এবাদাত' শব্দটির আভিধানিক, পারিভাষিক ও বাস্তব অর্থ। যে ব্যক্তি কোনো মানুষের রচিত আইন গ্রহণ ও তার আনুগত্য করে, সে তার এবাদাত তথা শর্তহীন আনুগত্য ও গোলামী বা দাসত্ব করে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে আল্লাহর উক্তি 'তারা তাদের বিদ্বান ও সন্ন্যাসীদেরকে আল্লাহর বিকল্প 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে' এর যে ব্যাখ্যা রসূল (স.) করেছিলেন, তাতেও তিনি একথাই বলেছিলেন। সাবেক খৃষ্টান আদী বিন হাতেম ইসলাম গ্রহণ করতে এসে যখন এ আয়াতটি শুনলেন, তখন বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, ওরা তো বিদ্বান ও সন্ন্যাসীদের এবাদাত করতো না। রসূল (স.) বললেন, 'হ্যাঁ, করতো। ওই বিদ্বান ও সন্ন্যাসীরা হালাল জিনিসকে হারাম এবং হারাম জিনিসকে হালাল করলেও ইহুদী ও খৃষ্টানরা তা মেনে নিতো। এটাই তাদের এবাদাত। (তিরমিযী)

তবে ফেরাউন যে বলেছিলো 'আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো 'ইলাহ' (মাবুদ) আছে বলে তো আমার জানা নেই', এর ব্যাখ্যা কোরআনের অন্য একটি আয়াত থেকে বুঝা যায়। মিসরের একচ্ছত্র রাজত্ব কি আমার নয়। এই নদ নদীগুলো তো আমার অধীনেই চলে। তোমরা কি দেখতে পাও না? আমি তো এই ব্যক্তির (মূসা) চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যে অত্যন্ত দুর্বল এবং স্পষ্টভাবে কথাও বলতে পারে না। মূসাকে স্বর্ণবলয় কেন দেয়া হলো না এবং তার সাথে দলবদ্ধভাবে ফেরেশতারা এলো না কেন?' এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ফেরাউন নিজের রাজত্ব, সোনা-দানা ইত্যাদির সাথে মূসার রাজ ক্ষমতাহীনতাও ঐশ্চর্যহীনতার তুলনা করছিলো। আমি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ আছে বলে তো আমার জানা নেই' এই কথা বলে সে শুধু এটাই বুঝাতে চাইছিলো যে, সে তাদের পরাক্রান্ত নিরংকুশ ও সর্বময় শাসক, সে যেমন খুশী তাদেরকে চালায় এবং কেউ তার কথার বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করতে পারে না। এ অর্থে শাসন ক্ষমতা ও সর্বভৌমত্ব যার হস্তগত হয়, সে আভিধানিক ও পারিভাষিক সকল অর্থেই 'ইলাহ' হয়ে যায় এবং তার এহেন ক্ষমতাকে উলুহিয়াত বলা যায়। অর্থাৎ ইলাহ হলো সেই ব্যক্তি বা সত্ত্বা, যে মানুষের জন্যে আইন রচনা করে ও তা বাস্তবায়িত করে, তাই সে নিজেকে ইলাহ বলুক বা না বলুক।(১) এই বিশ্লেষণের আলোকে আমরা ফেরাউনের বিশিষ্ট উপদেষ্টাদের নিম্নোক্ত বাক্যটির তাৎপর্য বুঝতে পারি।

'আপনি কি মূসা ও তার দলবলকে পৃথিবীকে অরাজকতা সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার 'ইলাহ'দেরকে পরিত্যাগ করতে অবাধ অনুমতি দিয়ে দেবেন?'

তাদের দৃষ্টিতে এক আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে নেয়ার দাওয়াত দেয়াটাই হলো পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়িয়ে দেয়ার শামিল। কেননা এ দাওয়াতের ফলে ফেরাউনের শাসন ব্যবস্থা ও গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈধতা আপনা-আপনি বাতিল হয়ে যায়। এর কারণ এই যে, এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা ফেরাউনের সার্বভৌমত্ব তথা তার জাতির জন্যে তার প্রভুত্ব বা রুবুবিয়াতের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। কাজেই আল্লাহর প্রভুত্বের দাওয়াত দেয়াটা তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টিরই নামান্তর। কেননা এতে শাসন ব্যবস্থা পাল্টে যায় এবং এর স্থলে এর ঠিক বিপরীত এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে রুবুবিয়াত তথা প্রভুত্ব মানুষের নয়, আল্লাহর হয়ে থাকে। এ জন্যেই ফাসাদ বা অরাজকতাকে মূসা ও তার সহযোগীগণ কর্তৃক ফেরাউনকে ও তার দেবতাদেরকে ত্যাগ করার সুযোগ দানের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

---

(১) 'উস্তাদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর রচিত' কোরআনের 'চারটি মৌলিক পরিভাষা' বইটি পড়ুন। (মূল লেখকের টিকা)

ফেরাউন তার ক্ষমতা ও প্রতাপ প্রতিষ্ঠায় পৌত্তলিক ধর্ম থেকে সাহায্য পেতো। সে নিজেকে দেশের উপাস্য দেবতাদের পুত্র বলে দাবী করতো। এ পুত্রত্ব আসল নয়। কেননা লোকেরা ভালো ভাবেই জানতো যে, ফেরাউন মনুষ্যজাত পিতা মাতার সন্তান। ওই পুত্রত্ব ছিলো প্রতীকী এবং তা থেকে সে রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতার শক্তি সঞ্চয় করতো। কিন্তু মূসা ও তার সম্প্রদায় যখন মিসরীয়দের উপাসিত এই সব দেবতাকে বাদ দিয়ে বিশ্বপ্রভু আল্লাহর এবাদাত করতে লাগলো, তখন তার অর্থ দাঁড়ালো এই যে, যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ফেরাউন তার দুর্বল জাতির ওপর আধ্যাত্মিক শাসন চালাতো, সেই ভিত্তিটাই ধসিয়ে দেয়া হয়েছে। এই জাতি তার আনুগত্য করতো এজন্যে যে, তারাও আল্লাহর সত্য দ্বীনের অবাধ্য ছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'সে (ফেরাউন) তার জাতিকে হতবুদ্ধি করে দিলো, ফলে তারাও তার আনুগত্য করতে লাগলো। তারা ছিলো ফাসেক (আল্লাহর অবাধ্য জাতি)।

এটাই হচ্ছে ইতিহাসের যথার্থ ব্যাখ্যা। ফেরাউনের সম্প্রদায় যদি আল্লাহর দ্বীনের অবাধ্য না হতো, তা হলে ফেরাউন তাদেরকে হতবুদ্ধি করে তাদের আনুগত্য আদায় করতে পারতো না। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারীকে কোনো স্বৈরাচারী শক্তি হতবুদ্ধি করে দিতে পারে না এবং তার আনুগত্যও আদায় করতে পারে না। কেননা সে জানে যে, এটা আল্লাহর রচিত আইন নয়। এ কারণেই মূসা (আ.) কর্তৃক বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর দিকে আহবান জানানো এবং জাদুকররা ও মূসার দলের কিছু লোক বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনা ও তার এবাদাত করার কারণে ফেরাউনের গোটা শাসন ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছিলো। অনুরূপভাবে, মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে কোনো সমাজ ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্বের প্রতি আহবান জানানোর কারণে অথবা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এরূপ সাক্ষ্য দেয়ার কারণে হুমকির সম্মুখীন হয়ে থাকে। অবশ্য এই সাক্ষ্য দেয়ার যে অর্থ প্রাথমিক যুগে ছিলো, যে অর্থে তৎকালে লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করতো, সেই অর্থে যদি কেউ সাক্ষ্য দেয়, তবেই বাতিল ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হয়ে থাকে। নচেত এর যে প্রহসনমূলক অর্থ আজকাল চালু হয়েছে, সেই অর্থে ইসলাম গ্রহণ করলে বাতিল কোনো হুমকির সম্মুখীন হবে না।

আর এ কারণেই এই কথাগুলো ফেরাউনকে উত্তেজিত করে এবং তার গোটা সাম্রাজ্যের ওপর ঘনিয়ে আসা সত্যিকার হুমকি সম্পর্কে তাকে সচকিত করে তোলে। তাই সে তার জঘন্য ও বর্বরোচিত সংকল্পটি ঘোষণা করে।

'সে বললো, আমি অচিরেই তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করবো এবং মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখবো। তাদের ওপর আমরা অবশ্যই পরাক্রান্ত।'

বনী ইসরাঈল ইতিপূর্বে হযরত মূসার জন্মের সময় আরো একবার এ ধরনের পাশবিক অত্যাচার ভোগ করেছিলো ফেরাউন ও তার দলবলের কাছ থেকে। সূরা কাসাসে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'ফেরাউন পৃথিবীতে প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে এবং তার দেশবাসীকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছে। তন্মধ্যে একটি গোষ্ঠীকে সে একেবারেই দুর্বল করে রেখেছে, তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করিয়েছে এবং মহিলাদেরকে জীবিত রেখেছে। সে তো নৈরাজ্যবাদীদের অন্যতম।'

বস্তুত, এ ধরনের স্বৈরাশাসন সর্বকালের সকল দেশে দেখা যায়। এর উপায়-উপকরণে আজকের যুগ ও হাজার হাজার বছর আগেকার যুগের মধ্যে মৌলিক দিক দিয়ে কোনোই পার্থক্য নেই।

এরপর ফেরাউন ও তার দলবল ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে এবং ষড়যন্ত্র ও হুমকি দানের তৎপরতাকে লুকিয়ে রাখতে থাকে। অতপর পঞ্চম দৃশ্যের অবতারণা হয়। তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ফেরাউন তার হুমকিকে কার্যে পরিণত করেছে। এ দৃশ্যটা হলো, হযরত মূসার সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর কথা বলার দৃশ্য। তিনি কথা বলেন নবী সুলভ হৃদয় ও ভাষা দিয়ে এবং আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়, তাঁর নিয়ম নীতি ও তাঁর পরিকল্পনার ব্যাপারে নবীসুলভ জ্ঞান ও উপলব্ধি নিয়ে। তিনি তাদেরকে সম্ভাব্য নির্যাতনে ও বিপদ মুসিবতে ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার উপদেশ দেন। তাদেরকে প্রাকৃতিক সত্য অবহিত করেন। কেননা পৃথিবী মূলত আল্লাহর সম্পত্তি। তিনি যাকে খুশী তাকে তার ভোগ দখলের অধিকার দিয়ে থাকেন। কিন্তু চূড়ান্ত সৌভাগ্য আল্লাহর সেই সব বান্দার জন্যেই নির্ধারিত, যারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। তার জাতি যখন তাকে জানালো যে, তাদের এই সব বিপদ-মুসিবত ও যুলুম নির্যাতন তো মূসা আসার আগেও ছিলো, এখনও রয়েছে। এর তো কোনো শেষ দেখা যায় না। তখন তিনি বলেন যে, তিনি আশাবাদী যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং তাদেরকে পৃথিবীর খেলাফত দান করবেন, যাতে তারা এই আমানতের সাথে কেমন আচরণ করে তা পরীক্ষা করতে পারেন।

'মূসা তার সম্প্রদায়কে বললো, তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্যধারণ করো ....' (১২৮ ও ১২৯ আয়াত)

আল্লাহর গুণবৈশিষ্ট্য কিভাবে একজন নবীর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় এবং তার অন্তরে উদভাসিত হয়, কিভাবে তিনি প্রাকৃতিক বাস্তবতাকে, প্রকৃতির জগতে তৎপর শক্তিগুলোকে/আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম বিধিকে ও তা থেকে ধৈর্যশীলরা কী প্রত্যাশা করতে পারেন- তা কিভাবে একজন নবী উপলব্ধি করেন, সেটাই এখানে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

এ আয়াত কয়টি থেকে জানা যায় যে, বিশ্ব প্রতিপালকের দিকে যারা দাওয়াত দিয়ে থাকে, তাদের একটিই মাত্র আশ্রয়স্থল আছে এবং সেটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল। তাদের জন্যে একজনই বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক রয়েছেন এবং তিনি অসীম শক্তিশালী বন্ধু। তাদের সকলকে ধৈর্যধারণ করতে হবে সেই সময় পর্যন্ত, যে সময়টাকে তিনি নিজের জ্ঞান ও কর্মকুশলতা দ্বারা তাদের সাহায্য করার সময় হিসাবে মনজুর করবেন। তাদের তাড়াহুড়া করা চলবে না, কেননা তারা অদৃশ্য জানে না এবং কিসে কল্যাণ আছে তা জানে না।

পৃথিবী আল্লাহর সম্পত্তি। ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায় এখানে মেহমান ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন, নিজের নির্ধারিত নিয়ম বিধি ও প্রজ্ঞা অনুসারে তাকে পৃথিবীর ভোগ-দখলের অধিকার দেন। কাজেই যারা আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে, তাদের সেই সব বাহ্যিক কার্যকারণগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত নয়, যা দেখে মনে হয় যে, আল্লাহদ্রোহী স্বৈরশক্তি পৃথিবীতে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে, এখান থেকে তারা কখনো উৎখাত হবে না। পৃথিবীর মালিক নিজেই স্থির করবেন কখন তাদেরকে উৎখাত করা দরকার।

মনে রাখতে হবে যে, শেষ পরিণতি খোদাভীরু সৎ লোকদের জন্যেই চাই সে পর্যন্ত পৌঁছতে দীর্ঘ সময় লাগুক অথবা অল্প সময়। সুতরাং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয় যে, শেষ পরিণতি কী দাঁড়াবে এবং কাফেরদের সুখ সমৃদ্ধি দেখে ভাবা উচিত নয় যে, তারা চিরস্থায়ী।

বস্তুত, এই মহা সত্যগুলোর প্রতি একজন নবী এভাবেই দৃষ্টি দিয়ে থাকেন এবং সঠিকভাবে উপলব্ধি করেন।

কিন্তু বনী ইসরাঈল নিজ খাসলাতে অবিচল ছিলো। তারা বললো, তুমি আসার আগেও যুলুমে ভুগেছি, আর তুমি আসার পরও ভুগছি।'

এ কথাগুলোর ভেতরে চরম উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ তোমার আসার আগেও কষ্টে ভুগলাম। তোমার আসার পরে তাতে কোনো পরিবর্তন এলো না। দুঃখ-কষ্ট কেবল বেড়েই চললো এবং এর কোনো শেষ দেখা যায় না।

নবী মূসা নিজস্ব নিয়মে তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকেন, তাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেন, আল্লাহর কাছে আশা-আকাংখা পেশ করতে বলেন, তাদের শত্রুর ধ্বংসের আভাস দেন ও পৃথিবীতে তাদের উত্তরাধিকারী হবার আশ্বাস দেন, সেই সাথে সাবধানও করে দেন যে, উত্তরাধিকারী হওয়ার পর যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হবে।

'তিনি বললেন, আশা করা যায় তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন। .....

তিনি নবীসুলভ দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহর নিয়ম দেখতে পান, যা তার ওয়াদা মোতাবেক ধৈর্যশীল ও অস্বীকারকারী উভয় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কার্যকর। আল্লাহর নিয়মবিধির মধ্যে তিনি দেখতে পান স্বৈরাচারী ও তার সমর্থকদের ধ্বংস অনিবার্য এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনাকারী ধৈর্যশীলদের ভোগদখলের অধিকার লাভ। তাই তিনি তার জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান, যাতে আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধানই তাদেরকে প্রত্যাশিত সফলতার দিকে নিয়ে যায়। তিনি শুরু থেকেই তাদেরকে এ শিক্ষাও দেন যে, আল্লাহ তায়ালা যদি তাদেরকে পৃথিবীর ভোগ দখলের অধিকার দেন, তবে তাও হবে একটা পরীক্ষা। তখন মনে করলে চলবে না যে তারা আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়জন, তাই তারা গুনাহ করলেও তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। বরং পরীক্ষামূলক ভোগ দখলের অধিকার দেয়া হবে। এই অধিকার পাওয়ার পর তোমরা কেমন কাজ করো তা দেখা হবে। আল্লাহ তায়ালা সব কিছুরই আগাম খবর জানেন। তবে তিনি যা জানেন, তা মানুষ প্রকাশ্যভাবে না করা পর্যন্ত তাদেরকে তার প্রতিফল দেন না--এটাই আল্লাহর নিয়ম।

বিদ্রোহীদের ওপর আল্লাহর আযাব

এরপর কোরআন মূসা ও বনী ইসরাঈলের প্রসংগ বাদ দিয়ে ফেরাউন ও তার দল বলের পরিণতি বর্ণনা করেছে। আল্লাহ তায়ালা কি ভয়ংকর ভাবে তাকে যুলুম ও স্বৈরাচারের শাস্তি দিলেন, মূসা (আ.) তাঁর জাতিকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা কিভাবে বাস্তবায়িত করলেন, আল্লাহর কাছ থেকে মূসা যা প্রত্যাশা করছিলেন তা কিভাবে তিনি পূরণ করলেন এবং কিভাবে তাঁর ঘোষিত সতর্কবাণীকে সত্যে পরিণত করলেন, তা দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত, পুরো কাহিনীটাই এই সতর্কবাণীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে তুলে ধরা হয়েছে।

দৃশ্যটা মৃদু ও শান্তভাবে শুরু হয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাতে ঝড়ের প্রবণতা বাড়তে থাকে। অতপর যবনিকাপাতের সময় ঘনিয়ে এলে সব কিছু ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং ভূপৃষ্ঠকে স্বৈরশাসকের অস্তিত্ব থেকে মুক্ত করা হয়। আমরা জেনেছি যে, বনী ইসরাঈল ধৈর্যধারণ করেছিলো। তাই তারা তাদের ধৈর্যের সর্বোত্তম ফল ভোগ করেছে। আর ফেরাউন ও তার দলবল পাপাচারে লিপ্ত ছিলো। ফলে তারা তাদের পাপাচারের শাস্তি হিসাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদা ও হুমকি দুটোই কার্যকরী করেছেন। আল্লাহর রসূলকে প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে প্রথমে বিপদ-মুসিবত তার পরে সুখ সমৃদ্ধি প্রদান এবং সবার শেষে ধ্বংস করার যে প্রক্রিয়া আল্লাহ তায়ালা আবহমানকাল ধরে চালিয়ে আসছেন এবং যা তার স্থায়ী নীতি, সেটা বাস্তবায়িত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আমি ফেরাউনের স্বজনদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফসলের ক্ষতি দিয়ে শাস্তি দিয়েছিলাম। হয়তো তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। যখন তাদের সুখ-শান্তি আসতো, তখন বলতো, এটা আমাদের সৌভাগ্য। আর দুর্যোগ এলে মূসা ও তার সাথীদেরকে অপয়া বলতো। জেনে রেখো, তাদের অপয়া তাদের সাথেই রয়েছে.........' (আয়াত ১৩০-১৩৭)

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, ফেরাউন তার ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছিলো, সে তার হুমকি ও শাসানি যথারীতি কার্যকরী করেছিলো, পুরুষদেরকে হত্যা করেছিলো ও নারীদেরকে জীবিত রেখেছিলো। আর মূসা ও তার জাতি নির্যাতন ভোগ করে চলছিলো, এবং মুসিবতে ধৈর্যধারণ করে চলছিলো। সামগ্রিক পরিস্থিতিটা পর্যালোচনা করলে বলা যায়, ফেরাউন এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলো যার সারসংক্ষেপ দাঁড়ায় এরূপ। ঈমানের সাথে কুফরের সংঘাত চলছিলো, ধৈর্য দ্বারা নির্যাতনের মোকাবেলা করা হচ্ছিলো এবং একটা পার্থিব শক্তি আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করছিলো। আর ঠিক এই পরিস্থিতিতে সর্ববৃহৎ শক্তি নির্যাতনকারী ও ধৈর্য ধারণকারীদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্যে হস্তক্ষেপ করেছিলো। সেই হস্তক্ষেপটার শুরু হয়েছিলো এভাবে,

আমি ফেরাউনের স্বজনদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফসলের ক্ষতি দ্বারা শাস্তি দিয়েছিলাম.........

'দুর্ভিক্ষ ও ফসলের ক্ষতি ছিলো প্রথম সতর্কতা সংকেত। মূল আরবী শব্দ 'সিনীন' অজন্মা, দুর্ভিক্ষ ও তীব্র অভাব- এ তিনটের প্রত্যেকটাকেই বুঝায়। এ জিনিসটা মিসরের মতো অসাধারণ উর্বর মাটির দেশে অত্যন্ত উদ্বেগজনক, ভীতিপ্রদ, চিন্তা ভাবনা ও চেতনার উদ্দীপক এবং শিক্ষাপ্রদ। কোনো স্বৈরশাসক ও তার অধীনস্থ পাপাচারী জনতা যদি চিন্তা ভাবনা করার ইচ্ছা ও প্রেরণা একেবারেই হারিয়ে না ফেলে, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ ও শস্যহানিতে আল্লাহর হাত থাকার কথা যদি অবিশ্বাস না করে, প্রাকৃতিক নিয়ম, তার প্রতিশ্রুতি ও হুশিয়ারীকে স্মরণ করতে যদি অসম্মত না হয় এবং ইসলামী মূল্যবোধ ও বাস্তব জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে সম্পর্ক অস্বীকার না করে, তাহলে তারা এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত, ইসলামী মূল্যবোধ ও বাস্তব জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে যে সম্পর্ক, তা অদৃশ্য জগত থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কিন্তু যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসই রাখে না তাদের অনুভূতি এতো কঠিন এবং তাদের মন এতো অচেতন যে, তারা অদৃশ্য জগতের কোনো জিনিস দেখতে পায় না। অথচ পশুরাও তা দেখে ও অনুভব করে থাকে। অদৃশ্য জগত থেকে আগত কোনো কিছু দেখলেও তারা আল্লাহর চলমান প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে সচেতন হয় না এবং তাকে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন বলে স্বীকার করে না বরং তাকে চলমান কাকতালীয় ঘটনা মনে করে এবং শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই বলে বিশ্বাস করে।(১)

ফেরাউন ও তার স্বজনেরা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমতের নিদর্শনকে চিনতে পারেনি এবং সতর্ক হতে পারেনি। এগুলো দেখেও অগ্রাহ্য করেছে এবং কুফরী ও পাপাচার চালিয়ে গেছে। কেননা পৌত্তলিকতা ও তার কুসংস্কারগুলো তাদের স্বভাব-প্রকৃতিকে বিকৃত করে দিয়েছিলো। ওটা তাদের মধ্যে এবং বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব জীবন পরিচালনাকারী নিয়মাবলীর মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলো। ওই নিয়মাবলী আল্লাহর প্রতি যথার্থভাবে ঈমান আনয়নকারীরা

---

(১) রাশিয়ায় এবং গোটা কমিউনিস্ট জগতে একবার ব্যাপক শস্যহানি ঘটেছিলো, তখন তদানিন্তন রুশ নেতা বলেছিলেন ক্রুশ্চেভ, 'প্রকৃতি' আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে। ক্রুশ্চেভ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন এবং 'অদৃশ্যে' বিশ্বাস করতেন না। আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতাকে দেখার মতো দৃষ্টিশক্তি তার ছিলো না। কিন্তু এই 'প্রকৃতি' জিনিসটা কী, যার কাছে মানুষের বিরুদ্ধাচরণ করার মতো স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রয়েছে? একথাটা তার

ছাড়া আর কেউ দেখেও না, বুঝেও না, বুঝতেও পারে না। এই ঈমানদাররা জানে যে, এই মহাবিশ্বকে অকারণে ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি, উদ্দেশ্যহীনভাবে তা চলেও না, বরং আল্লাহর দুর্লংঘ্য আইন দ্বারা এ মহাবিশ্ব পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আর এটাই হচ্ছে সত্যিকার বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, যা আল্লাহর অদৃশ্য তত্ত্বকে অস্বীকার করে না। কেননা সত্যিকার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সাথে অদৃশ্য তত্ত্বের কোনো বিরোধ নেই। ঈমানী মানসিকতা যার আছে, সে বাস্তব জীবন ও ইসলামী মূল্যবোধের মধ্যে সম্পর্ক অস্বীকার করে না। এর পেছনে রয়েছে সর্বশক্তিমান ও আপন ইচ্ছা অনুসারে সদা সক্রিয় আল্লাহ তায়ালা, যিনি তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও পৃথিবীতে তার খেলাফত প্রতিষ্ঠা কামনা করেন। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে এমন এক শরীয়ত রচনা করে দিয়েছেন, যা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সাথে সংগতিপূর্ণ ও মানানসই। এতে করে তিনি চান পৃথিবীতে তাঁর বান্দাদের তৎপরতা ও তাদের হৃদয়ের তৎপরতার মাঝে কোনো অসাম স্য না থাকুক।

ফেরাউন ও তার স্বজনেরা এ কথাও বুঝলো না যে, তাদের কুফরী ও আল্লাহর দ্বীনের অবাধ্যতা এবং আল্লাহর বান্দাদের ওপর তাদের অত্যাচার ও স্বৈরাচারের সাথে অজন্মা ও শস্যহানির সম্পর্ক অত্যন্ত অবিচ্ছেদ্য। বিশেষত, মিসরের মতো উর্বর মাটিতে অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ যে আল্লাহর সাক্ষাত শাস্তি, তা বুঝা খুবই সহজ ছিলো। এই দেশে শস্যহানি একমাত্র তার অধিবাসীদের নাফরমানীর কারণেই হওয়ার কথা, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

আল্লাহ তায়ালা নিজের রহমত ও দয়ার বশে এ ধরনের দুর্যোগ দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি এলে বলতো, এটা তাদের ন্যায্য পাওনা ও স্বাভাবিক অধিকার। আর কোনো দুর্যোগ দুর্বিপাক হলে এবং শস্যহানি ও দুর্ভিক্ষ হলে মূসা ও তার সাথীদের দুর্ভাগ্যকে সে জন্যে দায়ী করতো।

মানুষের সহজাত স্বভাব ও মেযাজ যখন আল্লাহর প্রতি ঈমান থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তখন সে বিশ্ব জগতের পরিচালনার পেছনে আল্লাহর হাতকে সক্রিয় দেখতে পায় না এবং কোনো ঘটনার পেছনে আল্লাহর পরিকল্পনা ও অদৃষ্টকে কার্যকর দেখতে পায় না। এ কারণেই সে আল্লাহর চিরস্থায়ী ও আবহমান কাল ধরে সক্রিয় প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকেও উপলব্ধি ও অনুভব করতে পারে না। ফলে ঘটনাবলী সম্পর্কে সে অসংলগ্ন ব্যাখ্যা দেয়। সে ব্যাখ্যা কেবল ভিত্তিহীন কল্পনার সাথেই সংগতিশীল এবং কোনো নিয়ম বা ব্যবস্থার সাথে তা সামঞ্জস্যশীল হয় না। এ ধরনের অসংলগ্ন ব্যাখ্যার একটি উদাহরণ হলো ক্রুশ্চেভের প্রকৃতির বিরোধিতার তত্ত্ব। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা এই নেতা শস্যহানির কারণ বলতে গিয়ে এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। অনুরূপ ব্যাখ্যা তার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অন্যান্য প্রবক্তারাও বলে থাকেন। তারা আল্লাহর অদৃষ্ট পরিকল্পনাকে অস্বীকার করে, আর এ সত্তেও, আল্লাহর প্রতি ঈমানের মূলনীতিগুলোকে অস্বীকার করা এবং অদৃশ্য বিষয়গুলোকে অস্বীকার করা সত্তেও তাদের অনেকেই নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে থাকে।

ফেরাউন ও তার দলবলও এভাবেই ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দিতো। সুখকর কিছু হলে সেটা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য সৌভাগ্য আর দুঃখজনক কিছু হলে সেটা মূসা ও তার সংগীদের কারণে সংঘটিত দুর্ভাগ্য ও অশুভ ঘটনা বলে আখ্যা দিতো।

আরবী তাতাইয়ুর' শব্দটির মূল অর্থ হলো পাখী দ্বারা ভাগ্য নির্ণয়। জাহেলী যুগের পৌত্তলিকরা আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম ও অদৃষ্ট সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে এসব কাজ করতো।

কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করতে চাইলে পাখির বাসার কাছে এসে তাকে উত্যক্ত করতো যাতে সে উড়ে যায়। অতপর যদি সে ডান দিকে উড়তো, তাহলে বুঝতো, কাজটা তার জন্যে শুভ। অতপর সে সামনে এগুতে, আর যদি বাম দিকে উড়ে যেতো, তাহলে সেটাকে অশুভ মনে করতো। ডানদিকে উড্ডয়নকে তাদের ভাষায় 'সানেহ' এবং বামদিকের উড্ডয়নকে 'বারেহ' বলা হতো। অশুভ মনে হলে সে কাজে আর অগ্রসর হতো না। কিন্তু ইসলাম এই ভ্রান্ত রীতিকে বাতিল বলে আখ্যায়িত করেছে এবং এর স্থলে 'বিজ্ঞানসম্মত' রীতি চালু করেছে। সেই রীতিটা হলো, সব কিছুকে বিশ্ব-জগতে প্রচলিত আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম ও অদৃষ্টের হাতে সোপর্দ করা। ইসলাম সব কিছুকে 'বৈজ্ঞানিক' ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে, যার আওতায় মানুষের নিয়ত বা উদ্দেশ্য, কাজ, তৎপরতা ও চেষ্টাকেই মানদন্ড ধরা হয় এবং তাকে আল্লাহর স্বাধীন ইচ্ছা ও সর্বব্যাপী অদৃষ্টের আলোকে তার সঠিক স্থানে স্থাপন করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'মনে রেখো তাদের ভাগ্য আল্লাহর কাছে রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'

বস্তুত, সকল ঘটনার উৎস একটাই এবং তা হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। এই উৎস থেকে মানুষের সুখ-শান্তি আসে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এবং দুঃখ-দুর্দশাও আসে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি ভালো ও মন্দ উভয়টা দিয়েই তোমাদেরকে পরীক্ষা করি। এই একই উৎস থেকে কর্মফল হিসাবে শাস্তিও আসে। 'কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।' যেমন 'বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ', এর নামে যারা অদৃশ্য জগতকে ও অদৃষ্টকে অস্বীকার করে, তারা এবং যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ বলে আখ্যায়িত করে তারা। এরা সবাই অজ্ঞ ও মূর্খ।

ফেরাউনের স্বজনেরা তাদের গোয়ার্তুমি ও হঠকারিতা অব্যাহত রাখে, পাপাচার ভিত্তিক আত্মসম্মানবোধের কারণে দুর্যোগ ও দুর্দশা তাদের দাম্ভিকতা ও একগুঁয়েমিকে বাড়িয়ে দেয়।

তাই 'তারা বলে, তুমি আমাদেরকে জাদু দ্বারা বশীকরণ করতে যতো নিদর্শনই দেখাও না কেন, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না।'

অর্থাৎ তারা এমনই যিদ ধরেছিলো যা কোনো আলাপ আলোচনা ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা নমনীয় হবার নয়। তারা কোনো চিন্তা ভাবনা ও বিচার বিবেচনা করতেও প্রস্তুত ছিলো না। তারা প্রমাণ দর্শনের আগেই বলে দিয়েছে যে, তারা প্রত্যাখ্যান করবেই, যাতে প্রমাণ আসার পথটাই রুদ্ধ হয়ে যায়। এটা এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যা দ্বারা স্বৈরাচারীরা আক্রান্ত হয়ে থাকে। স্বৈরাচারীরা এই অবস্থায় আক্রান্ত হয় তখনই, যখন সত্য তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দেয়, অকাট্য প্রমাণ তাদেরকে হতবুদ্ধি করে দেয় এবং তাদের আবেগ, স্বার্থ, ক্ষমতা ও রাজত্ব সবই সত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। আর ঠিক এরূপ অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালা তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন। এ হস্তক্ষেপের উদাহরণ এ আয়াতে দেখুন,

'অতপর আমি তাদের ওপর পাঠালাম বন্যা, পংগপাল, উকুন ব্যাং, রক্ত পৃথক পৃথক নিদর্শন হিসাবে।'

সতর্ক করা ও পরীক্ষা করার জন্যে 'পৃথক পৃথক নিদর্শন হিসাবে' অর্থাৎ সুস্পষ্ট, সুসমন্বিত ও ধারাবাহিকভাবে এবং প্রত্যেক পরবর্তী নিদর্শন পূর্ববর্তী নিদর্শনের সমর্থক হিসাবে এসেছিলো।

এখানে আয়াতে সব কটা নিদর্শনকে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো একে একে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি দুর্যোগ আসার পর তারা মূসার কাছে গিয়ে কাকুতি মিনতি করতো যাতে তিনি ওই দুর্যোগ হটিয়ে নেয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন,

প্রতিবার তাকে প্রতিশ্রুতি দিতো যে, বিপদটা সরে গেলেই বনী ইসরাঈলকে তার সাথে যেতে দেবে।

'যখনই তাদের ওপর দুর্যোগ আসতো অমনি বলতো, হে মূসা, তোমার প্রতিপালকের কাছে দোয়া করো। এই বিপদটা যদি তুমি হটিয়ে দাও, তবে আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবোই এবং তোমার সাথে বনী ইসরাঈলকে অবশ্যই যেতে দেবো।'

কিন্তু প্রতিবারই তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো এবং দুর্যোগ হটানোর আগে তারা যেমন ছিলো, হটানোর পর আবার সেই অবস্থায় ফিরে যেতো। চূড়ান্ত শাস্তি যতোক্ষণ না আসে, ততোক্ষণ আল্লাহর দেয়া অবকাশের অপব্যবহার করে তারা কুফরী করতেই থাকতো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অতপর যখনই আমি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের ওপর থেকে আযাব হটিয়ে দিলাম, তখনই তারা প্রতিশ্রুতি ভংগ করতে লাগলো।' (আয়াত ১৩৫)

এখানে একটি আয়াতে ফেরাউনের জাতির ওপর পাঠানো নিদর্শনাবলী তথা আযাবগুলোকে একত্রে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেন সব কটা এক সাথেই এসেছে এবং যেন তারা একবারই প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে। আসলে এর কারণ এই যে, তাদের ব্যাপারে সব সময়ই একই রকম অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে এবং সব কটির শেষ ফল এই রকম ছিলো। এটি কোরআনের কেসসা কাহিনী বর্ণনার একটি অন্যতম পদ্ধতি। প্রত্যেক ঘটনার সূচনা এক রকম এবং শেষও এক রকম হওয়ায় এগুলোকে একত্রে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কেননা বিকৃত ও রুদ্ধ মন-মগজ রকমারি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেও কোনোটা দ্বারাই সে উপকৃত হয় না ও শিক্ষা লাভ করে না বিধায় সবগুলোকে একটিই ধরে নেয়া হয়।

এই নিদর্শনাবলী তথা আযাব ও দুর্যোগগুলো কিভাবে সংঘটিত হয়েছিলো, সে ব্যাপারে কোরআনের বর্ণনার বাইরে আমরা নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাই না। কোনো প্রামাণ্য হাদীস থেকেও এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য জানা যায় না। এজন্যে তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআনের' স্থায়ী রীতি অনুসারে আমি শুধু কোরআনের বর্ণনার মধ্যেই সীমিত থাকতে চাই। কেননা কোরআন অথবা বিশুদ্ধ হাদীস ছাড়া এ সংক্রান্ত তথ্য লাভের আর কোনো উপায় নেই। ইসরাঈলী রেওয়ায়াত ও ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী থেকে আমি এ তাফসীরকে মুক্ত রাখতে চাই। দুঃখের বিষয় যে, প্রাচীন তাফসীরসমূহের একটিও এই সব ইসরাঈলী কল্প-কাহিনী থেকে মুক্তি পায়নি। এমনকি অত্যন্ত মূল্যবান ও মর্যাদাবান তাফসীর হওয়া সত্তেও ইমাম ইবনে জারীর তাবারী ও ইমাম ইবনে কাসীরের তাফসীরও এই বিপজ্জনক উপাদান থেকে মুক্ত হয়নি।

এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম আবু জাফর ইবনে জারীর তাবারীর তাফসীর গ্রন্থে ও ইতিহাস গ্রন্থে হযরত ইবনে আববাস, সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ ও ইবনে ইসহাক থেকে একাধিক বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তার একটি নিম্নরূপ,

'......মূসা (আ.) ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও। ফেরাউন অস্বীকার করলো। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর বৃষ্টি ও বন্যা পাঠালেন। এই বৃষ্টি থেকে এমন কিছু বস্তু তাদের ওপর পতিত হলো, যার দরুন তারা ভয় পেয়ে গেলো। ভাবলো যে, এটা হয়তো বা একটা আযাব। তখন তারা মূসা (আ.)-কে বললো, তুমি তোমার প্রভুকে বলো, তিনি যেন আমাদের ওপর থেকে বৃষ্টি-বন্যা হটিয়ে দেন, তাহলে আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সাথে যেতে দেবো।

মূসা (আ.) দোয়া করলে দুর্যোগ কেটে গেলো। কিন্তু তারা ঈমানও আনলো না এবং বনী ইসরাঈলকেও তার সাথে যেতে দিলোনা। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এমন ফসল, ফলমূল ও ঘাস জন্মালেন, যা ইতিপূর্বে কখনো জন্মাননি। এতে ফেরাউনের লোকেরা পুলকিত হয়ে বললো, এটাই আমরা চেয়েছিলাম। এরপর আল্লাহ তায়ালা এই ফসল, ফলমূল ও ঘাসের ওপর পংগপাল পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন পংগপালের প্রভাবে ঘাসকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখলো, তখন ভাবলো যে, এর প্রভাবে সমস্ত ফসলাদি ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই তারা পুনরায় মূসা (আ.)-কে অনুরোধ করলো যে, তুমি দোয়া করে এই পংগপাল হটানোর ব্যবস্থা করো। আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো এবং তোমার সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দেবো। মূসা (আ.) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। পংগপাল দূর হয়ে গেলো। এবারও তারা ঈমান আনলো না এবং বনী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে যেতে দিলো না। এরপর তারা ফসলাদি নিরাপদে ঘরে তুললো। অতপর সদম্ভে বললো, আমরা ফসল ঘরে তুলেছি। এবার আল্লাহ তায়ালা উকুন বা ছারপোকা পাঠালেন। ফলে অবস্থা এমন বেগতিক হয়ে দাঁড়ালো যে, কোনো ব্যক্তি যদি দশ সের গম ভাংগাতে নিয়ে যায়, তবে সে তা থেকে তিন ছটাক আটাও ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারতো না। (ওই পোকায় নষ্ট করে দিতো) তখন তারা আবার মূসা (আ.)-কে অনুরোধ করলো যে, আল্লাহর কাছে দোয়া করে আমাদেরকে এই পোকা থেকে উদ্ধার করো। আমরা এবার অবশ্যই ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে যেতে দেবো। তিনি দোয়া করলেন এবং এ দুর্যোগটাও কেটে গেলো। এবারও তারা বনী ইসরাঈলকে যেতে দিতে সম্মত হলো না। একদিন হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের কাছে বসে আছেন। সহসা ব্যাং-এর ঘ্যাংগর ঘ্যাং ডাক শুনতে পেলেন। তিনি ফেরাউনকে বললেন, এবার তুমি ও তোমার জাতি এই আপদ থেকে কিভাবে উদ্ধার পাও দেখবো। ফেরাউন বললো, ব্যাং আমাদের কী ক্ষতি করবে? এরপর দিন শেষে দেখা গেলো, ফেরাউনের লোকেরা যে যেখানে বসে, তার থুতনি পর্যন্ত ব্যাং-এর নিচে চাপা পড়ে যায়। এমনকি সে কথা বলতে গেলে ব্যাং তার মুখের ওপর লাফিয়ে পড়ে। এবার আবার তারা মূসা (আ.)-কে বললো, আল্লাহর কাছে দোয়া করে ব্যাং-এর আপদ হটাও। আমরা তোমার ওপর ঈমান আনবো এবং তোমার সাথে বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে যেতে দেবো। মূসা (আ.) পুনরায় দোয়া করে তাদেরকে উদ্ধার করলেন। কিন্তু এবারও তারা ঈমান আনলো না।

এবার আল্লাহ তায়ালা রক্ত পাঠালেন। ফেরাউনের লোকেরা নদীতে, পুকুরে বা অন্যান্য জলাশয়ে গেলেই দেখতো তা তাজা রক্তে থৈথৈ করছে। এবার সবাই ফেরাউনকে জানালো যে, আমাদের ওপর রক্ত এসেছে নতুন আপদ হয়ে। কোথাও একটু খাবার পানি নেই। ফেরাউন বললো, মূসা তোমাদেরকে জাদু করেছে। জনতা বললো, 'কোথা থেকে জাদু এলো? আমরা আমাদের কোনো জলাশয়ে তাজা রক্ত ছাড়া এক ফোঁটাও পানি পাচ্ছি না। তখন জনতা মূসা (আ.)-কে বললো, হে মূসা, দোয়া করো, যেন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রক্ত থেকে উদ্ধার করেন। এবার আমরা তোমার ওপর ঠিকই ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে যেতে দেবো। মূসা (আ.) দোয়া করলেন এবং তারা নিষ্কৃতি পেলো। কিন্তু এবারও তারা ঈমান আনলো না এবং বনী ইসরাঈলকে তার সাথে যেতে দিলো না।'

প্রকৃত ঘটনা কিরূপ ছিলো তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। এ আয়াতগুলোতে ঘটনা সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, বিভিন্ন বর্ণনায় তার স্বরূপ বিভিন্ন হলেও তাতে কিছু আসে-যায় না। আসল কথা হলো, আল্লাহ তায়ালা এ সব আযাবকে নিজ পরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে

নির্দিষ্ট জাতিকে পরীক্ষা করা বা শাস্তি দেয়ার জন্যে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর নবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করার শাস্তি হিসাবে বিপদ আপদ পাঠানো আল্লাহর চিরস্থায়ী নীতি। সেই নীতি অনুসারেই এ আযাব ও দুর্যোগগুলোকে পাঠিয়েছিলেন।

ফেরাউনের জাতি যদিও অজ্ঞ ও পৌত্তলিক ছিলো এবং ফেরাউন তাদেরকে নিরুপায় মনে করে অবজ্ঞা করতো, কিন্তু তারা মূসা (আ.)-এর কাছে আসতো এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তার সুবাদে তাকে দোয়া করে মুসিবত থেকে উদ্ধার করার অনুরোধ জানাতো। অবশ্য প্রতিবার শাসক মহল বিপদ উদ্ধার হয়ে যাওয়ার পর প্রতিশ্রুতি ভংগ করতো এবং দাবী অমান্য করতো। কেননা জনগণের ওপর ফেরাউনের প্রভুত্বের ওপর ভর করেই তারা ক্ষমতায় টিকে ছিলো, আল্লাহর প্রভুত্বের কথা শুনতেই তারা আঁতকে উঠতো। কেননা সেটা মেনে নিলে ফেরাউনের প্রভুত্বের ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেতো। কিন্তু আধুনিক যুগের জাহেলিয়াত এতোই হঠকারী যে, ফসলাদির ওপর আল্লাহর বিভিন্ন রকমের আপদ পাঠানো সত্তেও মানুষ আল্লাহর শরণাপন্ন হয় না। সাধারণ কৃষকরা যখন অনুভব করে যে, এই সব আপদের পেছনে আল্লাহর হাত রয়েছে, যা কিনা একটা স্বাভাবিক অনুভূতি, এমনকি কাফেরদের মনেও কঠিন বিপদের সময় এরূপ অনুভূতি জাগে, আর এরূপ অনুভূতির কারণে যখন কৃষকরা বিপদ উদ্ধারের দোয়া করতে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে, তখন তথাকথিত বিজ্ঞানের ধ্বজাধারীরা তাদেরকে বলে, এ ধারণা একটা কুসংস্কার মাত্র। শুধু তাই নয়, তাদেরকে নিয়ে তারা উপহাসও করে, যাতে করে পৌত্তলিকতার চেয়েও খারাপ ধরনের কুফরীর দিকে তাদেরকে ঠেলে দেয়া যায়।

বনী ইসরাঈল জাতির পুনরুত্থান

এরপর আসে চূড়ান্ত শাস্তির পালা। সুখ ও দুঃখ দিয়ে পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা করার পর কাফেরদেরকে চূড়ান্ত শাস্তি দেয়াই আল্লাহর রীতি। তাই আল্লাহ তায়ালা ফেরাউন ও তার তল্পিবাহক গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অবকাশ দেয়ার পর তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। এভাবে বলদর্পী স্বৈরশাসকদেরকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে তিনি ধৈর্যশীল নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন। ১৩৬ ও ১৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

'অতপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম, তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে মারলাম। কেননা তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিলো এবং তার প্রতি উদাসীন ছিলো। আর আমি নির্যাতিত জাতিটিকে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের সেই অঞ্চলগুলোর উত্তরাধিকারী করলাম, যার ওপর আমি বরকত ও কল্যাণ নাযিল করেছি। ....'

ডুবিয়ে মারার ঘটনাটা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য সূরায় যতোটা বিস্তারিতভাবে এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে ততোটা করা হয়নি। কারণ এখানকার প্রেক্ষাপট দীর্ঘ অবকাশ দেয়ার পর চূড়ান্ত আঘাতের প্রেক্ষাপট। তাই বিস্তারিত কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। ত্বরিত চূড়ান্ত আঘাতের উল্লেখই এখানে হৃদয়কে অধিকতর প্রভাবিত করে এবং চেতনাকে অধিকতর সচকিত করে।

'অতপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে মারলাম।'

অর্থাৎ একটা আঘাতেই তারা ধ্বংস হয়ে গেলো। সকল গর্ব ও অহংকার অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হলো। অবিকল কর্মের অনুপাতে কর্মফল।

'কেননা তারা আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছিলো এবং তা থেকে উদাসীন ছিলো।'

এখানে নির্ধারিত পরিণতির সাথে নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার ও তার প্রতি উদাসীনতার সংযোগ দেখানো হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অজ্ঞ লোকেরা যেমন ধারণা করে থাকে, কোনো

ঘটনাই অপরিকল্পিত বা কাকতালীয়ভাবে ঘটে না। বরং প্রতিটি ঘটনার পেছনে সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ থাকে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটের সাথে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে আয়াতে ঘটনার পরবর্তী ধাপটা তাৎক্ষণিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পরবর্তী ধাপ হচ্ছে নির্যাতিত বনী ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউন ও তার স্বজনদের স্থলাভিষিক্ত করার ধাপ।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, বনী ইসরাঈলকে যখন ফেরাউনের দলবলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিলো, তখন পর্যন্ত তারা সততার সর্বোত্তম মানের কাছাকাছি অবস্থান করছিলো এবং তখনো তারা বিকৃতি ও ভ্রষ্টতার দরুন অপমান, লাঞ্ছনা ও বিক্ষিপ্ততার শিকার হয়নি। আরো উল্লেখ্য যে, তারা ফেরাউনের দেশ মিসরে নয় বরং সিরিয়াতে গিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলো। তাদের জীবনে এই উত্থান ঘটেছিলো ফেরাউন ও তার দলবলের ডুবে মরার কয়েক দশক পরে, হযরত মূসার ইন্তেকালের পরে এবং মরুভূমিতে চল্লিশ বছর ধরে ভবঘুরে জীবন কাটানোর পরে। এ সব ঘটনার বিবরণ অন্য সূরায় এসেছে। কিন্তু এখানকার বর্ণনায় সময় ও ঘটনাবলীকে সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তী দুটি ধাপের সাথে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে স্থলাভিষিক্তকরণ তথা ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের বিষয়টা ত্বরিত এগিয়ে আনা হয়েছে।

'আমি নির্যাতিত জাতিটাকে পূর্ব ও পশ্চিমের সেই সব অঞ্চলে স্থলাভিষিক্ত করেছিলাম, যার ওপর আমি কল্যাণ বর্ষণ করেছি। ...... (আয়াত ১৩৭)

আমরা নশ্বর মানুষ কালের গন্ডীতে আবদ্ধ। তাই আমরা যখন 'আগে' বা 'পরে' বলি, তখন সেটা এজন্যেই বলি যে, যে ঘটনা আমাদেরকে অতিক্রম করে যায় এবং যে ঘটনাকে আমরা অনুভব করি, তার দিনটাকে আমরা চিহ্নিত করে রাখতে চাই। এ জন্যেই আমরা বলি যে, নির্যাতিত জাতিটাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার ঘটনা ফেরাউনের ডুবে মরার ঘটনার পরে ঘটেছে। এটা আমাদের মানবীয় অনুভূতির অভিব্যক্তি। তবে মহান আল্লাহ যেহেতু অনাদি অনন্ত ও অবিনশ্বর সত্ত্বা এবং তার জ্ঞানও অসীম, তাই তাঁর কাছে কোনো 'আগে' ও 'পরে' নেই। তার কাছে ইতিহাসের সব পাতাই উন্মুক্ত। কোনো পাতাই স্থান ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুত আল্লাহর দৃষ্টান্তই সর্বোচ্চ। মানুষকে সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।

এভাবে একদিকে ধ্বংসের এবং অপরদিকে গড়ার ও নব উত্থানের দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটেছে। স্বৈরাচারী বলদর্পী ও যুলুমবাজ ফেরাউন এবং তার তল্পিবাহক গোষ্ঠী ডুবে মারা গেলো। তাদের নির্মিত সকল জীবনোপকরণ, বড় বড় দালান কোঠা, ফলমূলের বাগান ইত্যাদি সবই চোখের নিমেষে ধ্বংস হয়ে গেলো।

এ দৃষ্টান্তটা আল্লাহ তায়ালা মক্কার মুষ্টিমেয় সংখ্যক মোমেনের জন্যে পেশ করেছেন। মোশরেকদের হাতে নিপীড়িত মোমেনদের মনে এ দৃষ্টান্ত আশার আলো জ্বালাতে পারে। ফেরাউনের গায়ে স্বৈরাচারীদের দ্বারা নিষ্পেষিত প্রত্যেক যুগের মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্যে এ দৃষ্টান্ত উদ্দীপনার সঞ্চার করতে পারে। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের ধৈর্যের প্রতিদান স্বরূপ তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে পারেন এবং তারপর তারা কেমন আচরণ করে তা দেখতে পারেন।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۚ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿١٣٨﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٠﴾ وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿١٤١﴾ وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ

১৩৮. (ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারার পর) আমি বনী ইসরাঈলদের সমুদ্র পার করিয়ে দিয়েছি, অতপর (সমুদ্রের ওপারে) তারা এমন একটি জাতির কাছে এসে পৌঁছলো, যারা (সব সময়) তাদের মূর্তিদের ওপর পূজার অর্ঘ দেয়ার জন্যে বসে থাকতো, (এদের দেখে বনী ইসরাঈলের) লোকেরা বললো, হে মূসা, তুমি আমাদের জন্যেও (এ ধরনের) একটি দেবতা বানিয়ে দাও, যেমন দেবতা রয়েছে এদের; (এ কথা শুনে) সে তাদের বললো, তোমরা হচ্ছো আসলেই এক মূর্খ জাতি। ১৩৯. এ লোকেরা যেসব কাজে লিপ্ত রয়েছে, তা (একদিন) ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং এরা যা করছে তাও সম্পূর্ণ বাতিল (বলে গণ্য) হবে। ১৪০. মূসা (আরো) বললো, আমি কি তোমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য একজন মাবুদ তালাশ করতে যাবো– অথচ এই আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের দুনিয়ার সব কিছুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। ১৪১. (তা ছাড়া তোমাদের সে সময়ের কথা স্মরণ করা উচিত,) যখন আমি তোমাদের ফেরাউনের লোকজনদের কাছ থেকে মুক্ত করেছিলাম, তারা তোমাদের মর্মান্তিক শাস্তি দিতো, তারা তোমাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করতো, আর তোমাদের মেয়েদের তারা জীবিত ছেড়ে দিতো; এতে তোমাদের জন্যে তোমাদের পরোয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা নিহিত ছিলো।

রুকু ১৭

১৪২. মূসাকে (আমার কাছে ডাকার জন্যে) আমি তিরিশটি রাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, (পরে) তাতে আরো দশ মিলিয়ে তা পূর্ণ করেছি, এভাবেই তার জন্যে তার মালিকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে, (যাত্রার প্রাক্কালে) মূসা তার ভাই হারুনকে বললো, (আমার অবর্তমানে) আমার লোকদের মাঝে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদের (প্রয়োজনীয়) সংশোধন করবে, কখনো বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের

سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۙ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ۝ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ۝ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ

কথামতো চলবে না। ১৪৩. যখন মূসা আমার সাক্ষাতের জন্যে (নির্ধারিত স্থানে) এসে পৌঁছলো এবং তার মালিক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বললো, হে আমার মালিক, আমাকে (তোমার কুদরত) দেখাও, আমি তোমার দিকে তাকাই; তিনি বললেন (না), তুমি কখনো আমাকে দেখতে পাবে না, তুমি বরং (অনতিদূরের) পাহাড়টির দিকে তাকিয়ে দেখো, যদি (আমার নূর দেখার পর) পাহাড়টি স্বস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে তুমি অবশ্যই (সেখানে) আমায় দেখতে পাবে, অতপর যখন তার মালিক পাহাড়ের ওপর (স্বীয়) জ্যোতি নিক্ষেপ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো, (সাথে সাথেই) মূসা বেহুশ হয়ে গেলো, পরে যখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেলো তখন সে বললো, মহাপবিত্রতা তোমার (হে আল্লাহ), আমি তোমার কাছে তাওবা করছি, আর তোমার ওপর ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে আমিই (হতে চাই) প্রথম। ১৪৪. আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মূসা, আমি মানুষের মাঝ থেকে তোমাকে আমার নবুওত ও আমার সাথে বাক্যালাপের মর্যাদা দিয়ে বাছাই করে নিয়েছি, অতএব আমি তোমাকে (হেদায়াতের) যা কিছু (বাণী) দিয়েছি তা (নিষ্ঠার সাথে) গ্রহণ করো এবং (এ জন্যে তুমি আমার) কৃতজ্ঞতা আদায় করো। ১৪৫. এই ফলকের মধ্যে আমি তার জন্যে সর্ববিষয়ের উপদেশমালা ও সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ লিখে দিলাম, অতএব একে (শক্ত করে) আঁকড়ে ধরো এবং তোমার জাতির লোকদের বলো, তারা যেন এর উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করে; অচিরেই আমি তোমাদের (সেসব ধ্বংসপ্রাপ্ত) পাপীদের আস্তানা দেখাবো। ১৪৬. অচিরেই আমি সেসব মানুষের দৃষ্টি আমার (এসব) নিদর্শন থেকে (ভিন্ন দিকে) ফিরিয়ে দেবো, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাহাদুরী করে বেড়ায়; (আসলে) এ লোকেরা যদি

لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٧﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٨﴾ وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ أَيْدِيْهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى إِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ أَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْ

(অতীত ধ্বংসাবশেষের) সব কয়টি চিহ্নও দেখতে পায়, তবু তারা তার ওপর ঈমান আনবে না, যদি তারা সঠিক পথ দেখতেও পায়, তবু তারা (পথকে) পথ বলে গ্রহণ করবে না, যদি এর কোথাও কোনো বাঁকা পথ তারা দেখতে পায়, তাহলে তাকেই (অনুসরণযোগ্য) পথ হিসেবে গ্রহণ করবে; এটা এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, এবং তারা এ (আযাব) থেকেও উদাসীন ছিলো। ১৪৭. যারা আমার আয়াতসমূহ ও পরকালে আমার সামনা সামনি হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করবে, তাদের সব কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে যাবে; আর তারা (এ দুনিয়ায়) যা কিছু করবে তাদের তেমনিই প্রতিফল দেয়া হবে।

রুকু ১৮

১৪৮. মূসার জাতির লোকেরা তার (তূর পর্বতে গমনের) পর নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি গো-বাছুর বানিয়ে নিলো, (তা ছিলো জীবনবিহীন) একটি দেহমাত্র– যার আওয়ায ছিলো শুধু (গরুর) হাম্বা রব; এ লোকেরা কি দেখতে পায় না যে, সে (দেহ)-টি তাদের সাথে কোনো কথা বলে না, না সেটি তাদের কোনো পথের দিশা দেয়, কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা সেটিকে (মাবুদ বলে) গ্রহণ করলো, তারা ছিলো (আসলেই) যালেম। ১৪৯. অতপর যখন তারা অনুতপ্ত হলো এবং (নিজেরা) এটা দেখতে পেলো যে, তারা গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন তারা বললো, আমাদের মালিক যদি আমাদের ওপর দয়া না করেন এবং (গো-বাছুরকে মাবুদ বানানোর জন্যে) যদি তিনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবো। ১৫০. (কিছু দিন পর) মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে এলো, তখন সে (এসব কথা শুনে) বললো, আমার (তূর পর্বতে যাওয়ার) পর তোমরা কি জঘন্য কাজই না করেছো! তোমরা কি তোমাদের মালিকের কাছ

بَعْدِیْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَی الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِیْهِ یَجُرُّهٗۤ اِلَیْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِیْ وَكَادُوْا یَقْتُلُوْنَنِیْ ۫ فَلَا تُشْمِتْ بِیَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِیْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِیْ وَلِاَخِیْ وَاَدْخِلْنَا فِیْ رَحْمَتِكَ ۫ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ۝ اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَیَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُفْتَرِیْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ عَمِلُوا السَّیِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْۤا ۫ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَی الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۚۖ وَفِیْ نُسْخَتِهَا هُدًی وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِیْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُوْنَ ۝

থেকে (কোনো পরিষ্কার) আদেশ আসার আগেই (তোমরা আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে) তাড়াহুড়া (শুরু) করলে! (রাগে ও ক্ষোভে) সে ফলকগুলো ফেলে দিলো এবং তার ভাইর মাথা (-র চুল) ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে আনলো; (মূসাকে লক্ষ্য করে) সে বললো, হে আমার মায়ের ছেলে (আমার সহোদর ভাই), এ জাতির লোকগুলো আমাকে দুর্বল করে দিতে চেয়েছিলো, তারা (এক পর্যায়ে) আমাকে তো মেরেই ফেলতে চেয়েছিলো, তুমি (আজ) আমার সাথে এমন কোনো আচরণ করো না যা শত্রুদের আনন্দিত করবে, আর তুমি আমাকে কখনো যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না। ১৫১. সে (মূসা) বললো, হে আমার মালিক, আমাকে ও আমার ভাইকে তুমি মাফ করে দাও এবং তুমি আমাদের তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল করে নাও, তুমিই সবচাইতে বড়ো দয়াবান।

রুকু ১৯

১৫২. (আল্লাহ তায়ালা মূসাকে বললেন, হাঁ,) যেসব লোক গরুর বাছুরকে মাবুদ বানিয়েছে, অচিরেই তাদের ওপর তাদের মালিকের পক্ষ থেকে 'গযব' আসবে, আর দুনিয়ার জীবনেও (তাদের ওপর আসবে) অপমান এবং লাঞ্ছনা; আল্লাহ তায়ালার নামে মিথ্যা কথা রটনাকারীদের আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। ১৫৩. যেসব লোক অন্যায় কাজ করেছে, এরপর তারা তাওবা করেছে এবং (যথাযথ) ঈমান এনেছে, নিশ্চয়ই এ (যথার্থ) তাওবার পর তোমার মালিক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (হিসেবে তাদের সাথে আচরণ করবেন)। ১৫৪. পরে যখন মূসার ক্রোধ (কিছুটা) প্রশমিত হলো, তখন সে (তাওরাতের) ফলকগুলো তুলে নিলো, তার পাতায় হেদায়াত ও রহমত (সম্বলিত কথাবার্তা লিখিত) ছিলো এমন সব লোকের জন্যে, যারা তাদের মালিককে ভয় করে।

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ

১৫৫. মূসা তার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে (এবার) সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত সময়ে সমবেত হবার জন্যে বাছাই করে নিলো, যখন এক প্রচন্ড ভূকম্পন এসে তাদের আক্রমণ করলো (তখন) মূসা বললো, হে আমার মালিক, তুমি চাইলে তাদের সবাইকে ও আমাকে আগেই ধ্বংস করে দিতে পারতে; (আজ) আমাদের মধ্যকার কয়েকটি নির্বোধ মানুষ যে আচরণ করেছে, (তার জন্যে) তুমি কি আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে! অথচ এ ব্যাপারটা তোমার একটা পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়; এ (পরীক্ষা) দিয়ে যাকে চাও তাকে তুমি বিপথগামী করো, আবার যাকে চাও তাকে সঠিক পথও তো দেখাও! তুমি হচ্ছো আমাদের অভিভাবক, অতএব তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, আমাদের ওপর তুমি দয়া করো, কেননা তুমিই হচ্ছো সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমার আধার। ১৫৬. তুমি আমাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লিখে দাও, হেদায়াতের জন্যে আমরা তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি; আল্লাহ তায়ালা বললেন (হাঁ), আমার শাস্তি আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই দেই, আর আমার দয়া তো (আসমান-যমীনের) সবকয়টি জিনিসকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে; আমি অবশ্যই তা লিখে দেবো এমন লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, যারা যাকাত আদায় করে, (সর্বোপরি) যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে। ১৫৭. যারা এই বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের অনুসরণ করে চলে- যার উল্লেখ তাদের (কিতাব) তাওরাত ও ইনজীলেও তারা দেখতে পায়, যে (নবী) তাদের ভালো কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, যে তাদের জন্যে যাবতীয় পাক জিনিসকে হালাল ও নাপাক জিনিসসমূহকে তাদের ওপর হারাম ঘোষণা করে, তাদের ঘাড়

الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ِۨ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۞ وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۞ وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا

থেকে (মানুষের গোলামীর) যে বোঝা ছিলো তা সে নামিয়ে দেয় এবং (মানুষের চাপানো) যেসব বন্ধন তাদের গলার ওপর (ঝুলানো) ছিলো তা সে খুলে ফেলে; অতপর যারা তাঁর ওপর ঈমান আনে, যারা তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে, (সর্বোপরি) তার সাথে (কোরআনের) যে আলো পাঠানো হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।

রুকু ২০

১৫৮. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহ তায়ালার রসূল (হিসেবে এসেছি), আল্লাহ তায়ালা যিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, অতএব তোমরা (সেই) মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনো, তাঁর বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের ওপরও তোমরা ঈমান আনো, যে (রসূল নিজেও) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে এবং তোমরা তাঁকে অনুসরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাবে। ১৫৯. মূসার জাতির মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়ও আছে, যারা (অন্যদের) সত্যের পথ দেখায় এবং নিজেরাও সে অনুযায়ী ইনসাফ করে। ১৬০. আমি তাদের বারোটি গোত্রে ভাগ করে তাদের স্বতন্ত্র দলে পরিণত করে দিয়েছি, মূসার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তার কাছে পানি চাইলো, তখন আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, তুমি তোমার হাতের লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো, অতপর তা থেকে বারোটি ঝর্ণাধারা উদ্ভূত হলো; প্রত্যেক দল তাদের (নিজেদের) পানি পান করার স্থান চিনে নিলো; আমি তাদের ওপর মেঘের ছায়াও বিস্তার করে দিলাম, তাদের কাছে 'মান' ও 'সালওয়া' (নামক উৎকৃষ্ট খাবার) পাঠালাম; (তাদের আমি এও বললাম,)

عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۖ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا

رَزَقْنٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾ وَإِذْ قِيْلَ لَهُمُ

اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا

الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓئٰتِكُمْ ۖ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ

الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا

مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾ وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ

حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ إِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ

سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَأْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا

يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ

তোমাদের আমি যেসব পবিত্র জিনিস দান করেছি তা তোমরা খাও; (আমার কৃতজ্ঞতা আদায় না করে) তারা আমার ওপর কোনো যুলুম করেনি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। ১৬১. (সে সময়ের কথাও স্মরণ করো,) যখন তাদের বলা হয়েছিলো, তোমরা এই জনপদে গিয়ে বসবাস করো এবং সেখান থেকে যা কিছু চাও তোমরা আহার করো এবং বলো (হে মালিক), আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আর (যখনি সেই) জনপদের দ্বারপথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে, (তখন) সাজদাবনত অবস্থায় প্রবেশ করবে, আমি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো; আমি অচিরেই উত্তম লোকদের অতিরিক্ত দান করবো।

রুকু ২১

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালেম ছিলো, তারা তাদের যা (করতে) বলা হয়েছিলো তা সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে ভিন্ন কথা বললো, তাই আমিও তাদের এ যুলুমের শাস্তি হিসেবে তাদের ওপর আসমান থেকে আযাব পাঠালাম। ১৬৩. তাদের কাছ থেকে সেই জনপদের কথা জিজ্ঞেস করো, যা ছিলো সাগরের পাড়ে (অবস্থিত)। যখন সেখানকার মানুষরা শনিবারে (আল্লাহ তায়ালার বেঁধে দেয়া) সীমালংঘন করতো, (আসলে) শনিবারেই (সাগরের) মাছগুলো তাদের কাছে উঁচু হয়ে পানির উপরিভাগে (ভেসে) আসতো এবং শনিবার ছাড়া অন্য কোনোদিন তা আসতো না, (বস্তুত) তাদের অবাধ্যতার কারণেই আমি তাদের অনুরূপ পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। ১৬৪. (আরো স্মরণ করো,) যখন তাদের একদল লোক এও বলছিলো, তোমরা এমন একটি দলকে কেন উপদেশ দিতে যাচ্ছো, যাদের আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করতে, অথবা (গুনাহের জন্যে) যাদের কঠোর শাস্তি দিতে যাচ্ছেন, তারা বললো, এটা হচ্ছে তোমাদের মালিকের দরবারে (নিজেদের) একটা ওযর পেশ করা

مَعۡذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ۝ فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦٓ أَنجَيۡنَا ٱلَّذِينَ يَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذۡنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابِۭ بَـِٔيسِۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفۡسُقُونَ ۝ فَلَمَّا عَتَوۡا۟ عَن مَّا نُهُوا۟ عَنۡهُ قُلۡنَا لَهُمۡ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ ۝ وَإِذۡ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبۡعَثَنَّ عَلَيۡهِمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَـٰمَةِ مَن يَسُومُهُمۡ سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلۡعِقَابِۖ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ ۝ وَقَطَّعۡنَـٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أُمَمٗاۖ مِّنۡهُمُ ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنۡهُمۡ دُونَ ذَٰلِكَۖ وَبَلَوۡنَـٰهُم بِٱلۡحَسَنَـٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ۝ فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٞ وَرِثُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ يَأۡخُذُونَ عَرَضَ هَـٰذَا ٱلۡأَدۡنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغۡفَرُ لَنَا وَإِن يَأۡتِهِمۡ عَرَضٞ مِّثۡلُهُۥ يَأۡخُذُوهُۚ

(যে, আমরা উপদেশ দিয়েছি)। হতে পারে, তারা এর ফলে সাবধান হবে। ১৬৫. অতপর যা তাদের (বার বার) স্মরণ করানো হচ্ছিলো তা তারা সম্পূর্ণ ভুলে গেলো, তখন আমি (সে দল থেকে) এমন লোকদের উদ্ধার করলাম, যারা নিজেরা গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকতো, আর কঠিন শাস্তি দিয়ে পাকড়াও করলাম তাদের– যারা যুলুম করেছে, তাদের নিজেদের গুনাহর জন্যে (আমি তাদের আযাব দিয়েছিলাম)। ১৬৬. তাদের যেসব (ঘৃণিত) কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছিলো, যখন তারা তা (ধৃষ্টতার সাথে) করে যাচ্ছিলো, তখন আমি তাদের বললাম, এবার তোমরা সবাই লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। ১৬৭. (স্মরণ করো,) যখন তোমার মালিক (ইহুদীদের উদ্দেশে) ঘোষণা দিলেন, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত এ জাতির ওপর এমন লোকদের (শক্তিধর করে) পাঠাতে থাকবেন, যারা তাদের নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিতে থাকবে; (একথা) নিশ্চিত, তোমার মালিক (যেমন) সত্বর শাস্তি দান করেন, (তেমনি) তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ১৬৮. আমি তাদের দলে দলে বিভক্ত করে যমীনে ছড়িয়ে দিয়েছি, তাদের মধ্যে কিছু নেককার মানুষ (ছিলো), আবার তাদের কিছু (ছিলো) এর চাইতে ভিন্ন ধরনের, ভালো-মন্দ (উভয়) অবস্থার (সম্মুখীন) করে আমি তাদের পরীক্ষা নিয়েছি এ আশায় যে, হয়তো তারা (কখনো হেদায়াতের পথে) প্রত্যাবর্তন করবে। ১৬৯. (কিন্তু) তাদের (অযোগ্য) উত্তরসুরিরা (একের পর এক) এ যমীনে উত্তরাধিকারী হলো, তারা আল্লাহ তায়ালার কেতাবেরও উত্তরাধিকারী হলো, তারা এ দুনিয়ার ধন-সম্পদ করায়ত্ত করে নেয়, (অপরদিকে মূর্খের মতো) বলতে থাকে, আমাদের (শেষ বিচারের দিন) মাফ করে দেয়া হবে, কিন্তু (অর্জিত সম্পদের) অনুরূপ সম্পদ যদি তাদের কাছে এসে পড়ে, তারা সাথে সাথেই তা হস্তগত করে নেয়; (অথচ) তাদের কাছ থেকে আল্লাহ

أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

তায়ালার কেতাবের এ প্রতিশ্রুতি কি নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না! আল্লাহ তায়ালার সেই কেতাবে যা আছে তা তো তারা (নিজেরা বহুবার) অধ্যয়নও করেছে; আর পরকালীন ঘরবাড়ি! (হাঁ) যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের জন্যে তো তাই হচ্ছে উত্তম (নিবাস), তোমরা কি (এ বিষয়টি) অনুধাবন করো না? ১৭০. অপরদিকে যারা আল্লাহর কেতাবকে (কঠোরভাবে) আঁকড়ে ধরে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে (তারা জানে), আমি কখনো সংশোধনকারীদের বিনিময় নষ্ট করি না। ১৭১. যখন আমি তাদের (মাথার) ওপর পাহাড়কে উঁচু করে রেখেছিলাম, মনে হচ্ছিলো তা যেন একটি ছায়া, তারা তো ধরেই নিয়েছিলো, তা বুঝি (এখনি) তাদের ওপর পড়ে যাবে (আমি তাদের বললাম,) তোমাদের আমি (হেদায়াত সম্বলিত) যে কিতাব দিয়েছি তা কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তাতে যা কিছু আছে তা (বার বার) স্মরণ করো, (এর ফলে) আশা করা যায় তোমরা বেঁচে থাকতে পারবে।

তাফসীর

আয়াত ১৩৮-১৭১

এ অংশে মূসা (আ.)-এর কাহিনীর আরেক পর্ব আলোচিত হয়েছে। এ অংশটা তাঁর সাথে তার জাতি বনী ইসরাঈলের আচরণ সম্বলিত। এ সময় আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন, ফেরাউন ও তার দলবলকে ডুবিয়ে মেরেছেন, তাদের যাবতীয় শিল্প, কৃষি ও পৌর কীর্তি এবং সকল স্থাপত্য ধ্বংস করে দিয়েছেন। এখন আর মূসা (আ.)-এর সামনে ফেরাউন ও তার দলবলের সেই দোর্দন্ড প্রতাপ নেই। স্বৈরাচারী শাসকের সাথে লড়াইয়ের অবসান ঘটেছে। কিন্তু তিনি অন্য এক লড়াইর সম্মুখীন। সম্ভবত এ লড়াই আরো কঠিন, আরো নির্মম ও আরো দীর্ঘ মেয়াদী। তিনি 'মানবীয় প্রবৃত্তি বা নাফস'-এর সাথে লড়াইর সম্মুখীন। মানবীয় মনমানসিকতায় পরাধীনতা ও জাহিলিয়াতের যে ক্ষতিকর প্রভাব বিদ্যমান থাকে, তার বিরুদ্ধে লড়াইর সম্মুখীন। এই প্রভাব তাদের স্বভাব-প্রকৃতিকে বিকৃত ও বিপথগামী করে দিয়েছিলো। তাদেরকে একাধারে নিষ্ঠুরতা, কাপুরুষতা, দায়িত্ব হিনতা ও এই সকল অপপ্রবণতার সমষ্টি এক জটিল স্বভাবের মানুষে পরিণত করেছিলো।

বস্তুত দীর্ঘস্থায়ী পরাধীনতা, শোষণ নিপীড়ন ও স্বৈরশাসন মানুষের মন মানসিকতাকে যতোখানি বিনষ্ট ও বিকৃত করে, ততোখানি আর কিছুতেই করে না। অনুরূপভাবে নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পালিয়ে বেড়ানো, ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশে জীবন যাপন এবং সার্বক্ষণিক আতংক ও বিপদাশংকার মধ্যে অন্ধকারে চলাফেরা করার মতো স্বভাব বিনষ্টকারী উপকরণ আর কিছু হতে পারে না।

বনী ইসরাঈল এই নির্যাতন ও নিপীড়নের পরিবেশে, সন্ত্রাস ও আতংকের পরিবেশে এবং ফেরাউনী পৌত্তলিকতায় আক্রান্ত সমাজে দীর্ঘকাল জীবন যাপন করেছে। ফেরাউন যখন তাদের পুরুষদেরকে তাদের সামনে হত্যা করেছে এবং স্ত্রীলোকদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তখনো তারা সেখানে জীবন ধারণ করেছে। আর এহেন পাশবিক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অবসান ঘটার পরও তাদেরকে অবমাননা, লাঞ্ছনা ও নির্বাসনের জীবন যাপন করতে হয়েছে।

এর ফলে তাদের মন মানসিকতা, স্বভাব ও মেযাজ, চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা বিকৃত হয়ে গেছে। তাদের মনে একদিকে কাপুরুষতা, নীচতা ও হীনমন্যতা এবং অপরদিক হিংসা বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতা বাসা বেঁধেছে। এই দুই ধরনের মানসিক প্রবণতা পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সন্ত্রাস ও স্বৈরাচারের অধীনে দীর্ঘদিন জীবন যাপন করলে এগুলোর জন্ম অনিবার্য হয়ে ওঠে।

হযরত ওমর (রা.) আল্লাহর অনুগ্রহে বিশেষ প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। মানুষের হৃদয়ের স্বভাব ও তার গুণবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। তাই তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও কর্মচারীদেরকে উপদেশ দিতেন যে, 'অনাবৃত দেহের ওপর মানুষকে প্রহার করো না। কেননা তাতে তাদেরকে অপমানিত করা হবে।' তিনি জানতেন যে, খালি গায়ে কাউকে পেটালে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয়। তিনি অন্তরের অন্তস্তল দিয়ে উপলব্ধি করতেন যে, আল্লাহর রাজত্বে ও ইসলামী সরকারের অধীনে কোন মানুষ লাঞ্ছিত হোক এটা ইসলামের কাম্য নয়। আল্লাহর রাজত্বে মানুষ সবচেয়ে সম্মানিত সৃষ্টি। তাকে সসম্মানেই রাখা কর্তব্য। তাকে অপমানজনক পন্থায় শাস্তি দেয়া শাসকদের অনুচিত। কেননা তারা শাসকদের গোলাম নয়। তারা শুধু আল্লাহর গোলাম। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর সবার কাছে সে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।

ফেরাউনী স্বৈরাচারের আমলে বনী ইসরাঈলের লোকদেরকে নগ্ন গায়ে প্রহার করে লাঞ্ছিত করা হতো। বরং সত্য বলতে কি, ফেরাউনী শাসনামলে সবচেয়ে কম যে নির্যাতন করা হতো, তা ছিলো নগ্ন দেহের ওপর প্রহার। ফেরাউনী আমলে ও রোমক সাম্রাজ্যের আমলে এই লাঞ্ছনাকর শাস্তি সমানে চালু ছিলো। এ লাঞ্ছনা থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে কেবল ইসলাম। ইসলাম যেদিন মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত ও একমাত্র আল্লাহর বান্দা বলে ঘোষণা করেছিলো, সেই দিনই তাকে সকল অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দিয়েছে। মিসর বিজয়ী ও মিসরের প্রথম মুসলিম শাসক আমর ইবনুল আসের ছেলে যখন জনৈক মিসরীয় কিবতির ছেলেকে প্রহার করলো, তখন কিবতী পিতা তার ছেলের পিঠে পতিত একটা বেত্রাঘাতের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করার জন্যে একটি উটনীর পিঠে চড়ে এক মাস ধরে সফর করে। রোমক শাসনের আমলে কয়েক বছর আগেও কতো বেত্রাঘাত তারা নীরবে হজম করেছে, কে তার ইয়ত্তা রাখে। কিন্তু আজ একটা বেত্রাঘাতও তাদের সহ্য হয়নি। এ ছিলো মিসরীয় কিবতীদের জীবনে এবং সকল মানুষের জীবনে একটা বিপ্লব এবং তাদের অন্তরে ইসলামী উদ্দীপনা সঞ্চারের মোজেযা। এমনকি যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের জন্যেও ইসলাম এই সম্মান নিশ্চিত করেছে। এই মোজেযা মানবাত্মাকে হাজার হাজার বছরের পুরানো লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইসলাম ছাড়া আর কোনো

ধর্ম বা মতবাদ মানুষকে এ অবমাননা থেকে মুক্তি দেয়নি। মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে সাগর পার হবার পর তাদের মন থেকে ফেরাউনী আমলের অবমাননা ও লাঞ্ছনার কু-প্রভাব দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন।

ইহুদীচরিত্রের জঘন্যতম রূপ

হযরত মূসার সেই চেষ্টা সাধনার বিবরণই আলোচ্য অংশে দেয়া হয়েছে । এই চেষ্টা সাধনা শুরু হয়েছে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে হযরত মূসার মিসর থেকে বেরিয়ে যাওয়া ও সমুদ্র পার হওয়ার পর থেকে। কোরআনের এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমরা এই জনগোষ্ঠীর চরিত্রের বিভিন্ন দিকের সাক্ষাত পাই। আমরা দেখতে পাই যে, দীর্ঘ দিনের বদ্ধমূল বিকৃতি, জাহেলিয়াত, পরাধীনতা ও ভ্রষ্টতার কারণে বনী ইসরাঈল আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নেয়ামত– স্বাধীনতা ও হযরত মূসার রেসালতকে তারা অবজ্ঞা ও প্রতিরোধ করেছে।

আমরা দেখতে পাই যে, মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের দীর্ঘ দিনের মজ্জাগত কু-স্বভাবগুলো দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অথচ তারা এই কু-স্বভাবগুলো থেকে মুক্তি লাভ করার ইচ্ছা তো পোষণ করেই না, উপরন্ত এগুলোকে তারা এমন স্বাভাবিক মনে করে নিয়েছে যে, এর কোনো বিকল্প থাকতে পারে বলে তারা ধারণাই করে না।

হযরত মূসার এই চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক দাওয়াতদাতার চেষ্টা সাধনার প্রকৃতি বুঝতে পারি। দীর্ঘদিন ধরে কোনো আল্লাহদ্রোহী স্বৈরশাসকের অধীনে জীবন যাপনের কারণে যখন কোনো জনগোষ্ঠী কোনো খারাপ কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়, বিশেষত দাওয়াত দানকারী যে আদর্শের দিকে আহবান জানায় তা তাদের পরিচিত হওয়া সত্তেও দীর্ঘকাল প্রতিকূল পরিবেশে জীবন যাপনের কারণে তা যখন বিকৃত ও নিস্প্রাণ হয়ে যায়, তখন সেই জনগোষ্ঠীকে সুপথে ফিরিয়ে আনা স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে দ্বিগুণ কষ্টকর হয়ে থাকে। তজ্জন্যে এরূপ ক্ষেত্রে দাওয়াত দানকারীর ধৈর্যের প্রয়োজন হয় দ্বিগুণ। সব রকমের বিকৃতি ও ভ্রষ্টতা, ইতরামি ও গোঁয়ার্তুমি এবং হীনতা, নীচতাকে বরদাশত করতে হয়। প্রতিটি পর্যায়ে এধরনের জনগোষ্ঠীর মাঝে যে অপ্রত্যাশিত নৈতিক অধোপতন দৃষ্টিগোচর হয় এবং উত্তেজনার প্রথম প্রকাশেই জাহেলিয়াতসুলভ চরিত্রের যে প্রতিফলন ঘটে, তাতে তার ধৈর্যধারণ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

মুসলিম জাতির কাছে বনী ইসরাঈলের কাহিনী এতো বিশদভাবে বারংবার বর্ণনা করার পেছনে আল্লাহর যে মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তার একটি দিক হয়তো এটাই। এতে করে তারা হযরত মূসার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। আর যারা যুগে যুগে ইসলামের দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত থাকবে, তাদের জন্যে হয়তো বা এতে মূল্যবান পাথেয় রয়েছে।

আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্রের ওপারে পার করিয়ে নিলাম। তারপর তারা এমন এক জাতির কাছে এলো, যারা তাদের দেবমূর্তিসমূহের সামনে ঝুঁকে বসেছিলো। বনী ইসরাঈলরা বললো, হে মূসা, ওদের যেমন দেবমূর্তি রয়েছে, তেমনি আমাদের জন্যেও কিছু সংখ্যক দেবমূর্তি বানিয়ে দাও। মূসা বললো, তোমরা একটা মূর্খ জাতি। .... (আয়াত ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১)

এ আয়াত কটিতে বনী ইসরাঈলের কাহিনীর সপ্তম দৃশ্য দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ সমুদ্র পার হওয়ার পর বনী ইসরাঈলের আচরণ ও কর্মকাণ্ডের দৃশ্য। হযরত মূসার সংশোধন প্রচেষ্টা ও অমান্যকারী জাতির বিকৃত স্বভাব এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের এই বিকৃত স্বভাব সেই প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। ফেরাউন ও তার তল্পিবাহী জনগোষ্ঠীর পৌত্তলিক ও জাহেলী শাসনের আওতাধীন তারা যে শোচনীয় দুরবস্থায় পতিত হয়েছিলো, সে বেশী দিন আগের কথা

নয়। তাদের নবী ও নেতা হযরত মূসা তাদেরকে সেই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করলেন, বিশ্ব জগতের প্রতিপালক এক ও অদ্বিতীয় সেই আল্লাহর নামে উদ্ধার করলেন, যিনি তাদের শত্রুকে ধ্বংস ও তাদের জন্যে সাগরকে দু' ভাগ করে রাস্তা করে দিলেন, তাদেরকে ভয়াবহ ও লোমহর্ষক অত্যাচার থেকে রক্ষা করলেন এবং মিসর ও তার পৌত্তলিকতা থেকে তাদেরকে বের করে এনেছেন সে বেশী দিন আগের কথা নয়। অথচ যেই তারা সাগর পার হয়ে এসেছে এবং একটা পৌত্তলিক জাতিকে মূর্তিপূজায় নিয়োজিত দেখেছে, অমনি মূসা (আ.)-এর কাছে একটি মূর্তি চেয়ে বসলো যেন নতুন করে তার পূজা করতে পারে। অথচ ইনিই বিশ্ব-প্রভুর প্রেরিত সেই মূসা, যিনি তাদেরকে ইসলাম ও তাওহীদের নামে মিসর থেকে মুক্ত করে বের করে এনেছিলেন।

'আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে আনলাম। তারপর তারা মূর্তিপূজায় রত একটা জাতির কাছে এসে পড়লো। বললো, হে মূসা, ওদের যেমন মূর্তি আছে, তেমনি আমাদের জন্যেও একটা মূর্তি যোগাড় করো।'

ছোঁয়াচে রোগ যেমন দেহকে আক্রান্ত করে, তেমনি আত্মাকেও আক্রান্ত করে। কিন্তু আত্মাকে আক্রান্ত করে তখনই, যখন তা তার যোগ্য হয় এবং সেজন্যে প্রস্তুত হয়। বনী ইসরাঈলের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে কোরআন বিভিন্ন প্রসংগে বিভিন্ন সময়ে যেরূপ বিবরণ দিয়েছে, তাতে বুঝা যায়, তারা সংকল্পে খুব ঢিলে এবং তাদের বিবেক অত্যন্ত দুর্বল ছিলো। গোমরাহীতে লিপ্ত না হয়ে তারা হেদায়াতের পথে আসত না। অধোপতন না হওয়া পর্যন্ত তারা উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতো না। বক্রপথে না গিয়ে তারা সোজা পথে ধাবিত হতো না। উপরন্তু তারা ছিলো নিষ্ঠুর, একগুঁয়ে ও হঠকারী স্বভাবের। সেই স্বভাব তাদের আজও বহাল রয়েছে। ফলে একটি পৌত্তলিক জাতির কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের মূর্তিপূজা একটি বার দেখামাত্রই হযরত মূসার বিশ বছর ব্যাপী তাওহীদের শিক্ষা ভুলে গেলো। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মূসা নবুওত লাভ করার পর সর্ব প্রথম যেদিন ফেরাউন ও তার সভাসদদেরকে দাওয়াত দেন, সেদিন থেকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে আসার দিন পর্যন্ত মিসরে সর্বমোট ২৩ (তেইশ) বছর কাটিয়েছিলেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বনী ইসরাঈল শুধু যে দুই দশকেরও বেশী সময় ধরে একজন নবীর প্রত্যক্ষ তদারকীতে প্রাপ্ত তাওহীদের শিক্ষা ভুলে গেলো তা নয়, বরং যে মুহূর্তে মূসা ও বনী ইসরাঈলকে অলৌকিকভাবে সমুদ্র পার করিয়ে প্রাণে রক্ষা করা হলো এবং ফেরাউন ও তার দলবলকে ধ্বংস করা হলো, সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটিকেও তারা ভুলে গেলো। ধ্বংস হয়ে যাওয়া এই ফেরাউন ও তার জনগোষ্ঠী যে পৌত্তলিক ছিলো এবং এই পৌত্তলিকতার নামেই যে, তারা বনী ইসরাঈলকে পরাধীন করে রেখেছিলো তাতো বলারই অপেক্ষা রাখে না। সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ হলো ফেরাউনের সভাসদ কর্তৃক ফেরাউনকে এই বলে মূসা ও বনী ইসরাঈলের ওপর উস্কে দেয়ার চেষ্টা করা যে, 'আপনি কি মূসা ও তার অনুসারীদেরকে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি এবং আপনাকে ও আপনার দেব দেবীকে বর্জন করার অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে দেবেন?' অথচ এসব কিছুকে বেমালুম ভুলে গিয়ে তারা খোদ বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত রসূলের কাছেই দাবী জানাতে লাগলো যেন তিনি স্বয়ং তাদেরকে মূর্তি যোগাড় করে দেন। এটা না করে তারা নিজেরা যদি মূর্তি যোগাড় করে নিতো, তাহলেও সেটা এতো বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হতো না। বোধ হয়, বনী ইসরাঈল বলেই তারা এতোটা বেয়াড়া।

তাদের এই অত্যাশ্চর্য দাবী শুনে মূসা (আ.) স্বাভাবিকভাবেই রেগে যান। কেননা তিনি আল্লাহর একজন নবী, আর তারই জাতি কিনা আল্লাহর সাথে শরীক করে তাঁর একত্বের ওপর আগ্রাসন চালানোর ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে! তাই তিনি উপযুক্ত ভাষায়ই মন্তব্য করলেন,

'নিশ্চয় তোমরা মূর্খ জাতি।'

কোন্ ব্যাপারে তারা মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে, সেটা তিনি উল্লেখ করেননি, যাতে তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতা যে সর্বব্যাপী, তা বুঝা যায়। আরবীতে 'জাহল' বা 'জাহালাত্' শব্দ দুটো দ্বারা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা এই দুই-ই বুঝানো হয়ে থাকে। আর এখানে শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার চরম অবস্থা ও সর্বোচ্চ মাত্রাই বুঝায়। এ দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, পথভ্রষ্ট হয়ে তাওহীদ থেকে শেরকের দিকে ধাবিত হওয়ার পেছনে অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা দুটোই দায়ী। জ্ঞান ও বুদ্ধি মানুষকে আল্লাহর একত্বের পথেই টেনে নিয়ে যায়। জ্ঞান ও বুদ্ধি কাউকে তাওহীদ ছাড়া অন্য কোনো দিকে টেনে নেয় না।

জ্ঞান ও বুদ্ধি যখন মহাবিশ্বের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন তার সমস্ত নিদর্শন ও প্রতীক একজন স্রষ্টা ও পরিচালকের অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং সেই স্রষ্টা ও পরিচালকের একত্ব নির্দেশ করে। পরিকল্পনা ও পরিচালনা- এই দুটো জিনিসই প্রাকৃতিক বিশ্বের সমস্ত নিদর্শনে ও নিয়ম কানুনে সুস্পষ্ট। আর একত্বের লক্ষণটাও প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীতে সুস্পষ্ট, যা সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা গবেষণা করলেই ধরা পড়ে। অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকেরা ছাড়া কেউ এই চিন্তা গবেষণা এড়িয়ে চলে না, চাই তারা যতোই জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার দাবিদার হোক না কেন। বস্তুত এ ধরনের অসার দাবীদারের সংখ্যাও কম নয়।

মূসা (আ.) শুধু 'তোমরা মূর্খ' বলে রাগ ঝেড়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তাদের দাবীর মধ্য দিয়ে তারা যে চরম অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যে জাতিটাকে তারা মূর্তিপূজা করতে দেখেই তাদের অনুসরণ করার আবদার জুড়ে দিয়েছে, তাদের পরিণাম অত্যন্ত খারাপ এ কথা বলার মাধ্যমেই বনী ইসরাঈলের নির্বুদ্ধিতা ও অপরিণামদর্শিতা ধরিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

'এরা যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছে, তা ধ্বংসশীল এবং এদের কার্যকলাপ বাতিল।'

অর্থাৎ শেরক, মূর্তিপূজা, শেরক ভিত্তিক জীবনাচার, অসংখ্য দেবদেবী, মন্দির ও পুরোহিত- এই সবের সমষ্টির ভিত্তিতে দেশ শাসনকারী শাসকমন্ডলী এবং এই তাওহীদভ্রষ্টতা থেকে সৃষ্ট আদর্শিক বিকৃতি ও সামষ্টিক জীবনের বিকৃতি- এই সবই ধ্বংসশীল ও বাতিল। অন্য সব ধ্বংসশীল ও বাতিল ব্যবস্থার পরিণাম যা হয়ে থাকে, এদের সমাজ ব্যবস্থার পরিণামও তাই হতে বাধ্য।

বনী ইসরাঈলের মধ্যে পৌত্তলিকতার মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠায় আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণে মূসা (আ.)-এর প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও ক্রোধ এবং এই জাতি কর্তৃক আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য নেয়ামতের কথা ভুলে যাওয়ায় মূসার (আ.)-এর বিস্ময় তাঁর পরবর্তী উক্তিতে অধিকতর তীব্র ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে,

'তিনি বললেন, তোমাদের জন্যে আমি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য উপাস্য খুঁজে দেবো, এ কেমন কথা? অথচ তিনি তোমাদেরকে সারা বিশ্বের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।'

অন্যান্য মোশরেক জাতির মধ্য থেকে শুধু বনী ইসরাঈলকে তাওহীদ প্রচারের জন্যে নির্বাচন করাই সে যুগের সারা বিশ্বের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার শামিল। এর চেয়ে বড় এবং এর সমান শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুগ্রহ আর কিছু হতে পারে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এ জন্যেও নির্বাচন করেছেন যে, তাদেরকে পবিত্র ভূমির উত্তরাধিকারী করবেন, যা তখনো পর্যন্ত

মোশরেকদের দখলে ছিলো। এতো সব কিছুর পরও তারা কিভাবে তাদের নবীর কাছে মূর্তি চায়? অথচ আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপার মধ্যেই তাদের সার্বক্ষণিক অবস্থান।

আল্লাহর বক্তব্যের সাথে আল্লাহর প্রিয়জনদের বক্তব্য সংযুক্তভাবে পেশ করার যে রীতি কোরআনে অনুসৃত হয়ে আসছে, সেই অনুসারে পরবর্তী আয়াতে মূসা (আ.)-এর বক্তব্যের পাশাপাশি আল্লাহর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, যাতে হযরত মূসার জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে।

'আর যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের অনুসারীদের কবল থেকে মুক্ত করলাম, যারা তোমাদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালাচ্ছিলো, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করছিলো এবং তোমাদের নারীদেরকে বাঁচিয়ে রাখছিলো। আর এসব কিছুতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষা রয়েছে।' (আয়াত ১৪১)

কোরআন আল্লাহর বক্তব্যকে ও আল্লাহর প্রিয়জনদের বক্তব্যকে এভাবে সংযুক্তভাবে পেশ করার মধ্য দিয়ে যে এই প্রিয়জনদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এখানে বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ তায়ালা নিজের যে অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তা তখনো তাদের মনে ছিলো এবং স্নায়ুতন্ত্রী দিয়ে তারা তা অনুভবও করছিলো। আল্লাহর এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে যদিও তাদেরকে নতুন করিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিলো না, তথাপি ওই পরীক্ষাগুলোতে যে শিক্ষা রয়েছে, সেদিকে তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্যেই তিনি তা নতুন করে স্মরণ করাচ্ছেন। নিকট অতীতে বনী ইসরাঈলকে দু'ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে, নির্যাতনের মাধ্যমে এবং নির্যাতন থেকে উদ্ধারের মাধ্যমে। প্রথমটি দুঃখের পরীক্ষা এবং দ্বিতীয়টি সুখের পরীক্ষা। সেই দুই ধরনের পরীক্ষার কোনোটাই অপরিকল্পিত ছিলো না, বরং তা ছিলো উপদেশ দান ও স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে, বাছাই করা ও প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে এবং কঠোর শাস্তি দেয়ার আগে অবকাশ দেয়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। পরীক্ষা যদি তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে সফল না হয়, তাহলেই কেবল শাস্তি দেয়া হবে— এই ছিলো আল্লাহর পরিকল্পনা।

আল্লাহর সাথে মূসা (আ.)-এর সাক্ষাত

এই পর্যায়ে এসে মূসা (আ.) ও তার জাতির মধ্যকার দৃশ্যটির সমাপ্তি ঘটে। যাতে তার পরবর্তী দৃশ্যটি শুরু হয়। সেটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্যে মূসা (আ.)-এর প্রস্তুতির দৃশ্য। সেই সাথে পার্থিব জীবনে তিনি যে নযিরবিহীন ঘটনার সম্মুখীন হতে যাচ্ছিলেন, তার জন্যে তার প্রস্তুতি এবং আল্লাহর সাথে তার সেই সাক্ষাতকারে যাওয়ার আগে তার ভাই হারুন (আ.)-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করাটাও এই দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

'আমি মূসার জন্যে ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করেছিলাম। অতপর তাকে আরো দশ রাত্রি দ্বারা পূর্ণ করেছিলাম। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতে পূর্ণ হয়। ..... (আয়াত ১৪২)

মূসা (আ.) যে দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তার প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সহযোগীদের লাঞ্ছনা, অপমান, নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করা এবং তাদেরকে পরাধীনতা ও স্বৈরাচারের কবল থেকে উদ্ধার করে পবিত্র ভূমিতে নিয়ে যাওয়ার পথে উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে পৌছানোর পর্বটা শেষ হয়েছে। কিন্তু বনী ইসরাঈল তখনো আল্লাহর বিধান অনুসারে দেশ শাসন তথা খেলাফতের বৃহত্তম কাজটার প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ লাভ করেনি। উপরন্তু আমরা দেখেছি, একটা জাতিকে মূর্তি পূজায় লিপ্ত দেখা মাত্রই

কিভাবে তাদের মন মূর্তিপূজা ও শেরকের দিকে ধাবিত হলো এবং মাত্র অল্প কদিন আগে তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করা সত্তেও কিভাবে তাদের তাওহীদ বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে গেলো। তাই এ জাতিকে প্রশিক্ষণ দানের জন্যে এবং তাদেরকে তাদের ভবিষ্যত গুরুদায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যে একখানা বিস্তারিত গ্রন্থের প্রয়োজন দেখা দিলো। এই গ্রন্থ প্রদানের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দা মূসা (আ.)-এর জন্যে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করেন, যাতে তিনি এই সাক্ষাতের সময় প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। এই সাক্ষাতকার স্বয়ং মূসা (স.)-কে তার গুরুদায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারবে।

এই প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ পর্বের মেয়াদ ছিলো প্রাথমিকভাবে ত্রিশটি রাত এবং পরে তার ওপর আরো দশরাত বাড়িয়ে দেয়া হয়। এভাবে তার মেয়াদ সাকল্যে চল্লিশ রাত হয়। এই সময়ে মূসা (আ.) প্রতিশ্রুত সাক্ষাতকারের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবেন, পার্থিব জীবনের সকল ব্যস্ততা পরিত্যাগ করে আল্লাহর নির্দেশাবলী গ্রহণের কাজে সর্বাত্মকভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন, গোটা সৃষ্টি জগত থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মহান স্রষ্টার আনুগত্যে নিরংকুশভাবে নিয়োজিত হতে পারবেন। তার আত্মা পবিত্র, স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হবে এবং প্রতিশ্রুত দায়িত্ব বহনে তার মন জোরদার হবে। মূসা (আ.) তার জাতির কাছ থেকে সাময়িকভাবে বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে নিজের ভাই হারুনকে এই বলে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন যে,

'তুমি আমার জাতির জন্যে আমার স্থলাভিষিক্ত হও, তাদেরকে সংশোধন করতে থেকো এবং অসৎ ও নৈরাজ্যবাদীদের পদাংক অনুসরণ করো না।'

মূসা যদিও জানতেন যে, হারুন তার সহযোগী একজন নবী, তথাপি এ কথা বলার কারণ এই যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের হিতাকাংখী হবে, এটাই তার স্বভাবসুলভ কর্তব্য। এক মুসলমানের জন্যে অপর মুসলমানের হিতকামী হওয়া শুধু অধিকার নয় বরং কর্তব্যও। এরপর মূসা (আ.) উপলব্ধি করেন যে, স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দায়িত্ব কতো কঠিন, বিশেষত, তিনি তার জাতির স্বভাব জানতেন। হারুন তার উপদেশ গ্রহণ করলেন। এ উপদেশকে তিনি কোনো ঝামেলা মনে করেননি। একে ঝামেলা মনে করে কেবল অসৎ লোকেরা। কেননা এটা তাদের কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রিত করে। সদুপদেশকে সেই সব অহংকারী লোক বোঝা মনে করে, যারা আসলে নীচ ও ক্ষুদ্র। তারা মনে করে অন্যের সদুপদেশ গ্রহণ করলে নিজের মর্যাদাহানি ঘটে। আসল নীচাশয় মানুষ হলো সেই, যে নিজের বড়ত্ব জাহির করার জন্যে অন্যের সাহায্যের হাতও সরিয়ে দেয়।

এরপর আসে ত্রিশ রাতের প্রসংগ। ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মূসার জন্যে ত্রিশ রাত নির্ধারণ করেছেন। তাফসীরকাররা বলেন যে, এই দিনগুলো মূসা রোযা রাখেন ও অভুক্ত থাকেন। যখন এই মেয়াদ পূর্ণ হলো, তখন তিনি একটি গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করলেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাকে নির্দেশ দিলেন যেন আরো দশ রাত যোগ করে চল্লিশ রাত পূর্ণ করেন।'

এরপর কোরআন নবম দৃশ্য তুলে ধরে। এটা একটা অতুলনীয় দৃশ্য, যা আল্লাহ তায়ালা কেবল মূসা (স.)-এর জন্যেই নির্দিষ্ট করেছিলেন। এটি হলো আল্লাহর সাথে তাঁর এক বান্দার সরাসরি কথোপথনের দৃশ্য। অন্য কথায় বলা যায়, একটি সীমাবদ্ধ নশ্বর কণার অনাদি ও অনন্ত সত্ত্বার সাথে মিলিত হওয়ার দৃশ্য। মহান স্রষ্টার কাছ থেকে একজন মানুষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে কোনো উপদেশ গ্রহণ এই পৃথিবীতে একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। আমরা জানি না এটা

কিভাবে হয়েছিলো। আমরা জানি না আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দা মূসার সাথে কিভাবে কথা বলেছিলেন। জানিনা কোনো অংগ বা যন্ত্র দ্বারা মূসা (আ.) আল্লাহর কথাগুলো শুনেছিলেন। পৃথিবীতে আমাদের সীমাবদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা এ কাজটা অসম্ভব বলেই আমাদের মনে হয়। তবে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত আত্মার সূক্ষ্ম অনুভূতি শক্তিদ্বারা আমরা এটা কিঞ্চিৎ অনুভব করতে পারি।

আর যখন মূসা আমার নির্ধারিত মেয়াদের জন্যে এলো এবং তার সাথে তার প্রতিপালক কথা বললেন, তখন সে বললো, হে আমার প্রতিপালক, তোমাকে দর্শন করার ক্ষমতা আমাকে দাও, আমি যেনো তোমাকে দেখি। তিনি বললেন, তুমি কখনো আমাকে দেখতে পাবে না। তবে পাহাড়ের ওপর তাকাও। পাহাড়টা যদি যথাস্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতপর যখনই তার প্রতিপালক পাহাড়ের ওপর নিজের আলো বিকিরণ করলেন, অমনি তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন এবং মূসা বেহুশ হয়ে পড়ে গেলো। অতপর তার হুশ ফিরে এলে বললো, আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনার কাছে তাওবা করছি এবং আমি প্রথম মোমেন ....' (আয়াত ১৪৩-১৪৭)

আমাদের সমগ্র সত্ত্বায়, স্নায়ুমন্ডলে ও কল্পনায় সেই বিরল ঘটনার দৃশ্য উপস্থিত করা প্রয়োজন, যাতে করে আমরা তার কল্পনার কাছাকাছি পৌঁছতে পারি এবং মূসা (আ.)-এর অনুভূতিকে কিঞ্চিৎ অনুভব করতে পারি।

'যখন মূসা আমার নির্ধারিত সময়ে এলো এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বললো, হে আমার প্রতিপালক, তোমাকে দেখবার ক্ষমতা আমাকে দাও, আমি তোমাকে দেখবো। ......'

মূসা (আ.) যখন আল্লাহর কথা সরাসরি শুনছিলেন, তখন এক চেতনা হরণকারী মুহূর্ত ছিলো। তার আত্মা ছিলো তখন স্বচ্ছতা, নৈকট্য ও আগ্রহের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। তাই তিনি নিজের প্রকৃত পরিচয় ভুলে যান যে, তিনি কী বা কে। তাই তিনি এমন কিছু চেয়ে বসেন যা পৃথিবীতে কখনো কোনো মানুষ পায় না এবং অর্জনে সক্ষম হয় না। বাসনা, আগ্রহ, ভালোবাসা ও আগ্রহের আতিশয্যে তিনি আল্লাহর দর্শন প্রার্থনা করেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে চূড়ান্তভাবে বলে দেন,

'তুমি কখনো আমাকে দেখবে না।'

পরক্ষণেই আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হন এবং তাকে জানিয়ে দেন কোন কারণে তিনি তাঁকে দেখতে পারবে না। তাঁর সে ক্ষমতাই নেই।

'তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও। পাহাড় যদি স্বস্থানে স্থির থাকে, তবে আমাকে তুমি দেখতে পাবে।'

পাহাড় হচ্ছে সবচেয়ে মযবুত ও স্থিতিশীল জিনিস। কিন্তু তবু পাহাড় মানুষের চেয়ে কম প্রভাব গ্রহণকারী ও কম সাড়া দানকারী। তথাপি কী ঘটলো?

'অতপর যখন তার প্রভু পাহাড়ের ওপর আলো বিকিরণ করলেন'

কিভাবে বিকিরণ করলেন, সেটা বর্ণনা তো দূরে থাক, আমরা তা উপলব্ধি করতেও অক্ষম। যে সূক্ষ্মতম অনুভূতি আমাদেরকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে তা দিয়ে আমরা এ ঘটনাটা শুধু কল্পনা করতে পারি। আমাদের আত্মা স্বচ্ছ হলে এবং সামগ্রিকভাবে তা তার উৎসমুখী হলে এটা কল্পনা করা দুঃসাধ্য থাকে না। তবে কেবল শব্দ দ্বারা এ সম্পর্কে কিছুই বুঝানো সম্ভব নয়। তাই

শব্দ দিয়ে এই বিকিরণের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করবো না। আর এর ব্যাখ্যা প্রসংগে যেসকল রেওয়ায়াত রয়েছে, তা আমাদের প্রত্যাখ্যান করাই সমীচীন। কেননা তার কোনোটা খোদ রসূল (স.) থেকে বর্ণিত নয়। আর কোরআন তো এ সম্পর্কে আমাদেরকে কিছুই বলে না।

'যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ের ওপর আলো বিকিরণ করলেন, অমনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। ......'

পাহাড়ের উচুঁ স্থানগুলো দেবে নীচু হয়ে যাওয়ায় মনে হতে লাগলো যেন তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে। ফলে মূসা (আ.) আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং তার দুর্বল মানবীয় সত্তাটি আরো দুর্বল হয়ে গেলো!

'এবং মূসা বেহুশ হয়ে পড়ে গেলো।' অর্থাৎ তিনি অজ্ঞান ও অচেতন হয়ে পড়লেন।

'অতপর যখন হুশ ফিরে পেলো'।

অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হলেন, নিজের শক্তির দৌড় কতদূর তা বুঝতে পারলেন এবং তিনি যে আল্লাহকে দর্শন করতে চেয়ে নিজের সামর্থের সীমা অতিক্রম করেছেন, তা উপলব্ধি করলেন, তখন-

'মূসা বললো, 'তুমি পবিত্র' অর্থাৎ তুমি চর্মচক্ষুর দর্শন থেকে মুক্ত ও তার উর্ধে। 'আমি তোমার কাছে তাওবা করছি।'

অর্থাৎ নিজের 'সাধ্যাতীত জিনিস চেয়ে আমি যে সীমা অতিক্রম করেছি, তা থেকে তাওবা করছি। 'এবং আমি প্রথম মোমেন।'

নবী রসূলরা সব সময় আল্লাহর মহত্ত্ব ও মর্যাদায় এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁদের কাছে যে ওহী নাযিল করেন, তাতে সর্বাগ্রে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন। উপরন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এই বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করতে আদেশ দেন এবং কোরআনের বিভিন্ন স্থানে তাদের এই ঘোষণা প্রকাশও করা হয়।

এরপর মূসা (আ.) পুনরায় আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেন। তাঁর কাছ থেকে এই মর্মে সুসংবাদ লাভ করেন যে, বনী ইসরাঈলের মুক্তির পর তাদের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছানোর জন্যে তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে তাদের মুক্তির জন্যে তাকে ফেরাউন ও তার সহযোগীদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিলো। এ প্রসংগেই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

'তিনি বললেন, হে মূসা, আমি তোমাকে সকল মানুষের কাছে আমার বার্তা পৌঁছানো ও আমার সাথে কথা বলার জন্যে মনোনীত করেছি। অতএব আমি যা তোমাকে দিয়েছি তা গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।' (আয়াত ১৪৪)

মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহর উচ্চারিত 'আমি তোমাকে সকল মানুষের কাছে আমার বার্তা পৌঁছানো ও আমার সাথে কথা বলার জন্যে মনোনীত করেছি' এ কথাটার মর্ম আমরা এটাই বুঝি যে, তিনি 'সকল মানুষ' বলতে তাঁর সময়কার সকল মানুষকেই বুঝিয়েছেন। কেননা হযরত মূসার আগে ও পরে বহু নবী-রসূল এসেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে এটা স্পষ্ট যে, মানব জাতির একটি প্রজন্মের জন্যে তিনি রসূল হিসাবে মনোনীত ছিলেন। তবে কথা বলা অর্থাৎ সরাসরি বাক্যালাপের সুযোগটা তিনি একাই পেয়েছিলেন। আর আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বিধানকে গ্রহণ করা তথা সযত্নে সংরক্ষণ করা এবং এই বিধান ও রসূল হিসাবে মনোনয়ন লাভের জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ দানের অর্থ হলো, জনগণকে ওই বিধান শিক্ষাদান ও তদনুসারে নির্দেশ দিতে তাঁকে আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা আল্লাহর এই নেয়ামতের যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতা এভাবেই

আদায় করা সম্ভব। আল্লাহর রসূলরা মানুষের নেতা ও আদর্শ হয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে মানুষের জন্যে অনেক অনুকরণীয় ও শিক্ষণীয় বিষয় থাকে। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা যে বিধান দেন, তাকে কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করা সকল সমকালীন মানুষের কর্তব্য, যাতে আল্লাহর নেয়ামত আরো বৃদ্ধি পায়, অন্তরাত্মা সংশোধিত হয়, অহংকার ও দাম্ভিকতা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

তাওরাতের ঐশীবিধান

এরপর ১৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সেই বিধানে কী কী ছিলো এবং তা কিভবে মূসাকে দেয়া হয়েছিলো।

'আমি ফলকগুলোতে তার জন্যে সকল বিষয়ে উপদেশ এবং সকল ব্যাপারে বিস্তারিত বিধান লিখে দিয়েছি।'

বিভিন্ন বর্ণনায় ও বিভিন্ন মোফাসসেরের তাফসীরে এই ফলকগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেকে এগুলোর এমন বিবরণ দিয়েছেন যা দেখে মনে হয় ওগুলো ইসরাঈলী জনশ্রুতি থেকে সংকলিত, যা অসাবধানতাবশত তাফসীরে ঢুকে পড়েছে। এগুলোর মধ্যে রসূল (স.)-এর কাছ থেকে উদ্ধৃত কোনো উক্তিই পাওয়া যায় না। তাই আমি শুধু কোরআনের নির্ভুল উক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো। এর বাইরে যাবো না। ফলকগুলো কী ধরনের, সে সম্পর্কে ওই সব বর্ণনায় উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। আর ওগুলো কী এবং কিভাবে লেখা হয়েছে, তা আমাদের জানবার প্রয়োজনও নেই। কেননা কোরআনের আয়াতে ও বিশুদ্ধ হাদীসে সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। আসল গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো ফলকগুলোতে যা লেখা ছিলো। নবী ও রসূলের প্রচারযোগ্য বিষয় ও নবী রসূলের আগমনের উদ্দেশ্য তথা আল্লাহর বিধান বা শরীয়ত এবং মানব জাতির সংস্কার ও সংশোধনের জন্যে প্রদত্ত নির্দেশাবলীই ওই ফলকগুলোতে লিখিত ছিলো। পরাধীনতার গ্লানি ও দীর্ঘস্থায়ী বিভ্রান্তিতে লিপ্ত একটি জাতির জন্যে এগুলো ছিলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

'অতএব এগুলোকে শক্তভাবে ধারণ করো এবং তোমার জাতিকে আদেশ দাও যেন তারা এগুলোর মধ্য থেকে যা উত্তম তাই গ্রহণ করে।'

এখানে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ.)-কে তাওরাতের ফলকগুলো দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং ওই ফলকগুলোতে তাদের ওপর যে কঠিন দায়িত্বগুলো অর্পণ করা হয়েছে তাকে তাদের জন্যে উত্তম ও উপকারী আখ্যায়িত করে তা গ্রহণ করার আদেশ দিচ্ছেন। আদেশ দানের এই ভংগি থেকে একদিকে যেমন প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পরাধীনতা ও দীর্ঘদিন ব্যাপী আল্লাহর বিধান পালনের অনভ্যস্ততা হেতু ইসরাঈলীদের মধ্যে সৃষ্ট নিষ্ক্রীয়তা দূর করে তাদেরকে রেসালাত ও খেলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য করে গড়ে তুলতে এরূপ দৃঢ় ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিলো, অপরদিকে এ দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, প্রত্যেক জাতির পক্ষেই তার কাছে আল্লাহর কাছ থেকে আগত আকীদা বিশ্বাসকে গ্রহণ করা ও মেনে নেয়া অপরিহার্য।

ইসলামী আকীদা বিশ্বাস আল্লাহর কাছে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আল্লাহর পরিকল্পনার দৃষ্টিকোণ থেকে, 'মানব জাতির' ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তার ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকেও তা গুরুত্বপূর্ণ। আর আল্লাহর একত্বে তথা মানব জাতি যে শুধু তাঁরই দাস এবং একমাত্র তিনিই যে মানব জাতির প্রভু প্রতিপালক ও সর্বময় কর্তা এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করলে সেই বিশ্বাস থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে যে বিধানের উদ্ভব ঘটে, তা গোটা মানব জীবনে সর্বাত্মক পরিবর্তন আনে এবং এই জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলে, যা

কোনোক্রমেই জাহেলী জীবনের মতো হয় না। কেননা জাহেলী জীবনে আল্লাহর একক প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব চলে না, চলে অন্যের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব। জাহেলী জীবনে সর্বত্র আল্লাহর বিধানের আধিপত্য চলে না – চলে অন্যান্য বিধানের আধিপত্য।

আল্লাহর দৃষ্টিতে এবং বিশ্ব প্রকৃতি-পার্থিব জীবন ও মানবেতিহাসে যে জিনিসের এতো গুরুত্ব তাকে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করা যথাযথগুরুত্বের সাথে মেনে চলা যে অত্যন্ত জরুরী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহর এ বিধান মানুষের মনেও যেন যথাযথ গুরুত্ব ও স্পষ্টতা সহকারে বিরাজ করে এটাও নিশ্চিত করা জরুরী। আল্লাহর এ বিধানকে ঢিলেমি, অলসতা ও উদাসীনতার সাথে গ্রহণ করা কোনোক্রমেই শোভনীয় নয়। কেননা একে তো এ বিধান স্বভাবতই গুরুত্বপূর্ণ, তদুপরি এর আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোও খুব কঠিন। যাদের মেযাজ ও স্বভাব প্রকৃতিতে উদাসীনতা, ঢিলেমি ও দুর্বলতা ও আপোষকামিতা থাকে,তারা এই সব দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয় না।

তবে এর অর্থ স্বভাবতই হিংস্রতা, হঠকারিতা, একগুঁয়েমি, ও উগ্রতা প্রদর্শন করা নয়। কেননা এগুলো আল্লাহর দ্বীনের স্বভাবসুলভ উপাদান নয়। দৃঢ়তা ও কঠোরতার অর্থ হলো সাহসিকতা, আপোষহীনতা, স্পষ্টবাদিতা আর এ গুণগুলো হিংস্রতা, হঠকারিতা, একগুঁয়েমি ও উগ্রতার সমার্থক নয়।

দীর্ঘকাল মিসরে পরাধীনতা ও গোলামীর জীবন যাপনের দরুন বনী ইসরাঈলের স্বভাব বিকৃত হয়ে যাওয়ায় তাদের জন্যে এ ধরনের নির্দেশ দানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। এজন্যে আমরা দেখতে পাই যে, বনী ইসরাঈলের প্রতি যে নির্দেশই এসেছে, তা এ ধরনের কঠোরতা সহকারেই এসেছে, যাতে করে তাদের উদাসীন, ঢিলে, অলস ও বিকৃত স্বভাবকে স্পষ্ট, দৃঢ়, সঠিক ও সহজ সরল স্বভাবে রূপান্তরিত করা যায়।

অন্যান্য যে সব জাতি বনী ইসরাঈলের মতো দীর্ঘস্থায়ী পরাধীনতা ও গোলামীর জীবন যাপন এবং সন্ত্রাস ও স্বৈরশাসনের কবলে জীবন যাপন হেতু চারিত্রিক বিকৃতির শিকার হয়েছে এবং যাদের মধ্যে পরিশ্রম এড়িয়ে সহজ কাজ করার মানসিকতা গড়ে উঠেছে, তারাও বনী ইসরাঈলেরই মতো। আমাদের যুগের বহু মানব গোষ্ঠীকে আমরা এরূপ অবস্থার শিকার দেখতে পাচ্ছি। তারা ইসলামী আকীদা বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কেননা এতে যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য ঘাড়ে চাপে, তা থেকে তারা নিরাপদে থাকতে চায়। তারা আদর্শহীন জীবন যাপনে আগ্রহী। কেননা এতে কোনো দায় দায়িত্ব বহন করতে হয় না। বরং স্বেচ্ছাচারপূর্ণ ও লাগামহীনভাবে জীবন যাপন করা যায়।

এভাবে দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর বিধানকে ধারণ করার বিনিময়ে মূসা ও তাঁর জাতিকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করা ও আল্লাহর অবাধ্য লোকদের পরিত্যক্ত ভূমির উত্তরাধিকারী করার ওয়াদা করেছেন। আয়াতের শেষাংশে একথাই বলা হয়েছে এভাবে,

'তোমাদেরকে ফাসেকদের আবাসভূমি দেখাবো।'

খুব সম্ভবত এখানে বাইতুল মাকদেসের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে, যা সে সময়ে পৌত্তলিকদের দখলে ছিলো। সম্ভবত এখানে বাইতুল মাকদেসে দখল লাভের সুসংবাদই দেয়া হয়েছে। অবশ্য বনী ইসরাঈল হযরত মূসার জীবদ্দশায় সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। কেননা তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক সংশোধনের কাজটি তখনো সম্পূর্ণ হয়নি এবং তাদের স্বভাবের বক্রতা তখনো দূরীভূত হয়নি। তাই তারা পবিত্র ভূমি বাইতুল মাকদেসে সামনে দাঁড়িয়ে তাদের নবীকে বলেছিলো, 'হে মূসা, ওখানে প্রবল ক্ষমতাশালী লোকেরা রয়েছে। তারা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত

আমরা প্রবেশ করবো না। তারা বেরিয়ে গেলে আমরা অবশ্যই প্রবেশ করবো।' অতপর তাদেরকে যখন দু'জন খোদাভীরু মোমেন বান্দা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে অনুরোধ করলো, তখন তারা কাপুরুষের মত ধৃষ্টতা দেখিয়ে বললো, 'আমরা কখনো ওই শহরে প্রবেশ করবো না যতোক্ষণ তারা ওখানে আছে। অতএব তুমি ও তোমার খোদা গিয়ে লড়াই করো। আমরা এখানে বসে রইলাম।' এই বাক্যালাপ থেকে বুঝা যায়, তাদের স্বভাব চরিত্র কতখানি বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো এবং মূসা (আ.)-এর শরীয়ত তাদেরকে সংশোধন করার কাজে কিভাবে ব্যাপৃত ছিলো। এ থেকে শক্তভাবে আল্লাহর বিধানকে ধারণ করা ও নিজ জাতিকে শরীয়তের দায় দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দানের জন্যে আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসাকে কেন আদেশ দিয়েছেন, তাও বুঝা যায়।

অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি

এরপরের আয়াতে দাম্ভিকসুলভ আচরণকারী ও আল্লাহর নিদর্শন ও নির্দেশাবলী লংঘনকারীদের ভয়াবহ পরিণতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই সাথে এই শ্রেণীর লোকদের চরিত্রের একটা নিখুঁত ছবি অংকন করা হয়েছে, যা মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোরআনের অনুপম শৈল্পিক বর্ণনার একটা দৃষ্টান্ত।

'আমি অচিরেই সেই সব লোককে আমার নিদর্শনাবলী থেকে দূরে হটিয়ে দেব যারা পৃথিবীতে বিনা অধিকারে অহংকার করে, তারা যে নিদর্শনই দেখুক, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, সততা ও ন্যায়ের পথ দেখলে সে পথ অবলম্বন করে না, আর বক্রতা ও বিভ্রান্তির পথ দেখলে সে পথ অবলম্বন করে। ....' (আয়াত ১৪৬-১৪৭)

আল্লাহ তায়ালা এখানে সেই সব লোক সম্পর্কে নিজের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন, যারা বিনা অধিকারে পৃথিবীতে অহংকার করে, সৎ পথ দেখলেও তা অবলম্বন করে না এবং খারাপ পথ দেখলেই তা অবলম্বন করে। এদের সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি তাদেরকে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগতে বিরাজমান তাঁর নিদর্শনসমূহ ও তাঁর রসূলদের ওপর নাযিল করা কেতাবের আয়াতসমূহ থেকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবেন। ফলে তারা তা দ্বারা উপকৃতও হবে না, সেগুলোকে মেনেও নেবে না। কারণ তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে এবং সেগুলোর প্রতি উদাসীন থেকেছে।

কোরআনের ভাষায় এই শ্রেণীর মানুষদেরকে এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যেন তাদের চিহ্ন ও চালচলনের মধ্য দিয়ে আমরা তাদেরকে দেখতে পাই। 'যারা পৃথিবীতে বিনা অধিকারে অহংকার করে।'

আসলে পৃথিবীতে আল্লাহর যে বান্দাই অহংকার করে, সে বিনা অধিকারেই তা করে। কেননা অহংকার হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। এতে তিনি কাউকে শরীক হিসাবে গ্রহণ করেন না। যখনই কোনো মানুষ পৃথিবীতে অহংকার করে, সে একটা অনধিকার চর্চাই করে। আর সবচেয়ে জঘন্য অহংকার হলো আল্লাহর বান্দাদের ওপর প্রভুত্বের দাবীদার হওয়া, সেই দাবী বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বান্দাদের জন্যে আল্লাহর অনুমোদন ছাড়াই আইন রচনা করা এবং সেই অবৈধ আইনের আনুগত্য করতে মানুষকে বাধ্য করা। এই অহংকার থেকে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের অহংকার জন্ম নেয়। তাই মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব তথা মানুষের রচিত আইন অনুসারে মানুষের জীবন পরিচালিত হওয়াই হলো সকল অন্যায় ও অকল্যাণের উৎস। এখান থেকেই অন্যান্য লক্ষণগুলোও জন্ম নেয়। যথা,

'যদি সততার পথ দেখে তবে তা অবলম্বন করে না, যদি গোমরাহীর পথ দেখে, তবে তা অবলম্বন করে।

অর্থাৎ তাদের স্বভাবটাই এমন হয়ে গেছে যে, সততা ও ন্যায়ের পথ যেখানেই চোখে পড়ুক, তা থেকে তারা দূরে সরে যায় এবং বিভ্রান্তির পথ যেখানেই দেখুক, তা গ্রহণ করে। যেন একটা যান্ত্রিক ব্যাপারে, এর মিশ্রণে যেন কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। এই হচ্ছে সেই লক্ষণ, যা দ্বারা কোরআনে তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই অহংকারী শ্রেণীটিকে বিশেষিত করা হয়েছে। এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি তাদেরকে তাদের ইচ্ছাকৃত প্রত্যাখ্যান ও গাফলতির শাস্তি স্বরূপ চিরদিনের জন্যে এ সব নিদর্শন ও আয়াত থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবেন।

এ ধরনের মানুষের সাথে কমবেশ সবারই সাক্ষাত ঘটে থাকে। সে দেখতে পায় যেন সে বিনা চিন্তায় বিনা পরিকল্পনায় বিনা কষ্টে ও বিনা চেষ্টায় সৎ পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সে সৎ পথ থেকে যেন অন্ধ থেকে যাচ্ছে এবং বক্রতা ও গোমরাহীর পথটা খুব ভালোভাবে চিনে নিতে পারছে। সেই সাথে সে যেন আল্লাহর নিদর্শনাবলী থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত। ফলে সে এগুলোকে দেখতেই পায় না, দেখলেও চিনতে পারে না এবং এর ইংগিত ও তাৎপর্য ও উপলব্ধি করে না।

কী আশ্চর্য! কোরআনের বিস্ময়কর বর্ণনায় সৃষ্টির এই নমুনাটি এতো স্পষ্ট হয়ে আবির্ভূত হয় যে, পাঠক যেন স্বগতভাবেই বলে ওঠে, 'আমি সৃষ্টির এই শ্রেণীটিকে চিনি। সে তো অমুক।' এই কথাগুলোতে যে গুণবৈশিষ্টের উল্লেখ রয়েছে, তা তার মধ্যে যথার্থই রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির এই শ্রেণীটিকে যখন দুনিয়া ও আখেরাতে চরম শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেন, তখন তিনি মোটেই যুলুম করেন না। কেননা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলীকে যে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, অবহেলা করে, পৃথিবীতে বিনা অধিকারে অহংকার করে, সত্য ও ন্যায়ের পথ যেখানেই দেখে, তা এড়িয়ে চলে এবং যেখানেই খারাপ ও বিভ্রান্তির পথ দেখতে পায়, সেই দিকে ছুটে যায়, তার জন্যে এ শাস্তি অত্যন্ত ন্যায়সংগত। সে তার কাজের উপযুক্ত ফলই পায় এবং নিজের কর্মের দোষেই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

১৪৭ নং আয়াতে 'হাবেতাত্ আ'মালুহুম' কথাটার অর্থ হলো তাদের সমস্ত কাজ অর্থাৎ সৎ কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। 'হাবেতাত্' শব্দটি 'হুবুত' ধাতু থেকে নির্গত, যার মূল অর্থ হলো বিষাক্ত ঘাস খেয়ে উটের পেট ফেঁপে মরা। বাতিলের চরিত্রের সাথে এই শব্দের ধাতুগত অর্থের মিল রয়েছে। আল্লাহর আয়াত ও আখেরাতকে যারা অবিশ্বাস করে, বাতিলকে তারাই আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। আর এই বাতিল তাদের আস্কারা পেয়ে এতো ফুলে ফেঁপে ওঠে যে, সবাই তাকে যথার্থ শক্তি ও মর্যাদার প্রতীক মনে করে। তারপর বিষাক্ত ঘাস খাওয়া উটের মতোই বাতিল এক সময় নিশেষ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অবিশ্বাসীদের করা সৎ কাজ বিনষ্ট হয়ে যাওয়াও শাস্তি হিসাবে ন্যায়সংগত। তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এই কাজ কিভাবে বিনষ্ট হয়ে থাকে।

আকীদাগতভাবে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর প্রতিটি হুমকিই অকাট্য সত্য, চাই তাঁর বাহ্যিক আচরণ এই অনিবার্য পরিণতির যতোই বিপরীত মনে হোক না কেন। সুতরাং যখন কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার এবং আখেরাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি অস্বীকার করবে, তখন তার সমস্ত সৎকর্ম বাতিল ও বিফল হয়ে যাবে এবং তা চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অপরদিকে তাত্ত্বিকভাবে দেখলে আমরা মানব জীবনে এর সুস্পষ্ট কারণ দেখতে পাই। যে মানুষটি বিশ্ব প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা, নবীদের নবুওতের মাধ্যমে প্রকাশিত অথবা নবীদের সাথে করে আনা নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ও আখেরাতের জীবনকে অস্বীকার করে, সে এক বিকারগ্রস্ত প্রাণী। আল্লাহর প্রতি নিখাদ বিশ্বাসী এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী এই বিশ্ব প্রকৃতি ও তার নিয়ম কানুনের সাথে এই বিকারগ্রস্ত ও ভ্রষ্ট প্রাণীর সকল সংযোগ ও সংস্রব ছিন্ন হয়ে যায়। মহাবিশ্বের সাথে তার কোনো সংযোগ থাকে না। আর এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে উপনীত হওয়া নিশ্চিত করে এমন সকল তৎপরতা ও তার প্রেরণা থেকে সে বঞ্চিত থাকে। তাই এই বিকারগ্রস্ত সংযোগহীন প্রাণীর সব কাজ ব্যর্থ ও বিনষ্ট হতে বাধ্য, যদিও বাহ্যত মনে হয় যে, তা সফল। কেননা বিশ্ব জগতের ভিত্তিমূলের গভীরে যে প্রেরণা ও চেতনা সক্রিয় রয়েছে, তার কোনো কাজ সেই চেতনা ও প্রেরণা থেকে উৎসারিত নয় এবং গোটা বিশ্বের যে বৃহত্তর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, (সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি) তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তা নয়। তার অবস্থা মূল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন ঝর্ণা বা নদীর মতো। আজ হোক বা কাল হোক, তা একদিন শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাবেই।

মানবেতিহাসের গতিধারার সাথে ঈমানী মূল্যবোধের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যারা দেখতে বা বুঝতে চেষ্টা করে না এবং এই মূল্যবোধ অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যারা উদাসীন, তারাই সেই সব হতভাগা মানুষ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে, তাদেরকে তিনি তাঁর নিদর্শনাবলী ও প্রাকৃতিক রীতিনীতির উপলব্ধি থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন। আল্লাহর ফয়সালা তাদের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবার অপেক্ষায় রয়েছে। অথচ তারা সে সম্পর্কে অচেতন।

দুনিয়ার সীমিত ক্ষুদ্র জীবনে স্থূল দৃষ্টিতে উক্ত ঈমানী মূল্যবোধ সম্পর্কে উদাসীন ও আস্থাহীন লোকদের সাফল্য ও সুখ-সমৃদ্ধি দেখে যারা প্রতারণার শিকার হয়, তারা বিষাক্ত ঘাস খাওয়া প্রাণীর স্ফীত মোটা দেহ দেখে তাকে তার সুস্থতা ও সুখের আলামত ভেবে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। অথচ এই স্ফীতির শেষ ফল হলো অবধারিত ধ্বংস।

অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো এর জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে আছে। কিন্তু তাদের স্থলাভিষিক্তরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম ও তাঁর অদৃষ্ট ফয়সালা যে সচল ও সক্রিয় রয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা যে তাদেরকে চার দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন, তা তারা বুঝতেই চায় না।

ইহুদীদের গোবৎস পূজার ঘটনা

মূসা (আ.) যখন আল্লাহর সান্নিধ্যে আলাপরত এবং এমন এক সাক্ষাতকারে নিয়োজিত, যা চর্মচক্ষু দিয়ে নয় বরং কেবলমাত্র অন্তরচক্ষু দিয়ে দেখা যায় ও চিন্তাশক্তি দিয়ে নয় বরং কেবল অন্তরাত্মা দিয়ে উপলব্ধি করা যায়, তখন মূসা (আ.)-এর অনুসারীরা তার এত দিনের শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে বাছুরের মূর্তি বানিয়ে আল্লাহর বিকল্প উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে তার পূজা শুরু করে দেয়। এই পর্যায়ে কোরআন আমাদেরকে আকস্মিকভাবে নবম দৃশ্য থেকে দশম দৃশ্যে স্থানান্তরিত করে। আর এটি আকাশ থেকে পাতালে স্থানান্তর করার মত ঘটনা।

'মূসার সম্প্রদায় তাঁর অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদি দ্বারা এমন একটা বাছুরের মূর্তি বানিয়ে নিলো, যা থেকে হাম্বা হাম্বা শব্দ বেরুচ্ছিলো। তারা কি এও লক্ষ্য করলো না যে, সে বাছুরের মূর্তিটা তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোনো পথও দেখাচ্ছে না। তারা

একেবারেই অন্যায়ভাবে এই মূর্তিটা বানালো। অতপর যখন তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো এবং বুঝতে পারলো যে, তারা সত্যিই গোমরাহ হয়ে গেছে .....' (আয়াত ১৪৮-১৪৯)

ক্রমাগত ভুল করতে করতে একেবারে বিপথগামী হয়ে গিয়ে তারপর অনুতাপ ও অনুশোচনা করা, সক্রিয়ভাবে রসূলের নেতৃত্ব থেকে ক্ষণেকের জন্যেও বঞ্চিত হলে অমনি বিপথে ধাবিত হওয়া এবং রসূলের উপস্থিতিতেও স্থূল দৃষ্টির ঊর্ধে উঠে ঈমানী ও আকীদাগত প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ন্যায়ের পথে চলতে না পারা- এ সবই ছিলো বনী ইসরাঈলীদের মজ্জাগত স্বভাব।

ইতিপূর্বে হযরত মূসা (আ.) তাদের সাথে উপস্থিত থাকা অবস্থাতেই ক্ষণেকের জন্যে একটি পৌত্তলিক জাতির মূর্তিপূজা দেখে তারা এতোই বেসামাল হয়ে গিয়েছিলো যে, তাদের নবীর কাছে একটা মূর্তি তৈরী দেয়ার জন্যে আবদার জুড়ে দেয়। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করে তা থেকে বিরত রেখেছিলেন। অতপর তারা যখন কিছু সময়ের জন্যে নবীর সাহচর্য থেকে মুক্ত হলো এবং সামেরী নামক এক বিভ্রান্ত ব্যক্তির বানানো একটা স্বর্ণময় বাছুরের মূর্তি হাতে পেলো, আর তাকে সে এমনভাবে তৈরী করেছিলো যে তা থেকে হাম্বা হাম্বা শব্দও বেরুচ্ছিলো, তখন আর যায় কোথায়! সেই বাছুরের মূর্তির ওপর তারা প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়লো। আয়াতে 'জাসাদ' অর্থাৎ দেহ বা মূর্তি শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, ওটা ছিলো একটা প্রাণহীন মূর্তি মাত্র। এই মূর্তি নির্মাণকারী সামেরী ছিলো সামেরার আশ্বাসী। তার সম্পর্কে সূরা তা-হা-য় বিশদ বিবরণ আসছে। সামেরী মূর্তিটা বানিয়ে বনী ইসরাঈলীদেরকে বলেছিলো, 'এটি তোমাদেরও খোদা এবং মূসারও খোদা' যার সাথে সাক্ষাতের জন্যে মূসা রওনা হয়ে গেছে, কিন্তু মূসা এই সাক্ষাতের দিনক্ষণ ভুলে গেছে। সম্ভবত মেয়াদের ত্রিশ দিনের ওপর আরো দশদিন যুক্ত হওয়ার কারণে এমনটি হয়ে থাকবে। কেননা বনী ইসরাঈলের এই দশদিন বৃদ্ধির খবর জানা ছিলো না। ত্রিশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন মূসা ফিরলেন না, তখন কুচক্রী সামেরী তাদেরকে বললো, 'মূসার যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন ধার্য ছিলো তা সে ভুলে হয়তো অন্য কোথাও চলে গেছে। তাই আল্লাহ তায়ালা এখানে চলে এসেছেন। এই যে সেই আল্লাহ।' সামেরীর এই কথা তারা বিশ্বাস করলো। অথচ তাদের নবী যে ইতিপূর্বে তাদেরকে এতো করে বলেছেন যে, তোমরা সব সময় সেই আল্লাহর এবাদাত করবে, যাকে চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না এবং যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক, সে কথা তারা একেবারেই ভুলে গেলো। শুধু তাই নয়, তাদেরই একজন অর্থাৎ সামেরীর তৈরী করা এই বাছুর কেমন বস্তু তাও তারা লক্ষ্য করলো না। আসলে বনী ইসরাঈল ছিলো এমন একটি মানবগোষ্ঠীর নমুনা, যার ওপর কোরআন বিস্ময় প্রকাশ করছে এবং মক্কার পৌত্তলিকদের সামনে তাদের সেই নমুনা পেশ করে বলছে,

'তারা কি লক্ষ্য করলো না যে ওই বাছুর তাদের সাথে কথাও বলে না এবং তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা একেবারেই যুলুম ও অবিচারমূলকভাবে সেটিকে গ্রহণ করেছিলো।'

বস্তুত মানুষের ও মানুষের তৈরী করা সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, এ কথা জেনেও যে ব্যক্তি মানুষের হাতে গড়া কোনো জিনিসের পূজা করে তার চেয়ে যালেম ও অবিচারকারী আর কে হতে পারে?

মূসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিকালে তাদের মধ্যে হযরত হারুন (আ.) উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাদেরকে এই জঘন্য গোমরাহী থেকে তিনি ফেরাতে পারেননি। তাদের মধ্যে বেশ কিছু বুদ্ধিমান লোকও ছিলো। কিন্তু তারাও এই অপকর্ম ঠেকাতে পারেনি। সম্ভবত বনী ইসরাঈলের আসল খোদা যে স্বর্ণ, সেই স্বর্ণের তৈরী বলেই এই মূর্তির প্রতি তাদের এমন অদম্য আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো।

অবশেষে এক সময় আবেগ প্রশমিত, প্রকৃত সত্য উদঘাটিত, নির্বুদ্ধিতার স্বরূপ উন্মোচিত, বিভ্রান্তির স্বরূপ প্রকাশিত এবং অনুতাপ ও অনুশোচনা সমাগত হলো।

'যখন তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো এবং বুঝতে পারলো যে, তারা বিপথগামী হয়েছে, তখন তারা বললো, 'আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের ওপর দয়া না করেন ও ক্ষমা না করেন, তাহলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।' (আয়াত ১৪৯)

মূল আয়াতে 'সুকেতা ফী আইদীহিম' কথাটা রয়েছে, যার অর্থ হলো, 'যখন তারা বুঝতে পারলো যে তারা যা করেছে তার কোনো যুক্তি নেই।'

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার জন্যে বনী ইসরাঈলের আকুতি থেকে বুঝা যায় যে, তখনো পর্যন্ত তাদের মধ্যে কিছুটা সৎ প্রবৃত্তি অবশিষ্ট ছিলো। তখনো পর্যন্ত তাদের হৃদয় 'পাথরের মতো বা তার চেয়ে বেশী পাষাণ' হয়নি, যা আল্লাহ তায়ালা তাদের পরবর্তী একটি স্তরে তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত তাদের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহর চেয়ে বেশী কেউ অবহিত নয়। আয়াতের মর্ম এই যে, যখন তাদের ভ্রষ্টতা তাদের কাছে স্পষ্ট হলো এবং তারা বুঝলো যে, তাদের এই অপকর্মের পরিণতি থেকে তাদেরকে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা ছাড়া আর কোনো কিছু নিস্কৃতি দিতে পারে না, তখন তারা দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করলো। এটা প্রমাণ করে যে, তখনো তাদের সৎ ও ন্যায়ের পথে চলার যোগ্যতা অবশিষ্ট ছিলো।

বনী ইসরাঈলের এই বিপথগামিতা যখন চলছিলো, তখন মূসা (আ.) ছিলেন আল্লাহর সাথে বাক্যালাপে লিপ্ত। আল্লাহ তায়ালা না জানালে তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিলো না যে, তাঁর জাতি তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন্ নতুন বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছে।

এই পর্যায়ে কোরআন ত্রয়োদশ দৃশ্যটি উন্মোচন করে,

'যখন মূসা ক্রোধান্বিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে তার জাতির কাছে ফিরে এলো, তখন বললো, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কেমন নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বই না করলে! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ থেকেও কি তাড়াহুড়ো করে ফেললে? অতপর মূসা ফলকগুলো (তাওরাত লেখা) ফেলে দিলো এবং নিজের ভাইয়ের চুল টেনে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলো। সে বললো, হে আমার মায়ের ছেলে, জনগণ আমাকে দুর্বল মনে করেছিলো এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো .... (আয়াত ১৫০. ১৫১)

অর্থাৎ মূসা অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। তার ক্রোধের মাত্রা তার কথা ও কাজ দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছিলো। তার জাতিকে তার বলা এই কথাটা দ্বারা তার ক্রোধের মাত্রা প্রকাশ পাচ্ছিলো যে,

'তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে আমার কেমন নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বই না করলে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের ব্যাপারেও তাড়াহুড়ো করে ফেললে?

তার ভাই হারুনকে তিনি যখন মাথার চুল ধরে টানছিলেন এবং তিরস্কার করছিলেন, তখন তাঁর এই কাজ দ্বারাও তার ক্রোধের মাত্রা প্রকাশ পাচ্ছিল। 'সে তার মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টানলো।'

মূসা (আ.)-এর এই ক্রোধের যুক্তিসংগত কারণও ছিলো। কেননা তাদের এই আকস্মিক অপকর্মটি ছিলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের এবং ঈমান থেকে তার দূরত্ব ছিলো অনেক বেশী।

'তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে আমার কেমন নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বই না করলে!' অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখে গেলাম, আর তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে

গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে গেলে। আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহর এবাদাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখে গেলাম, আর আমি চলে যাওয়ার পর তোমরা একটা বাছুরের মূর্তির পূজা করতে লেগে গেলে!

'তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ থেকেও তাড়াহুড়া করে ফেললে?'

এর দু'রকম অর্থ হতে পারে, (১) আল্লাহর ফয়সালা ও শাস্তিকে ত্বরান্বিত করার জন্যে তাঁর আদেশ লংঘন করলে? (২) আল্লাহর সাথে আমার আলাপ-আলোচনার যে সময় ও মেয়াদকাল নির্দিষ্ট ছিলো, তা শেষ হবার আগেই তাড়াহুড়ো করে এ অপকর্মটা করে ফেললে এবং আমার ফিরে আসার অপেক্ষাও করলে না?

'(মূসা) ফলকগুলো ফেলে দিলো এবং নিজের ভাই এর চুল ধরে নিজের দিকে টানলো।'

মূসা (আ.)-এর এ কাজটি তার ক্রোধের তীব্রতা প্রকাশ করে। কেননা এই ফলকগুলোতে আল্লাহর বাণী লেখা ছিলো। তাই ক্রোধে দিশাহারা হয়ে যাওয়া ছাড়া এই ফলকগুলোকে তিনি ফেলে দিতে পারেন না। অনুরূপভাবে তিনি নিজের ভাইয়ের চুল ধরে টানলেন। অথচ তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও পুণ্যবান বান্দা হারুন (আ.)।

ওদিকে হারুন (আ.) মূসা (আ.)-এর অন্তরে ভ্রাতৃসুলভ স্নেহমমতা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন, যাতে তার রাগ প্রশমিত হয়, তার প্রকৃত অবস্থান কী ছিলো তা মূসা (আ.)-এর কাছে স্পষ্ট করা যায় এবং তিনি যে মূসার অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলকে সুপথে চালিত করা ও সদুপদেশ দেয়ার কোনো কসুর করেননি তা তাঁকে অবহিত করা যায়।

'হারুন বললো, হে আমার মায়ের পুত্র, জনগণ আমাকে দুর্বল মনে করেছিলো এবং হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো।'

এখানে থেকে আমরা বুঝতে পারি বনী ইসরাঈলীরা বাছুরের স্বর্ণমূর্তির আকর্ষণে এতো দূর উন্মত্ত হয়ে পড়েছিলো যে, তারা হারুন যখন তাদেরকে মূর্তিপূজা ও ধ্বংসের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাঁকে হত্যা করতেও উদ্যত হয়েছিলো।

'হে আমার মায়ের ছেলে!' সম্বোধনটি কতো মিনতিভরা ও স্নেহমমতার উদ্রেককারী ছিলো তা সহজেই অনুমেয়।

আর 'জনগণ আমাকে দুর্বল মনে করেছিলো ও হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো' এ কথাটা তার অবস্থার সঠিক চিত্র তুলে ধরেছে।

'সুতরাং তুমি আমার ওপর আর শত্রুদের হাসিও না।'

এখানে উপহাসরত শত্রুদের উপস্থিতিতে মূসা (আ.)-এর ভ্রাতৃসুলভ আবেগ ও স্নেহময় মানসিকতাকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে হারুনের আরেকটি প্রয়াস লক্ষণীয় ঃ

'আর আমাকে যালেম জাতির অন্তর্ভুক্ত গণ্য করো না।'

অর্থাৎ আমাকে কুফরী ও গোমরাহীতে লিপ্ত বনী ইসরাঈলের দলভুক্ত গণ্য করো না। কারণ আমি তাদের সাথে কুফরী ও গোমরাহীতে শরীক হইনি। আমি তাদের অপকর্মের দায়মুক্ত।

এবারে মূসা এ সব বিবরণ শুনে শান্ত হলেন, আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং নিজের জন্যে ও নিজের ভাই-এর জন্যে সর্বোচ্চ দয়াশীলের কাছে দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করলেন।

'মূসা বললো, হে আমার প্রভু, আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উভয়কে তোমার দয়ার অন্তর্ভুক্ত করো। তুমি তো সবচেয়ে দয়াশীল।' (আয়াত ১৫২)

এই পর্যায়ে এসে মহান আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা ঘোষিত হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা নিজের বান্দা মূসার বক্তব্যের অব্যবহিত পর নিজের বক্তব্য দিচ্ছেন, যেমনটি কোরআনে বার বার দিয়ে থাকেন,

'নিশ্চয় যারা বাছুরের মূর্তিকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছে, পার্থিব জীবনেই তাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ ও লাঞ্ছনা নেমে আসবে ....' (আয়াত ১৫৩, ১৫৪)

এ আয়াত দুটিতে আল্লাহর ফয়সালা ও প্রতিশ্রুতি দুটোই রয়েছে। যে জাতি বাছুরের মূর্তি উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাদের ওপর যেমন ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আসবে, তেমনি যারা গুনাহ করার পর তওবা করে, তাদেরকে আল্লাহ নিজ দয়া গুণে ক্ষমা করেন। এটা তাঁর চিরন্তন রীতি। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যারা বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়েছিলো, তারা তাওবা করবে না এবং তারা ওই চিরস্থায়ী রীতি দ্বারা উপকৃত হতে না পারে এমন কাজ করবে– এ কথা আল্লাহ তায়ালা জানতেন। বাস্তবে হয়েছিলোও তাই। বনী ইসরাঈল ক্রমাগত পাপের পর পাপ করেই যাচ্ছিলো এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমার পর ক্ষমাই করে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর চিরন্তন ক্রোধ ও অভিশাপের শিকার হলো।

'এভাবেই আমি আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।'

অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত যতোবার আল্লাহর ওপর অপবাদ আরোপ করা হতে থাকবে, চাই বনী ইসরাঈল করুক বা অন্য কেউ করুক, তার এই শাস্তিই বিহিত হতে থাকবে।

আর আল্লাহর সকল প্রতিশ্রুতিই অকাট্য সত্য। তিনি বাছুর পূজারীদের জন্যে তাঁর ক্রোধ ও লাঞ্ছনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাদের জন্যে আল্লাহর সর্বশেষ প্রতিশ্রুতি ছিলো যে, তিনি তাদের ওপর নিকৃষ্টতম অত্যাচারী শাসক চাপিয়ে দেবেন। এ কথা যদিও সত্য যে, ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে আজ ইসরাঈলী জাতি পৃথিবীতে দোর্দন্ড প্রতাপের অধিকারী হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সমাজে তারা বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছে, যাকে তালমুদে 'গোয়েম' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তারা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য, তথ্য ও প্রচার মাধ্যম সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছে। তারা দেশে দেশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যা তাদের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার উপযোগী, তারা আল্লাহর কিছু কিছু বান্দাকে তাদের দেশে লাঞ্ছিত করে এবং কতককে দেশ থেকে বিতাড়িত করে, আর সত্যভ্রষ্ট জাতিগুলো তাদেরকে সমর্থন করে এবং আরো অনেক অনাচার আমরা আমাদের যুগে প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু এ দ্বারা এ কথা বুঝায় না যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের বিরুদ্ধে যে সব হুমকি উচ্চারণ করেছেন, তা রদ হয়ে গেছে এবং তাদের জন্যে পৃথিবীতে যে অভিশাপ আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা মাফ হয়ে গেছে। তারা তাদের এ সব কর্মকান্ড দ্বারা মানুষের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ পুঞ্জীভূত করছে এবং তাদের ধ্বংসের উপকরণ স্বরূপ মানুষের ক্ষোভ ও আক্রোশ ধূমায়িত করছে। ফিলিস্তীনের মতো দেশে তারা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চালাতে পারছে শুধু এজন্যে যে, তারা ইসলামের ওপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি এবং তারা আবার খাঁটি মুসলমান হয়নি। দুনিয়ার মুসলমানরা বিভিন্ন রকমের বর্ণ, বংশ ও জাতীয়তার পতাকাতলে সমবেত হয়ে পরস্পর থেকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, ইসলামী আকীদা ও আদর্শের পতাকার নীচে সমবেত হতে পারেনি আজও। এজন্যে তারা ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছে এবং ইসরাঈল তাদেরকে একটু একটু করে ধ্বংস করছে। তবে এ অবস্থাটা কোনোক্রমেই চিরস্থায়ী হবে না। একক সামরিক নেতৃত্ব, একক আদর্শিক নেতৃত্ব এবং একক পতাকা– এগুলোর সাহায্যেই মুসলমানরা হাজার বছর ব্যাপী বিজয় অর্জন করে এসেছে। আজ এই ক'টি জিনিসের অনুপস্থিতিই তাদের একমাত্র সমস্যা। এগুলোই চিরদিন তাদের বিজয় নিশ্চিত করেছে এবং এগুলোর অভাব তাদের পরাজয়কে অনিবার্য করে থাকে। আর এ অভাবটা ঘটিয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টানরাই মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরে বিভেদের বিষময়

বীজ বপন করার মাধ্যমে। আর এ বিভেদ যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, সে জন্যে তারা মুসলিম উম্মাহর মাঝেই এর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তবে এ পরিস্থিতি কোনো মতেই চিরস্থায়ী হবে না। এই অভাব থেকেই তাদের চৈতন্যোদয় হবে। যে হাতিয়ার নিয়ে মুসলমানদের পূর্ববর্তীরা বিজয়ী হয়েছিলো, পরবর্তীরা অচিরেই সেই হাতিয়ার সংগ্রহ করবে। এটাও বিচিত্র নয় যে, গোটা মানব জাতিই ইহুদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। এভাবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর হুমকি বাস্তবায়িত হতে পারে এবং আল্লাহর নির্ধারিত লাঞ্ছনা ও অপমান তাদের ওপর নেমে আসতে পারে। আর সমগ্র মানব জাতি যদি রুখে নাও দাঁড়ায়, তবে মুসলমানরা একদিন রুখে দাঁড়াবেই– এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।

চলতি একাদশ দৃশ্যের মাঝখানে এটি ছিলো বাছুরপূজারী ও আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের পরিণতি সংক্রান্ত একটি মন্তব্য। এরপর পরবর্তী আয়াত থেকে পুনরায় এ দৃশ্যটির বর্ণনা দেয়া শুরু হয়েছে।

'যখন মূসার রাগ প্রশমিত হলো, তখন ফলকগুলো তুলে নিল। ওগুলোতে যা কিছু লেখা ছিলো তাতে ছিলো সেই লোকদের জন্যে পথনির্দেশিকা ও অনুগ্রহ, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁকে ভয় করে।' (আয়াত ১৫৪)

কোরআনের বাচনভংগি এখানে ক্রোধকে একজন জীবন্ত ব্যক্তির রূপ দিয়েছে। যেন এই জীবন্ত ব্যক্তি তার ওপর চড়াও হয়েছিলো এবং তাকে চালিত ও প্ররোচিত করছিলো। অবশেষে যখন সে 'শান্ত' হলো এবং মূসাকে একলা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো, তখন মূসা নিজেকে সামলে নিলেন এবং নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেলেন। তাই ইতিপূর্বে রাগের বশে তিনি যে ফলকগুলো ফেলে দিয়েছিলেন, সেগুলো তুলে নিলেন। এরপর কোরআন পুনরায় বলছে যে, এই ফলকগুলোতে হেদায়াতের বাণী লেখা ছিলো এবং আল্লাহর রহমত ছিলো। এই রহমত ও হেদায়াত ছিলো তাদের জন্যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে। তাই তাদের মন হেদায়াত লাভের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং তারা রহমত লাভ করে। হেদায়াত স্বয়ং একটা রহমত। হেদায়াতের আলো থেকে বঞ্চিত বিপথগামী হৃদয়ের চেয়ে হতভাগা হৃদয় আর নেই। আর হেদায়াত ও বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত উদভ্রান্ত আত্মার মতো হতভাগা আত্মা আর নেই। আল্লাহর ভয়ই হচ্ছে মানুষের মনকে হেদায়াতের জন্যে উন্মুক্ত করার একমাত্র চাবি, তাকে উদাসীনতা ও স্থবিরতা থেকে মুক্ত করার একমাত্র হাতিয়ার এবং ঈমানের দাওয়াত গ্রহণ ও ঈমানের ওপর অবিচল থাকার শক্তির একমাত্র উৎস। হৃদয়ের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাই এই সত্যের ঘোষক। যিনি হৃদয়ের স্রষ্টা ও প্রতিপালক, হৃদয়ের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশী আর কেউ অবহিত হতে পারে না।

৭০ জনের মনোনয়ন ও তার রহস্য

এরপর আমরা এই কাহিনীর দ্বাদশ দৃশ্যের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। যাতে মূসা (আ.) কর্তৃক আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকারে মিলিত হওয়ার জন্যে ৭০ জন লোককে নির্বাচনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'মূসা তার জাতির মধ্য থেকে সত্তর ব্যক্তিকে মনোনীত করলো আমার প্রতিশ্রুত সময়ের জন্যে। তারপর যখন তারা ভূমিকম্পের কবলে পড়লো, তখন মূসা বললো, হে আমার প্রভু! তুমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ও আমাকে এর আগেই ধ্বংস করে দিতে পারতে। আমার সম্প্রদায়ের কিছু নির্বোধ লোকের অপকর্মের জন্যে কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? এ সবই তোমার পরীক্ষা। এ দ্বারা তুমি যাকে চাও বিপথগামী করো এবং যাকে চাও সঠিক পথে রাখো। তুমি আমাদের রক্ষক।

কাজেই তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো ও আমাদের ওপর দয়া করো। তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী ...... (আয়াত ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭)

এই সাক্ষাতকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। খুব সম্ভবত এটি তওবা ঘোষণা এবং বনী ইসরাঈল যে কুফরী ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো তা থেকে তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হয়েছিলো। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের এই সব পাপাচারের কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়েছিলো। যারা আল্লাহর অনুগত, তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিলো অবাধ্য ও পাপাচারীদেরকে হত্যা করতে। আল্লাহর পরবর্তী নির্দেশের মাধ্যমে হত্যা বন্ধ না করা পর্যন্ত এই হত্যাকান্ড অব্যাহত ছিলো। তাদের কাফফারা গৃহীত হয়েছিলো। নির্বাচিত এই সত্তর জন ছিলেন বনী ইসরাঈলের প্রবীণতম ও সর্বাপেক্ষা সৎ লোক অথবা বনী ইসরাঈলের প্রতিনিধি।

এ সবের পরেও এই নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ কি ধরনের কান্ডকারখানা করলেন লক্ষ্য করুন। তাদের ওপর প্রবল ভূমিকম্প এলো এবং তারা বেহুশ হয়ে গেলেন। কারণ তারা মূসা (আ.)-এর কাছে দাবী জানিয়েছিলেন যে, তাদেরকে যেন আল্লাহকে সরাসরি দেখানো হয়, যাতে তারা ফলকগুলোতে লিখিত আল্লাহর হুকুমগুলো সত্য কিনা তা আল্লাহর কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন। ভালো মন্দ নির্বিশেষে বনী ইসরাঈলের সবারই স্বভাব এরূপ ছিলো। এ ব্যাপারে মাত্রাভেদ ছাড়া আর কোনো পার্থক্য তাদের মধ্যে ছিলো না।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, তারা তাদের অতীত পাপের জন্যে তওবা করতে ও ক্ষমা চাইতে গিয়েও এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবী করতে ইতস্তত বোধ করেনি।

অন্যদিকে মূসা (আ.) আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও অনুগ্রহ চাইলেন এবং নিজের আনুগত্য ও আল্লাহর অসীম ক্ষমতার স্বীকৃতি দিলেন।

'যখন তারা ভূমিকম্পের কবলে পড়লো, তখন মূসা বললো, হে আমার প্রতিপালক, তুমি ইচ্ছে করলে ইতিপূর্বেই আমাকে ও ওদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতে।'

এ উক্তিটার মধ্য দিয়ে মূসা (আ.) মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কাছে নিজের আত্মসমর্পণেরই স্বীকৃতি দিলেন, অতপর তার জাতির ওপর থেকে তাঁর গযব ও বিপদ মুসিবত দূর করার অনুরোধ জানালেন এবং কতিপয় নির্বোধ লোকের অপকর্মের দায়ে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে না দেয়ার আবেদন জানালেন,

'তুমি কি আমাদের কতিপয় নির্বোধের অপকর্মের দায়ে আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে?'

এখানে প্রশ্নবোধক বাক্য দ্বারা নিজেদের বাঁচার আশা ও ধ্বংসকে সুদূর পরাহত করার আবেদন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ হে আল্লাহ, তোমার দয়ার আলোকে এটা কিছুতেই ধারণা করা যায় না যে, তুমি আমাদের মধ্যকার কতিপয় নির্বোধের অপকর্মের দোষে আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবে।

'এটা আসলে তোমার পরীক্ষা ছাড়া কিছু নয়। এ দ্বারা তুমি যাকে চাও গোমরাহ করো এবং যাকে চাও সুপথে চালাও।'

এ উক্তির মাধ্যমে মূসা (আ.) ঘোষণা করছেন যে, তিনি চলমান ঘটনাবলীর প্রকৃত স্বরূপ ও ধরন উপলব্ধি করেছেন এবং তা যে পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়, তাও জানিয়ে দিচ্ছেন। সুতরাং তিনি অন্যান্য অবহেলাপ্রবণ ও উদাসীন মানুষের মতো আল্লাহর ইচ্ছা ও কাজ সম্বন্ধে উদাসীন

নন। এটি প্রত্যেক পরীক্ষারই বৈশিষ্ট্য। যারা একে পরীক্ষা বলে বুঝতে পারে, তারা এ পরীক্ষা সতর্কতা ও সচেতনতার সাথে অতিক্রম করে এবং হেদায়াত লাভ করে। আর যারা একে পরীক্ষা বলে বুঝতে পারে না, তারা এ থেকে যখন নিষ্কৃতি পায়, তখন গোমরাহ তথা বিপথগামী হয়ে যায়। মূসা (আ.) আল্লাহর পরীক্ষায় পাস করার জন্যে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার ভূমিকা স্বরূপ বলেন,

'তুমি তো আমাদের রক্ষক।'

অর্থাৎ তুমি যখন আমাদের রক্ষক, তখন আমাদেরকে তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করো এবং ক্ষমা ও অনুগ্রহ করো।

'অতএব আমাদেরকে ক্ষমা করো ও আমাদের ওপর অনুগ্রহ করো, তুমি তো সর্বোত্তম ক্ষমাকারী।'

'আর আমাদের জন্যে এই দুনিয়ায় ও আখেরাতে কল্যাণ লিখে দাও। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।'

অর্থাৎ তোমার আশ্রয়স্থলে আশ্রয় নিচ্ছি এবং তোমার সাহায্য কামনা করছি।

এভাবেই মূসা (আ.) দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এর শুরুতে তিনি আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন ও তাঁর পরীক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য স্বীকার করেন। আর পরিশেষে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই আল্লাহর অনুগত সৎ বান্দারা কিভাবে তাঁর কাছে দোয়া করেন এবং দোয়ার শুরুতে ও শেষে কিরূপ আদবের পরিচয় দিতে হয়, তার একটা উৎকৃষ্ট নমুনা হচ্ছে মূসা (আ.)-এর দোয়া।

অতপর তাঁর কাছে আল্লাহর জবাব আসে,

'আল্লাহ বলেন, আমার আযাব যাকে দিতে চাই দেই। তবে আমার দয়া সব কিছুর চেয়ে প্রশস্ত।'

এ উক্তিতে আল্লাহর ইচ্ছা যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বাধ্যবাধকতা বিহীন, সে কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মাবলীকে তিনি স্বেচ্ছায় রচনা করেন ও স্বেচ্ছায় বাস্তবায়িত করেন। তবে এ কাজ তিনি স্বেচ্ছায় করলেও ন্যায়সংগতভাবে ও ইনসাফের সাথেই করেন। কারণ ইনসাফ ও ন্যায়বিচার আল্লাহর গুণাবলীরই একটি। তাই তাঁর ইচ্ছা যেখানে বাস্তবায়িত হয়, সেখানে তা ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের সাথেই বাস্তবায়িত হয়। কেননা এটাও তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত। তাঁর দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি আযাবের উপযুক্ত তাকে আযাব দেয়াই তাঁর ইচ্ছার আওতাভুক্ত। তবে তাঁর রহমত বা দয়া সব কিছুর চেয়ে প্রশস্ত। আর এই দয়াও তাঁর দৃষ্টিতে যারা দয়ার উপযুক্ত তারাই পায়। তার ইচ্ছা– চাই তা রহমতের ইচ্ছাই হোক, বা আযাবের ইচ্ছাই হোক- বিনা বিচারে ও বিনা পরিকল্পনায় কার্যকরী হয় না। আল্লাহ তায়ালা যে কোনো নির্বিচার পদক্ষেপের উর্ধে।

মোহাম্মাদ (স.) সম্পর্কে বহু পূর্বাভাস সত্তেও ষড়যন্ত্রের শেষ নেই

আযাব, রহমত ও ইচ্ছা সংক্রান্ত মূলনতি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তায়ালা স্বীয়নবী মূসা (আ.)-কে অনাগতকালের কিছু অজানা সত্য অবহিত করছেন। সেই অজানা সত্য হলো, শেষ নবীর উম্মাত সংক্রান্ত, যাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রশস্ততম ও ব্যাপকতম রহমত নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তাঁর রহমতকে তিনি তাঁর বিশাল সৃষ্টিজগতের চেয়েও প্রশস্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর রহমতের সীমানা কতো প্রশস্ত তা কোনো মানুষের জানা নেই। তাঁর রহমতের বিশালতা ও প্রশস্ততার পরিমাণ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি অচিরেই আমার এই প্রশস্ততম রহমতকে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করবো যারা পরহেযগার, যারা যাকাত দেয়, যারা আমার আয়াতগুলোতে ঈমান রাখে এবং যারা সেই নিরক্ষর নবীর অনুসরণ করে। যার কথা তারা তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত দেখতে পায়, যিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেন ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন, যিনি তাদের জন্যে পবিত্র জিনিসগুলো হালাল এবং অপবিত্র জিনিসগুলো হারাম করেন এবং যিনি তাদের কাধের বোঝা হালকা ও কড়াকড়ি শিথিল করেন। বস্তুত যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাকে শক্তি যোগাবে, তাকে সাহায্য করবে এবং তার কাছে নাযিল হওয়া আলোর অনুসরণ করবে, তারাই সফলকাম।'

নিসন্দেহে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর আগমনের সুনিশ্চিত আগাম সংবাদ বনী ইসরাঈল অনেক আগেই তাদের নবী মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে পেয়েছিলো। শুধু তাঁর আগমনের খবর নয় বরং তাঁর গুণাবলী, তাঁর রেসালাতের দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি এবং তাঁর উম্মাতের বৈশিষ্ট্যসমূহও জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো যে, তিনি সেই নিরক্ষর নবী, যিনি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবেন, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবেন, পবিত্র জিনিসগুলোকে হালাল ও অপবিত্র জিনিসগুলোকে হারাম করবেন এবং বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে যারা তাঁর ওপর ঈমান আনবে তাদের ওপর থেকে তিনি সেই সব কঠোর বিধিনিষেধ রদ করে দেবেন, যা তাদের গুনাহর কারণে তাদের ওপর আরোপ করা হবে বলে আল্লাহ তায়ালা জানতেন। এই নবীর অনুসারীরা অত্যন্ত খোদাভীরু হবে, নিজেদের সম্পদের যাকাত দেবে এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস রাখবে। তাদের কাছে এই মর্মেও অকাট্য খবর এসেছিলো যে, এই নিরক্ষর নবীর ওপর যারা ঈমান আনবে, তাঁকে সম্মান ও ভক্তি করবে, তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং তাঁর সাথে আগত পথ-প্রদর্শক আলোর (ওহীর) অনুসরণ করবে, তারাই হবে একমাত্র সফলকাম মানব গোষ্ঠী।

বনী ইসরাঈলের কাছে তাদের নবী মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে প্রেরিত এই ভবিষ্যত বার্তার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন ইসলামের ভবিষ্যত, তাঁর পতাকা বহনকারীর গুণবৈশিষ্ট্য, তাঁর অনুসারীদের কর্মপদ্ধতি এবং তাঁর রহমতের উৎস সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত করেছেন। এই অকাট্য ও সুনিশ্চিত ভবিষদ্বাণী পাওয়ার পর পূর্ববর্তী আসমানী কেতাবধারীদের জন্যে আর কোনো ওযর-বাহানা করার অবকাশ থাকেনি।

মূসা (আ.) ও তাঁর জাতির মধ্য থেকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকারে যাওয়ার জন্যে নির্বাচিত সত্তর ব্যক্তির কাছে বিশ্ব-প্রভুর পক্ষ থেকে আগত এই অকাট্য পূর্বাভাস থেকে সৃষ্ট হয়ে গেছে যে, বনী ইসরাঈল এই নিরক্ষর শেষ নবীর সাথে ও তাঁর আনীত দ্বীনের সাথে যে আচরণ করেছে, তা কী সাংঘাতিক অপরাধজনক আচরণ ছিলো। অথচ এই দ্বীনকে গ্রহণ করার মাধ্যমে তারা অনেক জটিল ও কঠিন বিধিনিষেধ থেকে রেহাই পেতো। সেই সাথে তাদের সাফল্যের সুসংবাদও এতে ছিলো।

এই অপরাধ আরো গুরুতর বিবেচিত হয় এজন্যে যে, এটি ছিলো তাদের সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে কৃত অপরাধ। এ অপরাধ সংঘটিত করতে তারা কোনো অপচেষ্টাই বাদ রাখেনি। ইতিহাস সাক্ষী যে, রসূল (স.) ও তাঁর আনীত দ্বীনের বিরোধিতাকারীদের মধ্যে প্রথমে ইহুদীরা ও পরে খৃষ্টানরা ছিলো নিকৃষ্টতম মানবগোষ্ঠী। রসূল (স.), ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিলো, তা ছিলো অত্যন্ত নোংরা, প্রতারণাপূর্ণ, হিংস্র ও হৃদয়হীন যুদ্ধ। তারা সব সময় অব্যাহত রেখেছে এবং আজও চালিয়ে যাচ্ছে।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আহলে কেতাবের পরিচালিত যুদ্ধ ও শত্রুতার যে বিবরণ কোরআনে এসেছে, শুধু সেই বিবরণ পড়েই যে কেউ জানতে পারবে যে, তারা ইসলামের ওপর কেমন সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়েছে এবং তারা মুসলমানদের কেমন কট্টর শত্রু। সূরা বাকারা, আলে ইমরান, নেসা ও মায়েদায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

কোরআনের পর কেউ যদি মদীনায় ইসলামের আগমন ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত-কার ইতিহাসও অধ্যয়ন করে, তবে সে বুঝতে পারবে ইসলাম বিরোধিতা এবং ইসলামকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করার জন্যে তারা কতো জঘন্য অপচেষ্টা চালিয়ে এসেছে এবং এখনও চালিয়ে যাচ্ছে।

ইহুদী ও খৃষ্টানরা পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোতে যতো রকমের যুদ্ধ, প্রতারণা ও অপকৌশল প্রয়োগ করেছে, আধুনিককালে প্রয়োগ করেছে ও করছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী, বিশেষ করে বর্তমান কালে তারা ইসলামকে একেবারেই খতম করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। তারা মনে করে যে, ইসলামের সাথে তারা বর্তমানে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত লড়াইয়ের মুখোমুখি। এজন্যে তারা অতীতে যতো রকম অপকৌশল প্রয়োগ করেছে সেই সব এবং নতুন আবিষ্কৃত অপকৌশলগুলো সব একই সাথে প্রয়োগ করে চলেছে।

অন্যদিকে নামধারী মুসলমানদের একটি গোষ্ঠী নাস্তিকতা ও বস্তুবাদ ঠেকানোর নামে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহযোগিতার নির্বোধসুলভ আহ্বান জানাচ্ছে। অথচ এই 'অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা' বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম নামধারীদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করে চলেছে। তারা মুসলমানদের ওপর এমন অমানুষিক হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, যা স্পেনের ক্রুসেড যুদ্ধ ও তদন্ত আদালতগুলোর পাশবিকতাকেও হার মানাচ্ছে। কখনো এই সব হত্যাযজ্ঞ তারা চালাচ্ছে এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলোতে বিদ্যমান তাদের নিজস্ব সংস্থাগুলোর মাধ্যমে, আবার কখনো বা তথাকথিত 'স্বাধীন' দেশগুলোতে তাদের প্রতিষ্ঠিত বা সমর্থিত সরকারগুলোকে দিয়ে করাচ্ছে। এ সব দেশে তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত বা সমর্থিত ও তল্পীবাহক সরকারগুলোকে দিয়ে তারা ইসলামের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যা 'অদৃশ্য' বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে অস্বীকার করে। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতাকে তারা 'বিজ্ঞান সম্মত' মনে করে এবং তা মানুষের চরিত্রকে 'প্রগতিশীল' বানায়, যাতে তা শোষক পশুর চরিত্রে পরিণত হয়। কেননা সর্বসমক্ষে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 'স্বাধীনভাবে' কামলিপ্সা চরিতার্থকারী পশুদের চরিত্র তাদের চোখে যথার্থ প্রগতিশীল চরিত্রই বটে। তারা এসব সরকারকে দিয়ে ইসলামী ফেকাহ তথা আইন শাস্ত্রকেও প্রগতিশীল বানাতে চায় এবং এ উদ্দেশ্যে তারা 'ওরিয়েন্টালিস্টদের মাঝে মাঝে সম্মেলনও অনুষ্ঠিত করে থাকে। ইসলামী ফেকাহ যাতে সুদ, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অন্য সকল নিষিদ্ধ জিনিসকে হালাল করে দেয়, সে জন্যে তারা ফেকাহকে সংশোধনের অব্যাহত অপচেষ্টায় এরা নিয়োজিত রয়েছে।(১)

পূর্বতন কেতাবধারী ইহুদী ও খৃষ্টানরা ইসলামের সাথে এহেন সর্বনাশা নারকীয় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদেরকে এই নবী ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে অনেক আগেই অবহিত করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এর সাথে তাদের এমন জঘন্য, নোংরা ও গোঁয়ারসুলভ আচরণ দেখে কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষ স্তম্ভিত ও মর্মাহত না হয়ে পারে না।

(১) এ ধরণের কিছু মুসলমানদের পক্ষ থেকে সূদসহ এমন বহু কিছুকে ইদানীং পুরোপুরিই হালাল ফতোয়া দেয়ার চেষ্টা চলছে ইউরোপে তো এ অভিযান এখন অনেকটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।—সম্পাদক

বিশ্বমানবতার মুক্তি দূত মোহাম্মাদ (স.)

কাহিনীর পরবর্তী দৃশ্যে যাওয়ার আগে কোরআন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেই কিছুক্ষণের জন্যে কাহিনী বর্ণনায় বিরতি দেয় এবং নিরক্ষর নবী (স.)-কে সম্বোধন করে। সমগ্র মানব জাতিকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে তাঁকে আদেশ দেয়, যাতে আল্লাহর পূর্বতন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়। বলা হয়েছে,

'হে নবী, তুমি বলো, ওহে মানব জাতি, আমি তোমাদের সকলের কাছে আল্লাহর রসূল, যার হাতে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন, অতএব আল্লাহর প্রতি ও সেই নিরক্ষর নবীর প্রতি ঈমান আনো, যে নবী আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি বিশ্বাসী এবং তোমরা তার অনুসরণ করো। আশা করা যায়, তোমরা হেদায়াত লাভ করবে।' (আয়াত ১৫৮)

তিনি হচ্ছেন শেষ রসূল। তাঁর রেসালাত সারা বিশ্বের জন্যে ও সকল মানুষের জন্যে। এ রেসালাত কোনো জাতি, কোনো অঞ্চল এবং কোনো বংশধরের জন্যে নির্দিষ্ট নয়। পূর্ববর্তী রসূলদের রেসালাত ছিলো বিশেষ অঞ্চল ও বিশেষ জাতির জন্যে নির্দিষ্ট এবং বিশেষ সময় অর্থাৎ দুই নবীর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে সীমিত। মানব জাতি এই সব রসূলের রেসালাতের পথ-নির্দেশনা অনুসারে সীমিত পর্যায়ে পথ চলতো এবং এভাবে নিজেদেরকে শেষ রসূলের রেসালাতের জন্যে প্রস্তুত করতো। মানব জাতির ক্রমবিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যেক রেসালাতে শরীয়তের সংস্কার, সংশোধন ও পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকতো। অবশেষে যখন শেষ রসূলের রেসালাত এলো, তখন ইসলামের মূলনীতিগুলো পূর্ণাংগ রূপ নিয়ে এলো। তবে তার খুঁটিনাটি বিধিগুলোতে পরিবর্তন ও সংশোধনের অবকাশ রাখা হয়েছে। শেষ নবী যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা সকল মানুষের জন্যে। কেননা বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন প্রজন্ম ও বিভিন্ন জাতির জন্যে এরপর আর কোনো রসূল আসবে না। তাছাড়া তাঁর আনীত এ দ্বীন মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি মেযাজ ও অভিরুচি অনুসারেই এসেছে। আর এই স্বভাব প্রকৃতির ব্যাপারে সকল মানুষ একমত। এ জন্যে এ দ্বীনকে এই নিরক্ষর নবীই বহন করে এনেছেন। কেননা নিরক্ষর হওয়ার কারণে তার মন মেজায ও স্বভাব প্রকৃতি অবিকল আল্লাহর হাতে যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে সেভাবেই একেবারে নির্মল, নিষ্কলুষ ও পরিষ্কার থেকেছে এবং আল্লাহর শিক্ষা ছাড়া দুনিয়ার কারো শিক্ষা বা চিন্তাধারা তার ওপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পায়নি। এতে করে তিনি মানুষের প্রকৃতির কাছে প্রকৃতির স্রষ্টার বাণী পৌছাতে সমর্থ হয়েছেন,

'বলো, হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সকলের কাছে রসূল হয়ে এসেছি। ....'

এই আয়াতটিতে রসূল (স.)-কে সমগ্র মানব জাতির কাছে নিজের রেসালাতের দাওয়াত পৌছানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটি একটি মক্কী সূরার মক্কী আয়াত। এটি সেই সব কুচক্রী ও জালিয়াত আহলে কেতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানকে প্রতিহত করার জন্যে নাযিল হয়েছে, যারা ধারণা করতো যে, মোহাম্মাদ (স.) মক্কায় থাকা অবস্থায় ইসলামকে মক্কার বাইরে প্রসারিত করার কথা হয়তো কল্পনাও করবেন না। বরং তিনি ইসলামকে প্রথমে কোরায়শ গোত্রের মধ্যে বিস্তৃত করার কথা ভাববেন, অতপর অন্যান্য আবরদের কাছে ও তারপর আহলে কেতাবের কাছে তাঁর দাওয়াত পৌছাবেন এবং সবার শেষে আরব উপদ্বীপের অন্যান্য এলাকায় ও তার বাইরে ছড়িয়ে দেয়ার চিন্তা করবেন। আর এই প্রচার ও প্রসার পর্যায়ক্রমে পূর্ববর্তী স্তরে তার সাফল্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ঘটতে থাকবে। আহলে কেতাবের এ চিন্তাধারা ছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে

তাদের প্রাচীন কাল থেকে পরিচালিত যুদ্ধেরই একটি প্রতারণাময় ও ন্যক্কারজনক অংশ। তাদের এই প্রতারণাপূর্ণ যুদ্ধ আজও অব্যাহত রয়েছে।

আর কুচক্রী আহলে কেতাব গোষ্ঠী যদিও ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এভাবে নিরন্তর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে এবং যে 'প্রাচ্যবাদী' বুদ্ধিজীবীরা এ ধরনের মিথ্যা কথা লিখতে অভ্যস্ত, তারা যদিও ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর আক্রমণকারী অগ্রবর্তী বাহিনী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা তেমন বিপজ্জনক ব্যাপার নয়। সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার এই যে, নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে এমন বহু সংখ্যক আত্মবিস্মৃত বেকুফ মুসলমানদের ও তাদের আকীদা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এবং তাদের নবী ও ধর্মকে বিকৃত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত এই আহলে কেতাব গোষ্ঠীকেও তাদের তল্পীবাহক আদর্শিক বশংবদ প্রাচ্যবাদীদেরকে তাদের শিক্ষাগুরু হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। আর তাও অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের নয়, বরং ইসলামেরই শিক্ষাগুরু হিসাবে মান্য করে। তাদের কাছ থেকে তারা ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ইসলামের তত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে ইসলামের ওই দুশমনেরা যা কিছু লেখে, তা থেকেই তারা সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে থাকে। আর এ সব কিছু করেই এই নির্বোধ ও বেকুফ লোকেরা নিজেদেরকে 'বুদ্ধিজীবী' বলে দাবী করে থাকে।

নিজেকে সারা বিশ্বের রসূল হিসাবে ঘোষণা করার জন্যে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়ার পর কোরআন তাঁকে পরবর্তী নির্দেশ দেয় মানব জাতিকে তাদের প্রকৃত মনিব ও প্রভুর সাথে পরিচিত করার জন্যে।

'যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মালিক, যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং যিনি জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র সর্বময় কর্তা।'

অর্থাৎ তিনি সমগ্র মানব জাতির নিকট তাদের সেই মনিবের প্রেরিত রসূল, যে মনিব সমগ্র সৃষ্টিজগতের মালিক। আর এই সৃষ্টিজগতেরই একটি অংশ হচ্ছে মানব জাতি। তিনিই একমাত্র ইলাহ ও মাবুদ। আর মানুষসহ বাদবাকী সব কিছু তাঁর বান্দাও গোলাম। তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা, তাঁর উলুহিয়্যাত প্রতিফলিত হয় তাঁর একমাত্র জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা হওয়ার মধ্য দিয়ে। যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের সর্বময় মালিক ও মনিব, যিনি সকল সৃষ্টির ইলাহ খোদা বা মাবুদ এবং যিনি জীবন ও মৃত্যু উভয়েরই মালিক, তাঁর সেই ধর্মই সকল মানুষের একমাত্র পালনীয় ও অনুসরণীয় ধর্ম হওয়ার অধিকারী, যাকে তাঁর রসূল মানব জাতির কাছে প্রচার করেছেন। সুতরাং এখানে মানুষের কাছে তাদের মনিবের প্রকৃত স্বরূপ ও পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, যাতে করে তারা তাঁর গোলামী ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে পারে।

'অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর সেই নিরক্ষর নবী রসূলের প্রতি ঈমান আনো যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহে বিশ্বাসী এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ করো। হয়তো তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হবে।'

এই সর্বশেষ সম্বোধনটিতে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যা নিয়ে আমাদের কিছু চিন্তাভাবনা করা দরকার।

প্রথমত এতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটি কালেমায়ে শাহাদাতেও একটু ভিন্নভাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া বা ঘোষণা দেয়া। এ জিনিসটি ছাড়া ঈমান ও ইসলাম এ দুটোর কোনোটাই হয় না। কেননা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার এ নির্দেশ দেয়ার আগে একই আয়াতে আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, 'যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় মালিক, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং যিনি জীবন দেন মৃত্যুও

দেন।' সুতরাং ঈমান আনার নির্দেশ দানের অর্থই হলো সেই আল্লাহর ওপর ঈমান আনার নির্দেশ দান, যাঁর সত্য গুণাবলী এরূপ। অনুরূপভাবে রসূল (স.)-এর পরিচয়ও এর আগেই দেয়া হয়েছে এই বলে যে, তিনি সারা বিশ্বের নবী বা এক কথায় বিশ্বনবী।

অতপর বলা হয়েছে যে, এই নিরক্ষর নবী (স.) আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বাণীগুলোর প্রতি ঈমান আনে। কথাটা যদিও সুবিদিত, তথাপি এখানে তা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ও মূল্যবান। সেটি এই যে, যে কোনো দাওয়াত দেয়ার পূর্বে স্বয়ং দাওয়াতদাতাকে সেই আদর্শের প্রতি ঈমান আনতে হবে, যার প্রতি সে দাওয়াত দিচ্ছে। সে আদর্শটি তার কাছে সুস্পষ্ট হতে হবে এবং তার প্রতি তার অবিচল আস্থা ও প্রত্যয় থাকতে হবে। এ জন্যেই সমগ্র মানব জাতির প্রতি আল্লাহর প্রেরিত নবীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, 'যিনি আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বাণীর প্রতি ঈমান রাখেন।' বলা বাহুল্য, তিনি মানুষকে যে জিনিসের প্রতি আহ্বান জানান, এটা তা থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

এর সর্বশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হলো, যে ঈমানের দিকে তিনি তাদেরকে দাওয়াত দেন সেই ঈমানের দাবীর প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এই দাবী আর কিছু নয়, রসূলের আদেশ, আইন, সুন্নাত ও কাজের অনুসরণ। এ কথাই বলা হয়েছে আয়াতের শেষভাগে যে, 'এবং তাঁর অনুসরণ কর, হয়তো তোমরা সুপথ পেয়ে যাবে।' বস্তুত আল্লাহর রসূল মানুষকে যে জিনিসের দাওাত দেন, তার সন্ধান পাওয়ার আর কোনো উপায় নেই রসূলের শর্তহীন অনুসরণ ছাড়া। শুধু মনে মনে তাঁর প্রতি ঈমান আনা হবে এবং সেই ঈমান বাস্তব আনুগত্য ও অনুসরণের রূপ নেবে না– এটা যথেষ্ট নয়। বস্তুত ঈমান যখন এরূপ বাস্তব আনুগত্য ও অনুসরণে পরিণত হয়, তখন তাকে বলা হয় ইসলাম।

প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা প্রসংগে ইসলাম নিজের হাকীকত তথা স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। এর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তা হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা কোনো বিশ্বাস মাত্র নয়। অনুরূপভাবে তা কতকগুলো আনুষ্ঠানিকতা ও মওসুমী কর্মকান্ড নয়। বরং ইসলাম হলো, রসূল (স.) আল্লাহর কাছ থেকে আল্লাহর যে সব আদেশ-নিষেধ প্রচার করেন এবং নিজে যে সব আইন ও বিধি চালু করেন, সে সবের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ। তিনি মানুষকে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি শুধু ঈমান আনারও আদেশ দেননি, শুধু আনুষ্ঠানিক এবাদাতগুলো পালন করারও আদেশ দেননি। তিনি মানুষের কাছে তার কথা ও কাজের জন্যে আল্লাহর বিধান পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এই সব কিছুতে রসূলের পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করা ছাড়া মানুষের হেদায়াত লাভের কোনো আশা নেই। এ হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন তথা ধর্ম বা জীবনবিধান। এই জীবন বিধানের একমাত্র রূপ এটাই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রথমে ঈমান আনতে হবে, অতপর রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর এই জীবন বিধান যদি শুধু বিশ্বাসগত ব্যাপারই হতো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকতেন যে, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো ।'এবং তাঁর অনুসরণ করো'– এ কথাটা তার সাথে যুক্ত করতেন না।

পাপিষ্ঠ ইহুদী জাতির অবাধ্যতার আরো কিছু নমুনা

এই বিরতির পর পুনরায় বনী ইসরাঈলের কাহিনী শুরু হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গের অন্যায় কর্মকান্ডের শাস্তি স্বরূপ ভূমিকম্প কবলিত হওয়ার পরবর্তী ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে। মূসা (আ.)-এর দোয়ার পর বনী ইসরাঈলের কী পরিণতি হয়েছিলো, কোরআনে তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে অন্যান্য সূরায় ঘটনার যে বিবরণ দেয়া হয়েছে, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা ভূমিকম্পের পর তাদেরকে

জীবিত করেছিলেন এবং তারা তাদের গোত্রের কাছে ঈমানদার অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছিলো। এখানে ঘটনার পরবর্তী পর্বের বর্ণনা দেয়ার আগে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে এ সত্যটি জানানো হচ্ছে যে, তারা সবাই বিপথগামী ছিলো না,

'মূসা (আ.)-এর জাতিতে কিছু লোক এমনও ছিলো, যারা ন্যায় পথ দেখায় ও ন্যায়বিচার করে।' (১৫৯)

ন্যায় পথ দেখায় ও ন্যায়বিচার করে এ ধরনের কিছু লোক মূসা (আ.)-এর আমলেও ছিলো এবং তাঁর পরেও ছিলো। এদের কয়েকজন শেষ নবী (স.)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলামও গ্রহণ করেছিলো। কেননা তারা তাওরাতে তাঁর আগমন সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলো। এদের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা.)। তিনি তাঁর সমকালীন ইহুদীদের সাথে শেষ নবী সংক্রান্ত তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ইসলাম কর্তৃক সমর্থিত তাদের কিছু কিছু শরীয়তী বিধি নিয়ে তর্ক করতেন।

বনী ইসরাঈল সংক্রান্ত এ সত্যটি বর্ণনা করার পর ভূমিকম্প পরবর্তী ঘটনাসমূহ তুলে ধরা হচ্ছে,

' তাদেরকে (বনী ইসরাঈলকে) আমি বারোটি গোত্রে বিভক্ত করেছি। মূসার সম্প্রদায় যখন তার কাছে পানি চাইলো, তখন আমি তাকে আদেশ দিলাম যে, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করো ....' (১৬০)

এ সময়েও আল্লাহর তদারকীমূলক ছায়া মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়কে ঢেকে রাখছিলো। বাছুর পূজার ন্যায় কাফেরসুলভ কাজ করা, তারপর আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক ঐ গুনাহর কাফফারা প্রদান, এর ফলে তাদের গুনাহ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মার্জনা করা, আল্লাহকে সরাসরি দেখতে চাওয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন, এর ফলে তাদের ভূমিকম্পের কবলে পড়া এবং তারপর মূসা (আ.)-এর দোয়াক্রমে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাদেরকে জীবন দান– এসব কিছুর পরও আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর মেঘের ছায়া দিয়ে চলছিলেন। তাদেরকে বারোটি দলে সংগঠিত করা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি তাদেরকে কিরূপ শৃংখলার সাথে তদারকী করে যাচ্ছিলেন। এই বারোটি দলের প্রতিটি হযরত ইয়াকুব বা ইসরাঈল (আ.)-এর কোন না কোনো পৌত্রের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিলো। বনী ইসরাঈল গোত্রীয় নিয়মে বংশ- তালিকা সংরক্ষণ করতো। তাদের প্রত্যেক গোত্রের জন্যে সুনির্দিষ্টভাবে একটা স্বতন্ত্র জলাশয় বরাদ্দ করা হয়েছিলো যাতে কেউ কারো ওপর বাড়াবাড়ি না করে। আর তাদেরকে মরুভূমির প্রখর রৌদ্র থেকে বাঁচানোর জন্যে মেঘমালা দিয়ে ছায়া দেয়া হয়েছিলো এবং 'মান্ন' নামক মধু ও 'সালওয়া' নামক পাখি দিয়ে তাদের খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিলো। পানির সুব্যবস্থার পর এই সব ব্যবস্থা তাদের জন্যে আল্লাহর সুষ্ঠু তদারকী ও তত্ত্বাবধানেরই প্রতীক। অতপর তাদের এতসব গুনাহ সত্তেও তাদের ওপর কোনো জিনিস নিষিদ্ধ না করে সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল করে দেয়াও তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপূর্ণ তদারকীর সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু ১৬০ নং আয়াতের শেষাংশ থেকে জানা যায় যে, মূসার লাঠির আঘাতে পাথরের মধ্য থেকে জলাশয়ের সৃষ্টি, ঊষর মরুভূমিতে মেঘমালার ছায়া বিতরণ এবং 'মান্ন' ও 'সালওয়া' দ্বারা অনায়াসে খাদ্যের ব্যবস্থা করার মতো অলৌকিক নেয়ামতসমূহ সত্তেও তাদের স্বভাব থেকে সততা ও হেদায়াতের বিরোধিতার প্রবণতা দূর হয়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তারা আমার ওপর যুলুম করেনি, বরং নিজেদের ওপরই যুলুম করেছে।'

পরবর্তী আয়াতসমূহে এক এক করে তাদের কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দেখানো হয়েছে কিভাবে তারা আল্লাহর আদেশ লংঘন করে ও তার দেখানো পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছে এবং এ দ্বারা তারা আল্লাহর ওপর কোনো যুলুম করতে পারেনি। কারণ তারাও সমগ্র সৃষ্ট জগত আল্লাহর আদেশ পালন করুক বা লংঘন করুক, তাতে আল্লাহর কিছু আসে-যায় না। সমগ্র সৃষ্টি জগত ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর নাফরমানী করলেও তাঁর কোনো ক্ষতি হয় না। আর সমগ্র সৃষ্টিজগত ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্য করলেও তাঁর কোনো লাভ হয় না। গুনাহ দ্বারা তারা কেবল দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করে ও নিজেদের জন্যেই কষ্ট ডেকে আনে।

এবার আমাদের দেখতে হবে আল্লাহর এমন অনুগ্রহপূর্ণ তদারকীকে বনী ইসরাঈল কিভাবে গ্রহণ করেছিলো এবং কিভাবে তারা ভ্রান্ত কর্মকান্ড চালিয়ে গিয়েছিলো।

'যখন তাদেরকে বলা হলো এই শহরে বসবাস করো, সেখান থেকে যা খুশী খাও এবং বলতে থাকো যে, আমরা 'নতি স্বীকার করছি', তাহলে আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবো .... (১৬১-১৬২)

বাছুর পূজার পরও আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং পাহাড়ের ওপর ভূমিকম্পের পর তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। এতসব নেয়ামত তাদেরকে তিনি দিয়েছেন। তারপরও তাদের স্বভাব সত্য পথের ওপর অবিচল থাকেনি। তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে। আল্লাহ তায়ালা যে কথা বলতে শিখিয়েছেন সে কথাকে বিকৃত করেছে। একটা নির্দিষ্ট শহরে অর্থাৎ একটা বড় শহরে তাদেরকে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। শহরটির নাম কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি। কেননা কোরআনে তা উল্লেখ করলে কাহিনীর কোনো তাৎপর্য বেড়ে যেতো না। সেই শহরের সকল উপকারী জিনিস তাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছিলো। কেবল এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিলো যে, শহরে প্রবেশের সময় একটা নির্দিষ্ট দোয়া পড়তে হবে এবং তার দরযা দিয়ে প্রবেশের সময় সেজদাবনত অবস্থায় প্রবেশ করতে হবে, যাতে করে বিজয় ও পরাক্রম লাভের সময় আল্লাহর আনুগত্য ঘোষণা করা হয়। রসূল (স.) যেমন মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশের সময় নিজ জানোয়ারের পিঠের ওপর সেজদারত ছিলেন, এটাও ঠিক তেমনি। আর এই আনুগত্যের প্রতিদান হিসাবে তিনি তাদের গুনাহ মাফ ও পুণ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির ওয়াদা করেছেন। অথচ তাদের একটা দল নির্দেশিত দোয়ার শব্দ পাল্টে দিলো এবং যেভাবে শহরে প্রবেশ করতে আদেশ দেয়া হয়েছিলো, সেভাবে প্রবেশ করলো না। এর কারণ শুধু এই ছিলো যে, তাদের প্রবৃত্তির প্ররোচনা অনুসারে তারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে চেয়েছিলো।

'তাদের মধ্য থেকে যারা অত্যাচারী, তারা তাদেরকে যে কথা বলতে আদেশ দেয়া হয়েছিলো তা পাল্টে ফেললো।'

এর পরিণামে সেই আকাশ থেকে তাদের ওপর আযাব নাযিল করা হলো, যেখান থেকে তাদেরকে ছায়া, মান্না ও সালওয়া দেয়া হয়েছিলো।

'তাদের অত্যাচারের ফলে আকাশ থেকে তাদের ওপর এক আযাব নাযিল করলাম।'

তাদের একটি গোষ্ঠীর অত্যাচারটা এ ধরনেরই ছিলো। অর্থাৎ কুফরী এবং আল্লাহর আযাব ভোগ করার যোগ্য হতে হয় এমন কাজ করা। এ সময়ে তাদের ওপর কি ধরনের আযাব এসেছিলো, তা কোরআন উল্লেখ করে না। কেননা কেসসার আসল উদ্দেশ্য সেটা উল্লেখ না করলেও পূর্ণ হয়। সেই উদ্দেশ্যটা হলো, আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পরিণাম কী, তা জানিয়ে দেয়া। সতর্ক করা এবং তার ন্যায্য প্রতিফল থেকে যে গুনাহগারদের পালানোর উপায় নেই, তা অবহিত করা।

ইহুদীদের বানরে পরিণত করার ঘটনা

পরবর্তী আয়াতগুলোতে দেখানো হচ্ছে যে, এই জাতি পুনরায় এক পাপের কাজে লিপ্ত হলো। এবার তারা আল্লাহর হুকুম সরাসরি নয় বরং আল্লাহর হুকুমের কদর্থ ও ছল-চাতুরীর মাধ্যমে লংঘন করে। তাদের ওপর পরীক্ষা এসেছিলো। কিন্তু ধৈর্য দ্বারা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। কেননা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে যে ধৈর্যের দরকার, তা একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ মেযাজ এবং প্রবৃত্তির লালসাকে দমন করার ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।

'সেই জনপদ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যা সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত ছিলো। ..... (আয়াত ১৬৩-১৬৭)

এখানে কোরআন বনী ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণনার স্টাইল পরিবর্তন করেছে। এখানে বনী ইসরাঈলের অতীত সরাসরি বর্ণনা করার পরিবর্তে রসূল (স.)-এর আমলে মদীনায় তাদের যে বংশধর ছিলো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। এখান থেকে ১৭১ নং আয়াত পর্যন্ত সবগুলো আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ। মদীনার ইহুদীদের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে এগুলো নাযিল হয়েছে এবং এই মক্কী সূরায় বনী ইসরাঈলের কাহিনীর পরিপূরক হিসাবে সংযোজিত হয়েছে।

ইহুদীদেরকে তাদের উত্তরসূরীদের এই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্যে আল্লাহ রসূল (স.)-কে আদেশ দিচ্ছেন। অতীতের এ ইতিহাস তাদের জানা ছিলো। তিনি নিরবচ্ছিন্নও অটুট প্রজাতিক ধারাবাহিকতা সম্পন্ন একটি জাতি হিসাবে এই ইতিহাস সহকারে তাদের মুখোমুখি হবেন এবং আদিকাল থেকেই তাদের আল্লাহর নাফরমানী করার এই প্রবণতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন– এটাই ছিলো এই আদেশের উদ্দেশ্য। এই নাফরমানীর ফলে তারা পার্থিব জীবনে দৈহিক বিকৃতি এবং চিরস্থায়ী সামষ্টিক লাঞ্ছনা ও আল্লাহর গযবের শিকার হয়েছে। তবে যারা শেষ নবীর অনুসারী হয়েছে তাদের কথা আলাদা। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা আযাব ও গযব থেকে মুক্তি দেবেন।

সমুদ্রোপকূলের এই জনপদটির নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি। কেননা সেটা ইহুদীদের জানা ছিলো। মূল ঘটনাটা এই যে, বনী ইসরাঈলের একটি গোত্র একটি উপকূলীয় শহরে বাস করতো। বনী ইসরাঈল নিজেদের এবাদাত ও বিশ্রামের জন্যে ও জীবিকা উপার্জনের কাজ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে একদিন ছুটি নির্ধারণের আবেদন জানিয়েছিলো। তাই তাদের জন্যে শনিবার ছুটি নির্ধারিত হয়। এরপর তাদের ওপর পরীক্ষা আসে যে, আল্লাহর সাথে তাদের করা অংগীকার যখন লোভ লালসার মুখোমুখি হয়, তখন তারা লোভ লালসাকে দমন করতে পারে কিনা এবং তেমন প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী কিনা। দীর্ঘদিন পরাধীনতার জীবন যাপনের কারণে বনী ইসরাঈলীদের স্বভাব, মেযাজ ও ব্যক্তিত্ব দুর্বল হয়ে যাওয়ায় তাদের জন্যে এ পরীক্ষা জরুরী ছিলো। পরাধীনতার পর ইচ্ছাশক্তিকে স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে দেয়া এ জন্যে জরুরী যে, এতে করে তা স্থিতি ও অনমনীয়তা লাভ করে। তা ছাড়া যারা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করে এবং পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্য হতে চায়। তাদের জন্যে এটা বিশেষভাবে অপরিহার্য। প্রলোভনের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্যে ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তার পরীক্ষা ইতিপূর্বে আদম (আ.) ও হাওয়াকেও করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা সে পরীক্ষায় দৃঢ়তা দেখাতে পারেননি, বরং অনন্তকালের বৃক্ষ ও রাজত্বের শয়তানী প্রলোভনের কাছে তারা হেরে গিয়েছিলেন। এরপর পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব-ভার দেয়ার আগে প্রত্যেক জাতি বা দলকে আল্লাহ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া

বাধ্যতামূলক বলে স্থির করেন। এ পরীক্ষা চিরন্তন। কেবল এর বাহ্যিকরূপ পরিবর্তিত হয়- পরীক্ষার বিষয় পরিবর্তিত হয় না।

এখানে যে পরীক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে, তাতেও বনী ইসরাঈলের সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীটি প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা দেখাতে পারেনি। কারণ তারা এর আগেও বারবার পথভ্রষ্ট হয়েছে ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। শনিবারে মাছগুলো সমুদ্র তীরে তাদের দৃষ্টি ও নাগালের মধ্যে চলে আসতো এবং সেদিন শিকার করা খুব সহজ হয়ে যেতো। কিন্তু শনিবারে সব ধরনের আয় রোযগারের কাজ করাকে তারা নিজেদের ওপর নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলো। তাই মাছ ধরা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। শনিবার অতিবাহিত হয়ে যখন কর্ম দিবস আসতো, তখন মাছ আর শনিবারের মতো নাগালের মধ্যে থাকতোনা। এই অবস্থায় তারা কী করেছিলো ও তার কী ফল ভোগ করেছিলো, সেটা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যেই রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ওদেরকে সেই সমুদ্র-তীরবর্তী শহরের অধিবাসীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন। শনিবারে যখন মাছগুলো পানিতে ভেসে তাদের কাছে চলে আসতো। অথচ শনিবার ছাড়া অন্যান্য দিন আসতো না। তারা পাপাচারী ছিলো বিধায় তাদেরকে আমি এভাবে পরীক্ষা করেছিলাম।' (১৬৩)

প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তাদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা ঘটলো কিভাবে? মাছকে কিভাবে মানুষের রীতিনীতির সাথে এতো পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ বানানো সম্ভব হলো? এর জবাব এই যে, এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালা যখনই ইচ্ছা করেন, তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে এমনটি ঘটে থাকে। যারা এটা জানে না, তারা 'প্রাকৃতিক নিয়মে'র বাইরে আল্লাহর কোনো ইচ্ছা বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করে। অথচ ইসলামী মতাদর্শে ও বাস্তবে প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন বিশ্ব জগতের স্রষ্টা। তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারেই এ বিশ্বজগত চলে। বিশ্ব জগত কিভাবে চলবে সেটা তিনি বিশ্ব জগতকে বলে দিয়েছেন। তবে তাঁর ইচ্ছা বিশ্ব প্রকৃতির এই ধরাবাধাঁ নিয়মের অধীন নয়। প্রাকৃতিক নিয়ম চালু হওয়ার পরও আল্লাহর ইচ্ছা স্বাধীন এবং তার আগেও স্বাধীন ছিলো। অথচ অজ্ঞ লোকেরা এই সত্যটা জানে না। মহান আল্লাহ নিজ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার বলে এবং নিজের সৃষ্ট বান্দাদের প্রতি সীমাহীন কৃপাবলত এরূপ স্থির করেছেন যে তার সৃষ্টি জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন স্থিতিশীল অপরিবর্তীত থাকবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর নিজের ইচ্ছাটাও এই নিয়ম কানুনের গন্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যখন কোনো ক্ষেত্রে চিরাচরিত প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কোনো কিছু ঘটানো তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার আলোকে সমীচীন মনে হয়, তখন তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তই সেখানে স্বাধীনভাবে কার্যকরী হয়। কোনো বাধা তাকে আটকে রাখতে পারে না। তা ছাড়া প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন যে ক্ষেত্রে চালু হয়, প্রতি বারই তা আল্লাহর পরিকল্পনা অনুসারে এবং নির্দিষ্ট পন্থায় ও পরিমাণেই শুধুমাত্র সেই বারের জন্যেই কার্যকরী হয়। এমন কোনো যান্ত্রিক শক্তি বলে তা কার্যকরী হয় না যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের কোনো নিয়ন্ত্রণ তার ওপর থাকবে না এবং তিনি তাতে কোনো হস্তক্ষেপই করতে পারবেন না। অথচ তাঁর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেও সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন স্থিতিশীল ও অপরিবর্তিত থাকে- যতোক্ষণ তিনি তাতে কোনো পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম ঘটানোর ইচ্ছা না করেন। যে কোনো ঘটনা- চাই প্রচলিত চিরাচরিত প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অধীনেই ঘটুক অথবা তার ব্যতিক্রমী কোনো অসাধারণ, অস্বাভাবিক বা অলৌকিক ব্যবস্থার ভিত্তিতেই ঘটুক, তা যেহেতু আল্লাহর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা পরিমাণ অনুসারেই ঘটে থাকে, তাই এই নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকার দিক দিয়ে

অলৌকিক ও স্বাভাবিক নিয়মে সংঘটিত সব ঘটনাই সমান। বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনায় কোথাও একটি বারের জন্যেও যান্ত্রিক বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিছুই ঘটে না– যেমনটি অজ্ঞ লোকেরা ভেবে থাকে। বিষয়টি অবশ্য তারা চলতি শতাব্দীর শেষ আড়াই দশকে উপলব্ধি করতে শুরু করছে।(১)

যা হোক, সমুদ্রোপকূলে বসবাসকারী বনী ইসরাঈলের গোত্রটির বেলায় এ ঘটনাটা ঘটেছিলো। মাছের অবাধ বিচরণে প্রলুব্ধ হয়ে তাদের একটি অংশের লালসা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলো। তাদের আকাংখা সীমা অতিক্রম করলো এবং তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কৃত ওয়াদা ও চুক্তি ভুলে গেলো। ফলে তারা ইহুদী জাতির চিরাচরিত নিয়মে ফন্দি আঁটা শুরু করলো শনিবারে মাছ ধরার জন্যে। আসলে মন যখন বাঁকা পথে চলতে আরম্ভ করে, খোদাভীতি ও আত্ম-সংযমের যখন ঘাটতি দেখা দেয়, কেবল আইনের শাব্দিক রূপই যখন পথ চলার অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় এবং আইনের ভাষাকে ফাঁকি দেয়াই যখন অভিপ্রেত হয়, তখন ফন্দি ফিকির ও ছলছুতোর অভাব হয় না। আইনকে কখনো ভাষার বর্ম পরিয়ে বা আইন রক্ষক বাহিনী দিয়ে রক্ষা করা যায় না। আইনকে কেবল সেই সংযমী হৃদয়ই রক্ষা করতে পারে, যা আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত থাকে। এরূপ হৃদয়ই আইনের একমাত্র রক্ষাকবচ। এছাড়া আর কোনো উপকরণ ধারা মানুষের ছলচাতুরী থেকে আইনকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। নিছক বস্তুগত শক্তি ও বাহ্যিক প্রহরা কোনো আইনকে রক্ষা করতে পারে না। কোনো দেশে সন্ত্রাস যতোই তীব্র আকার ধারণ করুক না কেন, তা তার অধিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও আইন শৃংখলা রক্ষা করার জন্যে তার প্রত্যেক নাগরিকের পেছনে একজন করে নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ করতে কখনো পারবে না। যতোক্ষণ মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে না এবং তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করবে না, ততোক্ষণ আর কোনো উপায়েই আইনকে বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে না। এ কারণেই যে সব রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা সর্বস্তরের জনগণের আল্লাহভীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না, তা সফল হয় না। মানুষের জন্যে মানুষের রচিত যে সব মতবাদ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সমর্থিত নয়, তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আইন শৃংখলা রক্ষা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মানবীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও ব্যর্থ হয়। আর বাহ্যিকভাবে তদারক ও তত্ত্বাবধানের সকল চেষ্টাও নিষ্ফল হয়।

এভাবেই সমুদ্র তীরবর্তী জনপদের অধিবাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোক শনিবারে শিকার ধরা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ওই দিন মাছ শিকার করার জন্যে ছলচাতুরী শুরু করে দেয়। বর্ণিত আছে যে, তারা শনিবারে মাছকে ঘেরা দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখতো। তার পরে যেই রবিবার আসতো অমনি মাছগুলোকে ধরে আনতো। তারা বলতো যে, আমরা শনিবারে তো মাছ ধরিনি। মাছ তো ঘেরার মধ্যে ছিলো এবং তারা মুক্ত অবস্থায়ই ছিলো।

ওই জনপদের অধিবাসীদের আরেকটি দল শনিবারে মাছকে ঘেরা দিয়ে আটকে রাখার এ কাজটাকে আল্লাহর আইনকে ফাঁকি দেয়া ও তার সাথে ছলচাতুরী করার শামিল মনে করতো। তারা এই অমান্যকারী দলকে তাদের এই ছলচাতুরীর খারাপ পরিণাম সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিতো এবং তা খুব অপছন্দ করতো।

তৃতীয় অপর একটি দল সৎ কাজের আদেশ দানকারী ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধকারী ওই দলটাকে বলতো, এই সব পাপাচারীকে যে এত সদুপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছ, এতে লাভ কী? ওরা যে পথ অবলম্বন করেছে তা থেকে ফিরবে না। আল্লাহ তায়ালা ওদেরকে শাস্তি দেয়া ও ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন।

---

(১) 'ফী যিলালি কোরআন'–এর সূরা আনয়ামের আয়াত ৫৯ 'তারই কাছে রয়েছে অদৃশ্য জগতের চাবি .....' এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

'যখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল বললো, আল্লাহ তায়ালা যে দলকে ধ্বংস করে দিতে কিংবা কঠোর শাস্তি দিতে বদ্ধ-পরিকর, তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছ কেন?'

অর্থাৎ তারা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লংঘন করার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে ধ্বংস অথবা কঠিন শাস্তি বরাদ্দ করার পর তাদেরকে উপদেশ দিয়ে ও সতর্ক করে কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না।

'তারা বললো, তোমাদের প্রতিপালকের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্যে এবং এতে হয়তো বা তারা সংযত হবে।'

অর্থাৎ আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি। সৎ কাজের আদেশ দান, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ কাজ থেকে সাবধান করা আমাদের কর্তব্য। আমরা এই কর্তব্য পালন করে যাচ্ছি যাতে আল্লাহর কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারি এবং তিনি জানতে পারেন যে, আমরা আমাদের কর্তব্য পালনে ত্রুটি করিনি। তাছাড়া এও বিচিত্র নয় যে, আমাদের এ উপদেশ হয়তো ওই সব পাপাচারীর মনকে প্রভাবিত করবে এবং তাতে খোদাভীতি ও সংযমের প্রেরণা সঞ্চার করবে।

এভাবে ওই জনপদটির অধিবাসীরা তিন দলে বা উম্মাহতে বিভক্ত হলো। আয়াতে 'উম্মাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় উম্মাহ বলতে এমন একটি মানব গোষ্ঠীকে বুঝায়, যারা একই আকীদা, একই চিন্তাধারা ও একই আদর্শের অনুসারী এবং একই নেতৃত্বের অনুগত। প্রাচীন ও আধুনিক জাহেলী পরিভাষায় একটি ভূ-খন্ডের অধিবাসী ও একটি রাষ্ট্রের শাসনাধীন জনগোষ্ঠীকে যেমন একটি জাতি বলা হয়, ইসলামী পরিভাষায় সে ধরনের জনগোষ্ঠীকে জাতি বা উম্মাহ বলা হয় না। উম্মাহ বা জাতির এ অর্থ ইসলামে স্বীকৃত নয়। এটা প্রাচীন বা আধুনিক জাহেলিয়াতের পরিভাষা তথা অনৈসলামী পরিভাষা।(১)

ইসলামী পরিভাষার আলোকে একই জনপদের অধিবাসীরা তিনটি 'উম্মাহ'তে বিভক্ত হয়েছিলো। একটি হলো, খোদাদ্রোহী বা পাপাচারী উম্মাহ; অপরটি ছলচাতুরীর মাধ্যমে পাপ কাজ অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ইতিবাচক প্রতিরোধ রচনাকারী, ওই অন্যায় কাজকে প্রত্যাখ্যানকারী ও তা বর্জনের উপদেশ দানকারী উম্মাহ এবং তৃতীয়টি দুষ্কর্ম ও দুষ্কর্ম অনুষ্ঠানকারীদেরকে আপন অবস্থায় পরিত্যাগকারী, নেতিবাচক প্রতিরোধ রচনাকারী ও সক্রিয় প্রতিরোধের বিরোধী 'উম্মাহ'। এখানে তিন ধরনের চিন্তা ও কর্ম তিনটি মানব গোষ্ঠীকে তিনটি 'উম্মাহ'তে পরিণত করেছে।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত সদুপদেশ যখন বিফলে গেলো এবং বিপথগামী লোকেরা তাদের বিপথগামিতা অব্যাহত রাখলো, তখন আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কার্যকর ও তাঁর হুমকি বলবৎ হলো। দেখা গেলো যে, যারা খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতো, তারা খারাপ পরিণতি ও আযাব থেকে রক্ষা পেলো এবং আল্লাহদ্রোহী গোষ্ঠীটি এমন কঠোর শাস্তি পেলো, যার বিবরণ সামনে আসছে। আর তৃতীয় গোষ্ঠীটি সম্পর্কে কোরআন নীরব। সম্ভবত তাদের মর্যাদাহীন দেখানোর উদ্দেশ্যে—

(১) আরবী ভাষায় 'উম্মাহ' শব্দটা কখনো কখনো স্রেফ একটা দল বা গোষ্ঠী অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কোরআনে এক স্থানে হযরত মূসা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সে যখন মাদয়ানের জলাশয়ে নামলো, তখন দেখলো, সেখানে একদল মানুষ (পশুদেরকে) পানি খাওয়াচ্ছে।' আবার কখনো তা ইমাম বা নেতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন কোরআনে এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় ইবরাহীম আল্লাহর একনিষ্ঠ অনুগত একজন 'উম্মাহ' (নেতা) ছিলো।' এ আয়াতে শব্দটির মধ্যে এ অর্থও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, তিনি একাই একটা দল স্বরূপ ছিলেন। তবে এ সব অর্থ 'উম্মাহ' শব্দটার ইসলামী পরিভাষাগত অর্থকে কোনোভাবেই ব্যাহত বা পরিবর্তিত করে না। সে অর্থটা হলো, একই আদর্শ ও আকীদার অনুসারী মানবগোষ্ঠী।

যদিও তারা আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছে। তারা কার্যকর ও ইতিবাচক প্রতিরোধে এগিয়ে না আসায় এবং নেতিবাচক অসম্মতি জ্ঞাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় শাস্তির যোগ্য না হলেও অবহেলিত ও অনুল্লেখিত থাকার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে।

'তাদেরকে যা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিলো তা যখন তারা ভুলেই রইলো, তখন আমি দুষ্কর্ম থেকে নিষেধকারীদেরকে অশুভ পরিণাম থেকে রক্ষা করলাম এবং অপরাধীদেরকে তাদের অবাধ্যতার কারণে কঠিন শাস্তি দিলাম। তারা যখন নিষিদ্ধ কাজ অব্যাহত রাখলো তখন আমি তাদেরকে বললাম, নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও।'

কুচক্রী অপরাধীদের ওপর যে আযাব নাযিল হয়েছিলো তা ছিলো তাদের না-ফরমানী অব্যাহত রাখার শাস্তি। কোরআন এই জিনিসটাকেই কুফর বলে আখ্যায়িত করে থাকে। কখনো কখনো একে ফিস্‌ক এবং যুলুম বলেও অভিহিত করে থাকে। কুফর ও শেরককে যুল্‌ম ও ফিস্‌ক বলে আখ্যায়িত করা কোরআনে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটা রীতি। ফেকাহ অর্থাৎ ইসলামী আইন শাস্ত্রের পরিভাষায় এগুলোর অর্থ একটু ভিন্ন। কিন্তু এ শব্দগুলোর প্রচলনের অনেক পরে এগুলোর এই পরিভাষাগত অর্থের উৎপত্তি হয়েছে। কেননা কোরআনে এ সব শব্দের অর্থ এগুলোর ফেকাহ শাস্ত্রীয় অর্থ থেকে আলাদা।

যা হোক, তাদের শাস্তিটা ছিলো তাদের মানুষ্য আকৃতি থেকে বানরের আকৃতিতে রূপান্তর। প্রবৃত্তির লালসা ও কামনা বাসনার ওপর বিবেকের প্রাধান্য হলো মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্টকে বিসর্জন দিয়ে তারা যখন মনুষ্যত্ব থেকে নীচে নেমে গেলো এবং মনুষ্য বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত জীব জানোয়ারের পর্যায়ে পর্যবসিত হলো, তখন তাদেরকে বলা হলো যে, তারা নিজেদের জন্যে যে হীন ও নীচ স্থান বেছে নিয়েছে, সে স্থানেই অবস্থান করুক।

প্রশ্ন এই যে, তারা কিভাবে বানরে রূপান্তরিত হলো? বানরে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাদের পরিণতি কী হলো? মূল জাতি থেকে রূপান্তরিত প্রত্যেক প্রাণী যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তারাও কি তেমনি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো? নাকি তারা বানর হিসেবেই বংশ বিস্তার অব্যাহত রেখেছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব প্রশ্নে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোরআন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। তাছাড়া এসব বিষয়ে রসূল (স.) এরও কোনো উক্তির উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না। সুতরাং এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

'আমি তাদেরকে বললাম, নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও।'

এরপর তারা বানর হয়ে গেলো। কেননা তাঁর কথাকে ব্যর্থ ও অকার্যকর করে দিতে পারে এমন কোনো শক্তি কোথাও নেই।

ইহুদীদের ওপর আল্লাহর গযব

এরপর শেষ নবীর ওপর ঈমান আনয়নকারী ও তার বাস্তব অনুসারীরা ছাড়া সকল বনী ইসরাঈলীর ওপর আল্লাহর অভিশাপ নেমে এসেছে। কেননা তাদের অব্যাহত নাফরমানী ও অবাধ্যতার একটা পর্যায় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে এরূপ অপরিবর্তনীয় ও অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,

'আর তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাদের ওপর নিকৃষ্টতম নির্যাতনকারীদেরকে পাঠাবেন। তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।'

এটা আল্লাহর চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ঘোষণা, যা এর সূচনাকাল থেকেই অব্যাহত রয়েছে। এ জন্যে ইহুদীদের ওপর যুগে যুগে জঘন্য নির্যাতন নিপীড়নকারী শাসক চেপে বসেছে। আজও এ ঘোষণা সাধারণভাবে কার্যকর রয়েছে। তাই মাঝে মাঝে তাদের ওপর জঘন্য নিপীড়ক শাসক এসে থাকে। যখনই তারা সীমাহীন অত্যাচার, আগ্রাসন ও যুলুম নিপীড়ন চালিয়েছে, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর যালেম শাসককে চাপিয়ে দিয়েছেন। এটাই এই আল্লাহদ্রোহী গোষ্ঠীর ন্যায্য পাওনা। কেননা তারা সর্বদাই চুক্তি ও অংগীকার লংঘন করে থাকে। এক পাপ ত্যাগ করলে তৎক্ষণাত আর এক পাপে লিপ্ত হয় এবং এক বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে ফিরে এলে আর এক বিকৃতি ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়।

কখনো কখনো মনে হয় যে, ইহুদীদের অভিশাপ বুঝি তামাদি হয়ে গেছে এবং তারা খুব মর্যাদাশালী ও পরাক্রমশালী হয়ে গেছে। ইতিহাসের দু'একটা অধ্যায় এরূপ আসে এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ে আবার কোন্ অত্যাচারী তাদের ওপর চেপে বসে তা কেউ জানে না। কেয়ামত পর্যন্তই এভাবে চলতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা ইসরাঈলীদের ব্যাপারে তাঁর এই ঘোষিত নীতি কেয়ামত পর্যন্ত চালু রেখেছেন এবং এ কথা স্বীয় কোরআনের মাধ্যমে তাঁর নবীকে জানিয়েও দিয়েছেন। সেই সাথে নিজের আযাব ও রহমত নামক দুটো বৈশিষ্টের উল্লেখপূর্বক মন্তব্যও করেছেন যে, 'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক দ্রুত আযাব দানকারী এবং ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।'

তাঁর দ্রুত আযাব দেয়ার বৈশিষ্ট্যের দরুনই তিনি তার আযাবের উপযুক্ত লোকদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন যেমন দিয়েছেন সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীকে। আবার তিনি নিজ ক্ষমা ও দয়াগুণে বনী ইসরাঈলের সেই সব লোকের তাওবা কবুল করে থাকেন, যারা তওবা করে এবং তাওরাতে ও ইনজীলে যে শেষ নবীর কথা তারা লিখিত পেয়েছে তার অনুসারী হয়। তাঁর আযাব কোনো জিঘাংসা বা বিদ্বেষপ্রসূত ব্যাপার নয়। এটা কেবল তাদের জন্যে ন্যায়সংগত প্রতিফল, যারা নিজেদেরকে এর যোগ্য বানায়। আবার এর অপর পার্শ্বেই রয়েছে তাঁর দয়া ও ক্ষমার প্রসারিত হাত।

এরপর চলতে থাকে ইতিহাসের পালাবদলের সাথে সাথে কাহিনীর পটপরিবর্তন। মূসা (আ.) ও তাঁর খলীফাদের পরে বনী ইসরাঈলের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে যেতে যেতে শেষ নবীর সমকালীন প্রজন্মে স্থানান্তর এবং মদীনার মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রসংগ,

'আমি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে জাতিতে জাতিতে বিভক্ত করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিলাম। তাদের মধ্যে কতক ছিলো সৎ, আর কতক ছিলো তার চেয়ে নিম্ন মানের। আর আমি তাদেরকে সুখ দিয়েও পরীক্ষা করেছি এবং দুঃখ দিয়েও, যাতে তারা ফিরে আসে।' ...... (আয়াত ১৬৮-১৭০)

এ পর্যন্ত সেই মাদানী আয়াতগুলো শেষ হয়েছে, যা মূসা (আ.)-এর পরে বনী ইসরাঈলের কাহিনীর পূর্ণতা দানের জন্যে এই মক্কী সূরার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হযরত মূসার পরে বনী ইসরাঈল রকমারি মতবাদ ও মতাদর্শ অবলম্বনকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তখন তাদের মধ্যে সৎ ও অসৎ উভয় শ্রেণীরই সমাবেশ ঘটেছিলো। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরীক্ষা করার ধারা অব্যাহত রাখলেন। কখনো সম্পদ সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য দিয়ে, কখনো দুঃখ দুর্দশা দিয়ে। এর উদ্দেশ্য ছিলো তাদেরকে সৎপথে ফিরে আসতে অনুপ্রাণিত করা। বস্তুত ক্রমাগত পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের শামিল। কেননা এতে তাদেরকে স্মরণ করানো এবং ধ্বংসকারী ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা হয়।

'অতপর অযোগ্য উত্তর পুরুষরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে কেতাবের উত্তরাধিকারী হয়। তারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে। অথচ তাদের কাছে অনুরূপ সামগ্রী গেলে তারা তাও গ্রহণ করে।' (আয়াত- ১৬৯)

মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সেই পূর্ব পুরুষদের পর যে উত্তর-পুরুষেরা জন্মেছে তাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা কেতাবের শুধু উত্তরাধিকারীই হয়নি, বরং তা পড়েছেও। কিন্তু তারা তদনুযায়ী নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলেনি এবং তাদের মন ও চালচলন তা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। একটা আদর্শ যখন নিছক একটি পঠিত সংস্কৃতি ও সংরক্ষিত বিদ্যার আকারে টিকে থাকে, তখন তার যেমন অবস্থা হয়, ইসরাঈলীদের জীবনে তাওরাত, ইনজীল ও অন্যান্য আসমানী কেতাবের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ হয়েছিলো। তারা কোনো দুনিয়াবী সামগ্রী দেখলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো হালাল হারামের বাছবিচার করতো না আর এই বলে তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতো যে, 'আমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।' এ ধরনের সামগ্রী যখনই নাগালের মধ্যে আসতো, তখনই তারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো।

এরপর নেতিবাচক প্রশ্ন করা হচ্ছে,

'তাদের কাছ থেকে কি কেতাবের অংগীকার নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? আর তারা তো কেতাবে যা আছে, তা পাঠ করে।'

অর্থাৎ কেতাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছ থেকে কি এই মর্মে অংগীকার নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর উক্তির অপব্যাখ্যা করবে না এবং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে সত্য ছাড়া আর কোনো কথা প্রচার করবে না? সে রকম অংগীকার যখন নেয়া হয়েছে, তখন তারা কিভাবে বলে যে, 'আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে' এবং কিভাবেই বা তারা যে কোনো তুচ্ছ পার্থিব সামগ্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? আর এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে কিভাবে তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মনগড়া কথা বলে এবং ক্ষমা পাওয়ার নিশ্চয়তা ব্যক্ত করে? তারা তো ভালো করেই জানে যে, আল্লাহ তায়ালা কেবল আন্তরিকভাবে তওবাকারী এবং পাপকাজকে বাস্তবিকভাবে পরিত্যাগকারীর তওবাই কবুল করে থাকেন। অথচ তাদের অবস্থা তো এরকম নয়। তারা আল্লাহর কেতাব অধ্যয়ন করেও এবং তার মধ্যে কী আছে তা জেনে শুনেই যে কোনো তুচ্ছ দুনিয়াবী সামগ্রী দেখলেই তার ওপর বারংবার ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহর কেতাব যতোই অধ্যয়ন করা হোক, তা যতোক্ষণ মানুষের মনকে প্রভাবিত না করে, ততোক্ষণ সেই অধ্যয়নে কোনো উপকার হয় না। দিনরাত ইসলামী বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে, অথচ মন ইসলাম থেকে যোজন যোজন দূরে এমন লোক অনেক রয়েছে। তারা এগুলো পড়ে শুধু তার অপব্যাখ্যা করা, ছল-চাতুরী করা, শব্দকে বিকৃত করা, এবং পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের জন্যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ফতোয়া বের করার লক্ষ্যে। বস্তুত যারা আল্লাহর দ্বীনকে শুধু অধ্যয়ন করার জন্যেই অধ্যয়ন করে, তাকে নিজেদের জন্যে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে না এবং আল্লাহকে ভয় করে না, তারাই ইসলামের জন্যে সবচেয়ে বড় আপদ।

'আর আখেরাতই খোদাভীরুদের জন্যে সর্বোত্তম। তোমরা কি তা বুঝতে পারো না?'

হাঁ, আখেরাতের জীবনই অগ্রগণ্য। যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের অন্তরে আখেরাতের গুরুত্ব অনেক বেশী। তার সমান গুরুত্ব আর কোনো কিছুর নেই। একমাত্র আখেরাত চেতনাই তাকে তুচ্ছ পার্থিব সামগ্রীর লালসা থেকে রক্ষা করে। একমাত্র আখেরাত চেতনা দ্বারাই মানুষের মন ও জীবন পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং সঠিক পথে চালিত হয়। আখেরাত চেতনা ছাড়া আর কোনো

জিনিসই তার মন থেকে অবৈধ পার্থিব সামগ্রীর লালসা মুছে ফেলতে পারে না, আর কোনো কিছুই তার মনকে লোভ ও খোদাদ্রোহ থেকে মুক্ত রাখতে পারে না। আর কোনো কিছুই তার মনের অবৈধ জিনিসের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ দমন করতে পারে না। দুর্নিবার সংগ্রাম ও সংঘাতে সে যতোই হারুক, তার আখেরাতের পাওনা যে কখনো হাতছাড়া হতে পারে না এই প্রত্যয় তার মনকে নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত রাখে। হক ও বাতিলের সংগ্রামে এবং ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্বে যখন দুনিয়ার স্বার্থ হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মন্দ বিজয়ী ও বাতিল পরাক্রান্ত হয়, তখন আখেরাতের বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মানুষকে হকের পথে অবিচল রাখতে পারে না।

পার্থিব জীবনের হাজারো উত্থান পতন ও বিপদ মুসিবতে মানুষকে ন্যায়ের ওপর বহাল থাকার শক্তি যোগাতে আখেরাত বিশ্বাসের কোনো বিকল্প নেই। আর এই আখেরাত খোদাভীরু, ক্ষমাশীল এবং সত্যের পথে অবিচল লোকদের জন্যে কল্যাণময়।

এই আখেরাত বিশ্বাস একটি অদৃশ্য জিনিস। 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে'র প্রবক্তারা এ বিশ্বাসটাকে আমাদের মনমগয থেকে মুছে ফেলতে চায়। এর পরিবর্তে তারা 'বিজ্ঞান-এর নামে একটা বিকৃত কুফরী ধারণাকে আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করতে চায়।

আর এই অপচেষ্টার কারণেই মানব জীবন ধ্বংস হতে চলেছে, মানুষের মন বিকারগ্রস্ত হতে চলেছে এবং ঘুষ, দুর্নীতি ও লোভ লালসার এমন উন্নত প্রতিযোগিতা চলছে, যা আখেরাত বিশ্বাস ছাড়া আর কোনো কিছু দিয়েই রোধ করা সম্ভব নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা, অবজ্ঞা ও অবহেলার যে সর্বব্যাপী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটতে চলেছে, একমাত্র আখেরাত-বিশ্বাসই তার একমাত্র ওষুধ।

যে বিজ্ঞান কোনো অদৃশ্য জিনিসের অস্তিত্ব মানতে চায় না, সেটা বিজ্ঞান নয় বরং অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর একটা মূর্খতা ও অজ্ঞতা। এই মূর্খতা স্বয়ং মানবীয় জ্ঞানেরই বিলুপ্তি ঘটাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর মূর্খরাই কেবল এই অজ্ঞতাপ্রসূত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করছে। এই মূর্খতা মানব প্রকৃতির বিরোধী। তাই এটি মানব জীবনের এমন ক্ষতি সাধন করছে, যা গোটা মানব জাতিকে ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে। এই তথাকথিত বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আসলে একটা ভয়ংকর ইহুদীবাদী ষড়যন্ত্র, যা গোটা মানব জাতির জীবন থেকে সততা ও বিশুদ্ধতা হরণ করে নিতে চায়, যাতে করে পরিণামে মানব জাতিকে ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যের পদানত করা সহজ হয়। বিজ্ঞানের নামে অদৃশ্য তত্ত্বের বিরুদ্ধে তোতা পাখির মতো শেখানো বুলি দেশে দেশে আওড়ানো হচ্ছে ইহুদীবাদীদের ইংগিতেই। অথচ খোদ ইহুদীবাদীরা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব নীলনকশা বাস্তবায়ন করছে, তা তাদের ভয়ংকর ষড়যন্ত্র কার্যকর করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান সম্মতভাবেই করছে।

যেহেতু আখেরাত ও খোদাভীতির বিষয় দুটি জীবন ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়, তাই পার্থিব স্বার্থের জন্যে যারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তাদেরকে কোরআন বুদ্ধির কাছে সঁপে দিচ্ছে।

'আর আখেরাতের আবাসভূমিই খোদাভীরুদের জন্যে সর্বোত্তম। তোমরা কি বুঝবে না?'

বস্তুত মানুষ যদি আবেগ তাড়িত হওয়ার পরিবর্তে বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হতো ও বুঝে সুঝে সিদ্ধান্ত নিত এবং বিজ্ঞান নামধারী মূর্খতার পরিবর্তে সত্যাভিসারী জ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার ফয়সালা করতো, তাহলে তার কাছে পার্থিব স্বার্থের চেয়ে আখেরাতই উত্তম বিবেচিত হতো এবং আল্লাহভীতি ও সততা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের সম্বল হতো।

'আর যারা কেতাবকে আঁকড়ে ধরে ও নামায কায়েম করে, সেই সব সংস্কারকের প্রতিদান আমি নষ্ট করি না।' (১৭০)

এখানে পরোক্ষভাবে সেই সব বনী ইসরাঈলীর সমালোচনা করা হয়েছে, যারা কেতাবে কী আছে তা পড়ে দেখেছে এবং তাদের কাছ থেকে আল্লাহর কেতাব মেনে চলার অংগীকারও নেয়া হয়েছে, অথচ তারা তাদের পঠিত কেতাবকে আঁকড়ে ধরে না, তদনুসারে কাজও করে না এবং তাদের চিন্তায়, কর্মে, জীবনে ও আচরণে ওই কেতাবের আলোকে ফায়সালা করে না। তবে এই সুস্থ ও পরোক্ষ সমালোচনা সত্তেও আয়াতটি উন্মুক্ত। এর বক্তব্য সকল অবস্থা ও সকল প্রজন্মের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য।

'ইউমাসসেকুনা' (আঁকড়ে ধরে) শব্দটা একটা দর্শনীয় ও অনুভবযোগ্য অর্থ নির্দেশ করে। এ থেকে কেতাবকে শক্ত ও মযবুতভাবে ধরার দৃশ্য ফুটে ওঠে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কেতাবকে ও তার ভেতরকার বক্তব্য বিষয়কে এরূপ মযবুতভাবে গ্রহণ করা পছন্দ করেন। তবে এই মযবুতভাবে ধরা বা আঁকড়ে ধরার মধ্যে কোনো গোয়ার্তুমি, হঠকারিতা বা গোঁড়ামি নেই। আঁকড়ে ধরা, শক্ত ও মযবুতভাবে গ্রহণ করা বা দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এক কথা, আর গোঁড়ামি ও গোয়ার্তুমি অন্য কথা। দৃঢ়তায় উদারতা ও নমনীয়তার অবকাশ থাকে কিন্তু শৈথিল্য, অলসতা ও উদাসীনতার অবকাশ থাকে না। শক্তভাবে কোনো নীতিকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে প্রশস্ততার অবকাশ আছে, কিন্তু বিদ্রোহ, অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের অবকাশ নেই। মযবুতভাবে ধারণ করাটা বাস্তব অবস্থার সাথে তার সমন্বয় সাধনের বিরোধী নয়। তবে বাস্তবতাকে আল্লাহর বিধানের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দেয়ার বিরোধী। বাস্তবতাকে সামগ্রিকভাবে ও নীতিগতভাবে আল্লাহর বিধানের অধীন রাখা অপরিহার্য।

আল্লাহর কেতাব বা বিধানকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা ও নামায কায়েম করা অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক এবাদাতসমূহ পালন করা পার্থিব জীবনকে সৎ, নিষ্কলুষ ও উদ্বেগমুক্ত রাখার আল্লাহর শেখানো পদ্ধতির দুটো অংশ। এখানে আনুষ্ঠানিক এবাদাতের সাথে যুক্ত করে কেতাবকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরার বিষয়টির উল্লেখ একটা সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য নির্দেশ করে। সেই তাৎপর্য এই যে, পার্থিব জীবনের সংস্কার ও সংশোধনের লক্ষ্যে মানব জীবনে আল্লাহর কেতাবের শাসন প্রতিষ্ঠা যেমন জরুরী, মানব মনের সংশোধনের জন্যে আনুষ্ঠানিক এবাদাতও তেমনি জরুরী। তাই এ দুটো হচ্ছে জীবন ও হৃদয়ের পরিশুদ্ধির পদ্ধতির দুটো অংশ। এই পদ্ধতির অনুসরণ ছাড়া কোনো কিছুর সংস্কার ও সংশোধন সম্ভব নয়। 'আমি সংস্কারকদের প্রতিদান নষ্ট করি না' এই কথাটার মধ্যে সংস্কার ও সংশোধনের উল্লেখ দ্বারা উপরোক্ত বিষয়টির দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর কেতাবকে কার্যকরভাবে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরা ও আনুষ্ঠানিক এবাদাতসমূহ বাস্তবায়িত করা এই দুটো হচ্ছে সংস্কার ও সংশোধনের দুটো হাতিয়ার। এই হাতিয়ার ব্যবহার পূর্বক যারা সংস্কার ও সংশোধনের কাজ সমাধা করে, তাদের প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা বিফল করেন না।

আল্লাহর বিধানের এই দুটো অংশকে পরিত্যাগ করলেই সমগ্র মানব জীবন বৈকল্য, বিকৃতি ও ব্যর্থতার শিকার হয়ে থাকে। সেই দুটো অংশ হলো, (১) আল্লাহর কেতাবকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা ও তাকে মানব জীবনে শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং (২) মনের পরিশুদ্ধি আনয়নকারী ও আহলে কেতাবের ন্যায় আল্লাহর আইনকে অপব্যাখ্যা ও অপকৌশলের আশ্রয় না নিয়ে হুবহু বাস্তবায়নের অভ্যাস সৃষ্টিকারী আনুষ্ঠানিক এবাদাতসমূহ ত্যাগ করা। শুধু প্রাচীন আহলে কেতাব

নয় বরং যে কোনো কেতাবধারীই এরূপ করতে পারে যখন তার অন্তর এবাদাত বা দাসত্ব চেতনা হারানোর কারণে আল্লাহর ভয়ও হারিয়ে বসে।

আল্লাহর দ্বীন একটা পূর্ণাংগ জীবন বিধান। এ বিধান আল্লাহর কেতাবের ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। আর এবাদাতের ভিত্তিতে মনকে পরিশুদ্ধ করে। তাই মন আল্লাহর কেতাবের অনুসারী হয়ে যায়। এভাবে জীবন ও মন দুইই পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর এ বিধানকে উপেক্ষা করা বা এর বিকল্প খোঁজা কেবল তাদেরই কাজ, যাদের জন্যে আযাব ও দুর্ভোগ বরাদ্দ হয়ে রয়েছে।

সূরার এই কাহিনী অংশের উপসংহারে আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে কিভাবে অংগীকার নিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করেন ১৭১ নং আয়াতে,

'আমি যখন পাহাড় উপড়ে তাদের মাথার ওপর শামিয়ানার মতো তুলে ধরলাম এবং তারা ভেবেছিলো যেন ওটা তাদের ওপর পতিত হবে, বলেছিলাম যে, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা শক্তভাবে ধরো এবং তাতে যা কিছু আছে তা স্মরণ করো। হয়তো তোমরা সংযত হবে।'

এটা এক অবিস্মরণীয় অংগীকার। এমন এক পরিস্থিতিতে এ অংগীকার নেয়া হয়েছে যা ভোলা যায় না। মাথার ওপর পাহাড়কে শামিয়ানার মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো এবং মনে হচ্ছিলো যেন পাহাড়টা এক্ষুণি পড়ে বনী ইসরাঈলকে পিষে মেরে ফেলবে। এই অবস্থায় অংগীকার নেয়া হয়েছিলো। ওই দিন অংগীকার দিতে তারা ইতস্তত করছিলো। তাই এমন একটা ভয়ংকর অলৌকিক কান্ড ঘটিয়ে অংগীকার নেয়া হলো, যা পরবর্তীতে তাদেরকে শৈথিল্য থেকে মুক্ত করতে সক্ষম। সেই অলৌকিক ঘটনার পরিবেশে তাদেরকে আন্তরিক ও দৃঢ়ভাবে অংগীকার করতে ও তা কঠোরভাবে পালন করতে আদেশ দেয়া হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো যে, এ অংগীকারে যেন তারা কোনো শৈথিল্য প্রদর্শন না করে এবং তা যেন সব সময় স্মরণ করে ও আলোচনা করে, যাতে তা মনে থাকে, তাদের মনে আল্লাহর ভয় জন্মে এবং আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক এতোটা ঘনিষ্ঠ থাকে যাতে ভুল না হয়।

কিন্তু বনী ইসরাঈলের চিরাচরিত স্বভাবের তখনো পরিবর্তন হয়নি। তারা অংগীকার ভংগ করলো, আল্লাহকে ভুলে গেলো এবং পাপে ডুবে গেলো। ফলে আল্লাহর গযব ও অভিশাপের যোগ্য হলো। আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মনোনীত করেছিলেন এবং তাঁর অসীম নেয়ামতে ভূষিত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন, তাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ, অকৃতজ্ঞতা ও অংগীকার ভুলে যাওয়ার কারণে তাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি কার্যকর হলো। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর যুলুম করেন না। তাদের ওপরও যুলুম করেননি।

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾

রুকু ২২

১৭২. (তোমরা স্মরণ করো,) যখন তোমাদের মালিক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের (পরবর্তী) সন্তান-সন্ততিদের বের করে এনেছেন এবং তাদের নিজেদের ওপর (এ মর্মে আনুগত্যের) স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন যে, আমি কি তোমাদের মালিক নই? তারা (সবাই) বললো, হাঁ নিশ্চয়ই, আমরা (এর ওপর) সাক্ষ্য দিলাম, (এর উদ্দেশ্য ছিলো) যেন কেয়ামতের দিন তোমরা একথা বলতে না পারো যে, আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। ১৭৩. কিংবা (একথাও যেন না) বলো যে, আল্লাহর সাথে শেরেক তো আমাদের বাপ-দাদারা আগে করেছে– আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর, বাতিলপন্থীদের কার্যক্রমের জন্যে কি তুমি আমাদের ধ্বংস করবে? ১৭৪. এভাবেই আমি (অতীতের) দৃষ্টান্তসমূহ তাদের কাছে খোলাখুলি বর্ণনা করি, সম্ভবত এরা (সোজা পথে) ফিরে আসবে। ১৭৫. (হে মোহাম্মদ,) তুমি তাদের কাছে (এমন) একটি মানুষের কাহিনী (পড়ে) শোনাও, যার কাছে আমি (নবীর মাধ্যমে) আমার আয়াতসমূহ নাযিল করেছিলাম, সে তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, অতপর শয়তান তার পিছু নেয় এবং সে সম্পূর্ণ গোমরাহ লোকদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে। ১৭৬. (অথচ) আমি চাইলে তাকে এ (আয়াতসমূহ) দ্বারা উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম, কিন্তু সে তো (ঊর্ধ্বমুখী আসমানের বদলে) নিম্নমুখী যমীনের প্রতিই আসক্ত হয়ে পড়ে এবং (পার্থিব) কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। তার উদাহরণ হচ্ছে কুকুরের উদাহরণের মতো, যদি তুমি তাকে দৌড়াতে থাকো তবু সে (জিহ্বা বের করে) হাঁপাতে থাকে, আবার তোমরা সেটিকে ছেড়ে দিলেও সে (জিহ্বা ঝুলিয়ে) হাঁপাতে থাকে; এ হচ্ছে তাদের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, এ কাহিনীগুলো (তাদের) তুমি পড়ে শোনাও, হয়তো বা তারা চিন্তা-গবেষণা করবে।

سَآءَ مَثَلًا ۨالْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٧٧﴾ مَنْ
يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾ وَلَقَدْ
ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۫ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫
وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ
كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ
الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨١﴾
وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٢﴾

১৭৭. যে সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার নিদর্শনসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করে আসছে, তাদের উদাহরণ কতোই না নিকৃষ্ট ! ১৭৮. আল্লাহ তায়ালা যাকে পথ দেখান সে (সঠিক) পথ প্রাপ্ত হবে, আবার যাকে তিনি গোমরাহ করেন তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত (হয়ে পড়ে)। ১৭৯. বস্তুত বহু সংখ্যক মানুষ ও জ্বিন (আছে, যাদের) আমি জাহান্নামের জন্যেই পয়দা করেছি, তাদের কাছে যদিও (বুঝার মতো) দিল আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা চিন্তা করে না, তাদের কাছে (দেখার মতো) চোখ থাকলেও তারা তা দিয়ে (সত্য) দেখে না, আবার তাদের কাছে (শোনার মতো) কান আছে, কিন্তু তারা সে কান দিয়ে (সত্য কথা) শোনে না; (আসলে) এরা হচ্ছে কতিপয় জন্তু-জানোয়ারের মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তাদের চাইতেও এরা বেশী প্রথভ্রষ্ট, এসব লোকেরা (দারুণ) উদাসীন। ১৮০. আল্লাহ তায়ালার জন্যেই যাবতীয় সুন্দর নামসমূহ (নিবেদিত), অতএব তোমরা সে সব ভালো নামেই তাঁকে ডাকো এবং সেসব লোকের কথা ছেড়ে দাও যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়; যা কিছু তারা (দুনিয়ার জীবনে) করে এসেছে, অচিরেই তার যথাযথ ফল তারা পাবে। ১৮১. আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের (মানুষ ও জ্বিনদের) মাঝে (আবার) এমন একটি দল আছে, যারা (মানুষকে) সঠিক পথের দিকে ডাকে এবং (সেমতে) নিজেরাও (নিজেদের জীবনে) ইনসাফ কায়েম করে।

রুকু ২৩

১৮২. যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, ক্রমে ক্রমে আমি তাদের এমনভাবে (ধ্বংসের দিকে ঠেলে) নিয়ে যাবো, তারা (তা) টেরও পাবে না।

وَأُمۡلِي لَهُمۡ ۚ إِنَّ كَيۡدِي مَتِينٌ ۝ أَوَلَمۡ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَوَلَمۡ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَٰوَٰتِ وَالۡأَرۡضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيۡءٍ وَأَنۡ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ اقۡتَرَبَ أَجَلُهُمۡ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍۭ بَعۡدَهُۥ يُؤۡمِنُونَ ۝ مَن يُضۡلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُۥ ۚ وَيَذَرُهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ ۝ يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرۡسَىٰهَا ۖ قُلۡ إِنَّمَا عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقۡتِهَآ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتۡ فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالۡأَرۡضِ ۚ لَا تَأۡتِيكُمۡ إِلَّا بَغۡتَةً ۗ يَسۡـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنۡهَا ۖ قُلۡ إِنَّمَا عِلۡمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ۝ قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ الۡغَيۡبَ

১৮৩. আমি তাদের (বিদ্রোহের) জন্যে অবকাশ দিয়ে রাখবো এবং (এ ব্যাপারে) আমার কৌশল (কিন্তু) অত্যন্ত শক্ত। ১৮৪. তারা কি কখনো চিন্তা করে দেখে না! তাদের সাথী (মোহাম্মদ) কোনো পাগল নয়; সে তো হচ্ছে (আযাবের) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। ১৮৫. তারা কি আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের (বিষয়টির) দিকে কখনো তাকিয়ে দেখে না এবং তাকিয়ে দেখে না আল্লাহ তায়ালা এখানে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন (তার প্রতি- এবং এর প্রতিও যে,) তাদের (অবস্থানের) মেয়াদও হয়তো নিকটবর্তী হয়ে এসেছে, এর পর আর কোন্ কথা আছে যা বললে এরা ঈমান আনবে? ১৮৬. আল্লাহ তায়ালা যাকে পথহারা করে দেন তাকে পথে আনার আর (দ্বিতীয়) কেউই নেই; আল্লাহ তায়ালা তো তাদের (সবাইকেই) তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দেন। ১৮৭. তারা তোমার কাছে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, এ দিনটি কখন সংঘটিত হবে; তুমি (তাদের) বলো, এ জ্ঞান তো (রয়েছে) আমার মালিকের কাছে, এর সময় আসার আগে তিনি তা প্রকাশ করবেন না, (তবে) আকাশমন্ডল ও যমীনের জন্যে সেদিন তা হবে একটি ভয়াবহ ঘটনা; এটি তোমাদের কাছে একান্ত আকস্মিকভাবেই; তারা (এ প্রশ্নটি এমনভাবে) জিজ্ঞেস করে যে, মনে হয় তুমি বুঝি বিষয়টি সম্পর্কে সব কিছু জানো; (তাদের) বলো, কেয়ামতের জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ সত্যটুকু) জানে না। ১৮৮. তুমি (আরো) বলো, আমার নিজের ভালো-মন্দের মালিকও তো আমি নই, তবে আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই হয়; যদি আমি অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতাম, তাহলে আমি (নিজের জন্যে সে জ্ঞানের জোরে)

لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ

অনেক ফায়দাই হাসিল করে নিতে পারতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না, আমি তো শুধু (একজন নবী, জাহান্নামের) সতর্ককারী ও (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী মাত্র, শুধু সে জাতির জন্যে যারা আমার ওপর ঈমান আনে।

রুকু ২৪

১৮৯. তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকে পয়দা করেছেন এবং (পরবর্তী পর্যায়ে) তার থেকে তিনি তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার (জুড়ির) কাছে (গিয়ে) সে পরম শান্তি লাভ করতে পারে, অতপর যখন (পুরুষ) সাথীটি (তার) মহিলা সাথীটিকে (দৈহিক প্রয়োজনের জন্যে) ঢেকে দিলো, তখন মহিলা সাথীটি এক লঘু গর্ভ ধারণ করলো (এবং প্রথম দিকে) সে এ নিয়েই চলাফেরা করলো; পরে যখন সে (গর্ভের কারণে ওযনে) ভারী হয়ে এলো, তখন তারা (পুরুষ-মহিলা) উভয়েই তাদের মালিককে ডেকে বললো, হে আল্লাহ তায়ালা, যদি তুমি আমাদের একটি সুস্থ ও পূর্ণাংগ সন্তান দান করো, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমার কৃতজ্ঞতা আদায়কারীদের দলে শামিল হবো। ১৯০. পরে (সত্যিই) যখন তিনি তাদের উভয়কে একটি (নিখুঁত) ও ভালো সন্তান দান করলেন, তখন তারা যা কিছু (সন্তানের আকারে আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদের দেয়া হয়েছে (সে ব্যাপারেই) অন্যদের শরীক বানিয়ে নিলো, আল্লাহ তায়ালা কিন্তু তাদের এ শরীক বানানো থেকে অনেক পবিত্র। ১৯১. এরা কি আল্লাহ তায়ালার সাথে এমন কিছুকে শরীক (মনে) করে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদের নিজেদেরই সৃষ্টি করা হয়! ১৯২. তারা তাদের কাউকে কোনো রকম সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা নিজেদেরও কোনো রকম সাহায্য করতে পারে না। ১৯৩. তোমরা যদি এ (মূর্খ) লোকদের হেদায়াতের পথের দিকে আহবান করো, তারা তোমাদের কথা শুনবে না, (তাই) তোমরা তাদের হেদায়াতের পথে ডাকো কিংবা চুপ করে থাকো– উভয়টাই তোমাদের জন্যে সমান কথা।

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَا ز اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَا ز اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَا ز اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ط قُلِ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنَ ۝ اِنَّ وَلِيِّ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ز وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ۝ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ط وَتَرٰهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝

১৯৪. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের (সাহায্যের জন্যে) ডাকো, তারা তো তোমাদের মতোই কতিপয় বান্দা, তোমরা তাদের ডেকেই দেখো না, তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হলে তাদের উচিত তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া। ১৯৫. তাদের কি কোনো পা আছে যার (ওপর ভর) দিয়ে তারা চলতে পারে, অথবা তাদের কি কোনো (ক্ষমতাধর) হাত আছে যা দিয়ে তারা সব কিছু ধরতে পারে, কিংবা তাদের কি কোনো চোখ আছে যা দিয়ে তারা (সব কিছু) দেখতে পারে, কিংবা আছে তাদের কোনো কান যা দিয়ে তারা শুনতে পারে! তুমি বলো, তোমরা ডাকো তোমাদের শরীকদের, এরপর তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো, (ষড়যন্ত্র করার সময়) আমাকে কোনো অবকাশও দিয়ো না। ১৯৬. (তুমি তাদের বলো,) নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন, তিনি হামেশাই ভালো লোকদের অভিভাবকত্ব করেন। ১৯৭. আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে যাদের তোমরা ডাকো, তারা তোমাদের কোনো রকম সাহায্য করতে সক্ষম নয়, (এমন কি) তারা নিজেদেরও কোনো রকম সাহায্য করতে পারে না। ১৯৮. তোমরা যদি (কখনো) তাদের হেদায়াতের পথে আসার আহ্বান জানাও, তবে তারা শুনতেই পাবে না; (কথা বলার সময়) যদিও তুমি দেখছো, তারা তোমার দিকেই চেয়ে আছে, কিন্তু এরা (সত্য) দেখতেই পায় না।

তাফসীর

আয়াত ১৭২-১৯৮

এই গোটা পর্বটি তাওহীদ ও শেরক সংক্রান্ত আলোচনায় পরিপূর্ণ। ইতিপূর্বে এ সূরার কাহিনী পর্বটাও পুরোপুরিভাবে এই একই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো। তবে সেই পর্বটি ছিলো সকল

রসূলের পক্ষ থেকে তাওহীদের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া ও শেরকের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা এবং তারপর সেই সতর্কবাণীর বাস্তবায়নের ঘটনা বর্ণনার আকারে।

বর্তমান পর্বে তাওহীদের বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন ও গভীর এক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে মানুষের সেই জন্মগত স্বভাব ও প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে, যে স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যে স্বভাব-প্রকৃতির ভিত্তিতে মানুষ অণুপরমাণুর জগতে বিরাজমান থাকা অবস্থায়ই তার কাছ থেকে অংগীকার নেয়া হয়েছে। আল্লাহকে একমাত্র মনিব ও প্রতিপালক বলে স্বীকার করা মানব সত্ত্বার স্বভাবগত ও জন্মগত আচরণ। স্রষ্টা স্বয়ং তাঁর সৃজিত এই মানুষের অভ্যন্তরে এই স্বভাব সংরক্ষণ করে রেখেছেন। আর এ স্বভাবটার অস্তিত্ব যেহেতু বাস্তবেই রয়েছে এবং মানুষ তা তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনুভবও করে, তাই সে নিজেও তার সাক্ষী। এরপর কেবল সেইসব লোককে স্মরণ করিয়ে দেয়া ও সতর্ক করে দেয়ার প্রয়োজনেই রসূলদের আগমন ঘটে থাকে, যারা তাদের স্বভাবগত অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়। বিচ্যুত ও পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণে এই সতর্কীকরণ তাদের জন্যে প্রয়োজন। মানুষের প্রথম সৃষ্টিলগ্ন থেকেই তার স্বভাব প্রকৃতি ও স্রষ্টার মাঝে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে রয়েছে যে, সে এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত ও আনুগত্য করবে না। কাজেই এ চুক্তি লংঘনের কোনো অধিকার তার নেই– এমনকি যদি কোনো নবী ও রসূল তার কাছে নাও আসতো এবং স্মরণ করিয়ে ও সতর্ক করে নাও দিতো। তবে আল্লাহ তায়ালা নেহাৎ দয়া পরবশ হয়ে এ ব্যবস্থাটা করেছেন যে, তাদের স্বভাবের ওপর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে না এবং তাদের বিবেকের ওপরও নির্ভরশীল করে রাখা হবে না। বরং তাদের কাছে নবী ও রসূলদেরকে পাঠানো হবে, যাঁরা তাদেরকে সতর্ক করবেন ও সুসংবাদ দেবেন, যাতে করে মানুষ আল্লাহর ওপর কোনো অনুযোগ না করতে পারে। এ ব্যবস্থাটা করার কারণ এই যে, মানুষের স্বভাব প্রকৃতি কখনো কখনো বিকৃত এবং তার বিবেক কখনো কখনো পথভ্রষ্টও হয়ে যেতে পারে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য পর্বে তাওহীদের বিষয়টি উপস্থাপন করা হচ্ছে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সূরার কয়েকটি পর্যায়ে এই প্রধান বিষয় তাওহীদ নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেয়া হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, যা বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে বনী ইসরাঈলে সংঘটিত হয়েছিলো। তবে খুব সম্ভবত এটা তেমন কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা নয় বরং রূপক ঘটনা, যা যে কোনো স্থানে ও যে কোনো সময়ে ঘটতে পারে। ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা হাজারো বার ঘটেছে। যখনই কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দেয়া হয়, তখন সেই জ্ঞান তাকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করবে এটাই প্রত্যাশিত। অথচ দেখা যায় যে, কেউ কেউ সেই জ্ঞান থেকে পিঠটান দেয়, তা দ্বারা উপকৃত হয় না বা তদনুসারে কাজ করে না এবং যারা এই জ্ঞান লাভ করেনি তাদেরই মতো গোমরাহীর পথে চলতে থাকে। বরং এই জ্ঞানের সাথে ঈমানের সংযোগ না থাকায় সে তাদের চেয়েও বেশী বিপথগামী হয়ে থাকে। যদি ঈমানের সংযোগ থাকতো, তবে সেই ঈমান তার এই জ্ঞানকে অন্ধকার পথে আলোর মশালে পরিণত করতো।

আর এক পর্যায়ে অন্য একটি ঘটনায় মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি কিভাবে বিকৃত হয়ে তাওহীদ থেকে শেরকের দিকে ধাবিত হয়, তার দৃশ্য অংকন করা হয়েছে। উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, এক দম্পতি তাদের অনাগত সন্তান সম্পর্কে ভালো ভালো আশা পোষণ করে এবং আল্লাহর

কাছে দোয়া ও অংগীকার করে যে, তিনি যদি তাদেরকে একটা সৎ সন্তান দেন, তবে তারা তার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকবে। অথচ যেই আল্লাহ তাদেরকে একটা উত্তম সন্তান দিলেন অমনি আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে বসলো।

আরেক পর্যায়ে মানব সত্ত্বার জন্মগত ইন্দ্রিয়গুলোর অকর্মণ্যতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই অকর্মণ্যতা তাকে গোমরাহীর এমন স্তরে নিয়ে পৌঁছে দেয়, যেখানে মানুষ পশুর চেয়েও অধম হয়ে যায় এবং সে জাহান্নামের কাষ্ঠে পরিণত হয়। এই যন্ত্রগুলোর অকর্মণ্যতার দরুন তাদের হৃদয় থাকতেও তা দিয়ে তারা সত্যকে উপলব্ধি করে না, চোখ থাকতেও তা দিয়ে তারা ভালো জিনিস দেখে না এবং তাদের কান থাকতেও তা দিয়ে তারা ভালো জিনিস শোনে না। ফলে সে এমন গোমরাহীতে নিক্ষিপ্ত হয় যেখান থেকে আর ফিরে আসার অবকাশ থাকে না।

আর এক পর্যায়ে এই সব অকর্মণ্য ইন্দ্রিয়গুলোকে সক্রিয় করার প্রেরণা যোগানো হয়েছে এবং আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিজগত, আকাশ ও পৃথিবীর দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ ও তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে তাকে সেই অজানা ও অদৃশ্য মুহূর্তটি সম্পর্কে সজাগ করা হয়েছে যার অপর পারে রয়েছে মৃত্যু। আর এই সম্মানিত রসূলের অবস্থা বিবেচনা করে দেখার আদেশ দেয়া হয়েছে, যিনি মানুষকে হেদায়াতের পথে ডাকছেন, অথচ পথভ্রষ্ট লোকেরা তাঁকে পাগল বলে অপবাদ দিচ্ছে।

আর এক পর্যায়ে তাদের কথিত দেবদেবী নিয়ে এই মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে মানুষের ইলাহ বা খোদা হওয়ার যোগ্যতা তো নেই-ই, উপরন্তু তাদের জীবনই নেই বরং তারা সম্পূর্ণ নির্জীব।

সবার শেষে রসূল (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন মোশরেকদেরকে এবং তাদের দেবদেবীকে চ্যালেঞ্জ দেন, বয়কট করেন এবং সেই অভিভাবকের শরণাপন্ন হন, যিনি ছাড়া আর কোনো অভিভাবক নেই। যিনি কেতাব নাযিল করেছেন এবং সৎ লোকদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন।'

সৃষ্টিলগ্নে আল্লাহর সাথে মানবজাতির অংগীকার

পূর্ববর্তী পর্বে বনী ইসরাঈলের কাহিনীর শেষে আল্লাহ তায়ালা তাদের মাথার ওপর পাহাড় তুলে ধরে তাদের কাছ থেকে অংগীকার গ্রহণের দৃশ্য দেখিয়েছেন। আর এই পর্বটি শুরু করেছেন সেই সর্ববৃহৎ অংগীকারের ঘটনা দ্বারা, যা তিনি সমগ্র মানব জাতির কাছ থকে নিয়েছেন। আর এ অংগীকার গ্রহণের ঘটনাটা ঘটেছিলো ঝুলন্ত পাহাড়ের চেয়েও অনেক বেশী আতংকজনক ও গুরুগম্ভীর পরিবেশে।

'স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের মধ্য থেকে তথা তাদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের ওপর সাক্ষী মেনে বললেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো, হাঁ। আমরা সাক্ষ্য দিলাম ......' (আয়াত ১৭২, ১৭৩, ১৭৪)

এ হচ্ছে স্বভাব ও আকীদা সংক্রান্ত একটা বিষয়। কোরআন তার চিরাচরিত রীতি অনুসারে এটিকে একটি দৃশ্যের আকারে উপস্থাপন করেছে। এটি একটি অনন্য দৃশ্য। অদৃশ্য জগতে লুক্কায়িত ও আদম সন্তানদের পিঠের মধ্যে সুপ্ত ভাবি বংশধরকে দৃশ্যমান জগতে আত্মপ্রকাশ করার আগে মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিজের মুঠোর মধ্যে ধারণ ও তার সাথে তাঁর কথোপকথনের দৃশ্য। নিজ মুঠোর মধ্যে এনে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই?' এর জবাবে তারা তাঁকে রব হিসাবে এবং নিজেদেরকে তাঁর গোলাম

ও দাস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। তারা সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ছাড়া আর কোনো রব নেই। অথচ এ সময় তারা অণুপরমাণুর আকারে বিক্ষিপ্ত এবং মহান স্রষ্টার মুঠোর মধ্যে একত্রিত।

এটি একটি বিস্ময়কর মহাজাগতিক দৃশ্য। ভাষায় যে সব ধ্যান-ধারণাকে উপস্থাপন করার ঐতিহ্য রয়েছে, এটি তার মধ্যে নযীরবিহীন। মানুষ তার সর্বোচ্চ কল্পনাশক্তি প্রযোগ করে যখন এটি কল্পনা করতে চেষ্টা করে, তখন এ দৃশ্য অপূর্ব ও আশ্চর্যজনক বলে প্রতীয়মান হয়। আর যখন সে সেই অগণিত কোষসমূহের সমবেত হওয়া এবং মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টা কর্তৃক তাদের সত্ত্বার অভ্যন্তরে গচ্ছিত শক্তি বলে তাদের বুদ্ধিমানসুলভ কথা বলার এ দৃশ্য কল্পনা করে, শুধু কথা বলা নয়, জ্ঞানীগুণী লোকদের ন্যায় সাড়া দেয়া, স্বীকার করা, সাক্ষ্য দেয়া ও ঔরসে থাকা অবস্থায় তাদের কাছ থেকে অংগীকার গ্রহণের কথা কল্পনা করে, তখন তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

মানুষ যখন এই অনন্য ও বিস্ময়কর দৃশ্য কল্পনা করে, তখন তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে জাগ্রত হয় এক সুগভীর শিহরণ। সে তখন কিলবিল করে সাঁতার কাটতে থাকা একটা অণু মাত্র। প্রত্যেক কোষে তখন জীবন ও প্রচ্ছন্ন যোগ্যতা বিদ্যমান। প্রতিটি কোষে একজন করে পরিপূর্ণ গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ রয়েছে। এক অজানা সত্ত্বার হৃদয়ে সুপ্ত যে আকৃতিতে ওই কোষটির আত্মপ্রকাশের ব্যবস্থা নির্ধারিত রয়েছে, সেই আকৃতিতে আত্মপ্রকাশের অনুমতি লাভের জন্যে সে অপেক্ষমাণ। আর কোনো এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশের আগেই সে কিনা অংগীকারেও আবদ্ধ হচ্ছে।

কোরআন সৃষ্টিজগতের ও মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির গভীরতম প্রকোষ্ঠে লুকানো সেই মহাসত্যটির এহেন বিস্ময়কর ও নযিরবিহীন দৃশ্য উপস্থাপন করেছে আজ থেকে প্রায় চৌদ্দ শতাব্দী আগে। যখন মানুষ মানব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে কোনো প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য জানতো না– জানতো শুধু অলীক কিছু কল্পনা। এরপর এতগুলো শতাব্দী কেটে যাওয়ার পর মানুষ এসব তত্ত্ব ও তথ্যের কিছু অংশ মাত্র জানতে পারছে। আজ বিজ্ঞান বলছে যে, বংশানুগতি নিয়ন্ত্রণকারী যে জনক কোষসমূহ মানুষের রেকর্ড সংরক্ষণ করে এবং যাতে প্রতিটি ব্যক্তির গুণবৈশিষ্ট সুপ্ত থাকে, সেই কোষগুলোই হচ্ছে পিতৃ ঔরসের কোষ। এই সকল জনক অর্থাৎ পিতৃকোষে তিন শো কোটি মানুষের রেকর্ড সংরক্ষণ করে থাকে এবং তাতে তাদের সকলের গুণবৈশিষ্ট সুপ্ত থাকে। অথচ এর আয়তন এক বর্গ সেন্টিমিটারের বেশী নয়।(১) এ তথ্য যদি সেদিন কেউ বলতো, তবে তাকে উন্মাদ বলা হতো। আল্লাহ তায়ালা সত্যই বলেছেন, 'আমি অচিরেই তাদেরকে মহাবিশ্বে ও তাদের সত্ত্বার ভেতরে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো, যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই বাণী সত্য।' (সূরা হামিম সাজদা)

ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)-এর পিঠ হাত দিয়ে স্পর্শ করা মাত্রই তিনি কেয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষকে সৃষ্টি করবেন, তারা সবাই বেরিয়ে এলো। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলের কাছ থেকে অংগীকার নিলেন এবং নিজেদের ওপর তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন যে, 'আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো হাঁ।'

---

(১) ডিএনএ এবং জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং–এর সর্বশেষ আবিস্কার এতোই বিস্ময়কর যে, তাতে দেখা যায় কয়েক হাজার কোটি মানুষের জীবন-বৃত্তান্ত এমনকি তাদের দৈনন্দিন অভ্যাসসমূহ পর্যন্ত একটি সুঁচছিদ্র বিশিষ্ট ব্লাড সেলে সংরক্ষণ করা।..............–সম্পাদক

এখন প্রশ্ন জাগে যে, ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিলো? কিভাবে আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং সাক্ষ্য ও অংগীকার নিলেন? কিভাবে তাদেরকে বললেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই? আর তারা জবাব দিলোই বা কিভাবে? এর জবাব এই যে, আল্লাহ তায়ালা যেমন অদৃশ্য, তেমনি তাঁর কার্যকলাপের পদ্ধতিও অদৃশ্য। মানুষের মেধা-শক্তি যেমন আল্লাহর সত্ত্বাকে উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনি তিনি কোনো কাজ কিভাবে করেন তাও বুঝতে পারে না। কেননা কাজের প্রক্রিয়া মূল সত্ত্বারই অংশ বিশেষ। আল্লাহর যে কোনো কাজের বিবরণ কোরআন ও হাদীস থেকে জানা গেলে তা তিনি কিভাবে করেন তা বুঝবার চেষ্টা না করেই মেনে নিতে হবে। আল্লাহর বহু কাজের বিবরণ কোরআনে আছে। যেমন 'তিনি আকাশে সোজা হয়ে অবস্থান করলেন ....' 'তিনি সোজা হয়ে আরশের ওপর অবস্থান করলেন .....' 'আল্লাহ যা চান নিশ্চিহ্ন করেন ও যা চান সংরক্ষণ করেন।' 'আকাশ তাঁর ডান হাত দিয়ে ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে,' 'তোমার প্রভু ও ফেরেশতারা কাতারে কাতারে আসবেন।' 'যে কোনো তিন জন গোপন আলাপ করলে আল্লাহ হন চতুর্থ........' এ ধরনের উক্তিগুলোতে আল্লাহর যে সব কাজের বিবরণ রয়েছে, তার পদ্ধতি না বুঝেও তা মেনে নিতে ও বিশ্বাস করতে হবে। কারণ যে আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করা হয়েছে, এ কাজগুলো সেই আল্লাহরই অংশ। তাই এগুলোও না বুঝে বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যেহেতু দৃশ্যমান জগতে আল্লাহর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিছুই নেই, তাই তাঁর সত্ত্বা ও তাঁর কাজকর্মের পদ্ধতিও বুঝবার কোনো উপায় নেই। কেননা তাঁর কাজ অমুকের কাজের মতো এমন কথা বলা সম্ভব নয়। যদি কেউ তাঁর কোনো কাজকে তাঁর কোনো সৃষ্টির কাজের অনুরূপ বলে ভাবতে চেষ্টা করে, তবে সে চেষ্টা হবে বিভ্রান্তিকর। কেননা সৃষ্টির সত্ত্বার সাথে তাঁর সত্ত্বার যেমন মিল নেই, তেমনি সৃষ্টির কাজের সাথেও তাঁর কাজের সাদৃশ্য নেই। যুগে যুগে যে সব দার্শনিক আল্লাহর কাজের বিবরণ দিতে চেষ্টা করেছে, তারা কেবল মূর্খতা ও ভ্রষ্টতারই পরিচয় দিয়েছে এবং জগাখিচুড়ি বানিয়ে ফেলেছে।

এছাড়া এ আয়াতের আরো একটা ব্যাখ্যা রয়েছে। সেটি এই যে, আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানদের কাছ থেকে যে অংগীকার গ্রহণ করেছেন, সেটা ছিলো সৃষ্টিকালীন অংগীকার। তাই বলা যায়, তাদেরকে তিনি একমাত্র আল্লাহকে মনিব মেনে নেয়ার স্বভাবসুলভ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ বিশ্বাসটাকে তাদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। তাই এই স্বভাব নিয়েই তারা জন্মগ্রহণ করে। পর তার কোনো কাজ দ্বারা সে এই স্বভাব থেকে বিচ্যুত ও বিপথগামী হয়ে যেতে পারে।

ইবনে কাসীর স্বীয় তাফসীরে বলেছেন, 'এই সাক্ষী বানানোর অর্থ হলো তাদেরকে একত্ববাদের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা। যেমন ইতিপূর্বে আবু হোরায়রা বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম হাসান বসরীও আয়াতটির এরূপ তাফসীর করেছেন। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমার প্রতিপালক যখন আদম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরকে বের করলেন, আদমের পিঠ থেকে বলেননি। 'তাদের বংশধরকে বের করলেন' একথা দ্বারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী প্রজন্মের পর প্রজন্ম সৃষ্টি করে তাদের বংশ বিস্তারের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন।' আরো বলেছেন, 'তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করে থাকেন।' আরো বলেছেন, 'যেমন তোমাদেরকে অন্য একটি জাতির বংশধর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।'

অতপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাদেরকে নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়েছেন যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বললো হাঁ অর্থাৎ তাদেরকে মৌখিকভাবে নয়, বরং কার্যত এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছেন যে, হাঁ, তুমিই আমাদের মনিব ও প্রভু। তাফসীরকাররা বলেছেন যে, সাক্ষ্য দু'রকমের হয়ে থাকে। কখনো হয় মৌখিক। যেমন আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন, 'তারা (কেয়ামতের দিন) বলবে, আমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম। ইহকালীন জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে (অর্থাৎ স্বীকার করেছে) যে, তারা কাফের ছিলো।' আবার কখনো হয় বাস্তব। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'মোশরেকেরা নিজেদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষী হওয়া (অর্থাৎ স্বীকার করা) সত্তেও তারা আল্লাহর মসজিদগুলোকে আবাদ করবে এ অধিকার তাদের নেই।' (অর্থাৎ তারা মুখে স্বীকার না করলেও তাদের বাস্তব অবস্থা সাক্ষী যে, তারা কাফের। অনুরূপভাবে আল্লাহর এ উক্তিটাও বাস্তব সাক্ষ্যের একটি উদাহরণ, 'আর সে এ ব্যাপারে (অর্থাৎ তার অকৃতজ্ঞ হওয়ার ব্যাপারে) সাক্ষী।' অনুরূপভাবে জিজ্ঞাসাও কখনো মৌখিক এবং কখনো বাস্তব হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু চেয়েছ দিয়েছেন।' তাফসীরকাররা বলেছেন, এই সাক্ষী বানানোকে যে আল্লাহ তায়ালা তাদের শেরকের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন, তা থেকেই বুঝা যায় যে, এই সাক্ষ্য দ্বারা বাস্তব সাক্ষ্য বুঝানো হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাওহীদের স্বীকৃতি মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবেই বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'যেন তোমরা কেয়ামতের দিন বলতে না পার যে, আমরা এটা (তাওহীদ) জানতাম না।

এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে,

বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, 'প্রত্যেক নবজাত শিশু স্বভাবধর্মের ওপর, অন্য রেওয়ায়াত অনুসারে, এই ধর্মের ওপর (উভয় রেওয়ায়াতেরই ইংগিত ইসলামের দিকে) জন্মগ্রহণ করে থাকে। এরপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান কিংবা অগ্নি-উপাসক বানায়।'

'সহীহ মুসলিমে হযরত ইয়ায ইবনে হাম্মার বর্ণনা করেন যে, রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, আমি আমার বান্দাদেরকে শুধু আমার এবাদাতকারী হিসাবে সৃষ্টি করেছি। এরপর তাদের কাছে শয়তান এলো, তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দিলো এবং তাদের জন্যে আমি যা কিছু হালাল করেছি, তা সে হারাম করে দিয়েছে।'

ইমাম আবু জাফর ইবনে জারীর (র.) বর্ণনা করেন যে, বনু সাদ গোত্রের আসওয়াদ বিন সারী বলেছেন, আমি রসূল (স.)-এর সাথে চারটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। এর একটি যুদ্ধে মুসলমানরা জনৈকা নারী যোদ্ধাকে হত্যা করার পর শিশুদের ওপরও হামলা করে বসে। এ কথা জানতে পেরে রসূল (স.) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন, 'শিশুদের ওপর হামলাকারীদের কী হয়েছে?' এক ব্যক্তি বললো, 'ইয়া রসুলাল্লাহ, তারা কি মোশরেকদের সন্তান নয়? রসূল (স.) বললেন, 'মোশরেকদের সন্তানরা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। মনে রেখো, প্রত্যেক শিশুই স্বভাবধর্মের (ইসলামের) ওপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। যতোক্ষণ সে কথা বলা না শেখে ততোক্ষণ এভাবেই থাকে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী কিংবা খৃষ্টান বানায়।' হাসান বলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কেতাবে বলেছেন, 'স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বললো, হাঁ।.........'

আমার মতে, 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই' এই প্রশ্নের জবাবে আদম সন্তানদের বংশধরদের সেই অণুগুলো বা কোষগুলোর 'হাঁ' বলাটা বাস্তব না হয়ে শাব্দিকভাবে হওয়াও অসম্ভব নয়। আমাদের ধারণা এই যে, ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালা যেভাবে ব্যক্ত করছেন, ঠিক সেই ভাবেই হয়ে থাকতে পারে। আল্লাহ তায়ালা যখন যা চান, তা হতে বাধা দেয় এমন কেউ নেই। তবে ইবনে কাসীর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকেও আমি অসম্ভব মনে করি না। হাসান বসরীও এটা উল্লেখ করেছেন এবং এর সপক্ষে এই আয়াত দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। প্রকৃত ঘটনা কী ছিলো, তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

উভয় ব্যাখ্যা থেকেই এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর সাথে মানব প্রকৃতির একটা দায়বদ্ধতা অবশ্যই রয়েছে, তাহলো তারা অবশ্যই এককভাবে তাঁর এবাদাত করবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তাওহীদের মর্মবাণী মানব প্রকৃতিতে বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাই প্রত্যেক নবজাত সন্তান পৃথিবীতে আসার সময় ওটা সাথে করেই নিয়ে আসে। বাইরের কোনো উপকরণ তাকে বিপথগামী না করলে সে তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। মানুষের মধ্যে সুপথ ও কুপথ উভয়টাতে চলার যে ক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, বাইরের উপকরণ সেটাকে কাজে লাগায়। মানুষের মধ্যকার প্রচ্ছন্ন এই যোগ্যতা ও ক্ষমতা বিরাজমান বিভিন্ন অবস্থার কারণেও আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

তাওহীদের মর্মবাণী শুধু যে মানুষের প্রকৃতিতেই বদ্ধমূল তা নয়, বরং তার পারিপার্শ্বিক বিশ্ব প্রকৃতিতেও তা বিদ্যমান। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সমগ্র বিশ্বের প্রকৃতিরই একটি অংশ। উভয়ে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ। উভয়ে একই প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত। উভয়ে ওই মহাজাগতিক সত্য অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে নিজের স্বীকৃতি ও প্রতিক্রিয়া কোনো না কোনো পন্থায় ব্যক্ত করতে সক্ষম।

তাওহীদ ভিত্তিক প্রাকৃতিক নিয়ম যে গোটা বিশ্ব জগতকে পরিচালনা করছে, সেটা বিশ্বজগতের আকার ও আকৃতি, তার সুষ্ঠু সমন্বয়, তার বিভিন্ন অংশের ভারসাম্য, তার গতি ও তৎপরতার সুশৃংখলতা, তার নিয়ম কানুনের স্থিতিশীলতা এবং এই নিয়ম কানুন অনুসারে তার প্রতিটি কার্যক্রম থেকে সুস্পষ্ট। সর্বোপরি মানুষ বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে যে সামান্য জ্ঞান অর্জন করেছে, তদনুসারে বিশ্ব প্রকৃতির অণুপরমাণুগুলোর উৎপত্তি যে মৌলিক পদার্থ থেকে হয়েছে তাও এক ও অবিমিশ্র। সে পদার্থটা হলো মহাজাগতিক রশ্মি। সকল পদার্থ তার অণুপরমাণু ধ্বংস হয়ে গেলে ও তার বাহন থেকে মুক্ত হয়ে গেলে ওই রশ্মির কাছেই ফিরে যায়। এ থেকেও তাওহীদের অকাট্যতা প্রমাণিত হয়। মানুষ পর্যায়ক্রমে বিশ্ব নিখিলের স্বভাব প্রকৃতিতে ও তার নিয়ম কানুনে তাওহীদ বা একত্ববাদের নিয়ম বিধির এক একটা অংশ আবিষ্কার করে চলেছে। এটা যদিও যান্ত্রিক নিশ্চয়তার সাথে আবিষ্কার করছে না, তবে আল্লাহর স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে ও তাঁর নির্ধারিত পরিমাণ মোতাবেক অব্যাহতভাবে নিত্যনতুন তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছে। তবে মানুষের এই অনুমানভিত্তিক জ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত এসব তথ্যের ওপর আমরা পুরোপুরি আস্থাশীল নই। কেননা মানবীয় উপায় উপকরণের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে এ সব তথ্য সুনিশ্চিত প্রাকৃতিক নিয়ম জানাতে সক্ষম নয়।

এ দ্বারা আমরা শুধু একটু ধারণাই পেতে পারি। কোনো নিশ্চিত প্রাকৃতিক তথ্য জানবার ব্যাপারে আমরা সর্বপ্রথম যে জিনিসের ওপর আস্থাশীল হতে পারি, তা হলো স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদেরকে যে তথ্য জানান। কোরআন আমাদেরকে সন্দেহাতীতভাবে অবহিত করে

যে, মহাবিশ্ব যে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় তা একত্ববাদ বা তাওহীদ থেকেই উৎসারিত। সেই নিয়মটা একমাত্র মহান আল্লাহর একক ইচ্ছারই সৃষ্ট। কোরআন একথাও অকাট্যভাবে জানায় যে, এই মহাবিশ্ব তার সৃষ্টি ও পালনকর্তা মহান আল্লাহরই গোলাম ও অনুগত দাস, সে তাঁর একত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং তাঁর এবাদাত করে। তবে এসব কিভাবে করে, সেটা আল্লাহ তায়ালাই জানেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা যতোটুকু আমাদেরকে জানান, আমরা তার চেয়ে বেশী জানি না। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাঁর সৃষ্টিকে নিরবিচ্ছন্নভাবে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনার যে সব নিদর্শন আমরা দেখতে পাই, তা থেকেও এ বিষয়ে কিছুটা অবগত হয়ে থাকি।

তাওহীদ সম্পর্কে কোনো ওযর নেই

আল্লাহর অবারিত ইচ্ছা ও তাঁর শাশ্বত নির্দিষ্ট রীতি নীতি অনুসারে গোটা বিশ্বকে পরিচালনাকারী এই প্রাকৃতিক নিয়ম বিধি মানব সত্ত্বার ওপরও সক্রিয়। কেননা মানুষও এই বিশ্ব প্রকৃতিরই অংশ। এই নিয়মবিধি মানুষেরও স্বভাব প্রকৃতিতে গভীরভাবে বদ্ধমূল। এটাকে অনুভব করতে তার কোনো বিশেষ বুদ্ধির প্রয়োজন পড়ে না। কেননা ওটা স্বভাবসুলভ ভাবেই অনভূত হয়ে থাকে।

তার সত্ত্বার গভীরতম স্থানে তার স্থিতিশীল অবস্থান রয়েছে। সে আপনা থেকেই তার অস্তিত্ব অনুধাবন করে এবং তদনুসারে কাজ করে, যতোক্ষণ অন্য কোনো কারণে তা ব্যাহত ও বিকৃত না হয়। এমন যখন হয়, তখন সে তার স্বতস্ফূর্ত উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত ও ভ্রষ্ট হয় এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনার হাতে তার পরিচালনার ভার অর্পণ করে। অথচ সৃষ্টিগতভাবে তার নিজের মধ্যে সক্রিয় স্থায়ী নিয়ম দ্বারা তা পরিচালিত হওয়া উচিত।

এই প্রাকৃতিক নিয়ম স্বয়ং মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও তার স্রষ্টার মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি বিশেষ। এ চুক্তি মানুষের দেহ ও মনে এবং তার প্রতিটি জীবন্ত কোষে সংরক্ষিত রয়েছে তার জন্মলগ্ন থেকেই। এ চুক্তি নবী রসূলদের চেয়েও পুরানো। এই চুক্তির অধীন প্রতিটি কোষ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রভুত্বের সাক্ষ্য দেয়। তিনি নিজে যেমন এক ও অদ্বিতীয়, তেমনি তাঁর ইচ্ছাও এক এবং তাঁর রচিত যে প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের স্বভাব প্রকৃতিকে শাসন ও পরিচালনা করে তাও এক। সুতরাং মৌখিকভাবেই হোক কিংবা বাস্তবভাবেই হোক, একবার যখন স্বভাবগত চুক্তি সম্পাদিত ও সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, তখন আর প্রতিবাদ করার অবকাশ থাকবে না। একথা বলার অবকাশ থাকবে না যে, তাওহীদের পথ প্রদর্শনকারী আল্লাহর কেতাব সম্পর্কে এবং তাওহীদের দিকে আহ্বানকারী রসূলদের সম্পর্কে আমরা সচেতন ছিলাম না। এ কথাও বলার অবকাশ থাকবে না যে, আমি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার পিতামাতাকে শেরকে লিপ্ত দেখেছি, তাই তাওহীদ সম্পর্কে অবহিত হবার উপায় খুঁজে পাইনি। আমার পিতামাতা পথভ্রষ্ট ছিলো বলে আমিও পথভ্রষ্ট হয়েছি। কাজেই পিতামাতাই আসল দোষী। আমি নির্দোষ। এ জন্যেই পরবর্তী দুটি আয়াতে এই সাক্ষ্য সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে,

'যাতে তোমরা বলতে না পার যে, আমরা এ সম্পর্কে অবহিত ছিলোম না, কিংবা এও বলতে না পারো যে, আমাদের পূর্ব পুরুষরা তো আমাদের আগেই শেরকে লিপ্ত ছিলো। আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি আপনি বাতিলপন্থীদের কৃতকর্মের দায়ে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?' (আয়াত ১৭২-১৭৩)

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াশীল। তিনি জানেন যে, তাঁর বান্দাদেরকে কেউ গোমরাহ করলে তাদের গোমরাহ হয়ে যাওয়ার অবকাশ রয়েছে এবং স্বয়ং রসূল (স.) বলেছেন যে, জ্বিন ও মানব জাতিভুক্ত শয়তানদের অপতৎপরতাজনিত বিভ্রান্তিকর উপকরণসমূহের প্রভাবে তার স্বভাব প্রকৃতি বিকৃত ও বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। কেননা ঐ শয়তানরা মানব স্বভাবের দুর্বল তার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত ফেলতে পারে। তাই আল্লাহ তায়ালা স্থির করেছেন যে, জন্মগত ও স্বভাবগত অংগীকারের ভিত্তিতে এবং ন্যায় অন্যায় বাছ বিচারের জন্যে তিনি যে বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন তার ভিত্তিতে তাদের হিসাব নেবেন না। বরং তাদের স্বভাব প্রকৃতিকে মরিচা, নিষ্ক্রিয়তা ও বিকৃতি থেকে এবং তাদের বিবেককে প্রবৃত্তির লালসা ও দুর্বলতা থেকে রক্ষা করার মানসে তাদের কাছে নবী রসূল ও কেতাব প্রেরণ করবেন। যদিও আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, জন্মগতভাবে তিনি মানুষকে যে যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়েছেন এবং যে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন, তা নবী রসূল ও কেতাব ছাড়াই হেদায়াত লাভ করার জন্যে যথেষ্ট হতো এবং বান্দাদেরকে কেবল এ জন্মগত যোগ্যতা ও বিবেকবুদ্ধির ভিত্তিতেই দায়ী করা ও প্রতিফল দেয়া যেতো। কিন্তু তিনি নিজ জ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং নবী ও রসূলের আগমনের ভিত্তিতেই তাকে দায়ী করা ও কর্মফল দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন,

'এভাবেই আমি আয়াতগুলো বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে।' (আয়াত ১৭৪)

অর্থাৎ তারা তাদের মূল স্বভাব ধর্মে, আল্লাহর সাথে করা অংগীকারে এবং আল্লাহ তাদেরকে জন্মগত ও স্বভাবগতভাবে যে অন্তর্দৃষ্টি ও বোধশক্তি দান করেছেন তার দিকে ফিরে আসে। এসব সুপ্ত স্বভাবগত যোগ্যতা ও ক্ষমতার কাছে ফিরে আসতে পারা তথা এগুলোর কর্মক্ষমতা পুনর্বহাল হওয়া হৃদয়ে তাওহীদ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে। নিশ্চিত করে তার সেই এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার কাছে প্রত্যাবর্তনকে, যিনি তাকে তাওহীদ বিশ্বাস সহকারেই সৃষ্টি করেছেন, অতপর তার ওপর আরো অনুগ্রহ করে তাকে স্মরণ করানো ও সতর্ক করার জন্যে কেতাব ও মোজেযাসহ রসূলদেরকে পাঠিয়েছেন।

দ্বীন থেকে বিচ্যুত দুনিয়াদার আলেমের পরিণতি

সহজ সরল স্বভাব ধর্ম থেকে বিচ্যুত ও বিপথগামী হওয়া, আল্লাহর কাছে জবাবদিহীর বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করে তাঁর সাথে সম্পাদিত অংগীকার লংঘন করা এবং আল্লাহর কেতাব ও নিদর্শনাবলীকে জানা ও দেখার পর তার অবাধ্য হওয়া যে কী গুরুতর পরিণাম বহন করে, তার উদাহরণ রয়েছে পরবর্তী তিনটি আয়াতে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর কেতাবের জ্ঞান দান করেছেন এবং তাঁর দৃষ্টি ও চিন্তাধারাকে সে ওই কেতাব অনুসারে পরিচালিত করতে সমর্থ ছিলো, অথচ তা না করে সে কেতাব প্রদর্শিত পথ ত্যাগ করলো, তার অনুকরণ থেকে সে বিচ্যুত হলো, দুনিয়ার জীবনের প্রতি সে ঝুঁকে পড়লো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। ফলে সে প্রথম অংগীকারের অনুগত থাকলো না এবং পথ-প্রদর্শক কেতাবের অনুসারীও থাকলো না। তাই শয়তান তার ওপর বিজয়ী হয়ে গেলো এবং সে আল্লাহর সংরক্ষিত আশ্রয়-স্থল থেকে বিতাড়িত হলো। কোথাও সে শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারলো না।

কিন্তু কোরআনের অলৌকিক বর্ণনাভংগি এ উদাহরণকে নিছক একটি উদাহরণের আকারে পেশ করেনি, বরং এমন একটি জীবন্ত ও চলন্ত দৃশ্যের আকারে পেশ করেছে, যাতে ফুটে উঠেছে প্রচন্ড গতিশীলতা, সুতীব্র প্রতিক্রিয়া, সুস্পষ্ট আলামত এবং সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট। এখানে আয়াতের ভাষার চমৎকারিত্ব ছাড়াও বাস্তব জীবনের সকল চালচিত্রও পরিস্ফুট। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তুমি তাদেরকে সেই ব্যক্তির ঘটনা শুনিয়ে দাও, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা বর্জন করলো।......... (আয়াত ১৭৫, ১৭৬ ও ১৭৭)

এ একটা বিস্ময়কর ও অভিনব দৃশ্য। এ ভাষার শব্দভান্ডারে যতো শব্দ থাকে, তা দিয়ে যতো ধারণা ও ছবি অংকন করা যায়, তার কোনোটাই এতো অভিনব নয়। এটা এমন একজন মানুষের দৃশ্য, যাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিদর্শনাবলী দান করেছেন, অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন এবং হেদায়াত লাভ করা, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়া এবং উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের পূর্ণ সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু সে এই সব কিছুকে বর্জন করেছে। এখানে বর্জন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইনসেলাখ' শব্দটি, যার আসল ও ধাতুগত অর্থ হলো দেহ থেকে চামড়া ছাড়ানো। এ শব্দটি এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর কেতাব ও নিদর্শনসমূহের সাথে তার সম্পর্ক এতো গভীর ছিলো যেন তা তার দেহের চামড়ার মতো তার গোশতের সাথে মিশে গিয়েছিলো। আর কোনো জ্যান্ত ব্যক্তি নিজের দেহ থেকে চামড়া খুলে ফেলতে চেষ্টা করলে তাকে যেরূপ কঠিন ও প্রাণান্তকর কষ্ট করতে হয়, আলোচ্য ব্যক্তি সেই রূপ কষ্ট করে আল্লাহর কেতাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলো। মানুষ যখন গভীরভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন তা তার সত্ত্বার সাথে পোশাকের মতো নয় বরং চামড়ার মতো লেগে থাকে এবং তা খুলে ফেলা সহজ থাকে না।

আলোচ্য লোকটি আল্লাহর আয়াতগুলোকে বর্জন করে সে যেন তাকে রক্ষাকারী আবরণ ও বর্ম খুলে ফেললো। সে হেদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সে আলোকোজ্বল আকাশ থেকে কর্দমাক্ত পৃথিবীতে নেমে এলো। ফলে সে শয়তানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো, যার খপ্পর থেকে তাকে কেউ উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে না। এভাবে শয়তান ক্রমান্বয়ে তার ঘনিষ্ঠ সাথীতে পরিণত হয় এবং তার ওপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করে। এরপর আমরা নিজেদেরকে এক শোচনীয়, মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক দৃশ্যের সামনে উপস্থিত দেখতে পাই। কর্দমাক্ত যমীনের সাথে লেপ্টে থাকা এই মানুষটিকে সহসাই দেখি কুকুরের আকারে রূপান্তরিত হয়ে জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। তাকে তাড়ালেও হাঁপায়, না তাড়ালেও হাঁপায়। এই দৃশ্যগুলো একের পর এক আসতে থাকে এবং কল্পনার জগতে তীব্র আলোড়ন, শিহরণ ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর সর্বশেষ দৃশ্যটি হলো বিরামহীনভাবে হাঁপানো। এই সর্বশেষ দৃশ্যে উপনীত হওয়ার পর শোনা যায় গোটা দৃশ্যের ওপর গুরু গম্ভীর মন্তব্য,

'এ হচ্ছে সেই সব লোকের উদাহরণ, যারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। সুতরাং কাহিনী বর্ণনা করো, হয়তো তারা চিন্তা করবে। আমার আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী ও নিজেদের ওপর অত্যাচারকারীদের উদাহরণ কতোই না জঘন্য।'

বস্তুত, এ হচ্ছে একটি শ্রেণীর মানুষের উদাহরণ। হেদায়াতের নিদর্শনাবলী ও ঈমানের উদ্দীপনাময় শিক্ষাসমূহ তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, তাদের দেহমন ও বিবেক এবং তাদের গোটা পারিপার্শ্বিকতার সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিলো। অতপর এক সময় তারা তা বর্জন করলো। ফলে তাদের রূপান্তর ঘটলো এবং তাদের সত্ত্বা বিকৃত হয়ে গেলো। তারা মানুষের স্তর থেকে পশুর স্তরে নেমে গেলো। ধুলো-কাদায় মলিন কুকুরের পর্যায়ে অধোপতিত হলো। অথচ তাদের ঈমান তাদেরকে 'ইল্লিয়্যীনের' সুউচ্চ মার্গে উন্নীত করতে পারতো। আদি জন্মগত স্বভাবের দিক দিয়ে তারা ছিলো শ্রেষ্ঠতম অবয়বের অধিকারী। অথচ তারা সেখান থেকে অধোপতিত হতে হতে সর্বনিম্ন স্তরে পতিত হয়েছে।

'আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী ও নিজেদের ওপর অত্যাচারকারীদের উদাহরণ কতোই জঘন্য!

এর চেয়ে জঘন্য উদহারণ আর কী হতে পারে? হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার পর তা বর্জন ও তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে খারাপ উদাহরণ আর কী হতে পারে? নশ্বর দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ও প্রবৃত্তির অনুসরণের চেয়ে খারাপ কোনো কাজ হতে পারে কি? নিজেকে এতো উচ্চ মর্যাদা থেকে এতো নীচে নামানোর মতো নিজের ওপর আর কোনো যুলুম আছে কি? নিজেকে ঈমানের ন্যায় নিরাপদ চর্ম থেকে বঞ্চিত করে শয়তানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা ও কুকুরের মতো নিকৃষ্ট পশুতে পরিণত করার মতো আর কোনো অত্যাচার আছে কি?

বস্তুত, এ অবস্থাটাকে কোরআনের মতো এতো আশ্চর্যজনকভাবে উপস্থাপন আর কেউ করতে পারে না।

এখন প্রশ্ন এই যে, এটা কি কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনা, নাকি ঘটনার আকারে বর্ণিত একটা উদাহরণ মাত্র? যেহেতু এ ধরনের ঘটনা অনেক ঘটে থাকে, তাই এদিক থেকে এটা একটা উদাহরণ হতে পারে।

কোনো কোনো বর্ণনা মতে এটা ফিলিস্তিনের একজন পুণ্যবান ব্যক্তির ঘটনা। বনী ইসরাঈল কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার আগে এই ব্যক্তি সেখানে বাস করতো। কিভাবে এই ব্যক্তির অধোপতন ঘটলো, সে সম্পর্কে এক বিরাট কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন তাফসীর-গ্রন্থে ইসরাঈলী কাহিনী পড়ার অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে, তারা এ কাহিনী পড়লে তাদের কাছে মনে হবে এটি হয়তো ওগুলোরই একটি। অন্তত এ কাহিনীর সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ তার বিশ্বাস হতে চাইবে না। তা ছাড়া এই কাহিনী সম্পর্কে এত বেশী মতভেদ রয়েছে যে, এ সম্পর্কে সতর্ক হওয়া খুবই জরুরী কেউ বলেন, এই ব্যক্তি 'বালয়াম বাউরা' নামক জনৈক ইসরাঈলী। কেউ বলেন, সে জনৈক প্রতাপশালী ফিলিস্তীনবাসী। কেউ বলেন, সে 'উমাইয়া ইবনুস সাল্‌ত' নামক জনৈক আরব। কেউ বলেন, সে রসূল (স.)-এর সমসাময়িক পাপিষ্ঠ আবু আমের কিংবা অন্য কেউ। কেউ বলেন, সে হযরত মূসা (আ.)-এর সমসাময়িক। আবার কেউ বলেন, সে হযরত মূসা (আ.)-এর সমসাময়িক নয়। বরং তাঁর পরবর্তী নবী হযরত ইউশা ইবনে নূনের সমসাময়িক। বনী ইসরাঈল যখন মূসা (আ.)-কে 'তুমি আর তোমার খোদা লড়াই করো গিয়ে, আমরা এখানে বসে রইলাম' এ কথা বলে ফিলিস্তীনে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলো, তখন এই ইউশা ইবনে নুনই চল্লিশ বছরব্যাপী ভবঘুরে জীবন যাপন শেষে বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে ফিলিস্তীনের প্রবল ক্ষমতাধর দখলদারদেরকে পরাজিত করে তা অধিকার করেন। যে 'নিদর্শনাবলী' তাকে দেয়া হয়েছিলো, তার ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত হয়ে থাকে যে, তাঁকে আল্লাহর সবচেয়ে মর্যাদাবান নাম 'ইসমে আযম' শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো, যার কল্যাণে সে দোয়া করলেই তা কবুল হতো। আবার এ কথাও বলা হয় যে, তিনি একজন কেতাবপ্রাপ্ত নবী ছিলেন। এরপর কাহিনীর খুঁটিনাটি ব্যাপারেও অনেক মতভেদ রয়েছে।

এ জন্যে 'ফী যিলালিল কোরআনের' স্থায়ী রীতি অনুসারে আমরা এসব কাহিনীর বর্ণনা দেয়া সমীচীন মনে করিনি। কেননা এ কাহিনীর কিছুই কোরআনেও উল্লেখ করা হয়নি এবং বিশুদ্ধ হাদীসেও নয়। আমরা স্থির করেছি যে, এই কাহিনী থেকে মতভেদমুক্ত বিষয়গুলো গ্রহণ করবো। এর ফলে বিষয়টা কোনো ব্যক্তি বিশেষের ঘটনা না হয়ে সেই লোকদের নিত্যকার অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে জানা ও মানার পর তার ওপর অবিচল থাকেনি বরং

তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এ রকম ঘটনা মানব জীবনে অহরহ ঘটছে। আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞানের অধিকারী হয়েও তা থেকে হেদায়াত লাভ করে না, এমন লোক অনেক রয়েছে। এ ধরনের লোকেরা তাদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত করে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে। শুধু নিজেদের খেয়ালখুশী নয় বরং সেই ক্ষমতাধর ও আধিপত্যবাদীদের খেয়ালখুশীরও তাবেদারী করে, যারা তাদেরকে পার্থিব সম্পদ দিতে পারে বলে তারা মনে করে।

আমরা এমন অনেক আলেমকে দেখেছি, যারা আল্লাহর দ্বীনের মর্ম উপলব্ধি করেও তা থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং অন্য পথ অবলম্বন করে। তারা তাদের জ্ঞানকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষমতা লাভ ও স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে ইসলামকে বিকৃত করা ও ফতোয়া দেয়ার কাজে লাগায়। এ দ্বারা তারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানকে অচল করে দেয়া ও তার নিষিদ্ধ জিনিস চালু করার লক্ষ্যাভিসারী শক্তিকে বিজয়ী করতে চায়।

এদের মধ্যে এমন অনেককে দেখেছি যারা জানে ও ঘোষণা করে যে, আইন প্রণয়ন আল্লাহর একক অধিকার। যে ব্যক্তি এ অধিকার দাবী করে সে নিজের জন্যে খোদায়ী দাবী করে। আর যে ব্যক্তি খোদায়ী দাবী করে, সে তাগুত এবং কাফের। আর যে ব্যক্তি এই দাবী সমর্থন করে এবং তার অনুসারী হয়, সেও কাফের। অথচ এই তত্ত্ব জানা সত্তেও তারা সেই সব আল্লাহদ্রোহীকে সমর্থন দেয়, যারা আইন প্রণয়নের অধিকার দাবী করে এবং এই অধিকার দাবী করার মাধ্যমে খোদায়ী দাবী করে। এ সব লোককেই তারা ইতিপূর্বে কাফের বলে আখ্যায়িত করতো। অথচ আজ তাদেরকে 'মুসলমান' বলে অভিহিত করছে। তাদের ইসলামকেও এরা একেবারে খাঁটি ইসলাম বলে ফতোয়া দিচ্ছে। এমন আলেমও দেখেছি, যিনি পুরো এক বছর ধরে সুদ হারাম ঘোষণা করেছেন, তারপর পরবর্তী আর এক বছর সুদ হালাল বলে রায় দিয়েছেন। এমন আলেমও দেখেছি, যিনি সমাজে পাপ ও অশ্লীলতার বিস্তারকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং এই পাপ পংকিলতার জন্যে নিজের দ্বীনদারীর ভাবমূর্তিকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন।

এ ধরনের আলেমই এ আয়াতে বর্ণিত সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন, কিন্তু সে তা বর্জন করে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ ধরনের আলেমই এ আয়াতে বর্ণিত রূপান্তরিত মানুষটির পর্যায়ভুক্ত। তাকে আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে এই জ্ঞানের বলে উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা করেননি। কারণ সে আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও কেতাবের জ্ঞান লাভ করেও তার অনুসরণ করেনি– অনুসরণ করেছে নিজের কুপ্রবৃত্তির ও দুনিয়াবী স্বার্থের।

আল্লাহ তায়ালা যাকে যাকে ইসলামের জ্ঞান দান করেছেন, কিন্তু তা দ্বারা সে উপকৃত হয়নি, ঈমানের পথে অবিচল থাকেনি এবং আল্লাহর এই নেয়ামতকে বর্জন করে শয়তানের তাবেদার ও পশুত্বের স্তরে পতিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের বেলায় এ উদাহরণ প্রযোজ্য।

এবার আসুন দেখা যাক, এই অব্যাহত হাঁপানিটা কী জিনিস?

কোরআনে এই দৃশ্যটি যেরূপ ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে আমার ধারণা এই যে, এই অব্যাহত হাঁপানি দ্বারা দুনিয়াবী স্বার্থের জন্যে লালায়িত হওয়া বুঝানো হয়েছে, যার খাতিরে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান ও তার নিদর্শনাবলীকে বর্জন করে। এ হাঁপানি দ্বারা দুনিয়ার জন্যে সেই হা-পিত্যেশ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে ও লোভ-লালসাকে বুঝানো হয়েছে, যার কোনো শেষ নেই। এই লোভ যাদেরকে একবার পেয়ে বসে, তাদেরকে কেউ সদুপদেশ দিক বা না দিক, তারা এটা অব্যাহতই রাখবে।

এ উদাহরণের মধ্য দিয়ে স্থান, কাল ও পরিস্থিতি নির্বিশেষে মানব জীবনের একটি দিকের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যুগ যুগ কালের ব্যবধানেও এমন আলেমের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে আল্লাহর এমন বহু বান্দা আছেন, যারা এর ব্যতিক্রম, যাদেরকে তিনি রক্ষা করেছেন, যারা আল্লাহর কেতাবকে বর্জন করে না, দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে না, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে না। শয়তানের ধোকায় পড়ে না এবং ক্ষমতাশালীদের মালিকানাভুক্ত ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্যে হাত্যেশ করে না। এ উদাহরণ বিরল কিছু নয় এবং কোনো বিশেষ যুগের বংশধরদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি এ উদাহরণটি তাঁর জাতিকে শুনিয়ে দেন, যাতে করে তারাও আল্লাহর আয়াত লাভ করার পর তা বর্জন না করে এবং যাতে এটা পরবর্তীকালেও পাঠ করা অব্যাহত থাকে। এতে করে আল্লাহর দ্বীনের কিছুমাত্র জ্ঞানও যারা অর্জন করেছে, তারা যেন এহেন শোচনীয় অধোপতন সম্পর্কে সাবধান হয়, এহেন অব্যাহত হাঁপানি বা উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় না ভোগে এবং নিজের ওপর এমন অত্যাচার না করে যে অত্যাচার কোনো শত্রু ও আরেক শত্রুর ওপর করে না। এরূপ চরম অধোপতন কেবল নিজের ওপরই অত্যাচার, অন্য কারো ওপর নয়।

এ যুগে আমরা এমন বহু লোক দেখেছি, যাদের চালচলন দেখে মনে হয়েছে যেন তারা নিজেদের ওপর অত্যাচার চালাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন, অথবা নিজের জন্যে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে স্থান নিশ্চিত করতে বদ্ধ-পরিকর এবং দুনিয়ার সাফল্য লাভের প্রতিযোগিতায় কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করে কিনা সেই ভয়ে তটস্থ। এ ধরনের লোকেরা প্রতিদিন সকালে এমন কাজ দিয়েই দিনের কাজ শুরু করে, যা তার জাহান্নামের অবস্থানকে নিশ্চিত করে। দুনিয়ার লালসা তাদের মৃত্যুর আগে কখনো শেষ হয় না। আল্লাহর কাছে এই ভয়ংকর লালসা থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ, আমাদেরকে রক্ষা করুন, আমাদেরকে সততার ওপর অবিচল রাখুন, আমাদেরকে ধৈর্য দিন এবং মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দিন।'

এরপর এই উদাহরণ ও এ সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য নিয়ে দু'একটি কথা বলতে চাই। এ হচ্ছে সেই জ্ঞানের দৃষ্টান্ত, যা তাকে দুনিয়ার আকর্ষণ, ঝোঁক ও লোভ লালসা থেকে রক্ষা করে না। রক্ষা করে না প্রবৃত্তির খেয়াল অনুসারে চলা থেকে, তার পরিণতি স্বরূপ শয়তানের গোলামী থেকে এবং শয়তান কর্তৃক প্রবৃত্তির নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো থেকে।

আর যেহেতু জ্ঞান মানুষকে গোমরাহী থেকে রক্ষার নিশ্চয়তা দেয় না, তাই মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী জীবন গঠনের জন্যে কোরআন কার্যকর পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। জ্ঞানের উদ্দেশ্য শুধু তত্ত্ব শিক্ষা দেয়া নয়, তবে তা এমন সবল ও সতেজ বিশ্বাস গড়ে তোলে যা মানুষকে চালিত ও উদ্দীপিত করে, যাতে করে ওই বিশ্বাসকে চিন্তায় ও কর্মে বাস্তব রূপ দেয়া যায়।

কোরআন ঈমানকে নিছক 'তত্ত্ব ও মতবাদ' হিসাবে অধ্যয়নের জন্যে উপস্থাপন করে না। কেননা এটা নিছক জ্ঞানেরই জন্ম দেয়, যা চিন্তা ও কর্মের জগতে কোনো বাস্তব ফল উৎপন্ন করে না। এটা এক ধরনের ঠান্ডা জ্ঞানের জন্ম দেয়, যা প্রবৃত্তির লালসা থেকে মানুষকে রক্ষা করে না এবং শয়তানকে প্রতিহত করে না, বরং হয়তো বা তার পথ সুগম করে।

কোরআন ইসলামকে 'ইসলামী বিধান', 'ইসলামী আইন', 'ইসলামী অর্থনীতি', 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' কিংবা 'মনোবিজ্ঞান' বিষয়ক কোনো ধারাবাহিক পাঠক্রম উপস্থাপিত করে না। কোনো ধরনের তাত্ত্বিক অনুশীলনের তত্ত্ব ও তথ্যও সে দেয় না।

কোরআন ইসলামকে এমন একটা আকীদা বিশ্বাস হিসাবে পেশ করে, যা তাকে উদ্দীপিত, চালিত, সচেতন ও বিজয়ী হবার প্রেরণা যোগায়। অন্তরে ও বিবেকে জ্ঞান ও বিশ্বাসের আকারে বদ্ধমূল হবার অব্যবহিত পর ইসলাম যাতে বাস্তব রূপ লাভ করে, সে জন্যে তাকে সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করে। সে মানুষের মৃত ও নির্জীব হৃদয়কে পুনরুজ্জীবিত করে। ফলে তা উজ্জীবিত ও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং মানুষের স্বভাবগত ইন্দ্রিয়গুলোকে জাগিয়ে তোলে। এতে করে তার স্বভাব আল্লাহর সাথে সম্পাদিত আদি চুক্তিতে পুনর্বহাল হয়। ফলে তাকে আর কোনো কিছুই দুনিয়ার মোহাবিষ্ট করতে পারে না।

কোরআন ইসলামকে একটা এমন চিন্তা-গবেষণার বিধান হিসাবেও পেশ করে, যা সকল মানব রচিত বিধান থেকে পৃথক ও অনন্য। কেননা ইসলাম মানুষকে তাদের রচিত মতবাদ ও মতাদর্শের ক্রটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে এবং শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনার দরুন সৃষ্ট বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার জন্যেই এসেছে।

কোরআন ইসলামকে সত্যের মাপকাঠি হিসাবেও উপস্থাপন করেছে। এ মাপকাঠি দ্বারা সে মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে সুশৃংখল করতে চায়, তাদের ঝোঁক, আবেগ, চিন্তা ও কর্মকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে চায়। এ মাপকাঠি যে জিনিসকে গ্রহণ করবে তা বিশুদ্ধ, সঠিক ও নির্ভুল বিবেচিত হবে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ চালু থাকবে। আর এ মাপকাঠি যে জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করবে, তা ভ্রান্ত ও ক্রটিপূর্ণ বিবেচিত হবে ও তার কাজ বন্ধ করে দেয়া অপরিহার্য হবে।

কোরআন ইসলামকে এমন একটি আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে উপস্থাপন করে, যা মানব জাতিকে পর্যায়ক্রমে উন্নতি ও উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করায়। কতো উচ্চে আরোহণ করাবে, তা নির্ভর করে মানুষের চেষ্টা ও ভাগ্যের ওপর। আর বাস্তব আন্দোলন চলাকালে সে মানব জাতির জন্যে ধাপে ধাপে তাদের বিস্তারিত জীবন পদ্ধতি, মৌলিক আইন কানুন এবং অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার বিধি বিধান প্রণয়ন করে। এরপর ওই বিধি বিধান ও মৌলিক নিয়ম কানুনের আলোকে জনগণ নিজেরাই নিজেদের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা তাদের বিস্তারিত বিধিমালা, তাদের প্রাকৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান -বিজ্ঞান এবং বাস্তব জীবনের জন্যে বাদবাকী সব প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও কর্মসূচী ইত্যাদি রচনা করে নেয়। এই সব বিধি বিধান, জ্ঞান বিজ্ঞান ও অন্য সব প্রয়োজনীয় কর্মসূচী রচনা করার সময় তাদের মনমগযে সক্রিয় থাকে ইসলামের মূল আকীদা বিশ্বাস থেকে উৎসারিত সতেজ চেতনা, প্রেরণা ও উদ্দীপনা, ইসলামী আইন ও তার বাস্তব দাবীর প্রতি অবিচল আনুগত্যবোধ এবং বাস্তব জীবনের প্রয়োজন ও নির্দেশাবলী সম্পর্কে কঠোর দায়িত্ববোধ।

মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী চরিত্র গঠনের জন্যে এই হলো কোরআনের দিক নির্দেশনা ও কর্মপদ্ধতি। এই দিক নির্দেশনা ও কর্মপদ্ধতিকে উপেক্ষা করে নিরেট অধ্যয়নের জন্যেই তাত্ত্বিক অধ্যয়ন ও অনুশীলন করলে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, সে জ্ঞান দুনিয়াবী স্বার্থের দুর্নিবার লালসা প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা ও শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে না এবং মানব জীবনের জন্যে কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

হেদায়াত প্রাপ্তির আসল উৎস

আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান লাভের পর তার অবমাননা ও অমর্যাদাকারী ব্যক্তি সম্পর্কে উদাহরণ পেশ করার পর এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলা হয়েছে যে, হেদায়াতের মূল উৎস হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি যাকে হেদায়াত করেন, তার হেদায়াত লাভ তথা সুপথে চালিত হওয়া সুনিশ্চিত।

আর যাকে আল্লাহ তায়ালা বিপথে চালিত করেন, সে নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত। তার লাভবান হবার কোনোই উপায় নেই। একথাই বলা হয়েছে ১৭৮ নং আয়াতে!

'আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়াত করেন তথা সুপথে চালিত করেন সেই সুপথপ্রাপ্ত। আর তিনি যাকে বিপথগামী করেন সে ক্ষতিগ্রস্ত।'

তবে কোরআনের অন্য সূরায় আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাকেই হেদায়াত করেন যে হেদায়াত লাভের চেষ্টা সাধনা করে। 'যারা আমার পথে চলার জন্যে চেষ্টা সাধনা করে তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করবো।' অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ না তারা স্বয়ং তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়।' তিনি আরো বলেছেন, 'আর সেই হৃদয়ের শপথ এবং যিনি তাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন, অতপর তাকে ন্যায় ও অন্যায় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। যে ব্যক্তি তার হৃদয়কে পবিত্র করেছে সে সফলকাম হয়ে গেলো। আর যে তাকে কালিমালিপ্ত করে সে ব্যর্থ হয়।'

অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা বিপথগামী করেন যে নিজের জন্যে বিপথগামিতা অন্বেষণ করে, হেদায়াতের সাক্ষ্য প্রমাণ ও ঈমানের প্রেরণাদায়ক উপকরণসমূহকে স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করে ও এড়িয়ে চলে এবং তা থেকে নিজের চোখ, কান ও মনকে বন্ধ করে রাখে। এ বিষয়টাই পরবর্তী ১৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন এভাবে,

'আমি বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না। তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শোনে না। তারা পশুর মতো, বরং পশুরও অধম। তারাই উদাসীন মানুষ।' আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন, 'তাদের হৃদয়ে রোগ রয়েছে। আল্লাহ সে রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।' তিনি আরো বলেন, 'যারা কুফরী ও অত্যাচার করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতেও প্রস্তুত নন, সুপথে পরিচালিত করতেও প্রস্তুত নন। তাদেরকে তিনি শুধু জাহান্নামের পথেই পরিচালিত করবেন এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে............'

কোরআনের যে সব উক্তিতে হেদায়াত (সুপথগামিতা) ও গোমরাহী (বিপথগামিতা) সম্পর্কে বক্তব্য রয়েছে, সেগুলোকে সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করলে এবং সেগুলোর অর্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করলে আমাদের কাছে একটিমাত্র বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যার সাথে বিভিন্ন ইসলামী দল ও শ্রেণীর আকীদা তাত্ত্বিকদের এবং খৃষ্টীয় ধর্ম-তত্ত্ব ও রকমারি দর্শনের উস্কে দেয়া বিতর্কের কোনোই সম্পর্ক নেই। এই বিতর্ক সাধারণত অদৃষ্টকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে থাকে।

সার্বিক পর্যালোচনা থেকে যে একটি মাত্র বক্তব্য ফুটে ওঠে তা এই যে, একদিকে হেদায়াত পাওয়া ও গোমরাহ হয়ে যাওয়া– এই উভয় কাজের যোগ্যতা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো এবং সেই ইচ্ছা মানুষের ওপর কার্যকরী রয়েছে। অপরদিকে তারই পাশাপাশি তার স্বভাব-প্রকৃতিকে এক আল্লাহর প্রভুত্বকে উপলব্ধি করা ও তাঁর অনুগত থাকা, তাকে ন্যায় ও অন্যায়ের বাছ বিচার করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন বিবেক প্রদান করা এবং তার স্বভাব প্রকৃতি বিপথগামী হলে তাকে সতর্ক করা ও বিবেক বিপথগামী হলে তাকে সুপথে চালিত করার মানসে নবী ও রসূলদেরকে সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে প্রেরণ করাও আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছিলো। কিন্তু এই শেষোক্ত ত্রিবিধ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সত্তেও মানুষের সৃষ্টির সাথে সাথে তাকে হেদায়াত ও গোমরাহীর যে দ্বিবিধ যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, তা অব্যাহত থাকবে। এটা আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ীই অব্যাহত থাকবে এবং এই ইচ্ছার ভিত্তিতেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে এটাও আল্লাহর ইচ্ছা যে, যে ব্যক্তি হেদায়াত লাভের জন্যে চেষ্টা সাধনা করবে, তাকে তিনি হেদায়াত করবেন এবং যে ব্যক্তি সৃষ্টি জগতের আনাচে কানাচে ছড়ানো নিদর্শনাবলী ও রসূলদের কাছে আগত ওহী ভিত্তি নিদর্শনাবলীকে বুঝার জন্যে আল্লাহর দেয়া বিবেক, কান ও চোখকে ব্যবহার করে না, তাকে গোমরাহ করবেন। এভাবেই বিভিন্ন মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে।

এই সকল অবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকরী হয়ে থাকে— অন্য কিছু নয় এবং যা কিছুই ঘটে, আল্লাহর সিদ্ধান্ত বলেই ঘটে— অন্য কিছুর বলে নয়। আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারটার নিষ্পত্তি এভাবে করতে চেয়েছেন বলেই তা এভাবে হয়ে থাকে। আর তাঁর পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত ছাড়া কোনো কিছুই কার্যকরী হয় না। মহাবিশ্বে তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কোনো ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের অস্তিত্বই নেই, যার ভিত্তিতে কোনো কিছু হয় এবং যার জোরে কোনো ঘটনা ঘটে। এই অকাট্য মহা সত্যের আলোকেই মানুষ কাজ করে এবং সে সুপথে কিংবা বিপথে চালিত হয়।

এটাই হলো হেদায়াত ও গোমরাহী সংক্রান্ত ইসলামী তত্ত্ব। কোরআনের সব কটি উক্তিকে একত্রে ও সার্বিকভাবে পাশাপাশি রেখে ও সুসমন্বিতভাবে বিবেচনা করলে বিভিন্ন দল ও উপদলের আশা আকাংখা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে বিবেচনা না করলে এবং বিতর্ক ও প্রতিবাদ করার মনোভাব নিয়ে এগুলোর একটাকে আরেকটার বিরুদ্ধে দাঁড় না করলে এগুলো থেকে এই তত্ত্বই পাওয়া যায়।

এই ১৭৮ নং আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, আমাদের ইতিপূর্বে আলোচিত খোদায়ী রীতি অনুযায়ী যাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করেন, সেই যথার্থ হেদায়াতপ্রাপ্ত, সেই সুনিশ্চিতভাবে গন্তব্যে উপনীত হতে পারে, সেই সঠিক পথ চিনে, সরল ও সোজা পথে চলে এবং আখেরাতে কল্যাণ লাভ করে। আর যাকে আল্লাহ তায়ালা বিপদগামী করেন, তার সেই চিরাচরিত রীতি অনুসারে, সে ক্ষতিগ্রস্ত, সে সব কিছু হারায়, কোনো কিছুই লাভ করতে পারে না। সে যতো কিছুই অর্জন করুক, সবই অসার ও বৃথা। যখন আমরা তার দিকে এরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকাই যে, এই পথভ্রষ্ট ব্যক্তি নিজেকেও হারিয়ে ফেলেছে, তখন বুঝা যায় যে, সে যথার্থই তদ্রূপ। কেননা যে নিজেকে হারায়, সে আর কী অর্জন করবে?

পূর্ববর্তী আয়াত ও অনুরূপ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় আমি যে দৃষ্টিভংগি অবলম্বন করেছি, সে দৃষ্টিভংগি পরবর্তী আয়াত দ্বারা সমর্থিত হয়

'আমি বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে. কিন্তু তা দ্বারা তারা বোঝে না.............' (আয়াত ১৭৯)

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এই সব জ্বিন ও মানুষ যদি জাহান্নামের জন্যেই তৈরী হয়ে থাকে, তাহলে তারা কিভাবে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করবে?

এর জবাব এই যে, আয়াতটির দুরকম ব্যাখ্যা হতে পারে।

প্রথম ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনাদি, অনন্ত ও শাশ্বত জ্ঞান দ্বারা জানতেন যে, এই সব সৃষ্টি জাহান্নামের দিকেই ধাবিত হবে। তাঁর এটা জানার জন্যে যে কাজের দরুন তারা বাস্তবিক পক্ষে জাহান্নামের যোগ্য হয়, সে কাজ জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়া জরুরী নয়। কেননা আল্লাহর জ্ঞান সর্বব্যাপী ও সীমাহীন। কোনো সময় বা কাজের ওপর তা নির্ভরশীল নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তার কাজ দ্বারা জাহান্নামের যোগ্য হয়েছে, তাকে যখন তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে না, তখন তার আত্মশুদ্ধির অবকাশ থেকেই যাচ্ছে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহর এই শাশ্বত ও অনাদি অনন্ত জ্ঞান, জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের যোগ্য হওয়ার মতো গোমরাহীর দিকে ঠেলে দেয় না। বরং আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, বুঝবার জন্যে তাদেরকে যে হৃদয় বা বোধশক্তি দেয়া হয়েছে তাকে তারা কাজেই লাগায়নি। বিশ্ব প্রকৃতিতে ও রসূলদের কাছে আগত ওহীর বাণীতে ঈমান ও হেদায়াতের প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান এবং খোলা মন ও খোলা চোখ দিয়ে তা অনায়াসেই দেখা যায়। কিন্তু তারা আল্লাহর প্রাকৃতিক নিদর্শন দেখার জন্যে চোখ মেলে তাকায়নি এবং ওহীর বাণীতে বিরাজমান নিদর্শনাবলীকে শোনার জন্যে কানও পাতেনি। আল্লাহর দেয়া এই সব ইন্দ্রিয়কে তারা নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। অলস ও উদাসীনভাবে বৃথাই জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। কোনোই চিন্তা-ভাবনা করেনি।

'তারা পশুর মতো। বরং পশুর চেয়েও অধম। তারা উদাসীন।'

জীবন ও জগত জুড়ে তাদের চারদিকে বিরাজমান আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে যারা উদাসীন থাকে, যারা তাদের বিশ্বলোকের প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে উদাসীন থাকে এবং তাতে আল্লাহর সক্রিয় হাত দেখতে পায় না, তারা পশুর মতো, বরং পশুর চেয়েও অধম। কেননা পশুদেরও কিছু জন্মগত ও স্বভাবগত যোগ্যতা রয়েছে, যা তাদেরকে ভালো পথের সন্ধান দেয়। কিন্তু মানুষ ও জ্বিনকে দেয়া হয়েছে পশুর চেয়ে অনেক উন্নত মানের যোগ্যতা ও অনুভব শক্তি। যেমন তাদেরকে বোধশক্তি সম্পন্ন হৃদয়, দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন চোখ এবং শ্রবণশক্তি সম্পন্ন কান দেয়া হয়েছে। উদাসীনভাবে জীবন পথ অতিক্রম করার সময় তারা যদি তাদের হৃদয়, চোখ ও কান না খোলে এবং তার ফলে তাদের হৃদয় জীবনের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে, তাদের চোখ বিরাজমান দৃশ্যাবলী ও তার মর্মার্থ না বোঝে এবং তাদের কান সে সবের ইংগিত ও ইশারা ধরতে না পারে। তাহলে তারা নিসন্দেহে জন্মগতভাবে সুপথের সন্ধান লাভের যোগ্যতা সম্পন্ন পশুদের চেয়েও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এভাবেই তারা জাহান্নামের কাষ্ঠে পরিণত হয়। আর আল্লাহ তায়ালা যখন তাদেরকে নিজের ইচ্ছা মোতাবেক ওইসব যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাদের এই কর্মফল প্রদানের নিয়ম তৈরী করেছেন এবং পরিণামে তারা জাহান্নামের কাষ্ঠ হয়েছে, তখন এ সব মিলেই বলা হয় যে, তাদেরকে আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য জাহান্নামে নিয়ে গেছে এটা বলা হয় এজন্যে যে, তারা যে এসব করবে তা আল্লাহ তায়ালা আগে থেকেই জানতেন।

আসমাউল হুসনা

প্রাকৃতিকভাবে তাওহীদের অংগীকার গ্রহণ এবং এই অংগীকার ও আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নিদর্শনাবলী থেকে বিচ্যুত ব্যক্তির উদাহরণ উপস্থাপনের পর আল্লাহ তায়ালা এই পথভ্রষ্ট লোকদেরকে অপেক্ষা করার আদেশ দিয়ে বিষয়টির উপসংহার টেনেছেন। ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে শেরকের ওপর যিদ ধরা মোশরেকরাই ওই অংগীকার বিচ্যুত গোষ্ঠী। তারা আল্লাহর নামগুলোকে বিকৃত করে তা দিয়ে নিজেদের কল্পিত দেবদেবীর নামকরণ করতো।

'আল্লাহরই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সেগুলো দিয়ে তাকেই ডাকো। আর যারা তাঁর নামগুলোকে বিকৃত করে তাদেরকে এড়িয়ে চল। তারা যা করে তার প্রতিফল তারা অবশ্যই পাবে।' (আয়াত ১৮০)

এখানে ব্যবহৃত 'ইলহাদ'-এর অর্থ বিকৃত করা। আরবে মোশরেকরা আল্লাহর নামকে খানিকটা বিকৃত ও রূপান্তরিত করে নিজেদের দেব-দেবীর নাম রাখতো। যেমন 'আল্লাহ' শব্দকে বিকৃত ও লিংগান্তরিত করে তাদের দেবীর নাম রাখে 'লাত্' এবং আযীয শব্দকে বিকৃত করে দেবীর নাম রাখে 'উয্যা'। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সুন্দরতম নামগুলো শুধু আল্লাহর।

মোমেনদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা এই নামগুলো ধরে কেবল আল্লাহকেই ডাকে, কোনো বিকৃতিকে প্রশ্রয় না দেয়, পথভ্রষ্টদেরকে পথভ্রষ্টই মনে করে এবং তাদের বিকৃতির জন্যে মোটেই উদ্বিগ্ন না হয়। কেননা তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর কাছে সমর্পিত। তারা এর শাস্তি ভোগ করবে।

এই সাথে উল্লেখ্য যে, আল্লাহর নামগুলোকে যারা বিকৃত করে, তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন না হবার এই নির্দেশ শুধুমাত্র সেকালের পৌত্তলিকদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় এবং আল্লাহর নামগুলোর শাব্দিক বিকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল রকমের বিকৃতি ও বিভ্রান্তি এর আওতাভুক্ত। যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে নানা রকমের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তারাও এর আওতাভুক্ত, যেমন যারা আল্লাহর সন্তান আছে বলে দাবী করে, যারা মনে করে যে, আল্লাহর ইচ্ছা প্রাকৃতিক নিয়মের শৃংখলে আবদ্ধ, যারা মনে করে আল্লাহর কিছু কিছু কাজ মানুষের কাজের মতোই, অথচ প্রকৃত পক্ষে তাঁর মতো বা তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। যারা দাবী করে যে, কেবল আকাশে, মহাবিশ্ব পরিচালনায় ও আখেরাতে মানুষের হিসাব গ্রহণের ক্ষেত্রেই আল্লাহর প্রভুত্ব সীমাবদ্ধ, পৃথিবীতে ও মানব জীবনে তাঁর প্রভুত্বের অবকাশ নেই। এজন্যেই তারা মনে করে যে, মানব জীবনের কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রয়োজন নেই, বরং মানুষই নিজের বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা ও স্বার্থের আলোকে নিজের জন্যে আইন প্রণয়নের নিরংকুশ অধিকার রাখে। এ ক্ষেত্রে মানুষ নিজেই নিজের খোদা বা প্রভু, অথবা একে অপরের খোদা। এসব ধারণাই আল্লাহর গুণাবলী ও খোদাসুলভ বৈশিষ্ট্যের বিকৃতি। মুসলমানদেরকে এসব ধারণা প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিকৃত ধারণা পোষণকারীরা তাদের অপকর্মের শাস্তি পাবেই।

মুসলিম উম্মার পরিচয়

এরপর আলোচিত হয়েছে আল্লাহর সৃষ্টির বিচিত্র প্রকারভেদ। ইতিপূর্বে মানুষের সেই শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। 'যাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা বোঝে না, যাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না।' আর যারা আল্লাহর নাম বিকৃত করে তারাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আরো একটা শ্রেণী আছে, যারা সত্যকে আঁকড়ে ধরে, মানুষকে সত্যের দিকে ডাকে, তদনুসারে বিচার ফয়সালা করে এবং তা থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয় না। আর সত্যকে অস্বীকার করা ও আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করার মজ্জাগত অভ্যাসধারী একটা হঠকারী শ্রেণীও আছে। প্রথমোক্ত দলটির যে একটা অবিচল ভূমিকা ও স্থিতিশীল অবস্থান পৃথিবীতে রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সত্য থেকে যখন অনেকেই বিচ্যুত হয় এবং অনেকেই যখন সত্যকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে, তখন তারা সত্যের পাহারাদার ও রক্ষক হয়ে থাকে। কিন্তু শেষোক্ত গোষ্ঠীটির পরিণতি অত্যন্ত ভয়ংকর এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর চক্রান্ত অপ্রতিরোধ্য। ১৮১ ও ১৮২ নং আয়াত দুটিতে এ কথাই ধ্বনিত হয়েছে,

'আমার সৃষ্টির মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে, যারা সত্যের আলোকে মানুষকে পরিচালিত করে ও সত্য অনুসারে ইনসাফ করে ....'

বস্তুত, মানব জাতি মোটেই সম্মানের পাত্র বিবেচিত হতো না, যদি তাদের মধ্যে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও এমন একটি দল না থাকতো, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা 'উম্মাহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। উম্মাহ একটা ইসলামী পরিভাষা। এর অর্থ হলো এমন মানবগোষ্ঠী, যা একই আকীদা ও আদর্শের অনুসারী, একই আদর্শের অধীন সংঘবদ্ধ এবং সেই আদর্শের অনুসারী একই

নেতৃত্বের অধীন সংগঠিত। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে আপোষহীন ও অবিচল এবং প্রতি মুহূর্তে তার জন্যে সংগ্রামরত এই দলই হলো পৃথিবীতে আল্লাহর অর্পিত আমানত বা দায়িত্বের রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক, আল্লাহর সাথে কৃত মানব জাতির অংগীকারের সাক্ষী এবং আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার প্রত্যাখ্যানকারী সকল যুগের বিপথগামীদের জারিজুরি ফাঁসকারী দল।

এই উম্মাহ বা দলের যে বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তা একটু লক্ষ্য করুন, 'তারা সত্যের আলোকে পথ প্রদর্শন করে এবং তদনুসারে বিচার-ফায়সালা করে।'

এই উম্মাহ বা দল, যা সংখ্যায় যেমনই হোক না কেন, তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা সততা ও সত্যের পথে মানুষকে ডাকে। তারা সত্য ও ন্যায়ের আহ্বায়ক। সত্যের দাওয়াত থেকে তারা কখনো নিবৃত্ত হয় না, নিজেদের প্রাণ ভয়ে ভীত হয় না এবং যে সত্যকে তারা জেনেছে ও বুঝেছে, তার ব্যাপারে কোনোরূপ জড়তা ও ইতস্তত বোধ করে না। তারা তাদের চারপাশের জনতাকে সত্যের সাহায্যে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। তাই সত্যভ্রষ্ট ও আল্লাহর অংগীকার ভংগকারীদের মধ্যে তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তারা শুধু নিজেরা সত্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ক্ষান্ত হয় না বরং এর দিকে অন্যদেরকে দাওয়াতও দেয়, পথ প্রদর্শনও করে এবং নেতৃত্বও দেয়।

তাদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো, 'তারা সত্যের আলোকে সুবিচারও করে।' অর্থাৎ সত্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অন্যদেরকে তার দিকে দাওয়াত দিয়ে ও পথ প্রদর্শন করেও তারা ক্ষান্ত হয় না, বরং এরপর তারা মানব জীবনে এই সত্যকে বাস্তবায়িতও করে এবং তদনুসারে বিচার ফয়সালাও করে, যাতে করে সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সুবিচার সত্য তথা ইসলামের শাসন ব্যবস্থা ছাড়া কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুত শুধু শেখা, শেখানো ও উপদেশ দানের জন্যে ইসলাম আসেনি। বরং মানব জাতির যাবতীয় বিষয় পরিচালনা ও যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্যে এসেছে। মানুষের আকীদা বিশ্বাসকে পরিশুদ্ধ করা ও তাকে নিজ বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছে। মানুষের আনুষ্ঠানিক এবাদাতকে পরিশুদ্ধ করে তাকে আল্লাহর সাথে বান্দার প্রকৃত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছে। মানুষের অর্থে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ওপর নিজের শাসন জারী করতে এবং সকল ক্ষেত্রে তাঁর আইন ও বিধান চালু করতে এসেছে। মানুষের আচার আচরণ, চরিত্র ও ঐতিহ্যকে তার বিশুদ্ধ বিধানের আলোকে পুর্নগঠিত করতে এসেছে। তাদের চিন্তা, জ্ঞান-গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকেও ইসলামের নিজের মূল্যবোধ ও মানদন্ডের আলোকে পুনর্নির্মাণ করতে এসেছে। এই সব কিছুর মধ্য দিয়েই এই সত্য ও সঠিক ব্যবস্থা মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং একমাত্র এই সত্য বিধানের ভিত্তিতেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সকলের কাছে সত্যের দাওয়াত পৌছানোর পর জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর বাস্তবায়নই এই উম্মাতের করণীয় কাজ।

ইসলামের স্বভাব প্রকৃতি ও মেযাজ নিয়ে কোনো জড়তা ও অস্বচ্ছতার অবকাশ নেই। ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট, অকাট্য ও অপরিবর্তনীয়। যারা ইসলাম থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত, তারা এর সুস্পষ্ট ও অপরিবর্তনীয় স্বভাব প্রকৃতি ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে পালটানো অসম্ভব দেখে এর বিরুদ্ধে নিরন্তর অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সকল সাজসরঞ্জাম এবং সকল দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে এর বিকৃতি সাধনের চেষ্টায় ব্যয় করছে। পৃথিবীর যেখানে যেখানে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও পুনপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন দল কাজ করে যাচ্ছে, তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে চরম অমানুষিক নির্যাতন ও নিষ্পেষণের অভিযান চালাচ্ছে। সেই সব ইসলামী দলগুলোর ওপর তারা এমন পেশাদার আলেমদেরকে লেলিয়ে দিচ্ছে,

যারা কোরআনের শাব্দিক বিকৃতি সাধন করে থাকে, আল্লাহর হারাম ঘোষিত জিনিসকে হালাল করার অপচেষ্টা চালায়। আল্লাহর শরীয়তের বিধি বিধানকে নমনীয় করে, পাপাচার ও অশ্লীলতাকে অভিনন্দিত করে এবং সেগুলোকে ধর্মের পতাকা শোভিত করে জায়েয করার অপচেষ্টা চালায়। যারা বস্তুবাদী সভ্যতা দ্বারা প্রতারিত এবং তার রচিত মতবাদ ও রীতিপ্রথা দ্বারা আক্রান্ত, তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে এই সব আলেম ওই সমস্ত বাতিল মতবাদ, রীতিপ্রথা, আইন কানুন ও বিধি বিধানকে ইসলামের সাথে সংযুক্ত করার পাঁয়তারা চালায়। যে ইসলাম মানুষের বাস্তব জীবনকে পরিচালনা ও শাসন করে, তাকে তারা অতীতের একটা বিষয় বলে আখ্যায়িত করে এবং তার পুনপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলে ফতোয়া ঝাড়ে। তারা মানুষের ভাবাবেগে মাদকতা আনয়নের উদ্দেশ্যে ইসলামের অতীত গৌরব ও মাহাত্ম্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, যাতে করে এই মাদকতার প্রভাবের আওতায় তাদেরকে বলতে পারে যে, আজকের দিনে ইসলামকে কেবল মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস, ভক্তি শ্রদ্ধা ও এবাদাতের পর্যায়ে সীমিত রাখতে হবে, আইন ও শাসন ব্যবস্থার পর্যায়ে নেয়া যাবে না। আমাদের ইসলামের এই অতীত ঐতিহাসিক গৌরব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তা ছাড়া ইসলামকে কিছুটা 'প্রগতিশীল' বানাতে হবে, যাতে তা মানুষের চলমান জীবনধারা দ্বারা শাসিত হতে পারে এবং সকল রকমের মানব রচিত আইন কানুন ও মতবাদকে সে জায়েয বলে সার্টিফিকেট দিতে পারে। যে সব দেশ এক সময় ইসলামী দেশ ছিলো, সে সব দেশে ইসলামের শত্রুদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে তারা বিভিন্ন মতবাদ রচনা করে তাকে ধর্ম ও আকীদা বিশ্বাসের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে, যাতে করে তা ইসলামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, আর কোরআনের স্থলাভিষিক্ত করার জন্যে তারা নতুন বইও আমদানী করছে, যা নিয়মিত পড়া ও শোনানো হয়। এসব কর্মকান্ডের মধ্যমে তারা সমাজের ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিকে পাল্টাতে চেষ্টা করে থাকে। এটা তারা করে সর্বশেষ পন্থা হিসাবে, যাতে করে মানুষ ইসলামের আলোকে নিজের চিন্তা ও চরিত্রকে শুধরাবার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। এভাবে তারা সমাজকে বানিয়ে ফেলে যৌন উচ্ছৃংখলতা অশ্লীলতা ও ব্যবিচারের পংকে আকৃষ্ট, নিমজ্জিত যুবক যুবতীর ক্লাব। এই সব যুবক-যুবতী হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর কয়েক গ্রাম খাবার পায়। এই খাবার পেয়ে ও অবাধ যৌনতার স্রোতে ভেসে গিয়ে তাদের আর ধর্ম বা সততার কথা শোনার রুচিই থাকে না।

ইসলাম এবং ইসলামের পথ নির্দেশক ও তদনুসারে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে এটা একটা সর্বনাশা আগ্রাসী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে অবাধে ও নিসংকোচে সব রকমের অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ যুদ্ধের জন্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যাপ্ত শক্তি সামর্থ ও তথ্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হয়। এ যুদ্ধের জন্যে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকেও নিয়ন্ত্রন করা হয় এবং এর জন্যে পরিস্থিতি ও পরিবেশকেও অনুকূল করা হয়। অথচ এরূপ আন্তর্জাতিক অভিভাবকত্ব না পেলে একদিনের জন্যেও পরিস্থিতি ও পরিবেশকে অনুকূল করা সম্ভব হতো না। কিন্তু ইসলাম এই আগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছে। আর সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত মুসলমানরা তাদের সংখ্যার স্বল্পতা ও সাজসরঞ্জামের অপর্যাপ্ততা সত্তেও আল্লাহর সাহায্যে এই অমানুষিক আগ্রাসী কর্মকান্ড প্রতিহত করে চলেছে। বস্তুত, নিজের কাজ সম্পাদনে আল্লাহ তায়ালা অদম্য ও অপরাজেয়। এ বিষয়টিই পরবর্তী আয়াতে (১৮২ নং) এভাবে বলা হয়েছে,

'আর যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তাদেরকে আমি ক্রমান্বয়ে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে, তারা টেরই পায় না।' আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি। আমার কৌশল অত্যন্ত জোরদার।'

এ আয়াতে সেই শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানোর সময় আল্লাহদ্রোহীদের হিসাবের বাইরে থেকে যায়। আল্লাহর নিদর্শন ও আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যানকারীরা এই শক্তির প্রতি উদাসীন থাকে। তাদের সাময়িক বিজয় যে আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে তাদের অজান্তে ধীরে ধীরে ধ্বংস ও তিলে তিলে নিশেষ করে দেয়ার একটা কৌশল এবং আল্লাহ তায়ালা যে তাদেরকে কেবল একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, সেটা তারা কল্পনাও করে না। আল্লাহর কৌশল যে অত্যন্ত শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য, তা তারা বিশ্বাস করে না। বাতিল শক্তিগুলো একে অপরকে বন্ধু ও সহায়ক হিসাবে পেয়ে যায় এবং এই বন্ধু ও সহায়কদের শক্তিকে পৃথিবীতে বিজয়ী দেখতে পেয়ে সর্ববৃহৎ পরাশক্তিকে ভুলে যায়। অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে এটা আল্লাহরই নির্ধারিত নীতি যে, তাদেরকে নাফরমানী ও আল্লাহদ্রোহিতা চালিয়ে যাওয়ার অবকাশ দেন, যাতে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায় এবং তাদের জন্যে প্রস্তুতকৃত কৌশলকে তিনি নিরীক্ষণ করতে থাকেন। তাদের বিরুদ্ধে এই কৌশল যিনি পরিচালনা ও প্রস্তুত করেন তিনি হচ্ছেন মহাশক্তিধর ও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ! কিন্তু তারা তাঁর প্রতি উদাসীন। পক্ষান্তরে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সাফল্য নির্দিষ্ট রয়েছে সত্যের পথ প্রদর্শক ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী খোদাভীরুদের জন্যে।

বিবেকের দরজায় কোরআনের করাঘাত

যদিও কোরআনের চিরস্থায়ী রীতি এই যে, সে উপস্থিত ও নির্দিষ্ট উপলক্ষের বাইরে অনেক সুদূরপ্রসারী বক্তব্য প্রদান করে থাকে। কিন্তু আলোচ্য হুমকিটার উপলক্ষ হচ্ছে মক্কার অবিশ্বাসীরা। কোরআন মুসলমানদের সাথে তাদের শত্রুতামূলক আচরণ করার বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। তাদেরকে শাসিয়ে দিয়েছে যে, তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দেয়া হয়েছে ও তাদের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য কৌশল করা হয়েছে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে। এ শাসানি ও হুমকির পর পুনরায় তাদেরকে হৃদয়, চোখ ও কানের উত্তম ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছে, যাতে তাদেরকে জাহান্নামের অধিবাসী ও উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে না হয়। যে রসূল তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান জানান ও সত্যের পথ প্রদর্শন করেন, তাঁকে নিয়ে বিচার বিবেচনা করার দাওয়াত দেয় এবং বিশ্ব জগতে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানায়। সেই সাথে তাদেরকে সতর্ক করে দেয় যে, জীবনের সময় দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে এবং সেই অজানা মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসছে। তাদের উদাসীন থাকা উচিত নয়।

'তারা কি চিন্তা ভাবনা করে না? তাদের সংগীকে জিন-ভূতে ধরেনি। সে তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। তারা কি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্যে ও আল্লাহর সৃষ্টিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি এবং ভেবে দেখেনি যে, তাদের সময় হয়তো ঘনিয়ে আসছে? এরপর আর কোন কথায় তারা বিশ্বাস করবে?' (আয়াত ১৮৩-১৮৪)

কোরআন মানুষের মরিচাধরা স্বভাব প্রকৃতি, বিবেকবুদ্ধি ও আবেগ অনুভূতিকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে জাগিয়ে তোলে। সে তাদের সকল গ্রহণযন্ত্র ও চেতনা কেন্দ্রসহ সমগ্র সত্ত্বাকে সম্বোধন করে। সে তাদের কাছে কোনো ঠান্ডা বিতর্কের সূত্রপাত করে না, বরং তাদের গোটা সত্ত্বাকে জাগ্রত ও সচেতন করে।

'তারা কি চিন্তা ভাবনা করে না ....' (১৮৩)

কোরায়শ নেতারা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে যে প্রচার-যুদ্ধ চালিয়েছিলো, তাতে তারা জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্যে বলতো যে, মোহাম্মদ (স.)-কে জ্বিনে পেয়েছে। তাই সে এই অভিনব ও সাধারণ মানুষের রীতি বহির্ভূত ভাষায় কথা বলে।

কোরায়শ নেতারা জানতো যে, এটা তাদের মিথ্যা অপপ্রচারণা। বহু বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তারা রসূল (স.)-এর দাওয়াতের সত্যতা ও যথাযর্থতা সম্পর্কে অবহিত ছিলো, তারা কোরআন শোনার লোভ সম্বরণ করতে ও তার গভীর প্রভাব প্রতিহত করতে পারতো না। আখনাস বিন শুরায়েক, আবু সুফিয়ান বিন হারব ও আমর বিন হিশাম (আবু জাহল) কর্তৃক গোপনে একাধারে তিন রাত কোরআন শ্রবণ ও তা দ্বারা অভিভূত হওয়ার কাহিনী সুবিদিত। অনুরূপভাবে ওৎবা বিন রবীয়া কর্তৃক রসূল (স.)-এর কাছ থেকে সূরা হামিম সেজদা শুনে অভিভূত হওয়ার ঘটনাও সুপরিচিত। অনুরূপভাবে হজ্জের প্রাক্কালে রসূল (স.)-ও কোরআন সম্পর্কে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত লোকদেরকে সতর্ক করা এবং ওলীদ ইবনে মুগীরা কর্তৃক একে অত্যন্ত 'প্রভাবশালী জাদু' বলার ঘটনাও সুপরিচিত। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, তারা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো না। তারা কেবল এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো এবং তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্যে একে হুমকি স্বরূপ গণ্য করতো। কেননা 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর রসূল' এই কলেমার প্রতি সমর্থন ঘোষণার অর্থই হলো মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্বের অবসান। এই কলেমা মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো গোলাম হতে বা থাকতে দেয় না এবং সাধারণভাবে যে কোনো মানুষের একনায়ক কে চ্যালেঞ্জ করে।

এ জন্যেই প্রচলিত মানবীয় ভাষা থেকে কোরআনের ভাষার পার্থক্য ও অভিনবত্ব। তৎকালীন ও প্রাচীনতর আরব্য সমাজে জ্বিন আশ্রিত মানুষের সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করার সামর্থের ওৎপ্রোত সম্পর্কের ব্যাপক পরিচিতি এবং সাংস্কৃতিক ভাষায় কথা বলার ব্যাখ্যা হিসাবে এরূপ দাবী করা যে, এটা অদৃশ্য জগত থেকে আগত, এসব দুর্বোধ্য রহস্যকে পুঁজি করে তারা জনগণকে ধোকা দিতো যে, মোহাম্মদ যা কিছু বলে তা তার কাছে আগত জ্বিনের কাছ থেকে পেয়েই বলে এবং সে জ্বিন আশ্রিত বলেই এসব আজগুবি ও রহস্যময় কথাবার্তা বলে থাকে।

কোরআন তাদেরকে এই মর্মে আহ্বান জানায় যে, মোহাম্মদের অতীত জীবন ও অন্য সব কিছুই যখন তাদের কাছে সুপরিচিত, তখন তাঁর ব্যাপারটা তাদের আরো গভীরভাবে ভাবা উচিত। তাদের চিরচেনা এই মানুষটির কথাবার্তা ও আচরণ কি জিনে ধরা মানুষের আচরণ বলে মনে হয়? কখনো তা হতে পারে না!

'তাদের সাথীর (মোহাম্মদ) কাছে কোনো জ্বিন নেই। ....

তাঁর কথাবার্তায় ও বিবেকবুদ্ধিতে কোনো ভেজাল নেই। সে নির্ভেজাল একজন সতর্ককারী। জিনে ধরা মানুষদের কথা ও চালচলনের সাথে তাঁর কোনোই সাদৃশ্য নেই।

এরপর বলা হচ্ছে,

'তারা কি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্যে এবং আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিতে দৃষ্টি দেয় না?'

এ বিস্ময়কর সৃষ্টি জগতের সামনে দাড় করিয়ে মানুষের বিবেককে আর একটা প্রবল ঝাঁকুনি দেয়া হয়েছে। এই বিশাল বিশ্ব নিখিলে খোলা মন ও দর্শনক্ষম চোখ দিয়ে শুধু তাকানোই মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিকে মরিচামুক্ত করা, মনুষ্য সত্ত্বাকে তাঁর ভেতরে লুকানো সত্য প্রত্যক্ষ করার যোগ্য করা এবং এক ও অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ লাভ করার জন্যে

যথেষ্ট। আর আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল সাম্রাজ্যে বিরাজিত অগণিত সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দান হৃদয়কে অভিভূত করে, চিন্তাশক্তিকে দিশাহারা করে এবং বিবেককে এসব সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে ও এ সৃষ্টি জগতকে এরূপ সুচিন্তিত শৃংখলা ও বিধি-ব্যবস্থা সহকারে নির্মাণ করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানোর আহ্বান জানায়।

অনুসন্ধান চালাতে গেলে কয়েকটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, এ বিশ্ব জগতকে আমরা যেভাবে দেখতে পাই, তা এ রকম না হয়ে অন্য রকম হলো না কেন? এর তো আরো অসংখ্য সম্ভাব্য আকৃতি ও রূপ থাকতে পারতো? এগুলো কেন এভাবে চলছে? কেন অন্যভাবে চলছে না! কেন এভাবে সব কিছু স্থিতিশীল? কে এগুলোকে স্থির করে রেখেছে? এ সৃষ্টি জগত যদি একই নিয়মে না চলে এবং এর পেছনে যদি একই ইচ্ছা, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত কার্যকর না থেকে থাকে, তাহলে এ সবের স্বভাব-প্রকৃতিতে ও প্রাকৃতিক নিয়মে এমন ঐক্য কেন?

একটা জীবন্ত দেহ এমনকি দেহের একটা জীবন্ত কোষ পর্যন্ত এক অলৌকিক সৃষ্টি এবং এক সীমাহীন বিস্ময়। তার অস্তিত্ব লাভ, তার গঠন, তার ক্রিয়া, তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রেখে তার ভেতরে প্রতি মুহূর্তে ক্রমাগত বিবর্তনের প্রক্রিয়া চালু থাকা, অনুরূপভাবে তার বংশ বিস্তার ও নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির যোগ্যতা তার ভেতরেই নিহিত থাকা, তার নিজের দায়িত্ব জানা এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও সেই দায়িত্ব সম্প্রসারিত হওয়া এসবের প্রত্যেকটাই এক একটা মহাবিস্ময়। এই একটি কোষের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কার বিবেক নিশ্চিত হয়ে বলবে যে, এ বিশ্বের কোনো ইলাহ নেই অথবা অনেক ইলাহ আছে?

দাম্পত্য সম্পর্ক ও প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবনের প্রসার ও বিস্তার এমন একটি প্রমাণ, যা প্রত্যেকের বিবেক ও মনকে জানিয়ে দেয় যে, একজন একক স্রষ্টা ও বিধাতা এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন ও পরিচালনা করছেন। নচেত সার্বক্ষণিকভাবে জীবনের বিস্তার নিশ্চিত করার জন্যে কে এরূপ আনুপাতিক হারে নর ও নারী সরবরাহ করে? কেন ইতিহাসে এমন কোনো সময় আসে না যখন শুধু নর অথবা শুধু নারী জন্ম নেয়? এমনটি হলে তো বংশ বিস্তার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতো। সকল প্রজন্মে সর্বক্ষণ এই ভারসাম্য কে রক্ষা করে?

শুধুমাত্র এই প্রাণী জগতেই নয়, বরং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীতে ভারসাম্য বিদ্যমান। একটি পরমাণু তৈরীতে যেমন ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে, তেমনি তা রক্ষা করা হয়েছে ছায়াপথ নির্মাণেও। অনুরূপভাবে, প্রাণী-জগত ও বস্তু জগতের মাঝেও অনুপাত ও ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে। এই ভারসাম্য যদি এক চুল পরিমাণও ব্যাহত হতো তাহলে এই মহা বিশ্ব এক মুহূর্তেও টিকে থাকতো না। কে আকাশ ও পৃথিবীতে এই বৃহত্তর অনুপাত ও ভারসাম্য রক্ষা করে?

যে আরব জনতাকে কোরআন প্রথম সম্বোধন করেছে, তারা তাদের জ্ঞান দ্বারা আকাশ পৃথিবী ও সমগ্র সৃষ্টির মাঝে এই ভারসাম্যের ব্যাপকতা বুঝতে পারতো না। তবে যেহেতু মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি এ বিশ্ব প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত, তাই প্রকৃতির সাথে মানুষের মৌখিক নয় বরং আত্মিক সংলাপ চলে। এজন্যে মহাবিশ্বের ইশারা ইংগিত বুঝার জন্যে মানুষের কেবল খোলামন ও দেখার মতো চোখ নিয়ে মহাবিশ্বের দিকে তাকানোই যথেষ্ট। এতেই সে হেদায়াতের সন্ধান পেয়ে যেতে পারে।

মানুষ তার অনুভূতি ও চেতনা দিয়েই বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও পারস্পরিক সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারে যে, তার একজন ইলাহ রয়েছেন। এটাই তার স্বভাব দ্বারা হেদায়াত তথা সত্যের সন্ধান লাভ। তার এই ইংগিতলব্ধ তত্ত্ব তার অনুভূতি থেকে কখনো হারিয়ে যায় না। সে

কেবল ওই সত্য ইলাহ বা খোদার গুণ-বৈশিষ্ট চিহ্নিত করতে গিয়ে ভুল করে। তার এ ভুল সংশোধন করে দিতে পারেন একমাত্র রসূলরা। কিন্তু আধুনিক নাস্তিকেরা তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা তাদের স্বভাব বিকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে মহাবিশ্বের ইলাহ থাকা সংক্রান্ত ইংগিত পায় না, অথবা পেয়েও তা অস্বীকার করে। তাদের কেউ যখন মহা শূন্যে আরোহণ করে এবং পৃথিবীকে মহাশূন্যে ঝুলন্ত একটা গোলকের আকারে দেখতে পায়, তখন তার স্বভাব তার কাছে প্রশ্ন করে, পৃথিবীকে এভাবে শূন্যে ঝুলিয়ে কে রাখলো? কিন্তু সে যখন পৃথিবীতে নেমে আসে এবং তার দেশের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কথা স্মরণ করে, তখন বলে, আল্লাহকে কোথাও পেলাম না। এভাবে সে আসলে তার চেতনার গভীরে নিনাদিত তার স্বভাবের চিৎকারকে আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল সাম্রাজ্যের একটা নগণ্য বস্তুর সামনে ধামা দেয়।

বস্তুত, যে আল্লাহ তায়ালা এই কোরআনের মাধ্যমে মানুষের সাথে কথা বলেন, সেই আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং একমাত্র তিনিই মানুষের স্বভাবকে নির্ভুলভাবে চিনেন।

আয়াতের শেষ ভাগে মোশরেকদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যা এক অজানা জগতে লুকিয়ে আছে এবং যে কোনো সময়ে তা তার ওপর পতিত হতে পারে। হয়তো বা তা আসন্ন। অথচ তারা সে ব্যাপারে অচেতন।

'আর হয়তো তাদের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী .....।

তারা কিভাবে জানবে যে, তাদের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী! আল্লাহর অদৃশ্য জগত যখন তাদের দৃষ্টির আড়ালে এবং তারা আল্লাহর কর্তৃত্বের নাগালমুক্ত নয়, তখন কিভাবে তারা মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে?

বস্তুত, অদৃশ্য মৃত্যু যা হয়তো বা আসন্ন, তার সম্পর্কে এই আভাস মানুষের মনকে প্রচন্ডভাবে কাঁপিয়ে তুলতে ও আলোড়িত করতে সক্ষম। আশা করা যায়, এতে তার মধ্যে জাগরণ ও সচেতনতা আসবে। যিনি কোরআন নাযিল করেছেন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, এই আভাস মানুষের মনকে সাধারণত উদাসীন থাকতে দেয় না। তবে কিছু কিছু লোকের মন এরপরও গোঁয়ার্তুমি ও ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে।

'তাহলে এরপর আর কোন কথায় তারা বিশ্বাস করবে?'

অর্থাৎ এই কথার পরে আর কোনো কথা থাকতে পারে না, যা মানুষের মনকে কাঁপাতে বা নরম করতে পারে।

একই আয়াতে এই আভাসটির পুনরাবৃত্তি থেকে আমরা জানতে পারি কোরআন মানুষের ভেতরকার সত্ত্বাকে কিভাবে সম্বোধন করে। মানব সত্ত্বার কোনো একটি দিককেও সে সম্বোধন না করে ছাড়ে না। তার স্নায়ুতন্ত্রীর কোনো একটি তন্ত্রীতেও সে আপন সুর না বাজিয়ে ছাড়ে না। কোরআন মানুষের মস্তিষ্ককে সম্বোধন করে না বটে। তবে তাকে উপেক্ষাও করে না। সে সমগ্র মানব সত্ত্বাকে আলোড়িত করতে গিয়ে মস্তিষ্ককেও জাগ্রত করে। সে ঠান্ডা বিতর্কের পথ ধরে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না, তবে তাকে সে জিইয়ে রাখে, যাতে সে চিন্তা গবেষণা করতে পারে এবং তার জীবনের উষ্ণতা ও তার গতিশীলতা অব্যাহত থাকে। এভাবে আল্লাহর দিকে আহবানের কর্মসূচী চিরদিন অব্যাহত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা মানুষ মানুষই থাকে এবং অন্য কোনো সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয় না। আর কোরআন আল্লাহর শাশ্বত বাণী এবং মানব জাতির প্রতি অপরিবর্তনীয় ভাষণ, চাই মানুষ যতোই শিক্ষা ও উন্নতি অর্জন করুক।

এই পর্যায়ে এসে মন্তব্য করতে গিয়ে কোরআন ক্ষণেকের জন্যে থামে। এ মন্তব্যে সে আল্লাহর হেদায়াত ও গোমরাহী সংক্রান্ত স্থায়ী মুলনীতি বর্ণনা করে। সে মূলনীতি হলো, যে ব্যক্তি

হেদায়াত কামনা করে ও তার জন্যে সচেষ্ট হয়, তাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করা তথা সঠিক পথে পরিচালিত করার ইচ্ছা করেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের মনকে স্বেচ্ছায় হেদায়াতের যুক্তি প্রমাণ ও ঈমানের প্রেরণাদায়ক জিনিসগুলোর দিকে মনোনিবেশ করা ও তা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে, তাকে তিনি বিপথগামী করার সিদ্ধান্ত নেন। কোরআন যাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলতো, তাদের অবস্থা সম্পর্কে সে ইতিপূর্বে যে বিবরণ দিয়েছে, তদনুসারে ব্যক্তিগত উদাহরণের মূলনীতি বর্ণনা করতে কোরআন যে পদ্ধতি আনুসরণ করে তদনুসারে এবং চলতি ঘটনা প্রসংগে যে স্থায়ী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে তদনুসারেই আল্লাহ তায়ালা এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তাই তিনি ১৮৬ নং আয়াতে বলেন,

'আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তাকে সুপথগামী করতে পারে এমন কেউ নেই। এ ধরনের লোকদেরকে তিনি তাদের বিদ্রোহী কর্মকান্ডে অবাধে বিচরণ করার জন্যে ছেড়ে দেন।'

যারা বিপথগামী হয়, তাদের বিপথগামী হবার একমাত্র কারণ এটাই হয়ে থাকে যে, তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিচার বিবেচনা করার ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়। এই নিদর্শনাবলী বিচার বিবেচনা করার ব্যাপারে যারা উদাসীন হয়ে যায়, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিপথগামী করেন। আর যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিপথগামী করেন, তাদেরকে সুপথগামী করার ক্ষমতা আর কারো থাকে না।

'আল্লাহ তায়ালা যাকে বিপথগামী করেন তার জন্যে আর কোনো হেদায়াতকারী থাকেনা।'

অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত আল্লাহর মূলনীতি অনুসারে আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে বিপথগামী হওয়া বরাদ্দ করে রেখেছেন, সে তার সত্যদ্রোহিতা চিরদিনই অব্যাহত রাখে এবং সত্য থেকে সে চিরদিনের জন্যে অন্ধ হয়ে যায়।

'এবং তাদের তিনি সত্যদ্রোহিতায় অবাধে বিচরণ করার জন্যে ছেড়ে দেন।'

এভাবে বিপথগামী হয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কোনো যুলুম করেননি। কেননা তারা নিজেরাই তাদের চোখকে ও অন্তর্দৃষ্টিকে বন্ধ করে রেখেছে, তারাই তাদের অনুভূতি শক্তিতে অচল করে রেখেছে এবং প্রকৃতির সৃষ্টি বৈচিত্র্য, জন্ম রহস্য ও পূর্ববর্তী আয়াতে যে বস্তু জগতের পর্যবেক্ষণের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, তা থেকে তারাই উদাসীন হয়ে নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেছে। এই মহাবিশ্বের যে দিকেই তারা চোখ মেলে তাকিয়েছে এবং একটা না একটা বিস্ময়কর জিনিস দেখতে পেয়েছে, একটা না একটা নিদর্শনের ওপর তাদের নজর পড়েছে। যখনই কোনো মানুষ নিজের দিকে বা তার পারিপার্শ্বিক জিনিসগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়েছে নিজের ও পারিপার্শ্বিক জিনিসের সৃষ্টিতে সে অলৌকিকত্বের সন্ধান পেয়েছে। এই সব কিছু থেকে সে যখন চোখ বন্ধ করেছে, তখন তাকে দৃষ্টিহীনই করে রাখা হয়েছে। এরপর সে যখন আল্লাহদ্রোহী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়েছে এবং সত্য ও ন্যায়কে উপেক্ষা করেছে, তখন এই উপেক্ষার মধ্যেই তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যতোক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। আয়াতের শেষাংশের মর্ম এটাই।

মানবীয় দৃষ্টি শক্তির বাইরে ঈমানের বিচরণ

নিজের পার্শ্ববর্তী জিনিসগুলো সম্পর্কেই অন্ধ ও উদাসীন এই অর্বাচীনেরা রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করতো যে, কেয়ামত কবে হবে, অর্থাৎ কিনা নিজের পায়ের তলায় কী আছে, তা যে দেখে না, সে দূর মহাকাশে কী আছে জানতে তা চায়!

'তারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, কেয়ামত কবে হবে। বলে দাও যে, এর জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকের কাছেই রয়েছে,.....(আয়াত ১৮৭ ও ১৮৮)

আখেরাত এবং আখেরাতের হিসাব-নিকাশ ও কর্মফলপ্রাপ্তি সংক্রান্ত আকীদা আরবের মোশরেকদের কাছে একেবারে আকস্মিকভাবেই এসেছিলো। যদিও এ আকীদা ওই মোশরেকদের পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) কর্তৃক প্রচারিত ধর্মের অংগীভূত ছিলো, কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় ইসলামের মূলনীতিগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত আখেরাত সংক্রান্ত বিশ্বাস তাদের মন থেকে একেবারেই মুছে গিয়েছিলো। এটা ছিলো তাদের কাছে একেবারেই অকল্পনীয় ও আজগুবি বিষয়। তাই তারা রসূল (স.)-এর কথাবার্তায় অবাক হয়ে যেতো। কেননা তিনি তাদেরকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা বলতেন। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, হিসাব নিকাশ ও কর্মফলের কথা বলতেন। এ সম্পর্কে কোরআন সূরা সাবার ৭ ও ৮ নং আয়াতে বলেন,

কাফেররা বললো, তোমাদেরকে কি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেবো যে তোমাদেরকে বলে যে, মৃত্যুর পর তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ রূপে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তোমরা নতুন করে সৃষ্ট হবে। সে কি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রটাচ্ছে, না তার কাছে জ্বিন রয়েছে, আসলে আখেরাতে যার বিশ্বাস করে না, তারা আযাবে ও চরম বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হবে।'

আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, আখেরাত সংক্রান্ত আকীদায় অবিচল বিশ্বাস ছাড়া কোনো জাতি মানব জাতির নেতৃত্ব দান ও তাদের পথ-প্রদর্শক হতে পারবে না, যেমন মুসলমানরা হয়েছে। কেননা জীবন দুনিয়ার জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এরূপ ধারণা পোষণ করলে আর যাই হোক, সমগ্র বিশ্বের গোটা মানব জাতির নেতা হওয়া সম্ভব নয়।

আখেরাতে বিশ্বাস চিন্তার ব্যাপকতা, অন্তরের উদারতা ও জীবনের প্রশস্ততাকে অনিবার্য করে তোলে। আর এগুলো মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে অত্যন্ত জরুরী, যাতে সে উক্ত বিরাট ও বিশাল দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করতে পারে। এ বিশ্বাস প্রবৃত্তির লালসা থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও অপরিহার্য। তা ছাড়া জীবন সংগ্রামের ময়দানেও এর প্রয়োজন অত্যধিক, যাতে করে অতীতের ব্যর্থতা ও বঞ্চনা তাকে হতাশাগ্রস্ত না করে এবং ভবিষ্যতের জন্যে কল্যাণের সুসংবাদ প্রদান, ভালো কাজ করা ও ভালো কাজে নেতৃত্ব দান অতীতের ব্যর্থতা ও বঞ্চনা সত্তেও সম্ভব হয়। ইসলামের মহান দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হওয়ার জন্যে উক্ত গুণাবলী ও চেতনায় অনুপ্রাণিত হওয়া খুবই জরুরী।

আখেরাতের বিশ্বাস মানুষের হৃদয়ে বিরাজিত দৃষ্টি ও চিন্তার প্রশস্ততা এবং পশুর অনুভূতিতে বিদ্যমান দৃষ্টির সংকীর্ণতা ও অবরুদ্ধতার মাঝে সীমানা চিহ্নিত করে। পশুর অনুভূতি নিয়ে মানব জাতির নেতৃত্ব দান এবং খেলাফাতে রাশেদায় আল্লাহর আমানত রক্ষা করা সম্ভব নয়।

এ জন্যে প্রত্যেক নবীর আমলে আখেরাত বিশ্বাসের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শেষ নবীর আমলে এটি সর্বাধিক প্রশস্ত, গভীর ও স্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে। তাই মুসলিম উম্মাহর চেতনায় তাদের বর্তমান পার্থিব জীবনের চেয়েও আখেরাত অনেক বেশী স্পষ্ট, বাস্তব ও গভীর। এ কারণেই এ জাতি সমগ্র মানব জাতির নেতৃত্ব দানের যোগ্য। মানবেতিহাসে রেকর্ড সৃষ্টিকারী কল্যাণময় নেতৃত্ব দান একমাত্র মুসলমানদেরই বিরল কৃতিত্ব।

সূরা আরাফের এই স্থানটিতে আমরা দেখতে পাই, মোশরেকরা আখেরাত বিশ্বাস সম্পর্কে খানিকটা বিদ্রূপাত্মক ভংগিতে এবং কিছুটা বিস্ময় ও বিরক্তি জড়িত ভাষায় প্রশ্ন করেছে যে, 'কেয়ামত কবে হবে।'

কেয়ামতের সঠিক সময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ জানে না এবং তিনি আর কাউকে জানাননি। অথচ মোশরেকরা রসূল (সঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। তাদের এ জিজ্ঞাসা রসূল (স.)-কে পরীক্ষা করা, বিস্ময় প্রকাশ করা কিংবা বিদ্রূপ করা, হেয় করা ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

রসূল (স.) একজন মানুষ। তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করেন না। আদেশ দেয়া হয়েছে যেন অদৃশ্য সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, অদৃশ্য জ্ঞান মানুষের আয়ত্তের বাইরের এটা শুধু আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। তিনি মানুষ হিসাবে মানবীয় সামর্থের বাইরে যেতে পারেন না। তিনি নিজের সীমা অতিক্রম করতে পারেন না। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যা জানাতে বা শেখাতে চান, তা তিনি নিজেই ওহী যোগে জানান। 'বলো, এ সংক্রান্ত জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তিনি এটা কেবল যথা সময়েই প্রকাশ করবেন।'

আল্লাহই অদৃশ্য জ্ঞানের একমাত্র মালিক। তিনি এ জ্ঞান নির্দিষ্ট সময়ের আগে ব্যক্ত করেন না। আর তিনি ছাড়া অন্য কেউও তা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়।

এরপর তাদেরকে কেয়ামতের সময় নিয়ে প্রশ্ন করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। তার পরিবর্তে কেয়ামত জিনিসটা কী, সেই বিষয়টাকে গুরুত্ব দেয়ার এবং তা কী ভয়ংকর জিনিস তা উপলব্ধি করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, কেয়ামত একটা গুরুতর ঘটনা। নিদারুণ ভয়াবহ একটা দিন। আকাশ ও পৃথিবীতে তা এক মহা প্রলয় সৃষ্টি করবে। উপরন্তু তা আকস্মিকভাবে এসে হাযির হবে। যারা এ সম্পর্কে উদাসীন ছিলো, তারা উদাসীনই থাকবে, সচেতন হবার ফুরসতও পাবে না।

'আসমান যমীনে তা হবে এক ভয়াবহ ঘটনা। তোমাদের কাছে তা আকস্মিকভাবেই উপস্থিত হবে।'

সুতরাং কেয়ামত হঠাৎ করে হাযির হওয়ার পর যখন সতর্ক হয়ে কোনো লাভ হবে না, তখন তার জন্যে আগে ভাগে প্রস্তুতি নেয়াই সর্বোত্তম কাজ। এখনো আয়ুষ্কাল অবশিষ্ট রয়েছে কেউ জানে না কখন কেয়ামত শুরু হবে। তাই সেই মুহূর্তটিকে স্বাগত জানানোর জন্যে দ্রুত উদ্যোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটি মুহূর্তও সময় নষ্ট করা চাই না। কেননা যে মুহূর্ত নষ্ট হবে, তার পরের মুহূর্তেই কেয়ামত ঘটে যেতে পারে।

এরপর কেয়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে। কেননা তাদের প্রশ্নের ধরন দেখে বুঝা যায় যে, তারা রসূলের দায়িত্ব কী তা জানেই না। উপরন্তু তারা আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়ও জানে না এবং মহান আল্লাহর পাশাপাশি রসূলের সাথে কি রকম আচরণ করা উচিত, তাও জানে না।

'ওরা তোমাকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করছে, যেন তুমি কেয়ামতের তথ্য সংগ্রহের কাজেই নিয়োজিত।'

অর্থাৎ যেন তুমি ক্রমাগত আল্লাহর কাছে 'কেয়ামত কবে হবে, কেয়ামত কবে হবে', জিজ্ঞাসা করেই চলেছো এবং কেয়ামতের সময়টা উদঘাটন করা যেন তোমার দায়িত্ব। অথচ যে বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট বলে রসূল (স.) জানতেন, সে বিষয়ে তিনি আল্লাহর কাছে কিছুই জিজ্ঞাসা করতেন না।

'বলো, কেয়ামতের যাবতীয় তথ্য কেবল আল্লাহর কাজেই রয়েছে।'

অর্থাৎ এ জ্ঞান শুধু আল্লাহরই একচেটিয়া। এটা তিনি আর কাউকে জানান না।

'কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'

শুধু কেয়ামতের বিষয় নয় বরং সকল অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে। অদৃশ্যের যে কোনো তত্ত্ব ও তথ্য জানার একমাত্র অধিকার ও ক্ষমতা আল্লাহর। যখন যাকে যতোটুকু অদৃশ্য জ্ঞান তিনি দিতে চান, কেবল তখনই ততোটুকু সে জানতে পারে– অন্য কেউ নয়। তাই মানুষ নিজের উপকার ও ক্ষতির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে না। অনেক সময় সে নিজের উপকারের উদ্দেশ্যে একটা কাজ করে, কিন্তু পরিণামে তাদের ক্ষতি হয়ে যায়। আবার অনেক সময় নিজেদের

ক্ষতি দূর করার জন্যে কাজ করে, কিন্তু তাতে সে ক্ষতি দূর হয় না। অনেক সময় একটা কাজ অনীহা ও অপছন্দের মনোভাব নিয়ে করে, কিন্তু পরিণামে তা উপকারী সাব্যস্ত হয়। আবার একটা কাজ খুব পছন্দ ও উৎসাহ নিয়ে করে, কিন্তু তার পরিণাম হয় ক্ষতিকর। আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারায় বলেছেন, 'তোমরা হয়তো একটা জিনিস অপছন্দ করবে, অথচ সেটাই তোমাদের জন্যে উপকারী, আবার তোমরা হয়তো একটা জিনিস ভালোবাসবে। কিন্তু সেটা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর।'

জনৈক কবি বলেন,

'আমার যাত্রার আগে আমার গন্তব্য আমাকে কে দেখিয়ে দেবে? কোথা থেকেই বা দেখাবে? কেননা গন্তব্যের সন্ধান তো যাত্রার পরেই পাওয়া যায়।'

গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের ব্যাপারে মানুষ যে কতো অসহায়, কবি এখানে সেটাই বুঝাতে চাইছেন। মানুষ যতো জ্ঞানীই হোক এবং যতো বিদ্যাবুদ্ধিই অর্জন করুক, পর্দার আড়ালে অদৃশ্য বিষয়ের সামনে তার অবস্থান তাকে অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেবে যে, অজানা অদৃশ্য জগতের অভ্যন্তরে তার মানবীয় সত্ত্বার কোনোই প্রবেশাধিকার নেই।

রসূল (স.) যতোই বিশিষ্টতার অধিকারী হোন এবং আল্লাহর যতো ঘনিষ্ঠই হোন, তাকে এ কথা ঘোষণা করার আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর অদৃশ্য জগতের সামনে তিনি একজন সাধারণ মানুষ বৈ কিছুই নন। নিজের লাভ ক্ষতির ওপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কেননা তিনি অদৃশ্য বিষয় জানেন না, যাত্রার আগে গন্তব্য সম্পর্কে তিনি অবহিত নন এবং নিজের ফলাফল তিনি আগাম দেখতে পান না। তাই নিজের কাজের পছন্দসই ফল লাভ করা তার আয়ত্তাধীন নয়। কোনো কাজের ফল ভালো দেখে যে এগিয়ে যাবেন এবং ফল মন্দ দেখে যে থেমে যাবেন, সেটা সম্ভব নয়। তিনি শুধু কাজই করতে পারেন। কাজের ফল আল্লাহ তায়ালা যেরূপ তার অদৃশ্য গোপন জগতে নির্ধারণ করে রেখেছেন সেরূপই হবে। এ বিষয়টাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন পরবর্তী (১৮৮ নং) আয়াতে। বলেছেন,

'বলো, নিজের লাভ ক্ষতির ওপর আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। শুধু আল্লাহ তায়ালা যতোটুকু চান ততোটুকুই আছে। আমি যদি অদৃশ্য জানতাম, তাহলে আমি অনেক বেশী কল্যাণের অধিকারী হতাম, অকল্যাণ আমাকে স্পর্শই করতো না।'......

এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইসলামের তাওহীদ তত্ত্বের সকল বৈশিষ্ট্য পূর্ণতা লাভ করেছে, সর্বপ্রকারের শেরকের সাথে তার পরিপূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছে এবং মহান আল্লাহর জন্যে এমন সব গুণ-বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়ে গেছে, যার মধ্যে মানুষের কোনোই অংশীদারিত্ব নেই। এ মানুষ যদি আল্লাহর রসূল, তাঁর প্রিয় ও মনোনীত বন্ধু মোহাম্মদ (স.)ও হন, তবু অদৃশ্যের দরজার সামনে গিয়ে তার মানবীয় শক্তি ও মানবীয় জ্ঞান থেমে যাবে। মনুষ্যত্বের শেষ সীমান্তে গিয়ে রসূল (স.)-এর ব্যক্তিত্ব নিষ্ক্রিয় ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়বে এবং তার দায়িত্ব নির্ধারিত হয়ে যায়।

'আমি মোমেনদের জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী ছাড়া আর কিছু নই।'

নিসন্দেহে রসূল (স.) মোমেন-কাফের নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যেই সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। তবে যারা ঈমান আনে তারাই তাঁর সতর্কবাণী ও সুসংবাদ দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে। কেননা রসূল (স.)-এর আনীত বিধানের প্রকৃত মর্ম ও তার উৎসকে তারাই সঠিকভাবে উপলব্ধি করে। এ জন্যে তারা গোটা মানব জাতির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানবগোষ্ঠী এবং রসূল (স.)-ও সমগ্র মানব জাতির মধ্য থেকে তাদেরকেই নিজের একনিষ্ঠ অনুগত মানুষ হিসাবে বাছাই করেছেন।

কলেমায়ে তাইয়েবার প্রকৃত তাৎপর্য তারাই উপলব্ধি করে, যাদের মন এর জন্যে উন্মুক্ত এবং যাদের বিবেক একে স্বাগত জানায় ও গ্রহণ করে। আর এই কোরআন মোমেনদের ছাড়া আর

কারো জন্যে তার রহস্যভান্ডার খুলে দেয় না এবং আর কাউকে তার সুফল প্রদান করে না। কোনো কোনো সাহাবী বলেছেন যে, 'আমরা কোরআন লাভ করার আগে ঈমান লাভ করতাম।' এই ঈমানই তাদেরকে কোরআনের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করায়, তার উদ্দেশ্য ও মর্ম যথাযথভাবে হৃদয়ংগম করায় এবং সেই অলৌকিক ঘটনাগুলো ঘটায়, যা তারা স্বল্পতম সময়ে ঘটাতে পেরেছিলেন।

সেই তুলনাহীন প্রজন্মটি কোরআনের যে স্বাদ, যে জ্যোতি ও যে প্রমাণ লাভ করেছিলো, তা শুধু ওই প্রজন্মের ন্যায় ঈমান আনা ছাড়া লাভ করা যায় না। যদিও কোরআনই তাদের অন্তরাত্মাকে ঈমানের সন্ধান দিয়েছিলো, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, ঈমানই তাদেরকে কোরআন থেকে সেই অমূল্য রত্মভান্ডার অর্জনের পথ দেখিয়েছিলো যা, ঈমান ছাড়া আর কোনো জিনিস দেখাতে পারে না।

তারা কোরআনকে অবলম্বন করে যেমন জীবন যাপন করেছিলো, তেমনি তাদের জীবনের উদ্দেশ্যও ছিলো কোরআনের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন। এজন্যে তারা ছিলো এমন এক অনুপম প্রজন্ম, যা ঐ মান, অতো পূর্ণতা ও আধিক্য নিয়ে সমগ্র মানবেতিহাসে আর দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হয়নি। সমগ্র ইতিহাস জুড়ে কেবল কিছু ব্যক্তিকেই অনুরূপ উঁচু ও বিস্ময়কর মান নিয়ে বিচরণ করতে দেখা যায়।

দীর্ঘকালব্যাপী তারা কোরআনের একনিষ্ঠ আনুগত্য করেছে। এই দীর্ঘ সময়ে রসূল (স.)-এর উক্তি ও নির্দেশাবলী ছাড়া তাদের জীবনে অন্য কোনো মানবীয় বাণীর বিন্দু বিসর্গও মিশ্রিত হয়নি। অনুরূপভাবে স্বয়ং রসূল (স.)-এর জীবনও ছিলো কোরআনের একক ও অবিমিশ্র অবদান। এ জন্যে তিনি যেমন ছিলেন, তাঁর অনুসারী সেই প্রজন্মটিও তদ্রূপ হয়ে গড়ে উঠেছিলো।

যারা সেই প্রজন্মের ভূমিকা পালন করতে চায়, তাদের জন্যে ওই প্রজন্মের পদাংক অনুসরণ করাই সর্বোত্তম পন্থা। আর তা করতে হলে তাদেরকে এই কোরআনকে অবলম্বন করে এই কোরআনকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই জীবন যাপন করতে হবে এবং তাদের মন মগযে কোরআনের সাথে আর কোনো মানব রচিত মতবাদ ও মতাদর্শের মিশ্রণ ঘটানো চলবে না। অন্যথায় তাদেরও মানব রচিত আদর্শের মতোই হয়ে যেতে হবে।

তাওহীদ ও শেরেকের চিরন্তর সংঘাত

এবার পুনরায় তাওহীদের একটা আলোচনার সুত্রপাত করা হচ্ছে একটা কাহিনীর আকারে। এ কাহিনী দ্বারা দেখানো হয়েছে কিভাবে মানুষ তাওহীদ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে শেরকের দিকে ধাবিত হয়। এ যেন আরবের মোশরেকদের পিতা ইবরাহীমের আদর্শ থেকে বিচ্যুতিরই কাহিনী। এরপর তারা তাদের দেব দেবীর পূজা করতে গিয়ে যে অসভ্যসুলভ ও নির্বোধসুলভ কর্মকান্ড করে থাকে, তার পর্যালোচনা করে তাকে প্রথম দৃষ্টিতেই এবং প্রথম বিবেচনাতেই প্রত্যাখ্যানযোগ্য রূপে দেখানো হয়েছে। সবার শেষে রসূল (স.)-কে তাদের ও তাদের এই সব বাতিল মা'বুদদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দেয়ার এবং তাঁর একমাত্র অভিভাবক ও সহায় আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

'তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র সত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার স্ত্রীকেও সৃষ্টি করেছেন ....' (আযাত ১৮৯-১৯৮)

এ হচ্ছে জাহেলী চিন্তাধারার একটা পর্যালোচনা। এই জাহেলী চিন্তাধারা একবার আল্লাহর দাসত্ব ও এবাদাতের পথ থেকে বিচ্যুত হবার পর তার ভ্রষ্টতা ও নির্বুদ্ধিতার আর কোনো সীমা পরিসীমা থাকেনি এবং তা আর কোনো বিচার বিবেচনা ও চিন্তা ভাবনার দিকে ফিরে আসেনি। এখানে দেখানো হয়েছে যে, গোমরাহী প্রাথমিক স্তরে কেমন অবস্থায় থাকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তা কেমন নিকৃষ্ট বিভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়।

'তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে একটি সত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করেছেন। ....' (আয়াত ১৮৯)

বস্তুত, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সেটা এই যে, তারা আল্লাহকে আপন প্রভু ও একমাত্র প্রভু হিসাবে গ্রহণ করবে, ভয় কিংবা লোভ সকল অবস্থায়। এখানে যে উদাহরণটি দেয়া হয়েছে তা সৃষ্টির গোড়ার কথা দিয়েই শুরু হয়েছে এবং এ প্রসংগে দাম্পত্য জীবন ও তার প্রকৃতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আয়াতটির প্রথমাংশে বলা হয়েছে,

তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা– যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র সত্ত্বা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তার কাছে পরম শান্তি করতে পারে।'

অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবে মানব-সত্ত্বা মূলত একই ব্যক্তি ও একই সত্ত্বা– যদিও নারী ও পুরুষের মধ্যে তার দায়িত্বের পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য শুধু এজন্যে যেন স্বামী তার স্ত্রীর কাছ থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। মানুষের আসল পরিচয় উদ্ধারে ও তার সৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবনের ভূমিকা চিহ্নিতকরণে এটাই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। এটাই পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দৃষ্টিভংগি, যা ইসলাম চৌদ্দশো বছর আগে উপস্থাপন করেছে। সে সময় বিকৃত ধর্মমতগুলো নারীকে মানব জাতির সকল বিপদ মুসিবতের উৎস মনে করতো এবং তাকে একটা অভিশাপ, একটা ময়লা এবং গোমরাহীর একটা ফাঁদ গণ্য করে তা থেকে সবাইকে কঠোরভাবে সাবধান করতো। পৌত্তলিক সমাজগুলোতে তাকে একটা আবর্জনা স্বরূপ কিংবা নিদেনপক্ষে পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট মানের একটা ভৃত্য বা সেবাদাসী মনে করা হতো এবং আজও করা হয়। পুরুষের আদৌ কোনো দায় দায়িত্ব নারীর ব্যাপারে নেই বলে পৌত্তলিক সমাজের বিশ্বাস।

স্বামী স্ত্রীর একত্র অবস্থানের ক্ষেত্রে মূল কথা হলো, শান্তি, তৃপ্তি, ভালোবাসা, স্থিতি ও আবাসন। এর উদ্দেশ্য পারিবারিক জীবনে এমন একটা শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ সুখময় পরিবেশ সৃষ্টি করা, যা মানুষের নতুন বংশধরদের বিকাশ ও প্রবৃদ্ধির সহায়ক, মূল্যবান মানবীয় ফসল উৎপাদন ও সংরক্ষণের অনুকূল এবং মানব সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন ও তাতে নতুন উপাদান সংযোজনের যোগ্যতা নতুন প্রজন্মের মধ্যে গড়ে তোলার উপযোগী। নিছক সাময়িক আনন্দ উপভোগের জন্যে এ ব্যবস্থা করা হয়নি। অনুরূপভাবে শত্রুতা ও ঝগড়াবিবাদে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে বিরোধে মেতে থাকার জন্যেও এ ব্যবস্থা করা হয়নি যেমনটি প্রাচীন ও আধুনিক জাহেলী সমাজে করা হয়।

এরপর কাহিনী শুরু হয় প্রথম স্তর থেকেই।

'অতপর যখন সে তার স্ত্রীকে ঢেকে ফেললো, তখন সে গর্ভবতী হলো। সে গর্ভ ছিলো হালকা, তা নিয়ে সে চলাফেরা করতে থাকলো।'

এখানে কোরআনের ভাষায় স্বামী স্ত্রীর প্রাথমিক সম্পর্ককে চিত্রায়ণে স্বচ্ছতা, সূক্ষ্মতা ও কোমলতা বজায় রাখা হয়েছে। 'যখন সে তাকে ঢেকে ফেললো' এ বাক্যটিতে আবাসিক পরিবেশের সাথে সহবাসের চিত্রটির সমন্বয় সাধন ও কাজটিকে ভদ্র ও শালীনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে করে তা দুটি দেহের নয় বরং দুইটি হৃদয়ের মিলন রূপে প্রতীয়মান হয়। এতে করে মানুষকে সহবাসের মানবীয় ভংগি অবলম্বনের ও তাকে ঘৃণ্য পাশবিক ভংগি এড়িয়ে চলার জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, গর্ভধারণের প্রাথমিক অবস্থাকে 'হালকা' বলে চিত্রিত করা হয়েছে, যা নিয়ে গর্ভধারিণী চলাফেরা করতে পারে, যেন তার কোনো ভারত্ব সে অনুভবই করে না।

অতপর দ্বিতীয় স্তর আসে,

'অতপর যখন তার গর্ভ ভারী হয়ে ওঠে, তখন উভয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে, তুমি যদি আমাদেরকে একটা উত্তম সন্তান দাও, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।'

এ পর্যায়ে এসে গর্ভ স্পষ্ট হয়ে যায়, তার প্রতি স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়ের টান সৃষ্টি হয় এবং সন্তান যেন সুস্থ, নিখুঁত ও সৎ রূপে গড়ে ওঠে, এই আকাংখা জন্মে। সন্তান গর্ভে থাকাকালে মা-বাবার মনে এরূপ আরো অনেক আকাংখার সৃষ্টি হয়। আর এই আকাংখা জাগার সাথে সাথে স্বভাব জাগ্রত হয়, আল্লাহর দিকে মন রুজু হয়, আল্লাহকে একমাত্র প্রতিপালক হিসাবে স্বীকার করে এবং একমাত্র তাঁর অনুগ্রহ কামনা করে। কেননা সে অবচেতন মনে অনুভব করে যে, তিনিই এই সৃষ্টি জগতে শক্তি, সম্পদ ও অনুগ্রহের একমাত্র উৎস। এজন্যে দোয়া করে যে,

'আমাদেরকে একটা উত্তম সন্তান দিলে তোমার কৃতজ্ঞ থাকবো।'

'অতপর যখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে একটা ভালো সন্তান দিলেন, তখন প্রদত্ত সন্তানে আল্লাহর সাথে অন্যকেও শরীক করে ফেললো। আল্লাহ তাদের শেরক থেকে অনেক উর্ধে।'

তাফসীরের কোনো কোনো বর্ণনায় এই কাহিনীকে হযরত আদম ও হাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট একটা সত্য ঘটনা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। কাহিনীর সারমর্ম এই যে, প্রথম দিকে আদম ও হাওয়ার সন্তানেরা প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নিতো। এরপর শয়তান এসে হাওয়াকে প্ররোচিত করলো যেন তার গর্ভস্থ সন্তানের নাম 'আবদুল হারেস' রাখে। হারেস হলো ইবালীসের আরেক নাম। সে বললো যে, এতে তার সন্তান সুস্থ ও স্বাভাবিক হবে এবং বেঁচে থাকবে। হাওয়া তাই করলেন এবং আদমকেও উদ্বুদ্ধ করলেন। এই বর্ণনাটা দৃশ্যত ইসরাঈলী উৎস থেকে আগত। কেননা ইসরাঈলী খৃষ্টীয় বিকৃত আকীদা বিশ্বাস অনুসারে গোমরাহীর সমস্ত দায়-দায়িত্ব হযরত হাওয়ার ওপর বর্তে। অথচ এটা প্রকৃত ইসলামী মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী।

কোরআনের এ বক্তব্যের ব্যাখ্যার জন্যে আমাদের এই সব ইসরাঈলী বর্ণনার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কেননা এ আয়াতে মানুষের মনে কিভাবে পর্যায়ক্রমে গোমরাহী আসে, সেটাই দেখানো হয়েছে। রসূল (স.)-এর যুগে ও তার আগে মোশরেকেরা তাদের সন্তানদের মধ্য হতে কাউকে কাউকে তাদের দেব দেবীর বা দেব মন্দিরের সেবক সেবিকা হিসাবে মান্নত করতো। এ দ্বারা তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা করতো। প্রথম দিকে তাদের মনোযোগ আল্লাহর দিকে থাকলেও তারা তাওহীদের পর্বতচূড়া থেকে গড়িয়ে পৌত্তলিকতার ভাগাড়ে নেমে যেতো। এই সব দেব দেবীর নামে সন্তানদেরকে মান্নত করার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তাদের সন্তানরা যেন দীর্ঘজীবী হয়, সুস্থ সবল হয় এবং বিপদ মুসিবত থেকে রক্ষা পায়। যেমন আজকাল অনেকে ছেলে-মেয়েদের দেহের অংশ বিশেষকে ওলী দরবেশ ও পীর ফকীরের নামে মান্নত রাখে। উদাহরণ স্বরূপ সন্তানের চুল রেখে দেয়া হয় এবং কোনো ওলী দরবেশ বা পীর-ফকীরের মাযারে বা কোনো পুরোহিতের কাছে না নিয়ে প্রথম চুল কাটা হয় না। আবার কেউ সেখানে নিয়ে সন্তানের খাতনা করায়। অথচ এ যুগের এই লোকেরা আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে অতপর এ ধরনের মোশরেকসুলভ ধ্যান ধারণা পোষণ করে। সেকালের ও একালের মানুষের এই ধরনের ধ্যান ধারণায় মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই।

'আল্লাহ তায়ালা তাদের শেরক থেকে উর্ধে।'

অর্থাৎ তিনি এসব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

আমাদের যুগে আমরা বহু বিচিত্র রকমের শেরক দেখতে পাই। অথচ এসব শেরকে যারা লিপ্ত থাকে, তারা নিজেদেরকে একত্ববাদী বলে স্বীকার করে। তাদের এসব ধারণা বিশ্বাস আমাদের সামনে শেরকের বিভিন্ন স্তরের চিত্র উপস্থাপন করে। যার উল্লেখ এই আয়াতে করা হয়েছে।

এযুগে লোকেরা কিছু নতুন নতুন খোদা তৈরী করে নিয়েছে। এর কোনোটাকে তারা 'জাতি' এবং কোনোটাকে 'দেশ' ইত্যাদি বলে থাকে। আগেকার সাদাসিধে পৌত্তলিকদের বানানো মূর্তিগুলো আর এগুলোর মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, আগের মূর্তিগুলো হতো সশরীরী আর এ

যুগের মূর্তিগুলো অশরীরী। আগেকার মোশরেকরা তাদের সন্তানদেরকে দৃশ্যমান মূর্তির নামে মান্নত করতো, আর এ যুগে জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের নামে মান্নত করা হয়। আগেকার যুগে মন্দিরে মন্দিরে সন্তানদের নামে পশু বলি দেয়া হতো, আর এ যুগেও তা দেয়া হয়।

মানুষ আল্লাহকে প্রভু ও মনিব হিসাবে স্বীকার করে বটে। তবে তাঁর হুকুম পালন করে না। অথচ যাদের নামে মান্নত মানা হয়, তাদের নির্দেশকে 'পবিত্র' বলে গন্য করা হয় এবং এগুলোর মোকাবেলায় আল্লাহর হুকুম বর্জন যোগ্য মনে করা হয়। এমনকি কার্যত বর্জন করা হয়। আধুনিক জাহিলিয়াতের এই সব কর্মকান্ড যদি শেরক না হয়, তাহলে শেরক আর কাকে বলা যাবে?

প্রাচীন জাহেলিয়াত আল্লাহর প্রতি অধিকতর ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছিলো। সেই জাহেলিয়াত আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আরো কিছু সংখ্যক উপাস্য দেব দেবীকে ফসল, পশু ও সন্তানাদি উপঢোকন দিতো আল্লাহরই নৈকট্য লাভ করার জন্যে। এভাবে আল্লাহ তায়ালাই ছিলো তাদের সর্বোচ্চ ভক্তির পাত্র। পক্ষান্তরে আধুনিক জাহেলিয়াত আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যে সব খোদাকে মানে, সেগুলোকে আল্লাহর চেয়েও উচ্চে স্থান দেয়, তাদের আদেশকে অগ্রগণ্য মনে করে এবং আল্লাহর আদেশকে বর্জন করে।

আমরা পৌত্তলিকতাকে যখন শুধু প্রাচীন মূর্তি, দেব দেবী, তাদের পূজা অর্চনা ও তাদেরকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হিসাবে বিশ্বাস করা অর্থের মধ্যে সীমিত রাখি, তখন নিজেদেরকেই প্রতারিত করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র মূর্তি ও পৌত্তলিকতার আকৃতিতেই পরিবর্তন এসেছে। অনুরূপভাবে এবাদাত-উপাসনার আনুষ্ঠানিক রূপটাই শুধু পাল্টে গেছে এবং নতুন নতুন শিরোনাম গ্রহণ করেছে। এসব পরিবর্তিত রূপের আড়ালে শেরকের প্রকৃতি ও মূলতত্ত্ব অপরিবর্তিত রয়েছে। সুতরাং এই মূলতত্ত্ব সম্পর্কে কখনো আমাদের ধোকা খাওয়া উচিত নয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নারীর সতীত্ব, শালীনতা ও নরনারীর সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু 'জাতীয়তাবাদ' ও 'উৎপাদন তত্ত্ব' নারীকে ঘরের বাইরে বে-পর্দা হয়ে ও দেহকে অনাবৃত রেখে বিচরণ করার এবং পৌত্তলিকতাবাদী জাপানের যুবতীদের মতো হোটেল-কর্মচারী হিসাবে কাজ করার আদেশ দেয়। এখন এই দুই আদেশদাতার মধ্যে যার আদেশ পালন করা হবে, সেই হবে ইলাহ। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কাকে ইলাহ হিসাবে মেনে নেবো? আল্লাহকে না এই সব তথাকথিত ইলাহদেরকে? (১)

আল্লাহ তায়ালা আদেশ দিয়েছেন ইসলামী আকীদা ও আদর্শ ভিত্তিক জাতি গঠন করতে। আর জাতীয়তাবাদ জাতি গঠনের পেছনে কোনো আকীদা আদর্শকে পাত্তা না দেয়ার আদেশ দেয়। বরং বর্ণ, বংশ, ভাষা ইত্যাদিকে জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার আদেশ দেয়। এ ক্ষেত্রে কার আদেশ পালন করা হবে? আল্লাহর, না জাতীয়তাবাদ নামক কল্পিত খোদার?

আল্লাহর অকাট্য নির্দেশ হলো, একমাত্র তার শরিয়াত বা আইন অনুসারেই মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় জীবন পরিচালিত হোক। কিন্তু আল্লাহর কোনো কোনো বান্দা, দল বা 'জাতি'র বক্তব্য যে, কখনো নয়, আল্লাহর আইন চলবেনা, বান্দারাই তাদের আইন রচনা করবে এবং সেই আইনই হবে দেশ ও জাতির চালক ও শাসক। প্রশ্ন এই যে, এখন কার কথা মানা হবে? আল্লাহর, না এই সব কল্পিত খোদার?

এ হচ্ছে পৃথিবীতে যা কিছু আজকাল চলছে, তার কয়েকটা উদাহরণ মাত্র। বিপথগামী মানব সমাজে এগুলো ব্যাপকভাবে পরিচিত প্রাচীনকালের দৃশ্যমান মূর্তি ও পৌত্তলিকতার স্থান গ্রহণকারী আধুনিক পৌত্তলিকতার প্রকৃত পরিচয় এই উদাহরণগুলোতে পরিস্ফুট। এটা পৌত্তলিকতার

(১) এ ব্যাপারে এখন আর পূর্ব-পশ্চিমে কোনো তফাৎ নেই প্রাচ্যের জাপান আর পাশ্চাত্যের আমেরিকা-সবখানেই নারীরা আজ অবহেলিত অনেকটা বাজারীপণ্য।—সম্পাদক

পরিবর্তিত রূপ বটে। কিন্তু শেরকের স্থায়ী ও আসল চরিত্র ও প্রকৃতি যে এর মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই।

কোরআন সেকালের সরল সোজা পৌত্তলিকতা ও সুস্পষ্ট জাহেলিয়াতকে সম্বোধন করেছিলো এবং সেই জাহেলিয়াত যুগের মানুষের বিবেককে বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছিলো। তারা যতো আদিম যুগের মানুষই হোক না কেন, তাদের বিবেকবুদ্ধির সাথে অমন নির্বুদ্ধিতা মানানসই নয় বলে তাদেরকে বুঝিয়েছিলো। তাদের জন্যে উক্ত দুটি আয়াতে উদাহরণ পেশ করেছে এবং মানুষের মনে শেরকের যে বিভিন্ন স্তর থাকতে পারে, সে কথা এতে ব্যাখ্যা করেছে। পরবর্তী ক'টি আয়াতে এই উদাহরণের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

'যারা কোনো বস্তুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং সৃজিত হয় এবং যারা তাদের কোনোই সাহায্য করতে পারে না এমন কি নিজেদেরও নয়, তাদেরকেই কি তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে?'

বস্তুত, এবাদাত ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য শুধু সেই সত্ত্বা, যিনি সৃষ্টি করেন। তাদের কল্পিত খোদারা কিছুই সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। বরং তারাই সৃষ্ট। এমতাবস্থায় তাদেরকে কিভাবে আল্লাহর শরীক বানায়?

যদিও সৃষ্টি ও ক্ষমতা সংক্রান্ত এই অকাট্য যুক্তি তৎকালীন সেই সরলমতি জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছিলো, কিন্তু এই একই যুক্তি আধুনিক জাহেলিয়াতের অনুসারীদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য। এরা নিজেদের জন্যে নতুন ধরনের কিছু সংখ্যক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে যাদের আদেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এবং নিজেদের সহায়-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির ব্যাপারে তাদেরকে আল্লাহর বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করে। প্রশ্ন এই যে, তাদের কেউ কি আকাশ ও পৃথিবীর কোনো একটি জিনিসও সৃষ্টি করতে পারে বা সৃষ্টি করে? তাদের কেউ কি তাদের ভক্তদের দূরে থাক, স্বয়ং তাদের নিজেদেরও কোনো উপকার বা সাহায্য করতে পারে?

মানবীয় বিবেক যদি এই বাস্তবতার আলোকে বিস্ময়টিকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার বিবেচনা করে, তাহলে পরিষ্কার নেতিবাচক জবাব দেবে। কিন্তু একমাত্র প্রবৃত্তির খাহেশ, ভাবাবেগ, প্ররোচনা ও প্রবঞ্চনাই কোরআন নাযিল হওয়ার চৌদ্দশো বছর পর মানব জাতিকে নতুন বেশধারী এই জাহেলিয়াতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে তারা সেই সব খোদার এবাদাত ও আনুগত্য করে যাচ্ছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না বরং নিজেরাই সৃষ্ট জীব। তারা তাদের অনুগামীদেরকে তো দূরের কথা, নিজেদেরও কোনো সাহায্য করতে পারে না।

তাই অতীতের মতো আজও মানব জাতি কোরআনের বাণী শোনার মুখাপেক্ষী, জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে ডেকে নেয় এমন মানুষের মুখাপেক্ষী এবং যারা তাদের মন ও বিবেককে আজকের এই নতুন পৌত্তলিকতা ও নতুন মূর্খতার অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আলোর দিকে নিয়ে যাবে তাদের মুখাপেক্ষী, যেমন ইসলাম তাদেরকে প্রথমবার উদ্ধার করেছিলো।

কোরআনের ভাষা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সে মানুষকে মানবরূপী খোদার উপাসনার জন্যে ভর্ৎসনা করছে,

'যারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং নিজেরাই সৃষ্ট হয় এবং তাদের ভক্তদেরকে দূরের কথা, নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না, তাদেরকেই কি তারা আল্লাহর অংশীদার বানায়?'

এ আয়াতে 'ইউখলাকূন' ও 'ইয়ানসুরুন' ক্রিয়া দুটি থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, আল্লাহর সাথে অংশীদার হিসাবে অবৈধভাবে গৃহীত এই প্রভুদের মধ্যে অন্তত কিছু কিছু মানুষরূপী প্রভুও আছে, যাদের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান প্রাণীর জন্যে নির্দিষ্ট এই বিশেষ ক্রিয়ারূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা যতোদূর জানি, পৌত্তলিক আরব সমাজ মানুষের মধ্য থেকে কাউকে দেব দেবী হিসাবে বরণ করেনি, দেবতা বা খোদা মনে করেনি এবং কোনো মানুষ দেবতার পূজা উপাসনা বা বান্দনাও করতো না। মানুষের মধ্য থেকে কাউকে যদি তারা আল্লাহর শরীক বা অংশীদার হিসাবে গ্রহণ

করে থাকে, তবে সেটা করতো এই অর্থে যে, তাদের কাজ থেকে তারা সামষ্টিক জীবনের বিধি বিধান ও বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার জন্যে তাদের নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর এ জিনিসটাকেই কোরআন শেরক বলে আখ্যায়িত করে এবং এই জীবন্ত শরীকদেরকে সে মূর্তি ও দেব-দেবীর সমান বিবেচনা করে। শেরকের এই প্রকার সম্পর্কে এটাই ইসলামের ব্যাখ্যা। আকীদা বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক এবাদাত-উপাসনায় যে শেরক করা হয়, তার সাথে এই শেরকের কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টি অবিকল একই ধরনের শেরক। যারা সন্ন্যাসী ও দরবেশদের কাছ থেকে জীবন যাপনের জন্যে আইন ও বিধি গ্রহণ করে, তাদেরকে কোরআন যেমন মোশরেক আখ্যায়িত করে, এদেরকেও ঠিক তেমনিভাবেই মোশরেক আখ্যায়িত করে। সেই সব সন্যাসী ও দরবেশকে তারা খোদা বা দেব-দেবী বলে বিশ্বাস করতো না এবং তাদের সামনে তারা কোনো আনুষ্ঠানিক এবাদাত-উপাসনাও করতো না। উল্লেখিত উভয় প্রকারের শেরকই শেরক ও তাওহীদ-বহির্ভূত। আল্লাহর দ্বীন ইসলামের ভিত্তিই এই তাওহীদ এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থই এই তাওহীদেরই সাক্ষ্য দান। আমরা যাকে আধুনিক জাহেলিয়াতের শেরক আখ্যায়িত করেছি, সেটা পুরোপুরিভাবে এই শেষোক্ত শেরকেরই মতো।

উল্লিখিত দম্পতির কাহিনীতে মানব মনের যে বিপথগামিতার উল্লেখ রয়েছে, সেটাই প্রত্যেক ধরনের শেরকের মূল কথা। এই কাহিনীর উদ্দেশ্য ছিলো কোরআনের প্রথম শ্রোতাদেরকে এই মর্মে সচেতন করা যে, তারা যে শেরকে লিপ্ত, তা চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়। যাদেরকে তারা খোদা, দেবতা বা প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছে, চাই তারা মানুষ হোক বা অন্য কিছু হোক, তারা কোনো জিনিস সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট হয়। তারা কাউকে সাহায্য করতে পারে না, এমনকি নিজের ভালো মন্দের ওপরও তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কোরআনের এই কাহিনীর উদ্দেশ্য যখন এই, তখন উপরোক্ত কাহিনী থেকে পরবর্তী আয়াত কটিতে আরবের মোশরেকদেরকে সরাসরি সম্বোধন করার পর্যায়ে স্থানান্তরকে উক্ত ভুয়া উপাস্যদের সংক্রান্ত আলোচনারই ধারাবাহিকতা বলে ধরে নেয়া যায়। আয়াত কয়টি লক্ষ্যণীয়,

'তোমরা তাদেরকে সঠিক পথের ডাকলেও, তবে তারা তোমাদের অনুসরণ করে না। তোমরা তাদেরকে ডাকো বা চুপ থাকো, তোমাদের জন্যে উভয়ই সমান।' (আয়াত ১৯৪, ১৯৫ ও ১৯৬)

আগেই বলেছি যে, আরবদের পৌত্তলিকতা ছিলো একেবারেই সরল ও সাদামাঠা। মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির যে কোনো স্তরের মানদন্ডে তা নির্বোধসুলভ ব্যাপার। তাই কোরআন যখন তাদেরকে এমন নির্জীব মূর্তির পূজা করার মতো নির্বোধসুলভ কাজে লিপ্ত দেখতো, তখন তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সচেতন করতো।

তাদের এই সব সাদামাঠা প্রতিমার না ছিলো হাঁটা চলার জন্যে পা, না ছিলো ধরার জন্যে হাত, না ছিলো দেখার জন্যে চোখ এবং না ছিলো শোনার জন্যে কান। অথচ এসব অংগ প্রত্যংগ মোশরেকদের রয়েছে। স্বয়ং মোশরেকদের চেয়েও নিকৃষ্ট এহেন নিশ্চল পাথরগুলোকে তারা কিভাবে পূজা করে, তা ভেবে দেখার জন্যে কোরআন তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে।

এই সব প্রতিমাকে তারা কখনো ফেরেশতাদের এবং কখনো তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতীক রূপে নির্মাণ করতো। অথচ সেই সব ফেরেশতা ও পূর্বপুরুষও তাদেরই মতো আল্লাহর সৃষ্টি ও আল্লাহর বান্দা। তারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করে না বরং সৃষ্ট হয় এবং নিজেদেরকে ও অন্য কাউকে সাহায্য করতে পারে না।

আরব মোশরেকদের বিশ্বাস অনুসারে দৃশ্যমান মূর্তিগুলোকে কিছু অদৃশ্য সত্ত্বার প্রতীক হিসাবে তৈরী করার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে যে প্রতীকী সম্পর্ক স্থাপন করার রীতি চালু ছিলো, সেটাই মোশরেকদের সাথে তাদের উপাস্যদের সম্পর্কে এরূপ কথা বলার কারণ বলে আমি মনে

করি। কখনো বুদ্ধিমান মানুষের বিবেককে মূর্তিগুলোর আড়ালে বিরাজিত প্রতীকী সত্ত্বাসমূহ সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। আবার কখনো সরাসরি মূর্তিগুলোর দিকে ইংগিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ওগুলোর না আছে জীবন, না আছে নড়াচড়ার ক্ষমতা। এই সমস্ত মূর্তি ও তাদের প্রতীকী সত্ত্বা সবই সাধারণ মানবীয় বিবেক বুদ্ধির বিবারে স্পষ্টতই বাতিল ও অসার। কোরআন মানুষের এই বিবেক ও বিচার বিবেচনাকেই জাগ্রত করে এবং তাকে এই নিন্দনীয় উদাসীনতা থেকে উদ্ধার করে।

মোশরেকদের মোকাবেলায় মুসলমানদের সুদৃঢ় অবস্থান

এই যুক্তি তর্কের শেষ পর্যায়ে আল্লাহ রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি মোশরেকদেরকে ও তাদের অক্ষম দেব-দেবীকে চ্যালেঞ্জ দেন এবং তিনি নিজে যে একমাত্র আল্লাহকেই অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করেছেন তা জানিয়ে দেন।

'বলো, হে মোশরেকরা, তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে ডাকো .....' (আয়াত ১৯৬ - ১৯৯)

দাওয়াতদানকারী কিভাবে জাহিলিয়াতের অনুসারীদের সাথে কথা বলবে, এখানে সেটাই শেখানো হয়েছে। আল্লাহর উক্ত নির্দেশ অনুসারে রসূল (স.) এ কথা যথাথই বলেছিলেন এবং তৎকালীন মোশরেক সমাজ ও তাদের তথাকথিত প্রভুদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন।

'বলো, তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে ডাকো এবং আমাকে কোনো সময় না দিয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো।'

মোশরেকদেরকে ও তাদের ভুয়া খোদাদেরকে তাঁর দেয়া এই চ্যালেঞ্জের মর্ম ছিলো এই যে, তোমরা যতো পারো আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকো। এর মোকাবেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে আমাকে সময় দেয়ারও প্রয়োজন নেই। একথাটা তিনি বলেছিলেন অত্যন্ত শান্ত ও নির্ভীক কণ্ঠে। তাঁর নির্ভর ছিলো আল্লাহর অভিভাবকত্বের ওপর, যার কাছে তিনি আশ্রয় নেন এবং যা দ্বারা তিনি তাদের চক্রান্ত থেকে নিরাপদে থাকতে পারেন।

'আমার অভিভাবক তো আল্লাহ তায়ালা, যিনি কেতাব নাযিল করেছেন এবং তিনিই সৎ লোকদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন।'

রসূল (স.) এভাবে সেই আল্লাহর কথাই ঘোষণা দিলেন যার কাছে রয়েছে তাঁর নিরাপদ আশ্রয়। 'যিনি কেতাব নাযিল করেছেন' এ কথাটার মর্মার্থ এই যে, তিনি তাঁর কেতাব নাযিল করা দ্বারা নিজের এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে, রসূল যেন তাঁর কাছে বিদ্যমান সত্য ও কেতাবের ব্যাপারে মানুষের মোকাবেলা করেন। সেই সাথে তিনি এই সত্যকে বাতিলের ওপরে জয়যুক্ত করা এবং তাঁর সেই বান্দাদেরকে রক্ষা করার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন, যারা এই সত্য বিধানকে প্রচার ও বাস্তবায়ন করে এবং তার ওপর অবিচল বিশ্বাস রাখে। বস্তুত রসূল (স.)-এর পরবর্তীকালের সকল দেশের ও সকল যুগের ইসলাম প্রচারকদেরও চিরন্তন বক্তব্য এটাই হওয়া উচিত যে, আমার অভিভাবক তো আল্লাহ ......।

ইসলামের দাওয়াতদানকারীকে পার্থিব সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা ও তাকে এড়িয়ে চলা অত্যন্ত জরুরী। কেননা তা বাহ্যত যতোই শক্তিশালী মনে হোক না কেন, আসলে তা দুর্বল ও অসার। যেমন আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন,

'হে মানুষেরা, একটা উদাহরণ দেয়া হয়েছে শোনো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকো, তারা সবাই মিলিত হয়ে চেষ্টা করলেও একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, আর মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিলে তা তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতেও পারে না। যে ডাকে সেও দুর্বল, যাকে ডাকে সেও দুর্বল।' ...... 'যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসাবে

গ্রহণ করেছে। তারা মাকড়ষার মতো। সে একটা ঘর বানায়। এটা সুনিশ্চিত যে, মাকড়ষার ঘরের মতো দুর্বল ঘর আর সেই, যদি তারা তা জানতো।'

যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে ডাকে সে আল্লাহরই আশ্রয়ে থাকে। তাহলে অমান্য অভিভাবক ও সহায়কের প্রশ্ন কেন উঠবে? নেই সব সহায়ক ও অভিভাবক যদি তাকে নির্যাতন করার ক্ষমতাও অর্জন করে, তাহলেও বা তারা তার অনুভূতিতে কতোটুকু ভয়ভীতি সৃষ্টি করতে পারে! তারা শুধুমাত্র তার অভিভাবক ও প্রতিপালক আল্লাহর অনুমতি নিয়েই নির্যাতন করতে সক্ষম। তাকে রক্ষা করতে আল্লাহর অক্ষমতার সুযোগে নয়, কিংবা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তার বন্ধুদের সাহায্য করতে অনীহার কারণেও নয়। এটা কেবল আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাঁর সৎ বান্দাদেরকে পরীক্ষা, বাছাই ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে এবং সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে অবকাশ দিয়ে দিয়ে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের পথে টেনে নেয়ার জন্যেই সংঘটি হয়ে থাকে।

হযরত আবু বকর (রা.) কলেমা উচ্চারণ করার সাথে সাথে মোশরেকরা তাকে তার মুখমন্ডলে কাঠের জুতো দিয়ে এতো প্রহার করে যে, তাকে চেনাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। যিনি আল্লাহর রসূলের (সা.) পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন, তাঁর ওপর এমন অমানুষিক নির্যাতন চলার সময় তিনি নিরন্তর কেবল একথাই বলে যাচ্ছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি কতোই না সহনশীল, তুমি কতোই না ধৈর্যশীল, তুমি কতোই না সহিষ্ণু।' অর্থাৎ তিনি অন্তরের অন্তস্তল দিয়ে অনুভব করছিলেন যে, এই নির্যাতনের অন্তরালে আল্লাহর যে ধৈর্যশীলতা রয়েছে, তাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর প্রতিপালক তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করে দিতে সক্ষম এবং তিনি তাঁর প্রিয় ব্যক্তিদেরকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ কাবা শরীফের চত্বরে মোশরেকদেরকে উচ্চস্বরে কোরআন পড়ে শোনানোর সাহস করেছিলেন। ফলে তারা তাঁকে প্রহার করে আধমরা করে ফেলে। এই অমানুষিক নির্যাতনের পর তিনি বলতেন, 'সেই সময় মোশরেকদেরকে আমার কাছে সবচেয়ে দুর্বল মনে হচ্ছিলো।' কেননা তিনি জানতেন যে, তারা খোদাদ্রোহী এবং আল্লাহদ্রোহীরা আল্লাহর কাছে দুর্বল ও পরাজিত। সুতরাং আল্লাহর প্রিয়জনদের কাছেও তাদের দুর্বল মনে হওয়া উচিত।'

মোশরেক নেতা ওৎবা বিন রবীয়া আব্দুল্লাহ ইবনে মাযউনকে মোশরেকদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তার কাছে আশ্রয় নিতে আহবান জানিয়েছিলো এবং সে তাকে রক্ষা করবে বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলো। সে সময় তাঁর অন্যান্য দ্বীনী ভাইরাও আল্লাহর পথে নির্যাতন ভোগ করছিলেন। তাই তিনি উৎবার আশ্রয় না নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মোশরেকরা তখন তাকে ঘিরে ফেললো এবং এমনভাবে মারলো যে, তার একটা চোখই অন্ধ হয়ে গেলো। উৎবা এই অবস্থা দেখে তাকে পুনরায় তার কাছে আশ্রয় নেয়ার জন্যে ডাকলে তিনি ওৎবাকে বললেন, 'আমি তোমার চেয়েও শক্তিশালী একজনের আশ্রয়ে আছি।' ওতবা যখন তাঁকে বললো, 'ওহে আমার ভাতিজা, তোমার চোখটা হারানোর কোনো প্রয়োজন ছিলো না', তখন তিনি জবাব দিলেন 'না', বরং অন্য চোখটিও আল্লাহর পথে তার যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালন করতে থাকবে।' তিনি জানতেন যে, তার মনিবের আশ্রয় বান্দার আশ্রয়ের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে পরিত্যাগ করবেন না, যদিও তিনি তাকে নির্যাতন ভোগ করতে ছেড়ে রেখেছিলেন। এটা করেছিলেন তার মনোবলকে এতো উচুঁ করার জন্যে, যার জন্যে তিনি বলতে পারলেন, 'না, বরং অন্য চোখটিও আল্লাহর পথে তার যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালন করতে থাকবে।'

রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর পাশে বসে যে মহান প্রজন্ম কোরআনের প্রশিক্ষণ পেয়েছিলো, এ হচ্ছে তাদেরই কিছু নমুনা। আল্লাহর এই আদেশ পালনকারী তারা এতো উচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পেরেছিলেন যে,

'বলো, তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে ডেকে আনো, অতপর আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো.............?

এরপর মোশরেকদের ষড়যন্ত্রের স্বীকার হয়ে তারা যে কষ্ট ভোগ করেছিলেন এবং আল্লাহর প্রতি ঈমানে যে দৃঢ়তার পরিচয় তারা দিয়েছিলেন, তার পর কী হয়েছিলো?

যা হয়েছিলো তা ইতিহাসে সুবিদিত। আল্লাহর প্রিয়জনরাই বিজয়ী, সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আর পরাজয়, ধ্বংস, অপমান ও বিপর্যয় জুটেছিলো সেই সব আল্লাহদ্রোহীর কপালে, যাদেরকে আল্লাহর বান্দারা হত্যা করেছিলেন। তাদের মধ্য থেকে যারা বেঁচেছিলো, তাদের অনেককেই আল্লাহ তায়ালা ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তারা প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী এই নেতাদেরই অনুসারী হয়েছিলো, যারা আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও অনমনীয় সংকল্প সহকারে নির্যাতন সহ্য করেছিলেন।

ইসলামের দিকে আহবানকারীরা যে যুগের ও যে ভূখন্ডেরই লোক হোক না কেন, এরূপ আস্থা, বিশ্বাস ও সংকল্প ছাড়া কোনো সাফল্যই অর্জন করতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে আদেশ দিয়েছিলেন মোশরেকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে। সে চ্যালেঞ্জ তিনি দিয়েছিলেন। তাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের দেব-দেবীর অক্ষমতা ও তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করার নির্বুদ্ধিতা বুঝিয়ে দিতে। সেটাও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন এভাবে,

'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদেরকে ডাকো, তারা তোমাদেরও সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেদেরও নয়। আর যদি তাদেরকে হেদায়াতের দিকে ডাকো, তবে তারা শোনে না। তুমি দেখবে তারা তোমার দিকে তাকাচ্ছে। অথচ আসলে তারা দেখতে পায় না।' (আয়াত ১৯৭, ১৯৮)

এসব বক্তব্য প্রাচীন আরব জাহেলিয়াতের সাদামাঠা পৌত্তলিকতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিলো, তেমনি আধুনিক জাহেলিয়াতের অধীন সকল ভুয়া খোদার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

আধুনিক যুগের মোশরেকরা দৃশ্যমান পার্থিব ক্ষমতার অধিকারীদেরকে আল্লাহর বিকল্প অভিভাবক ও সহায়ক মেনে থাকে। অথচ এই সব অভিভাবক তাদেরকে তো দূরের কথা, স্বয়ং নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না। তিনি যখন যে বান্দাদের ওপর যা কিছু সংঘটিত করতে চান, তা কেউ রদ করতে পারে না।

আরব পৌত্তলিকদের উপাস্য দেব দেবী বা মূর্তিগুলো যেমন দেখতে পেতো না, তেমনি আধুনিক যুগের খোদা সেজে বসা জাতি, সরকার, উৎপাদন কর্তৃপক্ষ বা কলকারখানাও দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি থেকে বঞ্চিত। আইন রচনা ও শাসন করার ন্যায় প্রভুসুলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তথাকথিত প্রভু ও শাসকবর্গও দেখতে পায় না ও শুনতে পায় না। আল্লাহ তায়ালা যাদের সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি কিছু সংখ্যক জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে হৃদয়ংগম করে না, চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না এবং কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শোনে না, তারা পশুর মতো বরং পশুর চেয়েও অধম' এরা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সে বহু রকমের জাহিলিয়াতের মধ্য থেকে একটা না একটার সাক্ষাত অবশ্যই পাবে। তার একমাত্র কর্তব্য জাহেলিয়াতের অনুসারীদেরকে ওই চ্যালেঞ্জ দেয়া, যা দিতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন।

'বলো, তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে ডেকে আনো ....' কেননা পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালে তাদের অবস্থান অব্যাহত থাকবে। (আয়াত ১৯৯-২০৬)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ
الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۖ إِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا
مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ
يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا
اجْتَبَيْتَهَا ۖ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى إِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ
رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠٣﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ
وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٢٠٤﴾ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً
وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٢٠٥﴾ إِنَّ
الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾

১৯৯. (হে মোহাম্মদ, এদের সাথে) তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, নেক কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের তুমি এড়িয়ে চলো। ২০০. কখনো যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, সাথে সাথেই তুমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় চাও; অবশ্যই তিনি (সব কিছু) শোনেন এবং (সব কিছু) জানেন। ২০১. আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে তাদের যদি কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তবে তারা (সাথে সাথেই) আত্মসচেতন হয়ে পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়। ২০২. তাদের (কাফের) ভাই-বন্ধুরা তাদের বিদ্রোহের পথেই টেনে নিয়ে যেতে চায়, অতপর তারা (চেষ্টার) কোনো ত্রুটি করে না। ২০৩. (আবার) যখন তুমি (কিছু দিন) তাদের কাছে কোনো আয়াত এনে হাযির না করো, তখন তারা বলে, ভালো হতো যদি তুমি নিজেই তেমন কিছু বেছে না নিতে! তুমি বলো, আমি তো তাই অনুসরণ করি যা আমার মালিকের কাছ থেকে আমার কাছে নাযিল হয়, আর এ (কোরআন) হচ্ছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে নাযিল করা (অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন) নিদর্শন, যারা ঈমান এনেছে (এ কিতাব) তাদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত। ২০৪. যখন (তোমার সামনে) কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন (মনোযোগের সাথে) তা শোনো এবং নিশ্চুপ থাকো, আশা করা যায় (এর ফলে) তোমাদের ওপর দয়া করা হবে। ২০৫. (হে নবী,) তোমার মালিককে স্মরণ করো মনে মনে, সকাল-সন্ধ্যায় সবিনয়ে ও সশংক চিত্তে, অনুচ্চ স্বরের কথাবার্তা দিয়েও (তাঁকে তুমি স্মরণ করো), কখনো গাফেলদের দলে শামিল হয়ো না। ২০৬. নিসন্দেহে যারা তোমার মালিকের একান্ত সান্নিধ্যে আছে, তারা কখনো অহংকার করে তাঁর এবাদাত থেকে বিরত থাকে না, তারা তাঁর তাসবীহ করে এবং তাঁর জন্যে সাজদা করে।

তাফসীর

আয়াত ১৯৯- ২০৬

সূরার এই সর্বশেষ উপদেশসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রিয়জনদের কাছে তথা রসূল (স.) ও তাঁর মোমেন সহচরদের কাছে এসেছে। তারা তখনো মক্কায়, আরব উপদ্বীপের চার পাশে ও সারা দুনিয়ায় জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করতে প্রস্তুত ছিলেন। এ উপদেশগুলো সেই অশ্লীল জাহেলী সভ্যতা ও এ যুগের এই পথভ্রষ্ট মানব জাতির মোকাবেলা করার নির্দেশ দিচ্ছে। এতে ইসলামের দাওয়াতদানকারী রসূল (স.)-কে উদারতা, নমনীয়তা, মানুষের স্বভাব প্রকৃতির কাছে সুস্পষ্টভাবে পরিচিত ন্যায় ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠায় জটিলতা ও কঠোরতা পরিহার করে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে মূর্খ ও অসভ্যদেরকে এড়িয়ে চলা, তাদের সাথে তর্ক ঝগড়া ও দ্বন্দ্ব সংঘাত না করা এবং তারা সীমা অতিক্রম করে ও গোঁয়ার্তুমি করে তার ক্রোধ উস্কে দিলে নিজেকে শান্ত ও সংযত করার জন্যে আল্লাহর পানাহ চাওয়া ও ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ক্ষমাব্রত অবলম্বন করো, ভালো কাজের আদেশ দাও এবং অসভ্যদেরকে এড়িয়ে চলো' .... (আয়াত ১৯৯, ২০০ ও ২০১)

অতপর সেই অসভ্য লোকদের স্বভাব প্রকৃতি কেমন, তা অবহিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যে প্ররোচনা ও উস্কানি সক্রিয় থাকে এবং যা তাদেরকে ক্রমাগত গোমরাহীর দিকে টেনে নিতে থাকে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে রসূল (স.)-এর সাথে তাদের অসদাচরণ, অলৌকিক কর্মকান্ড দাবী করা ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে এবং রেসালাতের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝানো হয়েছে।

'আর তাদের ভাইয়েরা তাদেরকে গোমরাহীর দিকে টেনে নেয় ......' (আয়াত ২০২-২০৩)

রসূলের কাছে ওহী যোগে প্রেরিত কোরআন প্রসংগে বলতে গিয়ে কোরআন শ্রবণের নিয়ম ও আল্লাহকে স্মরণ করার নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে এই স্মরণকে স্থায়ী করা ও তা থেকে উদাসীন না হওয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা ফেরেশতারা উদাসীন হয় না। তবু তারা সব সময় তাকে স্মরণ করে, তাসবীহ করে ও সেজদা করে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন ভুল-ভ্রান্তিপ্রবণ, তখন তাদের যেকর, তাসবীহ ও সেজদা থেকে উদাসীন হওয়া উচিত হয় না। 'যখন কোরআন পঠিত হয়, তখন তা শ্রবণ করো .....' (আয়াত ২০৪, ২০৫ ও ২০৬)

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্যে কোরআনের নির্দেশনা

আগের আয়াতগুলোতে ইসলাম এবং মুসলমানদের শত্রুদের অসচ্চরিত্রতা মন্দ চাল চলন, হঠকারিতা ও দাম্ভিকতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে নবী মোহাম্মদ (স.)-কে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের প্রচার, পথ নির্দেশনা, সংস্কার ও সংশোধন কৌশলের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবহিত করেছেন। আর এটা শুধু নবী কারীম (স.)-এর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং যারা পরবর্তীতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যুগে যুগে বিশ্ব মানবতাকে সরল, সঠিক সত্য ন্যায়ের পথে আহবান করবে, তাদেরকেও এ একই কৌশল ও পন্থা বাতলিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে তার ধারাবাহিক বর্ণনা আসছে।

ইসলামের আহবায়কের জন্যে যে গুণ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তার মধ্যে একটি হচ্ছে, তাকে কোমল স্বভাবের, সহিষ্ণু ও উদার হতে হবে। তাকে হতে হবে নিজের সংগী সহযোগীদের জন্যে স্নেহশীল, সাধারণ মানুষের জন্যে দয়ালু এবং বিরোধীদের প্রতি সহিষ্ণু। তাই আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আহবায়ক নবী (স.) সম্বোধন করে বলছেন, হে নবী তুমি 'কোমলতা ও

ক্ষমার পথ অবলম্বন করো।' অর্থাৎ নিজের মাঝে ক্ষমা ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলো। সংগী সাথীদের চলন বলনের ক্রুটি বিচ্যুতি ও দুর্বলতাগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখো, তাদের কাছে সকল কর্মের পরিপূর্ণতা আশা করো না, তাদেরকে কষ্টসাধ্য চরিত্র অবলম্বনেও বাধ্য করো না। আর তাদের ভুল ভ্রান্তি ও দুর্বলতাগুলো সহজভাবে গ্রহণ করো, তাদের কাছে সুউচ্চ মান দাবী করো না। তবে ব্যবহারে এই কোমলতা প্রদর্শন এবং ক্রুটি বিচ্যুতির প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একমাত্র ব্যক্তিগত লেন দেন ও চলন-বলনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য– ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস ও শরীয়তের বিধি বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ এতে ক্ষমা ও উদারতার কোনো অবকাশই নেই। ইসলাম লেন-দেন, সাহচর্য ও প্রতিবেশীত্বের ক্ষেত্রে উদারতা, কোমলতা ও ক্ষমার সুযোগ রেখেছে, যাতে মানুষের জীবন যাপন সহজ হয়। মানবিক দুর্বলতাকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং তার প্রতি দয়া পরবশ হওয়া এবং তার সাথে উদারতা প্রদাশ করা অসহায় ও ছোটদের প্রতি প্রভাবশালী ও বড়দের কর্তব্য । নবী মোহাম্মাদ (স.) হচ্ছেন পথ প্রদর্শক, শিক্ষক এবং প্রশিক্ষণদাতা। তিনি উদারতা, কোমলতা এবং ক্ষমা প্রদর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। রসূলুল্লাহ (স.) নিজের ব্যক্তিগত কাজে কারো প্রতি কখনো ক্রোধ প্রকাশ করেননি, চরম উত্তেজনাকর অবস্থায় তিনি নিজের আচরণে ভারসাম্য বজায় রাখতেন। বিরোধীদের কড়া ভাষা ও ভর্ৎসনা নীরবে সহ্য করে নিতেন।

নবী কারীম (স.) এরশাদ করেন, আমার রব আমাকে হুকুম দিয়েছেন, আমি যেন ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায়ই ইনসাফের কথা বলি, যে আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তার সাথে সম্পর্ক জুড়ি, যে আমায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাকে তার অধিকার দান করি, যে আমার প্রতি যুলুম করে আমি তাকে মাফ করে দেই।' রসূল যে সকল বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তাঁর উম্মত থেকে যারা এ পথে মানুষদেরকে আহবান করবে, তারাও সেই বিষয়ে আদিষ্ট। কারণ আল্লাহর পথে আহবান করা এবং মানুষকে হেদায়াতের পথ দেখানো অত্যন্ত বন্ধুর ও কষ্টকর। সুতরাং এক্ষেত্রে আহ্বানকারীকে উদারতা, মহানুভবতা, কোমলতা, সহনশীলতা ও ক্ষমার গুণে গুণান্বিত হতে হবে। পক্ষান্তরে কর্কশস্বভাব, সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ির পথ পরিহার করতে হবে।

রসূল (স.) সাহাবীদের সম্বোধন করে আরো বলেন, 'যেখানে তোমরা যাবে, সেখানে তোমাদের পদার্পণ যেন লোকদের জন্যে সুসংবাদ বয়ে আনে, তা যেন লোকদের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার না করে। লোকদের জীবন যেন তোমাদের কারণে সহজ হয় কঠিন ও সংকীর্ণ হয়ে না পড়ে।'

আল্লাহ তায়ালা নিজে নবীর এগুণের প্রশংসা করে বলেছেন, 'আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের জন্যে কোমল প্রমাণিত হয়েছো, যদি তোমার ব্যবহার কর্কশ হতো এবং তোমার মন হতো সংকীর্ণ ও অনুদার, তাহলে এসব লোক তোমার চারদিক থেকে সরে যেতো।

'সৎ কাজের উপদেশ দিতে থাকো' এখানে 'উরফ' দ্বারা যাবতীয় ভালো ও প্রশংসনীয় কাজকে বুঝানো হয়েছে, যা সবার কাছে সৎ কাজ হিসাবে পরিচিত এবং যেখানে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। সৎ কাজ হবার ব্যাপারটি বুঝার জন্যে প্রত্যেক মানুষের সাধারণ জ্ঞানই যথেষ্ট হয়। আর যখন কোনো মানুষ কোনো কাজকে সত্য ও উত্তম হিসাবে মেনে নেয়, তখন সে কাজ করা তার জন্যে অধিকতর সহজ হয় এবং কোনো প্রকার কষ্ট ছাড়াই সে তা সম্পাদন করতে পারে। পক্ষান্তরে মানুষ যদি কোনো কাজকে উত্তম হিসাবে গ্রহণ না করতে পারে তখন সে কাজ তার কাছে পাহাড় সম মনে হয় এবং তা সমাপন করা তার কাছে অত্যন্ত দুরূহ বলে বিবেচিত

হয়। হে নবী, যেসব লোক তোমার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, তুমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে না, বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে সৎ কাজের উপদেশ দিতে থাকো। অর্থাৎ, অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায় নীতির মাধ্যমেই নয়– বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করো।

'এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাকো, বিতর্কে জড়িও না।'

'জাহেলীন' (মূর্খরা) শব্দটি 'জাহালাতুন' (মূর্খতা) থেকে উৎপন্ন, যা হেদায়াত (আলো) এবং জ্ঞানের বিপরীত। হেদায়াত এবং জ্ঞান অনেকটা সমার্থক শব্দ। মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাকার অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে পরিত্যাগ করা, তাদের কাজের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা, তাদের অজ্ঞতাপূর্ণ আচার আচরণ এবং চলন বলনকে সহজভাবে নেয়া, তাদের অসার ক্রিয়া কর্মকে ভদ্রভাবে গ্রহণ করা এবং তাদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে না পড়া– যার পরিণাম অনর্থক সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। জাহেলদের ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের অজ্ঞতা থেকে নিজকে দূরে সরিয়ে রাখার অর্থ এটাও হতে পারে যে, তাদের সাথে অশ্লীল বাক্য বিনিময় এবং প্রকাশ্যে তাদের সাথে বিরোধে লিপ্ত হওয়া ছাড়াই তাদেরকে অপদস্থ করা এবং সত্য-ন্যায়ের আনুগত্যের জন্যে বাধ্য করা। যদি এ অর্থ নেয়া সম্ভব না হয়, তবে ন্যূনপক্ষে তাদের এবং ভালো লোকদের মাঝে এর ফলে একটা পার্থক্য সূচিত হবে। আমরা যদি আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের প্রতি তাকাই, তাহলে আমরা তাদেরকে ধৈর্যশীল এবং অনর্থক কর্ম থেকে বিমুখ দেখতে পাই। পক্ষান্তরে আমরা যদি জাহেলদের দিকে তাকাই, তবে তাদেরকে নির্বোধ বোকা, নীচ এবং ভালো লোকদের থেকে পৃথক দেখতে পাই। প্রজ্ঞাময় আল্লাহর এই দিক নির্দেশনার অনুসরণ করা প্রত্যেক আহ্বানকারীর উচিত।

আল্লাহ তায়ালা নবী মোহাম্মদ (স.)-কে বিশ্ব মানবতার জন্যে করুণার মূর্ত ছবি হিসাবে প্রেরণ করেছেন, জাহেলদের অজ্ঞতা, নির্বোধদের মূর্খতা ও বেকুবদের বেকুবীর দরুন মানবীয় কারণে যদিও কখনও কখনও তিনি রেগে যেতেন, তথাপি তিনি নিজকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু আল্লাহর পথে আহবানকারী অনুসারীরা এ ধরনের পরিবেশে তাদের ক্রোধ সংবরণ করতে সক্ষম নাও হতে পারে। ক্রোধের অবস্থায় শয়তান অন্তরে ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা দিতে পারে। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসূলকে এধরনের অবস্থায় তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং সে শয়তানের পথকে পরিহার করতে সক্ষম হয়।

'আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।'

প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ এতে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার উৎপীড়ন করে এবং মূর্খের মতো ব্যবহার করে আপনি তাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না।

'নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।'

এ বাক্যটি নির্দেশনা দিচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা জাহেলদের অজ্ঞতা ও মূর্খতাপূর্ণ কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর অনুগত বান্দার কতোটুকু ব্যথিত হয়, তাও তিনি জানেন। এ বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছেন। এর সাথে তাদের সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছেন, যেখানে মহান রব্বুল আলামীন তাদের অজ্ঞতাপূর্ণ কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করছেন এবং রসূলের কষ্টও অনুভব করছেন, সেখানে প্রতিকার ও শায়েস্তার জন্যে তো তিনিই যথেষ্ট।

পূর্ববর্তী আয়াতে আরো উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, সত্যের আহ্বায়ক যখনই বিরোধীদের যুলুম, নির্যাতন ও অনিষ্টকর কার্যকলাপ এবং তাদের মূর্খতাপ্রসূত অভিযোগ আপত্তির কারণে মানসিক উত্তেজনা অনুভব করবে, তখনই তার বুঝে নেয়া উচিত যে, এটি শয়তানের উস্কানি ছাড়া আর কিছুই নয়। তখনই তার আল্লাহর কাছে এ মর্মে আশ্রয় চাওয়া উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁর বান্দাকে এ উত্তেজনার স্রোতে ভাসিয়ে না দেন এবং তাকে এমন অসংযমী ও নিয়ন্ত্রণহীন না করেন যার ফলে সে সত্যের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো কোনো কাজ যেন না করে বসে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইংগিত করেছেন যে, যারা তাঁকে ভয় করে কাজ করে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকতে চায়, তারা নিজেদের মনে কোনো শয়তানী প্ররোচনার প্রভাব এবং কোনো অসৎ চিন্তার ছোঁয়া অনুভব করার সাথে সাথে সজাগ ও সতর্ক হয়ে ওঠে। তারপর এ পর্যায়ে কোন ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বনে দ্বীনের স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং কী করলে সত্যপ্রীতির প্রকৃত দাবী আদায় হবে তাও তারা পরিষ্কার দেখতে পাবে কিংবা সে ধরনের কর্মপন্থা নির্ধারণে সক্ষম হবে।

'যাদের মনে খোদাভীতি রয়েছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনা-শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।'

সংক্ষিপ্ত এ আয়াতটি বিস্ময়কর কিছু সংকেত এবং গভীর সত্যসমূহকে উন্মোচনা করে যা মূলত তার মাঝেই লুপ্ত ছিলো। 'তখন তারা সঠিক কর্মপদ্ধতি দেখতে পায় তথা তাদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।' এ উক্তির মাধ্যমে এ আয়াতের সমাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, অসংখ্য অর্থকে এ আয়াতের শুরুর সাথে সংযোজন করা, যার আসলেই কোনো প্রতিশব্দ নেই। এ আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, শয়তানের প্রভাব অন্তরদৃষ্টিকে নির্বাপিত করে দেয় অন্ধ করে দেয়।

কিন্তু আল্লাহভীতি তথা তাঁর ক্রোধ এবং শাস্তির ভয় মানুষের অন্তরকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করে এবং হেদায়াতবিমুখতার বিপদ থেকে তাকে জাগ্রত করে। অতপর যখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন তাদের অন্তর দৃষ্টি জাগ্রত হয়, দূরদর্শিতা উন্মোচিত হয় এবং তাদের অন্তর চোখের পর্দা সরে যায়। 'তারা তাদের কর্ম পদ্ধতি সঠিকভাবে দেখতে পায়।' কারণ শয়তানের প্রভাব হচ্ছে অন্ধত্ব, আর আল্লাহর স্মরণ হচ্ছে দৃষ্টিশক্তি। অনুরূপভাবে শয়তানের প্রভাব হচ্ছে অন্ধকার, আর আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন হচ্ছে আলো। তাকওয়া (আল্লাহভীতি) শয়তানের প্রভাবকে দূর করে। সুতরাং মোত্তাকীদের ওপর শয়তানের কোনো কর্তৃত্ব থাকতে পারে না।

মোত্তাকীদের অবস্থা হচ্ছে, 'যখন শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে (সতর্ক হয়ে যায়) এবং তারা নিজেদের সঠিক কর্মপদ্ধতি এতে পরিষ্কার দেখতে পায়।'

এ অবস্থার বর্ণনা এসেছে দুটি বিষয়ের মাঝে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, জাহেলদের থেকে বিমুখ হওয়া এবং তাদের সাথে বিতর্কে না জড়ানো সম্বলিত আল্লাহর নির্দেশ। অপরটি হচ্ছে, এ মূর্খ ও জাহেলদের পশ্চাতে কী লুকানো আছে তার বর্ণনা, যা তাদেরকে মূর্খতা, বেকুবি এবং নির্বুদ্ধিতার কাজে জড়িত না হওয়ার জন্যে উৎসাহিত করছে। এই মন্তব্যের পর আল্লাহ তায়ালা পুনরায় জাহেলদের প্রসংগে বক্তব্য পেশ করছেন। (আয়াত ২০২- ২০৩)

শয়তানের ভাই বন্ধুরা, যারা তাদেরকে ক্রমাগত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তারা হচ্ছে জ্বিন শয়তান। তারা কখনও মানুষ শয়তানও হতে পারে। তারা তাদের পথভ্রষ্টতাকে আরো

বাড়িয়ে দেয়। তারা এ কাজে কখনও বিরক্তিবোধ করে না, অলসতা করে না এবং চুপও থাকে না। সুতরাং তারা এ কাজে বারবার নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার পরিচয় দেয়। এভাবে তারা গোমারাহীতেই নিমগ্ন থাকে।

কোরআনের চিরন্তন মোজেযা

মোশরেকরা রসূলে কারীম (স.) থেকে অলৌকিক ঘটনা দেখতে চাইতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। এটা রেসালত এবং রসূল (স.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক। এ পর্যায়ে কিছু উক্তি কোরআনে করীম এখানে বর্ণনা করছে।

'হে নবী! যখন তুমি তাদের সামনে কোনো নিদর্শন (অর্থাৎ মোজেযা) পেশ করো না, তখন তারা বলে, তুমি নিজের জন্যে কোনো নিদর্শন বেছে নাওনি কেন?'

কাফের ও মোশরেকদের এ প্রশ্নের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিদ্রূপের ভাব ফুটে উঠেছিলো, যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আরে ভাই! তুমি যেভাবে নবী হয়ে বসেছো ঠিক তেমনিভাবে নিজের জন্যে একটি মোজেযাও বেছে নিয়ে এসে পারতে, অথবা তুমি তোমার রবকে মোজেযা নাযিলের জন্যে বাধ্য করতে পারতে।

নিসন্দেহে মোশরেকরা রসূলের গুরুত্ব এবং তাঁর মিশন সম্পর্কে অবহিত ছিলো না। অনুরূপভাবে তারা রবের সাথে তাঁর শিষ্টাচার সম্পর্কেও অবগত ছিলো না বিধায় তারা এ ধরনের প্রশ্ন করতে পেরেছে। রসূল (স.) তাই গ্রহণ করেন যা আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দান করেন। তিনি আল্লাহর দরবারে কোনো জিনিস চান না বা তার প্রস্তাবও রাখেন না। অনুরূপভাবে তিনি নিজ থেকে কোনো মোজেযা আনেন না। জাহেলদের একথার জবাবে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে নির্দেশ করছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদেরকে বলে দাও, আমি তো কেবল সেই ওহীরই আনুগত্য করি, যা আমার রব আমার কাছে পাঠান।'

যে জিনিসটির চাহিদা দেখা যায় বা আমি নিজে যার প্রয়োজন অনুভব করি সেটি আমি নিজে উদ্ভাবন করে পেশ করে দেবো বা তার জন্যে আল্লাহর দরবারে প্রস্তাব পেশ করবো– এটা আমার কাজ নয়, আমি তো আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রসূল বৈ আর কিছুই নই। আমার দায়িত্ব কেবল এতোটুকু, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যাবো। মোজেযা হিসেবে আল্লাহ তায়ালা আমার কাছে এ কোরআনে হাকীম নাযিল করেছেন। যার মধ্যে আছে এক অন্তরদৃষ্টির আলো, যারা তার অনুসরণ করবে তারা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

জাহেলী যুগের মিথ্যা নবুওতের দাবীদারদের বিকৃত চিত্র তাদের সামনে সুস্পষ্ট ছিলো। রেসালাত এবং রসূলের স্বভাব সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান ছিলো না।

রসূলুল্লাহ (স.) এ মর্মে আদিষ্ট হয়েছেন যে, তিনি কোরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং হাকীকত জাহেলদের সামনে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করবেন, যে সম্পর্কে তারা ছিলো সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শুধু তাই নয়, বরং তাদের সামনে প্রকাশ্য হেদায়াত (কোরআন) থাকা সত্ত্বেও তারা রসূলের নিকট জড়বাদী মোজেযা দাবী করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন,

'এটি তো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অন্তরদৃষ্টির এক আলো এবং হেদায়াত ও রহমত সেসব লোকের জন্যে, যারা ঈমান এনেছে।'

এই কোরআন তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে আগত বহুবিধ দলীল প্রমাণ ও মোজেযার সমাহার। সামান্য লক্ষ্য করলে একথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না যে, এটা যথার্থই

আল্লাহর কালাম। এ কোরআন সারা বিশ্বের জন্যে শুধু সত্য দলীলই নয়, বরং যারা ঈমানদার এবং এই পবিত্র গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে চায়, তাদের জন্যে সুস্পষ্ট হেদায়াত ও অব্যাহত রহমতের ফলগুধারাও।

কোরআন, যার থেকে আরবের জাহেলরা নিজেদের মুখ ফিরিয়ে রাখতো। কিন্তু তারাই নবী মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে পার্থিব অলৌকিক ঘটনা সদৃশ মোজেযা পেশ করার দাবী জানাত, যা পূর্বের নবী-রসূলদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিলো। তাদের নবুওত ও রেসালাত ছিলো এলাকাভিত্তিক, তা সর্ব যুগ, সর্বকাল ও সর্বস্থানের জন্যে প্রযোজ্য ছিলো না। পূর্ববর্তী নবী রসূলদের নবুওত, রেসালাত ও মোজেযা ছিলো সমকালীন মানব সম্প্রদায়ের জন্যে নির্দিষ্ট ও সীমিত, তাই পরবর্তী প্রজন্ম ও জাতির ক্ষেত্রে কি করে তা প্রযোজ্য হবে।

এ কোরআনে করীমের বর্ণনাভংগি ও রচনাশৈলী এতো উন্নত ও অভিনব যার সমকক্ষ কোনো গ্রন্থ আজ অবধি এ পৃথিবীতে আবিষ্কৃতি হয়নি। যারা এর সমকক্ষ কিছু তৈরী করতে চেষ্টা করেছে তারাই ব্যর্থ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হবে। সুতরাং আল কোরআন অন্যান্য নবীদের মোজেযা থেকে স্বতন্ত্র।

প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর যুগোপযোগী মোজেযা দান করেছেন। শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর যুগের লোকেরা ভাষা, বর্ণনা, রচনাশিল্প ও অলংকার শাস্ত্রে প্রচুর পান্ডিত্য অর্জন করেছিলো। তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, তখনকার কবি-সাহিত্যিকরা ওকায, যুল মাজায ও মাজান্নাহ নামক স্থানে প্রতি বছর সাহিত্য মেলার আয়োজন করতো এবং পুরো বছরে ধরে তারা যা প্রস্তুত করতো, তা তারা সেখানে উপস্থাপন করতো এবং এ ব্যাপারে তাদের মাঝে প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা ছিলো। প্রতিযোগিতায় যারা ভালো করতো, তাদেরকে বিভিন্ন খেতাব ও পুরস্কার দান করা হতো। এমনকি তাদের উন্নত সাহিত্য শিল্পকে কাবাঘরে ঝুলিয়ে রাখা হতো। মানুষ তাদের সেই সাহিত্যকর্ম পড়তো। এহেন পরিবেশে বিশ্বনবী মোহাম্মদ (স.)-এর আগমন ঘটেছিলো। একারণেই তাঁকে সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্রে পরিপূর্ণ এই কোরআনে হাকীম দান করা হয়। এর সাথে আল্লাহ তায়ালা এ কোরআনের মাধ্যমে সেই যুগের পন্ডিতদেরকে কোরআন সদৃশ কোরআন এমনকি তার একটি আয়াত সদৃশ কোনো আয়াত তৈরী করতে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। কিন্তু তারা সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি। কোরআনে কারীম এ কালের এ দীর্ঘ পরিক্রমায় মোজেযা হিসাবেই বিদ্যমান রয়েছে। তার মোকাবেলা করতে এখন পর্যন্ত কোনো মানব সন্তান দুঃসাহস করেনি। আল্লাহর সেই চ্যালেঞ্জ অদ্যাবধি বিদ্যমান ও বহাল রয়েছে। যারা কথাশিল্প নিয়ে চর্চা করে, তারা এক্ষেত্রে মানবশক্তির সীমাবদ্ধতা ভালো করেই উপলব্ধি করে। তারা এটা খুব ভালো করেই জানে যে, কোরআনের বর্ণনাভংগি নিসন্দেহে একটি মোজেযা– এতে তারা বিশ্বাস করুক বা নাই করুক। সুতরাং এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ প্রদান অবশ্য যুক্তিসংগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার সামনে মোমেন এবং কাফের উভয়ই সমান। কোরায়শ নেতৃবৃন্দ তাদের জাহেলী যুগে এ কোরআনের মাঝে এমন কিছু অভিনব মোজেযা পেয়েছিলো যে, এ কোরআনকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করা সত্তেও তার প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এমনিভাবে কোরআনকে অস্বীকার ও অপছন্দকারী নব্য জাহেলরাও তাতে এমন ধরনের বহু জিনিস পাবে, যা তাদের আগের যমানার জাহেলরা পেয়েছিলো।

উপরোক্ত বক্তব্যের পশ্চাতে এই অতুলনীয় গ্রন্থের বিস্ময়কর রহস্য জানা যায়। আর সেই রহস্য হচ্ছে এর প্রভাব ও কর্তৃত্ব। স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপরই কোরআনের প্রভাব বিদ্যমান। তবে যাদের অন্তরে পর্দার পাহাড় স্তূপীকৃত হয়েছে এবং যারা কোরআনকে দেখতে পারে না, তারাও যখন এ কোরআনে আযীমের তেলাওয়াত শ্রবণ করে, তখন তারা প্রভাবিত হয়।

যুগে যুগে কোরআনের বিরুদ্ধে বলার লোকের সংখ্যা অগণিত। তারা কোরআন সম্পর্কে এমন সব বক্তব্য পেশ করে যা বিভিন্ন মূল্যবোধ, মতাদর্শ, চিন্তা চেতনা ও দর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করে। কোরআনে কারীম তার বক্তব্য দিয়ে মানব অন্তর ও তার প্রকৃতিতে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে একক ও অতুলনীয় গ্রন্থ। নিসন্দেহে এ ক্ষেত্রে কোরআন বিজয়ী ও প্রভাবশালী। তখনকার নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের অনুসারীদেরকে বলতো। এমন কি তারা নিজেদেরকে লক্ষ্য করে বলতো, 'তোমরা এ কোরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি করো, যাতে তোমরা জয়ী হও।' এ নিষেধের উদ্দেশ্য ছিলো যাতে করে অনুসারীরা কোরআনের তেলাওয়াত শোনার পর তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পড়ে। কারণ কোরআনের প্রভাব ছিলো অপ্রতিরোধ্য। কাফেররা কোরআনের মোকাবেলা করতে ছিলো অক্ষম এবং তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর তারা এ দুষ্কর্মের আশ্রয় নিয়েছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আবু জাহল অন্যদেরকে প্ররোচিত করলো যে, মোহাম্মদ যখন কোরআন তেলাওয়াত করে, তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে থাকবে, যাতে সে কী বলেছে তা কেউ যেন বুঝতে না পারে। কেউ কেউ বলেন, কাফেররা শিস দিয়ে তালি বাজিয়ে এবং নানারূপ শব্দ করে কোরআন শোনা থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রস্তুতি নিয়েছিলো। কোরআনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়ার ভয়ে আজকের প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরাও সাধারণ লোকদের বিভিন্ন ওজুহাতে কোরআন থেকে বিমুখ করতে চায়। এতদসত্ত্বেও কোরআন বিজয়ীর বেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং থাকবে। কোরআনে করীমের প্রভাব এমন ব্যাপক যে, কোরআনের একটি আয়াতও মানুষের কথা বা লেখার মাঝে যদি অন্তর্ভুক্ত করানো হয়, তবে তার স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং পাঠক বা শ্রোতারা পড়া বা শোনার সাথে সাথেই পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে যে, কোনটি আল্লাহর কালাম আর কোনটি মানুষের কথা !

কোরআনে হাকীমের আলোচ্য ও বিষয়বস্তু ব্যাপক। কোরআনের আলোকে তা বর্ণনা করতে গেলে শত শত পৃষ্ঠার প্রয়োজন। তারপরও কথা আরো থেকে যাবে। সংক্ষেপে এখানে কিছু বক্তব্য পেশ করা হলো–

বাস্তবতার আলোকে মানব জাতিকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে কোরআনে করীমের বিধান ও পদ্ধতি অভিনব। এ বিধান গোটা সৃষ্টিকে সম্বোধন করে। সম্বোধনের ক্ষেত্রে তার সামনে কোনো দিকই বাদ পড়ে না। কোরআনের এ অভিনব বিধান সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে। অতপর সেসব বিষয়গুলোকেও উন্মোচন করে, যা মানব প্রকৃতি, অন্তর এবং বিবেক নিরংকুশ আত্মসমর্পণ ও প্রাণবন্ত সাড়া দিয়ে তা গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে এ বিধান তাও উন্মোচন করে যা মানব প্রকৃতির সাথে একান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ ছোট বড় সত্যের দিকে কোরআনের অভিনব বিধান মানব প্রকৃতিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যায়। তৎসাথে কোমলতা-দূরদর্শিতার সাথে এ বিধান মানব প্রকৃতিকে তার ধাবমান সিঁড়ির বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে এর সর্বোচ্চ শৃংগে আরোহণ করে নিয়ে যায়।

কোরআনের এ বিধান মানব প্রকৃতিকে এভাবে প্রভাবিত করে যে, মানুষ অজ্ঞাতসারে তার ডাকে সাড়া দেয়। এটা এজন্যে যে, যিনি এ কোরআনকে নাযিল করেছেন, তিনি এ মানবকুলকেও সৃষ্টি করেছেন। তিনি ভালোভাবেই অবগত আছেন যে, মানবকুলকে কেমন প্রকৃতি কী দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি তো তার ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।

কোরআনের বিধান ও বিষয়বস্তু বলে লিখে শেষ করা যাবে না। এরই দিকে ইংগিত করে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

'হে নবী, বলো, পালনকর্তার কথা লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে পালন-কর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও তা শেষ হয়ে যাবে।'

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, 'পৃথিবীতে যতো গাছ আছে সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথে যদি সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবু তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না।'

আমি দীর্ঘ পঁচিশ বছর পবিত্র কোরআনের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। মানব জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহে অবগাহন করেছি। যার কিছু জ্ঞান মানুষ আবিষ্কার করেছে। আর কিছু আবিষ্কার করতে তারা অদ্যাবধিও সক্ষম হয়নি। কোরআনে মানুষের পরিচয় ও মানব জ্ঞান সংক্রান্ত যে সকল তথ্য ও সত্য মানুষ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে, আমি তা অধ্যয়ন করি এবং তারই ভিত্তিতে কোরআনের বিশাল জ্ঞান ভান্ডারের কিছু দিক অবলোকন করি।

এই সৃষ্টি, এ প্রকৃতি, এর বিভিন্ন দিক ও উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন রহস্য ও গোপন তত্ত্বসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে অনেক বিষয় নযরে পড়ে। তন্মধ্যে মানব সৃষ্টির দর্শন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

স্বয়ং মানুষ, তার মূল, উৎপত্তি, তার গোপন শক্তিসমূহ তার কর্মের ক্ষেত্রসমূহ, তার গঠন প্রকৃতি, আবেগ অনুভূতি এবং কোনো কাজের আহ্বানে সাড়া দেয়া সহ ইত্যাদি বিষয়ের দিকে তাকালে এর বিভিন্ন আলোচ্য বিষয় জানা যায় হয়। জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা, শিক্ষাবিদ্যা, সমাজবিদ্যা এই কয়েকটি দিক মাত্র।

অনুরূপভাবে মানুষের জীবন ব্যবস্থা, তার বাস্তব কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক সম্পর্ক এবং মেলামেশার নানাবিধ বিষয়, নিত্য নতুন প্রয়োজন এবং তাকে সুবিন্যস্ত করলে যে সমস্ত বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তন্মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ ও দর্শন হচ্ছে কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য বিষয়।

ওপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কোরআনের একজন সচেতন পাঠক পর্যাপ্ত পরিমাণ দলীল প্রমাণ এবং দিক নির্দেশনা পাবে। যার পরিমাণ দেখে পাঠক অবাক হয়ে পড়বে। অধিকন্তু তাতে বাস্তবতা, গ্রহণ যোগ্যতা, গভীরতা, ব্যাপকতাও সে খুঁজে পাবে।

আমি এই মৌলিক বিষয়গুলো মন্থন করতে গিয়ে কোরআনে হাকীম ও রসূলের হাদীস ছাড়া অন্য কোনো দলীল-প্রমাণাদির শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন ঘুণাক্ষরেও অনুভব করিনি। বরং কোরআন ও হাদীস ছাড়া যে কোনো উক্তি এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে মনে হয়েছে– দুর্বল।

নিসন্দেহে এ কাজটি হচ্ছে একটি বাস্তব অনুশীলন, যা উল্লেখিত বিষয়ের অনুসন্ধান, গবেষণা ছায়াতলে দীর্ঘ সান্নিধ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ মহান গ্রন্থের প্রশংসা করার আমি কে? আমি এবং সারা বিশ্বের মানুষ সম্মিলিতভাবে যদি তার প্রশংসা করে তার সাথে নতুন কিছু সংযোজন করতে সক্ষম হবে কি?

নিসন্দেহে মহাগ্রন্থ আল কোরআন নযিরবিহীন অপূর্ব এক গ্রন্থ। সব কয়টি প্রজন্মের জন্যে জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষা দীক্ষা, দিক নির্দেশনার একমাত্র উৎস এবং একক সংবিধান। পূর্বে বা পরে যার পুনরাবৃত্তি মানব ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি, সেই প্রজন্ম হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যামানা। যারা মানব ইতিহাসে ঘটনাবহুল বিশাল অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। যে বিষয়ের বিশদ গবেষণা অদ্যাবধি হয়নি।

আর এই জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎসই আল্লাহর ইচ্ছায় মানব জাহানে এই মোজেযার সৃষ্টি করেছে। পূর্বেকার নবী রসূলদের মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনাসমূহের কোনোটিই এ মোজেযার সমতুল্য

নয়। এটা হচ্ছে বাস্তব মোজেযা। আর সাহাবায়ে কেরামের সময়টা হচ্ছে ইতিহাসের একক অনন্য ঘটনা।

সাহাবাদের দ্বারা যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তা এই হাজার বছরের চেয়ে বেশী সময় স্থায়ী হয়েছিলো। যে সমাজে কোরআনের আনীত শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আর সে সমাজ ছিলো কোরআনের মূল্যবোধ মানদন্ড, নির্দেশনা এবং প্রত্যাদেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষয়িক দিক থেকে উন্নত অপরাপর মানব সমাজের বিভিন্ন বর্ণাঢ্য চিত্রের সাথে যদি এ সমাজের তুলনা করা হয়, তবে একে মানব ইতিহাসে আরেকটি বড়ো রকমের মোজেযা হিসাবে আখ্যায়িত করা হবে। কারণ এ সমাজে যেভাবে মানব সভ্যতার বিকাশ সাধিত হয়েছিলো এবং মানবাধিকার সংরক্ষিত হয়েছিলো, অন্য কোনো সমাজেই আজ পর্যন্ত তা হয়নি।

আধুনিক জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত বর্তমান মানব সম্প্রদায় তাদের আত্মা, সমাজ এবং জীবনের চাহিদা ও সমাধানসমূহ কোরআনের বাইরে অন্য কিছুর মাঝে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। যেমন রসূলের যুগের জাহেল সম্প্রদায় কোরআন ভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ও মোজেযা চাইতো। রসূলের যুগের জাহেলদের জাহেলিয়াত, গভীর অজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ও স্বার্থসমূহ তাদের এ কেতাবে বিদ্যমান বিশাল মোজেযার দর্শনে তাদের সামনে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিলো। পক্ষান্তরে বর্তমান জাহেলী সমাজ এবং কোরআনে হাকীমের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের জ্ঞানের অহংকার ও দাম্ভিকতা– যা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বস্তুজগতে দান করে রেখেছেন– বর্তমান মানবীয় জীবনের জটিলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক অহমিকা এর সম্প্রসারিত জীবন, স্তূপীকৃত অভিজ্ঞতা, নিত্য নতুন প্রয়োজন এবং তার জটিলতার সাথে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে তাদের এবং এ কোরআনের মাঝে বাধ সেধেছে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের হিংসায় পরিপূর্ণ চৌদ্দশত বৎসরের প্রতারণা। ইহুদী এবং খৃষ্টানরা তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পর যখন জানতে পারলো যে, মুসলমানরা যতো দিন পর্যন্ত সত্যিকারার্থে সাহাবায়ে কেরামের মতো কোরআনে মজীদকে মযবুতভাবে আঁকড়ে থাকবে এবং সে মতে তাদের জীবনকে পরিচালনা করবে ততোদিন পর্যন্ত তাদেরকে কাবু করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তখন থেকে তারা দ্বীন ইসলাম এবং কোরআনে হাকীমের বিরুদ্ধাচরণ করা, মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীন থেকে গাফেল করা এবং তাদেরকে কোরআনের সরাসরি নির্দেশ থেকে দূরে সরাবার কাজ থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরত থাকেনি। তাদের সুপরিকল্পিত সুদূরপ্রসারী ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট প্রতারণার চূড়ান্ত ফল হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বর্তমান অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থা। তারা মৌখিকভাবে নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবী করলেও সত্যিকারার্থে তারা মুসলমান নয়, কারণ তারা তাদের জীবনে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা করেনি। বিশ্বব্যাপী ইসলামের শত্রুরা দ্বীন ইসলামের নিদর্শনসমূহ এবং কোরআনের অস্তিত্বকে মুছে ফেলতে চায়। কারণ তারা মনগড়া জীবন বিধান রচনা করতে চায় এবং কোরআনকে সকল বিধানের উৎস মনে করে না।

নিসন্দেহে আজকের বিশ্বে কোরআনের পতাকাবাহীরা কোরআন থেকে গাফেল। কোরআনের সার্বজনীন বাণী থেকে তারা উদাসীন। কারণ তারা কোরআন বলতে বুঝে নামাযে দৃঢ় স্থিরভাবে তার তেলাওয়াত করা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাকে সুর করে পড়া, তা দিয়ে তা'বীয লেখা এবং তেলাওয়াত শুনে মাথা নাড়তে নাড়তে আরামে এক সময় ঘুমিয়ে পড়া। মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সুদূরপ্রসারী যড়যন্ত্রেরই ফসল। যে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেছে এবং তাদের চিন্তা চেতনার মাঝে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে।

এ সেই কোরআন– যার থেকে প্রাচীন যুগের জাহেলরা তৎকালীন জনসাধারণকে বৈষয়িক মোজেযা চেয়ে কোরআন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো। আর বর্তমান যুগের জাহেলরা তাদের

মনগড়া নতুন কোরআন এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের দ্বারা জনসাধারণকে তার থেকে ফিরিয়ে রাখছে। অথচ এ কোরআন সম্পর্কে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

'এটি তো অন্তরদৃষ্টির আলো, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এবং হেদায়াত ও রহমত তাদের জন্যে যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে।'

অর্থাৎ এই কোরআন তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আগত বহুবিধ দলীল-প্রমাণ ও মোজেযার এক সমাহার। যারা একে মেনে নেয় তারা জীবনের সঠিক-সরল পথ পেয়ে যায়, অধিকন্তু তারা আল্লাহর অফুরন্ত করুণারও ভাগীদার হয়।

কোরআন তেলাওয়াতের সময় মন দিয়ে শোনা

কোরআনে পাকের তেলাওয়াত শুরু হলে মোমেনদের তার সাথে কি ধরনের আচরণ করা উচিত সেই দিক নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

'যখন তোমাদের সামনে কোরআন পড়া হয়, তা মনোযোগ সহকারে শোনো এবং নীরব থেকো, হয়তো তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হবে।'

যে কোরআনের দিকে ইংগিত করে এ সূরার সূচনা হয়েছিলো, সেই কোরআনের দিকে ইংগিত করেই তার সমাপ্তি হতে যাচ্ছে। সূচনায় বলা হয়েছিলো, 'এটি তোমার প্রতি নাযিল করা একটি কেতাব। কাজেই তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোনো সংকোচ না থাকে। এটি নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে তুমি অস্বীকারকারীদেরকে ভয় দেখাবে এবং মোমেনদের জন্যে এটি হবে একটি স্মারক।'

কোরআন তেলাওয়াতের সময় নীরব থেকে তা শ্রবণ করার স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ ও বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়েছে। কারো কারো মতে, এই নীরব থাকার স্থান হচ্ছে ফরয নামায। কেবল মাত্র ইমাম যখন ফরয নামাযে উচ্চ স্বরে কেরাআত পড়বেন, তখনই মোকতাদীদের নীরব থেকে ইমামের কেরাআত শুনতে হবে। ইমামের কেরাআতের সাথে ঝগড়া করবে না। এটা ইমাম আহমদ ও হাদীস বিশারদগণের অভিমত। ইমাম তিরমিযী (র.) এ সম্পর্কে বলেন, এটা হাসান হাদীস। আবু আক্সামা আবু হোরায়রা থেকে ইমাম যুহরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে ইমাম আবু হাতেম আল রাযী সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা রসূলে কারীম (স.) নামাযে উচ্চস্বরে কেরাআত পড়ার পর কামরার দিকে ফেরার পথে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি এখন নামাযে আমার সাথে কেরাআত পড়েছে? প্রত্যুত্তরে জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি পড়েছি। তখন রসূল (স.) বললেন, আমার কি হলো যে, আমি কোরআনের সাথে ঝগড়া করছি?

তখন থেকে সাহাবায়ে কেরাম জেহরী নামাযে কেরাআত পড়া থেকে বিরত থাকতেন। অনুরূপ একটি হাদীস ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। আবু কোরাইব আল মুহারিবীর সূত্রে, তিনি দাউদ বিন আবী হিন্দ, তিনি বশীর বিন জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। বশীর বিন জাবির বলেন, একদা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ নামায পড়ার সময় জনগণকে ইমামের সাথে কেরাআত পড়তে শুনলেন। অতপর ইমাম চলে যাওয়ার পর উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, আল্লাহর এ নির্দেশটি ('যখন কোরআন তোমাদের সামনে পড়া হয়, তা শোনা মনোযোগ সহকারে এবং নীরব থাকো, হয়তো তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হবে।') বুঝা এবং হৃদয়ঙ্গম করার সময় কি তোমাদের জন্যে এখনো হয়নি?'

কেউ কেউ মনে করেন, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন যে, তারা যেন মোশরেকদের মতো না হয়। রসূল (স.) নামায পড়ার সময় মক্কার মোশরেকরা রসূলের পাশে এসে জড়ো হয়ে একে অপরকে বলতো, 'তোমরা এ কোরআন শ্রবণ

করো না এবং এর আবৃত্তিতে হট্টগোল সৃষ্টি করো, যাতে তোমরা জয়ী হও।' অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের কথার জবাবে নাযেল করেন, 'যখন কোরআন তোমাদের সামনে পড়া হয়, তা শোনো মনোযোগ সহকারে এবং নীরব থাকো।' আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াতটি নামাযের প্রসংগে নাযিল হয়েছে। এ ধরনের হাদীস আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আবু হোরায়রা, জাবের, যুহরী, ওবাদুল্লাহ বিন ওমায়র, আতা বিন রাবাহ এবং সাঈদ বিন আল মোসায়েব (রা.) থেকে বর্ণিত।

ইবনে জারীর এ আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আবু কোরাইব আবু বকর বিন আয়্যাশের সূত্রে আসেম, তিনি আল মোসায়েব বিন রাফি থেকে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, আমরা একে অপরকে নামাযের মধ্যে সালাম দিতাম। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়, 'যখন কোরআন তোমাদের সামনে পড়া হয়, তা শোনো মনোযোগ সহকারে এবং নীরব থেকো। হয়তো তোমাদের প্রতিও রহমত বর্ষিত হবে।'

আল্লামা কুরতুবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে মোহাম্মদ বিন, কা'ব আল কুরযী থেকে বর্ণনা করেন। রসূল (স.) যখন নামাযে কেরাআত পড়তেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁর পশ্চাৎ থেকে হুবুহু তা উচ্চসরে আওড়াতেন। যখন রসূল (স.) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তেন, তখন তারাও তা পড়তেন। অনুরূপভাবে সূরায়ে ফাতেহা ও তার সাথের অন্য সূরাও তাঁরা রসূলের সাথে পড়তেন। এমন অবস্থা কিছুদিন চলার পর আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হলো, 'যখন কোরআন তোমাদের সামনে পড়া হয়, তা শোনো মনোযোগ সহকারে এবং নিশ্চুপ থাকো। হয়তো তোমাদের প্রতিও রহমত বর্ষিত হবে।' এর দ্বারা বুঝা গেলো নীরব থাকার অর্থ হচ্ছে, উচ্চস্বরে কেরাআত না পড়া, যা তারা রসূল (স.)-এর সাথে পূর্বে করতেন।

অনুরূপভাবে আল্লামা কুরতুবী কাতাদা থেকে এ আয়াত প্রসংগে রেওয়ায়াত করেন, সাহাবায়ে কেরাম নামাযে থাকাবস্থায় কেউ আসলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতো, তোমরা কতো রাকআত নামায পড়েছো? আর কতো রাকাত বাকি আছে? তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।' যখন কোরআন তোমাদের সামনে পড়া হয়, তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো।' মোজাহেদ থেকেও বর্ণিত আছে যে, তারা নামাযে তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের শানে নাযিল করেন, ' .... আশা করা যায় তোমাদের ওপর করুণা বর্ষিত হবে।'

যে সকল মোফাসসের মনে করেন, এ আয়াতটি নামাযে কেরাআত পড়ার সাথে নির্দিষ্ট, তারা ইবনে জরীর থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। তিনি বলেন, হুমায়দ বিন মাস্আদা বিশর বিন মুফাযযাল, তিনি জারীরীর সূত্রে তালহা বিন উবাইদুল্লাহ বিন কোরায়য থেকে বর্ণনা করেন। জারীরী বলেন, আমি ওবায়দ বিন ওমায়র এবং আ'তা বিন আবী রাবাহকে জনৈক ক্বারী কেরাআত পড়ার সময় পরস্পর কথাবার্তা বলতে দেখে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, তোমরা কি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত শুনছো না এবং তার ওয়াদার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না? ('......... আশা করা যায় তোমাদের ওপর করুণা বর্ষিত হবে।') তারা উভয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে পুনরায় তাদের কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগলেন। পুনরায় আমি তাদেরকে কোরআন কারীমের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিলাম। তারা পূর্বের মতোই আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। তৃতীয় বার যখন আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, তখন তারা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা তো নামাযের ক্ষেত্রে। 'যখন কোরআন তোমাদের সামনে পড়া হয়, তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো এবং নীরব থাকো।' ইবনে কাসীরও উক্ত হাদীসটি তাঁর

তাফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত করে বলেছেন, এটা নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে সুফিয়ান ছাওরী আবু হাশেম সূত্রে মোজাহেদ থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। আবদুর রাযযাক ছাত্তরী থেকে, তিনি লাইছ থেকে, তিনি মোজাহেদ থেকে বর্ণনা করেন। মোজাহেদ বলেন, নামাযের বাইরে কেরাআত পড়ার সময় কথাবার্তা বলতে কোনো কোনো বিধি নিষেধ নেই।

কোনো কোনো ফকীহর অভিমত হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং নীরব থাকার হুকুমটি যেমন নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি জুময়া এবং দুই ঈদের খুত্বার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই অভিমত সাঈদ বিন জোবায়র, মোজাহেদ, আতা, আমর বিন দীনার, ইয়াযীদ বিন আস্লাম, আল কাসিম বিন মুখাইমারা, মুসলিম বিন ইয়াসার. শাহর বিন হাওশব, আবদুল্লাহ বিন মুবারক (রা.)-এর আল্লামা কুরতুবী বলেন, এ অভিমতটি দুর্বল, কারণ জুময়া ও দুই ঈদের খুতবার মাঝে কোরআনের আয়াতের পরিমাণ কম। অথচ পুরো খুতবা চলাকালীন চুপ থাকা ওয়াজিব। এ অভিমতটি ইবনুল আরাবী ও নাক্কাশের। তারা বলেন, উপরোক্ত আয়াতটি মক্কী। অথচ মক্কাতে হিজরতের পূর্বে জুময়া এং খোতবা কিছুই ছিলো না।

আল্লামা কুরতুবী তার তাফসীর গ্রন্থে নাক্কাশের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তাফসীর বিশারদরা এ ব্যাপারে ঐকমত্য যে, ফরয এবং অ-ফরয উভয় নামাযেই মনোযোগ সহকারে কেরাআত শোনা এবং নিশ্চুপ থাকা ওয়াজিব। নাহ্যাস বলেন, স্বাভাবিকভাবে উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে সর্বাবস্থায় চুপ থাকা ওয়াজিব হওয়াকে বুঝায়, কিন্তু হাঁ, এটাকে নির্দিষ্ট করার মতো অন্য কোনো দলীল প্রমাণ পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা।

আমরা উল্লেখিত আয়াতটিকে ফরয এবং অ-ফরয নামাযের সাথে নির্দিষ্ট করা ও এর নাযেল হবার কারণের দিকে তাকাবো না। কারণ বক্তব্যের ব্যাপকতাটাই এখানে বিষয়– নির্দিষ্ট পটভূমি নয়। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে, এ আয়াতের হুকুম ব্যাপক– নির্দিষ্ট নয়। কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার সময় মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং নীরব থাকা কোরআন শরীফ এবং তার নাযিলকারীর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের অধিকতর উপযোগী। যদি আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কোনো বক্তব্য রাখেন, মানুষ কি তা মনোযোগ সহকারে নীরবে শুনবে না? অবশ্যই। আর রহমতের আশায় তো অবশ্যই শুনবে। 'আশা করা যায় তোমাদের ওপর করুণা বর্ষিত হবে।' সুতরাং এ হুকুমটাকে নামাযের সাথে নির্দিষ্ট করার কী আছে? যে কোনো স্থানে কোরআন তেলাওয়াত করা হোক না কেন, যদি কোনো মানুষ তা মনোযোগ দিয়ে শুনে ও চুপ থাকে, তবে আশা করা যাচ্ছে যে, সে তা অনুধাবন করবে, এতে প্রভাবিত হবে ও তার আহ্বানে সাড়া দেবে। এর ফলশ্রুতিতে ইহকালে ও পরকালে তার ওপর করুণা বর্ষিত হবে।

কোরআনে কারীম থেকে বিমুখ হওয়ার ফলে মানুষ যে ক্ষতির শিকার হবে, তার ক্ষতিপূরণ অন্য কোনো জিনিসের মাধ্যমেই সম্ভব নয়। কোরআনে কারীমের একটি আয়াত নীরবে মনোযোগ সহকারে শুনলে কখনো তা অন্তরে এমন আশ্চর্য ধরনের আবেগ অনুভূতি, প্রভাব, উপলব্ধি, মানসিক সুখ শান্তি এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী গতি সৃষ্টি করে, যা একমাত্র স্বাদ আস্বাদনকারী ছাড়া অন্য কেউ উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়।

শুধু তেলাওয়াত বা সুর ধরে কোরআন পড়া ছাড়া যদি সত্যিকারার্থে কেউ কোরআনে হাকীম অনুধাবন করে অধ্যয়ন করে, তা অন্তরে এবং বিবেকের মাঝে এমন সুদূর প্রসারী প্রত্যয়ী জ্ঞান, উষ্ণতা, উদ্যম গতি গ্রহণ করার মানসিকতা, দৃঢ়তা এবং স্থিরতা সৃষ্টি করে, অন্য কোনো অনুশীলন, জ্ঞান বা পরীক্ষা কিছুতেই এর সমকক্ষ হতে পারে না।

আল্লাহর যেকের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

এ সূরার ইতি টানা হচ্ছে আল্লাহর যেকের (স্মরণ)-এর প্রতি দিক-নির্দেশনা দেয়ার মাধ্যমে। আর এটা নামাযের ভিতরেও হতে পারে, বাইরেও হতে পারে। (আয়াত ২০৫-২০৬)

আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় তাঁর বেশী বেশী স্মরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। অনুরূপভাবে তিনি এ দু'সময়ে বেশী বেশী তাঁর এবাদাতের জন্যে নির্দেশ দিচ্ছেন, 'হে নবী, আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে।' এই নির্দেশটি মেরাজের রাত্রে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয হওয়ার পূর্বের ঘটনা। উপরোক্ত আয়াতটি মক্কী। 'আল গুদুব্বু' শব্দের অর্থ, সকাল বেলা, দিনের প্রথম ভাগ। 'আল আসালু' শব্দটি আসীলুন শব্দের বহুবচন, যার অর্থ, সন্ধ্যা বেলা। 'আল আসালু'-এর অনুরূপ হচ্ছে- 'আল-আয়মানু'। তার একবচন হচ্ছে, ইয়ামীনুন। 'তাযাররুআন ওয়া খীফাতান' কান্নাজড়িত স্বরে ও ভীত বিহ্বল চিত্তে। 'দুনাল জাহরি মিনাল কাওলে'- এর অর্থ, অনুচ্চ কণ্ঠ। অর্থাৎ এমন স্বরে ক্রন্দন করা! যা চীৎকার করে বলা অপেক্ষা কম। অতএব, আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায়, হে নবী! তোমার রবকে স্মরণ করো সকাল-সাঁঝে মনে মনে কান্নাজড়িত স্বরে ও ভীত বিহবল চিত্তে এবং অনুচ্চ কণ্ঠে। এটাই যেকেরের মোস্তাহাব পদ্ধতি, যেকের এমন সুউচ্চ কণ্ঠে হবে না, যা ডাকাডাকির পর্যায়ে পড়ে। এজন্যেই যখন সাহাবায়ে কেরাম রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের নিকটেই থেকে থাকেন, তবে আমরা আস্তে আস্তে দোয়া করবো এবং তাঁকে ডাকবো। আর যদি দূরে থেকে থাকেন, তবে উচ্চ-স্বরে ডাকবো। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন,

'আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে-বস্তুত আমি রয়েছি একান্ত সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করি, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে।'

সহীহ বুখারী এবং মুসলিম শরীফে আবু মূসা আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে সাহাবায়ে কেরাম উচ্চস্বরে দোয়া করতে লাগলেন, তখন নবী কারীম (স.) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে মানব সকল, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে কষ্ট দিওনা অর্থাৎ তোমরা আস্তে আস্তে ডাক। কারণ তোমরা কোনো বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। যেই সত্তাকে তোমরা ডাকছো, তিনি তিক্ষ্ণ শ্রবণশক্তির অধিকারী এবং তিনি তোমাদের খুবই কাছে। এমনকি তিনি তোমাদের কারো বাহন (সাওয়ারী)-এর চেয়েও অধিক কাছে।'

আল্লামা ইবনে কাসীর এক্ষেত্রে ইবনে জারীরের অভিমতটি গ্রহণ করেননি, বরং আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম ইবনে জারীরের অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। ইবনে জারীর এবং তাবারীর মতে উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে, কোরআনের শ্রোতাকে শোনার সময় অনুচ্চ স্বরে যেকের করা। ইবনে কাসীর বলেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বান্দাদের সকাল বিকাল আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করার প্রতি উৎসাহিত করা, যাতে তারা তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল না হয়ে পড়ে। আর এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের প্রশংসা করেছেন যারা অবিরাম ক্লান্তিহীনভাবে দিবারাত্রি তাঁর তাসবীহ ও গুণ বর্ণনা করে যাচ্ছে। তাদের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা তোমার পরওয়ারদেগারের সান্নিধ্যে রয়েছে, তারা তাঁর বন্দেগীর ব্যাপারে অহংকার করে না।'

আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের কথা এখানে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, যাতে মানুষ অধিক আনুগত্য এবং এবাদাতের ক্ষেত্রে ফেরেশতাদের অনুসরণ করে।

আল্লামা ইবনে কাসীর এ প্রসংগে যে সমস্ত হাদীসের অবতারণা করেছেন, তার প্রতি তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, কোরআনে করীম এবং নবী কারীম (আ.)-এর শিক্ষা আরববাসীদের

কাছে তাদের প্রভুর ধারণা এবং তাদের চতুর্পার্শ্বের প্রকৃতির জ্ঞান কতোটুকু পৌঁছে দিয়েছিলো? অনুরূপভাবে আমরা তাদের প্রশ্নোত্তরের আলোকে ওই পরিধিও উপলব্ধি করতে পারি, যেই ধাপে দ্বীন ইসলাম কোরআনে হাকীম এবং নবী কারীম (স.)-এর সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমে তাদেরকে পরিবর্তন করেছে। নিসন্দেহে এটি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ব্যাপার— যাতে রয়েছে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত এবং করুণা।

কোরআন ও হাদীসের আলোকে শুধু ঠোঁট ও জিহবার যেকেরকে যেকের বলা হয় না এবং সত্যিকারের যেকের হচ্ছে অন্তরের যেকের। ওটা সত্যিকার আল্লাহর যেকের বা স্মরণ নয়, যাতে আবেগ অনুভূতিতে শিহরণ জাগে না, অন্তরে কোনো কম্পন সৃষ্টি হয় না, আত্মায় প্রশান্তি আসে না এবং ভয় ভীতি এবং কান্না তাতে মিশ্রিত হয় না, বরং সে যেকর আল্লাহর মর্যাদার সাথে বে-আদবী বৈ আর কিছুই নয়। সত্যিকারের যেকের হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিজকে পুরোপুরি সঁপে দেয়া এবং বিনয়, ভয় ও তাকওয়ার মাধ্যমে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। অধিকন্তু আল্লাহর মর্যাদা এবং মহত্ত্বকে স্মরণ করা, তাঁর অভিশাপ এবং শাস্তির ভয়কে মনে জাগানো এবং তাঁর রহমতের আশা করা এবং সর্বশেষে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার কথা মনে রাখা, যাতে মানুষের আত্মিক উপাদানটি বিশুদ্ধ হয় এবং তার ঐশী উৎসের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়।

যখন অন্তরের সাথে সাথে জিহবা নড়ে এবং যখন ঠোঁট তার আত্মার সাথে কথা বলে, অর্থাৎ মানুষের প্রত্যেকটি কাজ এমনভাবে সম্পাদন করা উচিত, যা নম্রতা, ভদ্রতা ও কাকুতি মিনতির পরিপন্থী না হয়, আর এ যেকের অনুচ্চস্বরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মুখে সিটি বাজানো, হাততালি দেয়া, চিৎকার করা, গন্ডগোল করা এবং গান-বাদ্যের ধ্বনির ন্যায় যেকের সুউচ্চ ধ্বনিতে না হওয়াই উচিত। মোট কথা, অত্যন্ত জোরে চিৎকার করে যেকর করা বাঞ্ছনীয় নয় বরং মাঝামাঝি আওয়াযে তা করা উচিত— যাতে আল্লাহর আদব এবং মর্যাদাবোধের প্রতি লক্ষ্য থাকে, অতি উচ্চস্বরে যেকর বা তেলাওয়াত করাতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, যার উদ্দেশ্যে যেকর করা হচ্ছে, তাঁর প্রতি কোনো রকম মর্যাদাবোধ অন্তরে নেই। যে সত্ত্বার সম্মান ও মর্যাদা মানুষের মনে বিদ্যমান থাকে, তাঁর সামনে স্বভাবগতভাবেই মানুষ অতি উচ্চস্বরে কথা বলতে পারে না। কাজেই আল্লাহর সাধারণ যেকেরই হোক, কিংবা কোরআনের তেলাওয়াতই হোক, যখন আওয়াযের সাথে পড়া হবে, তখন সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যাতে করে তা প্রয়োজনের চাইতে বেশী উচ্চস্বরে না হয়।

'হে নবী! তোমার রবকে স্মরণ করো সকাল সাঁঝে মনে মনে কান্নাজড়িত স্বরে ও ভীতি বিহবল চিত্তে এবং অনুচ্চ কণ্ঠে।' 'বিল্-গুদুব্বি ওয়াল আসাল'-এর অর্থ দিনের প্রথমভাগ এবং শেষভাগ।

মানব অন্তর সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকবে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর যেকর এ সময়ের মাঝে সীমিত থাকবে। আল্লাহর স্মরণ মানব অন্তরে সর্বাবস্থায়ই থাকা উচিত। তাঁর তদারকির ভয় মানব অন্তরে প্রতি মুহূর্তে জাগরূক থাকা উচিত। কিন্তু সকাল সন্ধ্যা এ দুটি সময় নির্দিষ্ট করার অর্থ হচ্ছে, এই দু'সময়ে মানুষ সৃষ্টির পাতায় সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করে— যথা দিন থেকে রাত, আবার রাত থেকে দিন। এ দু'মুহূর্তে মানুষের অন্তর তার আশপাশের অস্তিত্বের সাথে ঘনিষ্ট হয়ে পড়ে। সে আল্লাহর কুদরত পর্যবেক্ষণ করে যে, তিনি কিভাবে রাত্রিকে দিন এবং দিনকে রাত্রিতে পরিণত করেন এবং পৃথিবীর বাহ্যিক অবস্থায় পরিবর্তন সাধন করেন। নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি ভালো করেই অবগত আছেন যে, মানব অন্তর এই দু'সময়ে প্রভাবিত হওয়া এবং সাড়া দেয়ার মতো অবস্থায় থাকে, কোরআনে কারীমে ওই সময়ে আল্লাহর যেকর ও তাসবীহ তাহলীল বেশী বেশী করার নির্দেশ এসেছে, যে সময় গোটা সৃষ্টিজগত মানুষের অন্তরকে প্রভাবিত করে, তাকে নরম করে এবং তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্যে সবাইকে আগ্রহান্বিত করে তোলে। এ প্রসংগে নিম্নে কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো।

যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা ক্বাফে এরশাদ করেছেন,

'অতএব, তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন। রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণ করুন এবং নামাযের পরেও।'

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আপনি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন রাত্রির কিছু অংশ এবং দিবাভাগে, সম্ভবত তাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।'

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা সূরা আদ দাহরে এরশাদ করেন,

'হে নবী! সকাল সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সেজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন।'

এ কথা বলার কোনো প্রযোজন নেই যে, উপরোল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ে যেকরের নির্দেশটি পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয হওয়ার পূর্বের ঘটনা। আর নামায ফরয হওয়ার পর এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এ যেকের শুধু নামাযের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তার চেয়ে ব্যাপকতর। সুতরাং তার সময়ও ফরয নামাযের সময়-সীমার সাথে সীমাবদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে এ যেকের ফরয ও অ-ফরয নামাযের আকৃতি ছাড়া অন্য আকৃতিতেও হতে পারে, যেমন শুধু অন্তরের যেকের অথবা অন্তর ও মুখের যেকের। আসলে যেকেরের ব্যাখ্যা তার চেয়েও ব্যাপকতর। যেকের হচ্ছে আল্লাহ পাকের মর্যাদা ও মহত্ত্বকে সর্বদা মনে জাগরূক রাখা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, ছোট ও বড় অপরাধ এবং কাজ করা এবং নিয়তের ক্ষেত্রে আল্লাহকে হাযির নাযির জানা। যেকের হচ্ছে, সকাল, বিকাল এবং রাতে আল্লাহকে স্মরণ করা। কারণ এতে মানব অন্তরে যথেষ্ট প্রভাব পড়ে যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

'তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না যারা গাফলতির মাঝে ডুবে আছে।'

আল্লাহর যেকের থেকে উদাসীন বলতে ওদেরকে বুঝায়, যারা অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করে না। যেই যেকরে যেকেরকারীর অন্তরে শিহরণ জাগে ও মন প্রকম্পিত হয়, সে ব্যক্তি কখনো এমন পথে চলতে পারে না– যা আল্লাহ তায়ালা জানলে তাকে তার কাছে লজ্জিত হতে হবে। সে এমন কোনো কাজ করতে পারে না, যা আল্লাহ তায়ালা দেখলে তাকে শরমিন্দা হতে হবে। তৎসাথে তাকে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, তার ছোট-বড় সকল কাজের জন্যে তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এটাই যেকরের প্রকৃত সংজ্ঞা। আল্লাহর যেকের যদি কোনো ব্যক্তিকে তাঁর আনুগত্য, সৎ কাজ, ভালো ব্যবহার এবং রসূলের অনুসরণের প্রতি ধাবিত না করে তাহলে সেটা সত্যিকারের যেকর নয়।

হে নবী! তুমি তোমার প্রভুকে স্মরণ করো। তাঁর স্মরণ থেকে বেখবর হবেন না। তোমার অন্তর তাঁর তদারকির ব্যাপারে উদাসীন হওয়া উচিত নয়। শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজকে বাঁচাবার জন্যে সর্বদা একটি মানুষকে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। তাই তিনি বলেন,

'আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।'

সূরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা মানুষ এবং শয়তানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ঈমানের কাফেলার সামনে জ্বিন এবং মানুষ শয়তানের প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি বনী ইসরাঈলের সেই আলেমের ঘটনার অবতারণা করলেন, যাকে তিনি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলেন। পরে সে তা পরিহার করে দ্বীন থেকে বেরিয়ে গেছে। আসলে তার পেছনে শয়তান লেগেছিলো। ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

সর্বশেষে তিনি শয়তানের প্ররোচনা এবং তার থেকে বাঁচার জন্যে তাঁর দরবারে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে মনে কান্নাজড়িত স্বরে ও ভীত বিহবল চিত্তে তাঁর স্মরণ করা এবং গাফেল না হওয়ার জন্যে নির্দেশ করেছেন। এই আদেশ এবং নিষেধ এসেছে আল্লাহর ওই দিক-নির্দেশনার পথ ধরে, যেখানে তিনি রসূলকে কোমলতা ও ক্ষমার পথ অবলম্বন করা, সৎ কাজের উপদেশ দিতে থাকা এবং মূর্খদের সাথে বিতর্কে না জড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটা একজন আল্লাহর সৈনিকের জন্যে পথ নির্দেশিকা, যে বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে মানুষকে হকের পথে দাওয়াত দিতে থাকবে।

অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নৈকট্য হাসিলকারী কিছু সংখ্যক ফেরেশতার উদাহরণ পেশ করেছেন। যাদেরকে শয়তান ধোকা দিতে পারে না। তাদের চরিত্র গঠনে শয়তানের কোনো ভূমিকা নেই। তাদেরকে কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ কাবু করতে পারে না। তারা সদা আল্লাহর যেকের আযকার এবং তাসবীহ তাহলীলে মগ্ন থাকে। কখনো তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করে তাঁর এবাদাত থেকে বিরত থাকে না। যেখানে ফেরেশতারা পাক পংকিলতার উর্দ্ধে থাকা সত্তেও আল্লাহর গুণ কীর্তন ও প্রশংসা থেকে বিরত থাকে না, সেক্ষেত্রে একজন পাপী-তাপী মানুষের জন্যে তা তাঁর যেকের, এবাদাত, করা এবং মহিমা ঘোষণা করা আরো অনেক বেশী প্রয়োজন। কারণ তার পথ বন্ধুর, শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনাও বেশী, আর তার প্রতিরোধ ক্ষমতাও খুব সীমিত। আল্লাহর সাহায্য ও রহমত যদি তার এ পথ চলার সাথী না হয়, তবে এ পথ অতিক্রম করা তার পক্ষে নিতান্তই দুষ্কর।

'নিশ্চয়ই যারা তোমার পরওয়ারদেগারের সান্নিধ্যে রয়েছেন, তারা তাঁর বন্দেগীর ব্যাপারে অহঙ্কার করে না এবং স্মরণ করে তাঁর পবিত্র সত্তাকে, আর তাঁকেই সেজদা করে।'

নিসন্দেহে এবাদাত এবং যেকর এ দ্বীনের প্রধান উপাদান। এটা তত্ত্বগত জ্ঞান এবং বাদানুবাদের বিধান নয়। এটা মানব সমাজের পরিবর্তনের জন্যে বাস্তব আন্দোলনের একটি বিজ্ঞানসম্মত বিধান। আল্লাহর বিধান মোতাবেক তাঁর মরযীমাফিক বর্তমান জাহেলী সমাজকে পরিবর্তন করে তাকে খোদায়ী সমাজে রূপান্তরিত করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এর জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘ সংগ্রাম, প্রচেষ্টা এবং প্রচুর ধৈর্যের। আল্লাহর পথে আহবানকারী একজন ব্যক্তির শক্তি সামর্থ এখানে নিতান্তই সীমিত। আল্লাহ প্রদত্ত সম্বল ও রসদ ছাড়া এ কষ্টের মোকাবেলা করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। এ রসদ বা সম্বল– শুধু জ্ঞান বা জানারই নাম নয়। একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবাদাত করা এবং তার সাহায্য চাওয়াই এ দুর্গম বন্ধুর পথের সম্বল, রসদ এবং একমাত্র অবলম্বন।

সূরার শেষ নির্দেশিকাটি হচ্ছে ঈমানের কাফেলার জন্যে পথ চলার পাথেয়। এই সূরার সূচনা হয়েছিলো আল্লাহর নিম্নোক্ত নির্দেশের মাধ্যমে– 'এটি একটি গ্রন্থ, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে করে তুমি এর মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করতে পারো। সুতরাং তোমার মনে কোনো সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়।.......... এটা হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্যে উপদেশ।' এ সূরার ভেতরে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূলদের একটি সম্মানিত কাফেলার নেতৃত্বে এক ঈমানের কাফেলার অনন্তর যাত্রা, যাদের গতিপথে বাঁধ সেধেছে অভিশপ্ত শয়তানের প্রতারণা, জ্বিন এবং মানুষ শয়তানের ধোকা। এ ধরায় প্রতাপশালীদের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং মানুষের কাধে জেঁকে বসা তাগূতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

ওপরে যা উল্লেখ করলাম, তাই হচ্ছে ঈমানের কাফেলার একমাত্র অবলম্বন এবং দীর্ঘ বন্ধুর পথের একমাত্র পাথেয়।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্‌র
সূরা আন নাহ্‌ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্‌ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড

সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ
সূরা আল হুজুরাত
সূরা ক্বাফ
সূরা আয যারিয়াত
সূরা আত তূর
সূরা আন নাজম
সূরা আল ক্বামার

২০তম খন্ড

সূরা আর রা[illegible]
সূরা আল ওয়াক্বেয়া
সূরা আল হাদীদ
সূরা আল মোজাদালাহ
সূরা আল হাশর
সূরা আল মোমতাহেনা
সূরা আস সাফ
সূরা আল জুমুয়া
সূরা আল মোনাফেকুন
সূরা আত তাগাবুন
সূরা আত তালাক্ব
সূরা আত তাহ্রীম

২১তম খন্ড

সূরা আল মুলক
সূরা আল ক্বালাম
সূরা আল হাক্বাহ
সূরা আল মায়ারেজ
সূরা নূহ
সূরা আল জ্বিন
সূরা আল মোযযাম্মেল
সূরা আল মোদ্দাসসের
সূরা আল ক্বেয়ামাহ
সূরা আদ দাহর
সূরা আল মোরসালাত

২২তম খন্ড

সূরা আন নাবা
সূরা আন নাযেয়াত
সূরা আত তাকওয়ীর
সূরা আল এনফেতার
সূরা আল এনশেক্বাক
সূরা আল বুরুজ
সূরা আত তারেক
সূরা আল আ'লা
সূরা আল গাশিয়া
সূরা আল ফজর
সূরা আল বালাদ
সূরা আশ শামস
সূরা আল লায়ল
সূরা আল এনশেরাহ
সূরা আত তীন
সূরা আল আলাক্ব
সূরা আল ক্বদর
সূরা আল বাইয়্যেনাহ
সূরা আয যেলযাল
সূরা আল আদিয়াত
সূরা আল ক্বারিয়াহ
সূরা আত তাকাসুর
সূরা আল আসর
সূরা আল হুমাযাহ
সূরা আল ফীল
সূরা কোরায়শ
সূরা আল কাওসার
সূরা আল কাফেরূন
সূরা আন নাসর
সূরা লাহাব
সূরা আল এখলাস
সূরা আল ফালাক্ব
সূরা আন নাস